

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

---

অষ্টাদশ ভাগ

— ০ —

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মল্লিক

---

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

২৪৩১ আগার মার্কেটার রোড,  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হইতে প্রকাশিত

---

কলিকাতা

২১৩ নং শান্তি রাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

“বিশ্বকোষ-প্রেসে”

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

১৩১৮

# অষ্টাদশ ভাগের সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আসাম ভ্রমণ [ ২য় প্রবন্ধ ] ( শ্রীপদ্মনাথ বিহ্মাবিনোদ এম্ এ )	১৮১
কামতাবিহারী ভাবাসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ( শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেনহানবীশ )	২১৯
কুন্তিবাসের জন্ম-শক ( শ্রীবোধেশচন্দ্র রায় দিগ্বানিধি, এম্ এ )	২৩
কোটবিহারেব ভাষা ও সাহিত্য ( শ্রীজ্ঞানিকাচরণ গুপ্ত )	২২৭
চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ( শ্রীবসন্তবজ্রণ বায় দিদ্যল্লভ )	১২৩
চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি ( শ্রীএকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় )	১৯৩
জীবগণের রোম ও কেশের একটা নূতন ব্যবস্থা ( শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য )	২৪৯
হিনাথের উপাখ্যান ( চৌধুরী বিশ্বনাথ দশমুখী )	২৫
ছুঁখানি অসমীয়া পুথি [ কথাভাগবত ও সুকন্যায় ] ( শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে )	১২০
নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা	
( ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এম্, বি এম্ সি )	১৭
গাটপনাতন ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্গম ( শ্রীজ্ঞানিকাচরণ ব্রহ্মচারী )	১০৭
প্রাচীন পদাবলী ও পদকল্পগণ [ গোবিন্দদাস কবিবাজ ] ( শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ )	৬৫
প্রাচীন পুথির বিবরণ ( শ্রীআবুল করিম )	২৯
বঙ্গভাষায় বর্ণযোজনা ও উচ্চারণ ( শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় )	২৫১
বঙ্গ পদ্য গীতপ্রভাব ও বঙ্গভাষায় পদ্যপ্রভাব ( শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্, বি, এল্ )	৪৫
বঙ্গের আদিমসম্প্রদায় ও শাক্তপীত্ৰাঙ্গণ ( শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী )	২৬১
বঙ্গালসেনের তান্ত্রশাসনের পাঠশোধন ( পত্রিকা-সম্পাদক )	১৩৭
ব্যাকরণের সন্ধি ( শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ )	৯
মাগধের পল্লীভাষা ( শ্রীহরিদাস পালিত )	১৩৭
রাজা দত্তবাস কে ? ( পত্রিকা-সম্পাদক )	১৯৭
রাগক কুলস্তম্ভের তান্ত্রশাসন ( পত্রিকা-সম্পাদক )	৫৯
শিবের গাজন ( শ্রীহরিদাস পালিত )	২০১
সভাপতির অভিভাষণ ( শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ )	১
সূর্য্যমূর্ত্তিসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৯৫
হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ( শ্রীচরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ )	১৩৩
১৩১৮ সালের কার্য-বিবরণী	...

## প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ" প্রবন্ধের ত্রয় সংশোধন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত সংখ্যায় মুদ্রিত "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ (গোবিন্দদাস কবিবাজ)" শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ছাপার ভুলগুলি রহিয়াছে যথা, ১-

পত্রসংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	২৯৫	সাহিত্য	হাতে
৭০	১২	বরিধান	বরিগনে
"	১৫	বহল	রহল
৭৩	১৩।১৯।২১।২৭	তদ্বাব	তদ্বব
৭৪	৫	জাবল	জারল
"	৬	দেখবি	দেখ রি
"	৩০	মকরন্দ	মরন্দ
৭৫	৭	কাণ্ড	কান্ত
"	১১	কুক্ষ্মাঙ্কিত	কুক্ষ্ম-অঙ্কিত
"	১২	কুণ্ডল বণ্ড	কুণ্ডলবস্ত
৭৬	১৫	কুলে	ফুলে
৭৭	৩২	নির্দিষ্ট	অনির্দিষ্ট
৭৮	১	পসার	পয়ার
"	১০	ভাবম্	ভারম্
"	১২	কবিতা	রচয়িতা
"	১৮	অক্ষরের	ষোল অক্ষরের
৭৯	১০	করাইতে	করইতে
"	"	বাগী	বাণী
"	১৩	রণ ঠাট	রস ঠাট
৮০	১	কালে	ফলে
"	১০	বাবু আই-লা	বন্ধু আইলা
৮১	৪	সাধাবি	সাধবি
"	৫	দিশতি	দিনহি
"	২৪	বিষয়	বিধায়
৮২	৫	কাটে	বাটে
"	৬	চুষিয়ে	চুষয়ে
"	১৬	পংক্তির পর "সুন্দর পড়িল প্রেমভরঙ্গে ॥ বিজ্ঞানসুন্দর।"	
		পংক্তিটির পূর্বে "মাতিল বিজ্ঞা বিপরীত রঙ্গে।" অতিরিক্ত	
		পংক্তিটি হইবে।	
৮৪	৯	কানড়া	কানড়
"	১৯	কারণ	কারক
"	২০	হিন্দী, মৈথিল	হিন্দী মৈথিল
"	২৪	উচ্চ	উঠত
"	"	ভ্রমরা	ভ্রমরী
"	২৬	আলতা	অলতা

পত্রসংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৮	পছ	পছ
"	১৫	বিরিঁদা-বন	বিরিঁদাবন
৯	৩১	লবঙ্গ	লবঙ্গল
১৬	১	লতা	তা
৮৭	১৪	নিয়মে	নিয়ম
"	২১	পয়্যারে	পয়্যারের
"	২৩	আঁকারের	আঁকারের
"	২৪	মাত্রা-ছন্দ	এবং মাত্রা-ছন্দ
৮৮	২২	ছন্দ	ছন্দের
৮৯	৬	বরিখণ্ডিয়া	বরিখণ্ডিয়া
"	৮	হণ্ডিয়া	হণ্ডিয়া
"	১৪	অংশ	অংশে
"	১৯	পাবকে	পাবকে
৯০	৯	একটি	ত্রুটি
৯২	১	দাসী	দানী
৯৩	৪	মলিন ; চিত্ত-বৃত্তি	মলিন চিত্তবৃত্তি
"	৫	নহে।	নহে—
৯৪	২১	দোহা	দেখন
৯৫	২৩	অধিকার	অধিকাংশ
৯৬	১	রবীন্দ্রনাথ	সেই রবীন্দ্রনাথ
"	২২	পংক্তির 'প্রসঙ্গেই' শব্দটির পরে 'তাহার' অল্পপ্রাসপটুতার অংশটি ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।	
৯৭	২১	কাণ	কান
৯৯	১১	ভরহি ডর-কাতর	ডরহি ডর-কাতর
"	১৬	ভারসি	ভারসি
"	২২	কিরত	কিরত
১০০	১৯	অভয়ে	অভয়ে
"	২৫	(তোমার ও আমার	(তোমার ও আমার)
"	২৭	পদটিকে	পদটিতে
১০১	১৭	প্রভেদ	অভেদ
"	১৮	এক	কান্ত
১০২	২০	মনে বিরহ	মান, বিরহ
১০৫	৩	শীত-ভাব	শীত-ভাব
১০৬	২	কন্দল	কন্দল
"	২২	গোবিন্দদাসের	গোবিন্দদাসের
"	২৫	অল্পপ্রাসপটুতা	অল্পপ্রাসপটুতা
"	২৬	কবিতা	কবিতা



## সভাপতির'অভিভাষণ

আর এক বৎসর চলিয়া গেল। আমরা মনে করিয়া যে, এবৎসবে সাহিত্যসোপানে আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, অথচ প্রকাশিত পুস্তকেব তালিকা নিতান্ত কম নহে। কেবল কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটেব পুস্তকতালিকায় প্রকাশিত পুস্তকের নামাবলী গণনা করিলে, মুদ্রায়ত্রে বেশ কাজ হইয়াছে বলিতে হইবে; কিন্তু শিশুপাঠ্য পুস্তকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মানের পুস্তকগুলি ও ব্যাকরণের সংখ্যা দেখিয়া এবং শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মাবলী গ্রন্থের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাহিত্যেব উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। শিক্ষাবিভাগের গ্রন্থ-নির্বাচন-সমিতির আমাৰ মত ছুভাগা সভাগণের কাৰ্য্যভারের পরিমাণ বৃদ্ধি সাহিত্যের উন্নতির নিদর্শন হইতে পাবে না। শিশুপাঠ্য পুস্তক বচনাতেও গ্রন্থকারগণের স্বাধীনতা নাই। শিক্ষাবিভাগেব নির্দেশমত কয়েক পৃষ্ঠা পত্ৰসংগ্রহ, কয়েকপৃষ্ঠা ব্যাকরণের স্থলস্থল নিয়মসংগ্রহ, কয়েক পৃষ্ঠা স্বাক্ষরকাব কথা, কয়েক পৃষ্ঠা সামান্য কৃষির দুই চারিটি তথ্য, দুই চারিটি হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানের জীবন-কথা, দুই চারিটি নীতিমূলক গল্প ভিন্ন আর কিছু লিখিবার উপায় নাই; স্তবং সকল পুস্তকেই সেই একই কথা; সেই “খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়”—নূতন জিনিষ কিছু থাকিতে পায় না। প্রকৃত কাব্য, ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,—লিখিতে পড়িতে পারি একরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এই শিক্ষাবিস্তারের ফলেই আমাদের মুসলমান ভাতারাও বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখিতেছেন; তাঁহাদের অনেকেই পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি লিখিতেছেন। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র পরিচালনেও তাঁহাদের মধ্যে বহু উপযুক্ত লোক দেখা দিয়াছেন। বিদ্বৎ ও ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে তৃপ্ত ও মোহিত করিতে পারেন, একরূপ অনেকগুলি মুসলমান বক্তাকেও আমি জানি। কিছুদিন পূর্বে এমনটা ছিল না। তখন তাঁহারা উর্দু, পারসী, আরবী ভাষাকেই মুসলমানের শিক্ষণীয় ভাষা বলিয়া জানিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়াছেন; এখন তাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন তাঁহাদের মধ্যে আর একদল ভক্তিনিষ্ঠ, শক্তিশালী সুলেখক পাইয়াছেন। হিজ হাইনেস্ আগাখানপ্রমুখ মুসলমান নেতৃগণ আজকাল নবোন্মেষ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে আবার উর্দু, পারসী ও আরবী ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা হিন্দু-বাবুহঁত হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার বিরোধী; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এ অঞ্চলে সে ভাব নাই। এখানকার মুসলমান ভক্তসমাজ দেশীয় মাতৃভাষা শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া, আপনাদের সমাজের সকল স্তরেই মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবশে আমাদের সহিত যোগ

দিয়াছেন। পূর্বকালেও আমাদের এ অঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা-বিদ্যে ছিল না ; যখন এদেশে মুসলমান শাসনকর্তারা দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া দেশশাসন করিতেছিলেন, সেই মুসলমান-অভ্যুদয়ের সময়েই মুসলমান কবিরা বাঙ্গালা ভাষার রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান কবি-রচিত বহু বাঙ্গালা সংকাব্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আবিস্কৃত হইয়াছে। রাজশাহীর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সাত্তাল মহাশয় বহু মুসলমান-কবির বৈষ্ণবপদাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। আমার বাল্যকালে, “বকো” মুসলমানেব যাত্রা বিলক্ষণ সম্মানিত ছিল। তাহার গান ভাব ও লয়ে হিন্দু কবিদিগের সমতুল্য ছিল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মাতৃভাষার প্রতি ঐ নবোন্মেষিত অমুরাগ দর্শনে আমাদের আশা হয় যে, কালে তাঁহাদিগের সাহায্যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে পারসী ও আরবী ভাষা হইতে মুসলমানলিখিত বহুদেশের তত্ত্বার্থ বা ইতিহাস গ্রন্থ, তাজিক বা জ্যোতির্ষক গ্রন্থ, হাকিমী বা চিকিৎসাগ্রন্থ এবং হাদিস্ বা ধর্ম-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রভৃতির অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সঞ্চিত হইতে দেখিতে পাইব ; আর তাহা হইলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতভেদজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিদ্বেষের সামঞ্জস্য হইয়া সৌহার্দ্য বর্দ্ধিত হইবে। যে সকল মুসলমানছাত্র আজকাল উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিই এই সকল কার্য্যসম্পাদনের ভার পরোক্ষে সংস্থাপ্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে।

১৩১৭ সালে সাহিত্যিক-বিয়োগের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, রঞ্জীকান্ত সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই মহাস্বপ্নগণের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের দেহত্যাগ আমার পক্ষে বিশেষ শোচনীয়। তাঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আয়োজন হইতেছে ; কিন্তু যশস্বী, সুলেখকগণের স্মৃতিরক্ষাব জন্ত আমাদের চেষ্টার তেমন আবশ্যকতা নাই ; তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার উপায় তাঁহারা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিয়া আমরা আমাদের নিজকর্তব্য পালন করিতেছি মাত্র।

“যেমনটি যার, তেমনটি আর হয় না”—ইহা চলিত কথা ; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিরবধি কালে অনেক সুকবি কাব্যরসে মানবহৃদয় উৎফুল্ল করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণও যশোমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন ; মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন,—

“মনঃ কবিশঃপ্রার্থী গমিষ্যামৃপহাস্ততাম্।

প্রাণ্ডলভ্যে কলে লোভাজ্জ্বাহরিব বামনঃ ॥

কবিশ্রুত বাঙ্গালিকির পদাঙ্ক প্রণাম করিয়া অনেক কবিকেই কাব্যরচনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহারাও নিজ নিজ কাব্যসৌরভ বিস্তার করিয়া দর্শনিক আমোদিত করিয়া গিয়াছেন

এবং পরবর্ত্তিগণের প্রণয়া হইয়াছেন। আমাদের দেশেও যে সকল সুকবি ইহলোকে কাব্যকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভাগ্যদেবতার যশোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সকল গুণীশু কবির স্থানও আমাদের সাহিত্যসংসারে কালে অনধিকৃত থাকিবে না। কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, দেশে সভ্যতারূপের সহিত কবিত্বের হ্রাস হয় এবং বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পায়। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থান্বিত নহি। সভ্য জগতের সাহিত্যের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অনেক সময়েই এক একটি বিপ্লবের—বুদ্ধ বিগ্রহের পর দেশ শান্তিময় হইলে, এক একশ্রেণী কবিকুলের আবির্ভাব হয়। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দিনের অবসানেও সুদিন আসা সম্ভব। আমাদেরও স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীনভাবে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশের দিন আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য-কুঞ্জ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও স্বাধীন ভাবে সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করিতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। পরিষৎও তৎসম্বন্ধে নিজের কর্তব্যপালনে এখনও অসমর্থ। বাঙ্গালা ভাষার ভাল সমালোচনাগ্রন্থের একান্ত অভাব। প্রতিভাশালী গ্রন্থলেখকদিগের রচনার ভাব ও রসমাধুর্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা, তাঁহাদের প্রতি সমুচিত আদর প্রদর্শন করা এবং যাহাদের প্রতিভা নাই, অথচ যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থকল রচনা করিয়া সাহিত্যকে অগাধ ভাৱাক্রান্ত ও আবর্জ্ঞনাময় করিতেছেন, তাঁহাদের রচনার দোষ প্রদর্শন করা, সাহিত্যকে পরিমার্জিত করিবার চেষ্টা করা, সাহিত্যহিতৈষী ব্যক্তি যাত্রেরই উচিত। প্রকৃত সমালোচককে সবাসচী অর্জুনের মত একহাতে সংসাহিত্যের গঠনে সাহায্য ও অন্তহাতে সাহিত্যশত্রু নিবারণ করিতে হইবে; কিন্তু নানাকারণে প্রকৃত সমালোচকের একান্ত অভাব হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যের সকল বিভাগেই আজকাল নবীন লেখক ও নবীন গ্রন্থকার আবির্ভূত হইতেছেন। ইহাদের রচনার গুণদোষের সমালোচনা করিয়া ইহাদিগকেও প্রশংসা ও সংস্কৃত করা একান্ত কর্তব্য। প্রবীণ স্নলেখকগণের সঙ্গে সঙ্গে নবীন স্নলেখকগণকে সঙ্গর্জন করিলে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে নব নব গ্রন্থের সঞ্চয় হইতে থাকিবে। নবীন কবিকুলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণা-নিধান প্রভৃতি, গল্পলেখকগণের মধ্যে সরোজনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, ফকীরচন্দ্র, ইন্দুপ্রকাশ প্রভৃতি, ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন, নিখিলনাথ, সত্যচরণ, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে, বিনোদবিহারী, রাখালদাস, হরিন্দাস প্রভৃতি, প্রবন্ধকারগণের মধ্যে রাখাকুমুদ, বিনয়কুমার প্রভৃতি, বিজ্ঞানালোচনায় পঞ্চানন, নিবারণচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নবীন স্নলেখকগণের যথোচিত সমাদর আবশ্যক। সমালোচকগণের এই সকল স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমাদের দেশে আজকাল অনেকগুলি সাময়িক পত্র বাহির হয়। নবীন সাহিত্যের সমুচিত সমালোচনা সেই সকল পত্রে বিস্তৃত ও সুসঙ্গত ভাবে হওয়াই শোভনীয়, কিন্তু তাহা কোথাও দেখিতে পাই না। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ "White Doe of Rylstone" প্রকাশ করিলেন, অমনি Edinburgh Review এ Jeffries বলিয়া উঠিলেন, "This will

not do.”—আমরা স্বাভাবিক দুর্জনতাবশতঃ প্রয়োজনীয় স্থলেও এমন করিয়া যথোচিত নিন্দা করিতে কুঠিঁক এবং উপযুক্ত স্থলে প্রাণ গুলিয়া প্রশংসা করিতেও পবাগুণ হই। ইহা স্বীকার না করিলে, বলিতে হয়, ভালমন্দ বিবেচনা ও বিচার কবিত্তে আমবা অক্ষম। সাহিত্য-পরিষদের এখনও সেরূপ শক্তি সঞ্চিত হয় নাই। জার্মানিয়া জুনিয়া কর্তব্য কক্ষে, অনেক সময়ে, এখনও আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয় এবং অবস্থানুসাবে হুই একটা অবাস্তব নিয়ম বচনা করিতে ও তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হয়।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের গ্রাম মহাবথ সাহিত্যিককে সম্মুখিত সমাদর দেখাইয়া তাহার এক-পঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন কবিস্বার সুপ্রস্তাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও তাহা অনভিমত; যথার্থ কথা পুরুষকে, যথার্থ গুণশালী পুরুষকে, তাহার জীবদশায় যদি আমরা শ্রদ্ধা করিতে, সমাদর কবিত্তে সাহসী না হই, অগ্রসব না হই, সমস্তই তাঁহাব মৃত্যাব পরে তাঁহাব শোকসভায় নিবেদন কবিস্বার জগ্না বাগিয়া দিই, তাহা হইলে, আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও কাপুরুষতা বাড়িয়া যাইবে গুণগ্রাহিতা শক্তির হ্রাস হইবে এবং উন্নতির পথেও প্রতিকূলতা করা হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া এখন আমাদিগকে দিন দিন অনেক নূতন কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করিস্বার নিমিত্ত সচেষ্ট ও সাহসী হইতে হইবে।

১৩১৭ সালের বাঙ্গলাসাহিত্যেব সদিষ্টাব বিবরণ শ্রীমান্ অমলাচরণ এখনই আমাদিগকে শুনাইবেন। তিনি বতই কেন আমাদিগকে আশার আশ্বাসে আশ্বস্ত কবিত্তে চেষ্টা ককন না, আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস প্রণয়নকাযা আরম্ভ হইলেও, তাহা আর বড় অধিক অগ্রসর হইতেছে না। দেশেব ইতিহাস বলিতে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত আর বেশী কিছু পাওয়া যাইতেছে না। নাটক প্রহসন নাম লইয়া অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের কঠোব জীবন বহন করিয়া বাচিয়া থাকিবে কয়খানা, তাহা বলিতে পারি না। বিজ্ঞান-রচনা নাই বাললেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাবই সম্ভবতঃ তাহাব গুরুতব অন্তরায়। শ্রদ্ধাঙ্গদ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, ডাক্তার প্রফুল্ল-চন্দ্র, যোগেশবাবু, রামেন্দ্র বাবু প্রভৃতি মহারথগণই এ তত্ত্ব-মীমাংসার প্রধান ভরসা। বঙ্গ-ভাষায় বিজ্ঞানের আবগুকতা বিবয়ে অবহিত হইয়া তাহারাই এ বাধা অতিক্রমের উপায় নির্ধারণ করিয়া দিবেন। আমার নিজের মত আমি পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রচলিত আছে এবং বাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম ভাণ্ডারে পাওয়া যায় তাহার সঙ্কলন আবগুক। অপর শব্দ সকল সমস্ত সভ্য জগতে একই হওয়ার ক্ষতি নাই।

সম্পূর্ণ শক্তি সমন্বিত না হইলেও সাহিত্য-পরিষৎ দেশের এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। শিক্ষিত সমাজ অনেক আশা, অনেক ভরসা লইয়া পরিষদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং অধিকতর উত্তোণের সহিত ইহার উন্নতিবিধানপক্ষে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ বার্ষিক অধিবেশনের শুভ-

অবসবে সভাপতিরূপে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আনাব এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিব।

পরিষৎ যে সঙ্কল্প লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং আজ সম্পদশব্দকাল চেষ্টা করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের জ্যোত্বেব কাবণ কিছুই নাই; বরং আশাবতী অনেক আছে। যে সুযোগ্য সম্পাদক কর্ণধার হইয়া ইহার গতি পরিচালন করিতেছেন, তাহার প্রদত্ত বার্ষিক কাগ্য বিবরণ হইতে আমরা এখনই জানিতে পারিব যে, গতবর্ষে পরিষৎ সকল দিকেই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে। সদত্তসংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছে, পুস্তকালয়ে পুথি ও পুস্তক অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, চিত্রশালায় প্রাচীন ছলিত মুদ্রা ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বচনবোঝার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। সে সকল বস্তুর মধ্যে এমন কতকগুলি বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে যে, তদ্বশনে কতিপয় দেশীয় এবং বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। এতদ্বিধ ইচ্ছা প্রকাশে, বিজ্ঞানেব আলোচনায়, ঐতিহাসেব আলোচনায়, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, অভিধানসঙ্কলনে অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ-বিশেষ বিবরণ সম্পাদক মহাশয় আমাদের কাছে এখনই শুনাইবেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পরিষদের গতি আশানুরূপ দ্রুত না হইলেও, একান্ত মনুষ্য নহে। পরিষদের বাক্সেরও অনেকে পরিষদেব নির্দেশিত গ্রন্থাদি প্রচারেব ব্যবস্থা করিয়া পথোক্ষে ইহারই সঙ্কল্পকে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। ইচ্ছাতেও পরিষদের উৎসাহ ও গৌরব উন্নয়ন বদ্ধিত হইতেছে। পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং পরিষদের পবনহিতৈষী সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদকের গৃহে যে ছলিত প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশেব ব্যবস্থা করিতে পারিলে পরিষদের গৌরব এবং রূতকারিতা লক্ষণেব বদ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাব উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কেবল ছাপা খরচের অভাবই যে, ইচ্ছাব একমাত্র কারণ আমার তাহা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস পরিষদেব নিজের একটি ছাপাখানা থাকিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প উদ্বোধে প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের সুব্যবস্থা করিতে পারা যায়। পরিষদের শৈশব হইতেই ইহার প্রথম সভাপতি ৬৪মেশচন্দ্র পরাস্ত এ বিষয়ে এইরূপ অভাব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশেব সঙ্কল্প করিয়াই তিনি সর্ব প্রথমে ইহার নিজের একটি ছাপাখানা কন্নিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন পরিষদের নিজের স্থান ছিল না, আয়ও অতি সামান্য ছিল; সেই নিমিত্ত তখন সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ যখন প্রাচীন গ্রন্থাবলী খণ্ডন; প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন ছাপাখানার অসুবিধাই অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন বদান্তবর, পরম-হিতৈষী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের বার্ষিক দান হই একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীন সাহিত্য-সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারেন, এরূপ বহু উপযুক্ত ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ছাপাখানার অভাবে পরিষৎ তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে

পারিতেছেন না। সুভাপতিরূপে কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে যখনই এই সকল কথার আলোচনা আমাকে করিতে হইয়াছে, তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যতদিন না পরিষদের নিজের ছাপাখানা হইবে, ততদিন এ সকল গোলমাল মিটিবে না। তৎপবে আমি বহুবার এ বিষয়ে উদ্যোগ করিবার জন্ত পরিষৎকে অনুরোধ করিয়াছি। পরিষদের কার্যোপযোগী একটি ছাপাখানা হইলে, লালগোলাল রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত বার্ষিক দান হইতেই আরও বেশী সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার হিতৈষী অগ্রান্ত বাজন্তবর্গের নিকটেও এজন্ত আরও সাহায্য আমরা আশা করিতে পারি। গ্রন্থপ্রকাশ ব্যতীত অগ্রান্ত মুদ্রণ-কার্যেও পরিষদের বার্ষিক প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয় হয়। নিজের ছাপাখানা হইলে, এই ব্যয়-ভারও অনেক হ্রাস হইতে পারে এবং তাহা হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্য হইতে পারে। আমি আপাততঃ ইহার এই অভাবটি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভব করিতেছি। আশা করি, পরিষদের প্রিয়চিকিৎসু ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষে এ বিষয়ে ইহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন এবং নবীন কার্য-নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

কেবল প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সকল বিভাগেই উন্নতি ও পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এখনও প্রচুর আয়োজন ও বহু গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে। এখনও কোনও সামান্য বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাবই সর্বপ্রথমে প্রধান অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। এখনও প্রতিবিষয়েই, এমন কি, আমাদের মাতৃভূমির ইতিহাস, মাতৃভাষা তত্ত্বালোচনা করিতে হইলেও আমাদের বিদেশী সাহিত্যের দ্বারে নিত্যভিখারীর ন্যায় ঘূর্ণিতে হয়। অস্বাস্থ্যম্ভান ইহাতে যে কতটা ক্লান্ত হয়, তাহা মনে উদ্ভিত হইলে, ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও অনুভব করিতে হয়। যাহারা পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নহেন, অথবা ইহার কার্যের এবং কার্যপ্রণালীর সমাক সংবাদ রাখেন না, তাহারা এই ক্ষোভ ও লজ্জার জন্ত পরিষৎকেই অনুরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে বিদ্যাবুদ্ধিতে যাহারা বরণ্য, গ্রন্থরচনার যাহারা বশবী এবং ধনসম্পদে যাহারা সকল আশাভরসার অবলম্বন, এরূপ সকল শ্রেণীর অধিকাংশ শক্তিশালী ব্যক্তিই যে পরিষদে সমবেত হইয়াছেন, সেই পরিষদের নিকট যদি আশানুরূপ ফল পাইতে আশাতীত বিলম্ব ঘটে, তবে সামান্য দৃষ্টিতে এবং বিধি অনুরোধের নিমিত্ত কাহারও প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হয় না; কিন্তু সেজন্ত সাহিত্য-পরিষদের মনস্তাপের বা লজ্জার কোন কারণ আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। এই অভাব-জনিত ক্রেশের অনুভূতি, এই অভাবজনিত পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিঘটিত লজ্জা, পরিষদের চোঁটেই যে দিন দিন পবিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সকল পীড়াদায়িনী অনুভূতি বর্ধন অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন দেশের কন্দশক্তি জাগরিত হইবে এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় হইবে।

পরিষদের সদস্যসংখ্যা দিন দিন দেশের সর্বত্র এবং শিক্ষিত সমাজের সকল বিভাগ হইতেই আকৃষ্ট হইতেছে এবং আজকাল অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আপনা হইতে আগ্রহ প্রকাশ-

পূর্বক ইহাব সদস্তপদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাই পরিষদের কৃতিত্বের এবং সমাদরের উজ্জ্বল-  
তম প্রমাণ। আজ পরিষদের সদস্তসংখ্যা দেশের সকল সভাসমিতির সদস্তসংখ্যা হইতে  
অধিক হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে, বলিতে হয়, এখনও ইহাব উপযুক্ত বলবৃদ্ধি  
হয় নাই। দেশের বিদ্যৎসমাজের, শিক্ষিত সমাজেব অনেকেই ইহার সদস্ত হইয়াছেন, তথাপি  
বহু প্রাচীন সাহিত্যসেবক, বহু খ্যাতিমান গ্রন্থকার, বহু সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, বহু স্থলেখক  
এখনও ইহার বাহিরে রহিয়াছেন। নবীন সাহিত্যসেবী এবং প্রতিষ্ঠাবান লেখকগণেবও  
অনেকে ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন। ইহা পরিষদেব পক্ষে ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা-  
সাহিত্যেব সামান্য সম্পর্কেও যাহারা আসিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্তশ্রেণীতে  
তাঁহাদের প্রত্যেককেই যাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি পরিষদেব হিতকাম  
বান্ধিবর্গের এবং পরিচালকবর্গের লক্ষ্য থাকা প্রাণনীয়। পরিষদের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প সম্বন্ধে  
কাহারও কিছু বলিবাব নাই। কিন্তু পরিচালকবর্গের সহিত মতভেদেব হেতুতে যাহারা  
সম্মিলিত হইতে ইত্তস্ততঃ কবেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার নিবেদন,—দূরে থাকাতেই মতভেদ  
বজায় রহিয়া যাইতেছে; একত্র হউন, সম্মিলিত হউন, দেখিবেন মতভেদ হ্রাস হইবে, ইহার  
তীব্রতা কমিয়া গিয়া উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য সাধিত হইবে। আজ বার্ষিক অধিবেশনের এই  
শুভাবসরে পরিষদেব সভাপতিরূপে আমি দেশেব সকল সাহিত্যিককে ইহার সদস্তপদ গ্রহণ  
করিবাব জন্ত সাদরে আহ্বান করিতেছি। আহুন, সকলে একত্রিয় হইয়া সাহিত্য-যজ্ঞে ব্রতী  
হই। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মাতৃভাষানুরাগেব কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পরিষদে মুসলমান  
সদস্তের অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও যাহারা গ্রন্থকার, যাহারা স্থলেখক, তাঁহাদেরও  
অনেকে এখনও পরিষদের বাহিরে রহিয়াছেন। আজ আমি তাঁহাদিগকেও ইহাতে সম্মিলিত  
হইবার জন্ত সাদরে আহ্বান করিতেছি। আহুন আজ হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্র হইয়া  
মাতৃভাষার চরণে ভক্তি-উপহার উৎসর্গ করি।

অতঃপর পরিষদের কার্য কেন দ্রুতগতিতে আশানুরূপ সম্পন্ন হইতেছে না, তৎসম্বন্ধে  
কয়েকটি কথা নিবেদন করিয়া আমি উপসংহার করিব। আমরা প্রতিবৎসর একত্র হইয়া  
পরিষদের বার্ষিক কার্যফল আলোচনা করি; কিন্তু ইহার অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত  
হইয়াও তাহার প্রতিকারে অবহিত হই না। প্রকৃত কর্মী পুরুষের, উৎসাহী পুরুষের, সাহায্যের  
অভাবেই পরিষদের সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে অথবা বিলম্ব হইতেছে। অর্থের স্বচ্ছলতা অনেক  
কার্যকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করে। প্রকৃত কর্মী পুরুষের দর্শন পাইলে অর্থের অভাব থাকে না।  
যে সকল দেশ উন্নত হইয়াছে, উন্নতির পূর্বে তাহাদেরও দরিদ্রতা ছিল; কিন্তু কর্মী  
পুরুষের আবির্ভাবে সে দরিদ্রতা বাধা জন্মাইতে পারে নাই। অর্থসাপেক্ষ কার্যগুলি  
রাখিয়া দিয়া, কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে, আমরা সে  
সকল কার্য করিয়াও পরিষদকে সাহায্য করি না; সুতরাং পরিষদের কার্য সপ্তদশ বৎসরের  
সাধনাতেও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা কেবল আমাদের বাসগ্রামখানিতে বসিয়াই,

পরিষদের অভিধান-সঙ্কলনে সাহায্য করিবাব নিমিত্ত গ্রাম্য ভাষা হইতে প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, কৃষি ও শ্রমজীবীদিগের নিকট কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্যসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, জাতীয়-ভাণ্ডারে নৃপুত্র প্রাচীন সাহিত্যসম্বন্ধেব জ্ঞাত গ্রাম হইতে পুণি-সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, গ্রাম্য ইতিহাস সংগ্রহেব জ্ঞাত গ্রাম্য দেবালয়ের মেলা-মহোৎসবেব বিবরণ এবং গ্রামের জমিদার ও পণ্ডিতবংশেব ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি, গ্রাম্য বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এবং তদ্বিন্ন কেবল গৃহমধ্যে বসিয়াই আমাদের মহিলাগণেব আচার্যত বাবরত্তেব বিবরণ, আমাদের স্বজাতীয় বর্ণগত আচার-ব্যবহাৰ ও দশকশ্বেব বিবরণ, গ্রাম্য ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া লৌকিক সাহিত্য-বচনায় পরিষদকে সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু কয়জনে আমবা সে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হই ? ছাত্র-সভাগণেব পরিদশক এই সভার যে বাষিক বিবরণ উপস্থাপিত করিবেন, তাহা হইতে আপনাবা জানিতে পারিবেন যে, ছাত্র সভাগণ এদিকে এনোনিবেশ করিয়া ইতি-মধ্যেই কত কাজ করিয়াছেন। আমি আশা করি, পরিষদের এই অনুরাগী ছাত্র-সভাগণ সাহিত্য ও দেশেব সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদেব গোবধ বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু এখনও এদিকে অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও অনেক তথ্য সংকলিত হইতে বাকী আছে। আমাদের নিজেদেব অবহেলায়, অলসতায় ও কক্ষে অনভ্যাস প্রযুক্ত পরিষৎ উন্নত হইতে পারিতেছে না, আরও কার্য সমাপ্ত ও সংকলিত কার্য অগ্রসর করিয়া দিতে পারিতেছে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া পরিষদেব উদ্দেশ্যসাধনে ও বলবদ্ধনে আমাদেরকে আলস্য ভাগ করিয়াহাতে কলমে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইচ্ছা থাকিলে, কাহা কতটা সহজসাধ্য হয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। এবৎসর পরিষদে আমাদের ১৫৪২ জন সদস্য আছেন। ইহারা প্রত্যেকে স্বীয় আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে যদি একটি মাত্র সদস্য সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে, একদিনে পরিষদের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া যায় এবং একবারে বাষিক আয় কেবল চাঁদায় নয় হাজার টাকা ও প্রবেশিকায় দেড় হাজার টাকা বাড়িয়া যায়। একটি সদস্য সংগ্রহ করা কাহাবও পক্ষে কঠিন বা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নহে। পরিষদের সদস্যগণ এই সামান্য কার্যদ্বারা পরিষদেব উপকার সাধন করিতে, আশা করি, কেহই পরাশ্রুত হইবেন না। ইহাতে কাহাকেও কোনরূপ ব্যয় বহন করিতে হইবে না, অথচ কেবল মাত্র মৌখিক চেষ্টায় পরিষদের বিপুল সাহায্য সম্পাদিত হইবে।—ইহাই আমার শেষ নিবেদন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। ভরসা করি, এই প্রার্থনাটিতে সকলেই কর্ণপাত করিবেন এবং আগামী বাষিক অধিবেশনে আমরা ইহার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিব।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র



## ব্যাকরণের সন্ধি

একজন লোক নিজের রচনায়, কেমন করিয়া শব্দগুলিকে সন্ধির বন্ধনে বাঁধিয়া লইবে, ইহার শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ নয়। যে সকল রচনায় সন্ধি-বন্ধন আছে, সেখানে কি উপায়ে পদবিচ্ছেদ করিয়া মূল শব্দগুলিকে চিনিয়া লইয়া অর্থ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষার জন্যই ব্যাকরণের সূত্র। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হইতেই তাহা সূচিত হয়। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির জ্ঞান হয়,—বিশ্লেষণ প্রণালীর শিক্ষা হয়। পদে পদে সন্ধি যোগ না করিয়া যদি কেহ সংস্কৃত গদ্য রচনা করেন, তবে তাঁহার রচনাকে কেহ দোষযুক্ত বলিতে পারেন না। ব্যাকরণে এমন সূত্র নাই যে, সন্ধিযোগ না রাখিলে রচনা অগুহ্য হইবে। শব্দের রূপ বা ধাতুর রূপ, স্বতন্ত্র কথা। যে রূপ ধারণ করিলে শব্দের যে অর্থ হয়, কিম্বা ক্রিয়াপদে যে কাল বুঝায়, তাহা হইল ভাষার মূল কথা; তাহা না মানিলে কোন পদের বা কোন শব্দের অর্থই হয় না। সন্ধি যোগ করা বা না করা, লেখকের সুবিধার কথা। যেখানে সন্ধি যোগ হয়, সেখানে যে তাহা করিতেই হইবে, এটা হইল অকাটীন যুগের সংস্কৃত রচনায় এঁকটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি।

মহাযের প্রতিদিনের কথা কহিবার ভাষায় সন্ধিবন্ধনের কড়া নিয়ম থাকিতে পারে না; স্বাভাবিক উচ্চারণের সুবিধায় যতটুকু সন্ধির বাধন পড়িয়া যায়, ততটুকুই থাকে। বাঙ্গালার আমরা “ফলাফল” “হিতাহিত” প্রভৃতি যেমন বলি, বৈদিক ভাষা বা ছন্দসেও তাহাই দেখিতে পাই। যখন সন্ধিবাধনের কড়া নিয়মের যুগে বৈদিক ঋক্গুলির পদে পদে সন্ধিযোগ করিয়া পুঁথি লেখা চলিতেছিল, তখন ‘পদপাঠের’ সৃষ্টি। সন্ধি করিলে বৈদিক ছন্দ এবং সুর নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, ‘পদপাঠে’ যেখানে সন্ধি নাই, মূলতঃ সেখানে সন্ধি ছিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলে যে সন্ধি করিতে গেলে অক্ষর কমিয়া গিয়া ছন্দঃপতন হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৈদিক ঋক্গুলির কেবলমাত্র পদপাঠ দেখিলেই সকলে উহা বুঝিতে পারিবেন। সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ইহা স্বীকার করেন; পরলোকগত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ একথার সমর্থন করিয়াছিলেন।

ছন্দস হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি; কিন্তু এই ভাষা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ‘সংস্কৃত’ নাম পায় নাই। মহাভারতসংহিতায় “সংস্কৃত” শব্দ ভাষা অর্থে পাওয়া যায় না; ১৪০ শ্লোক পূর্বের মহাভাষ্যেও সংস্কৃত ভাষাটি লৌকিক ভাষা নামে আখ্যাত। যখন হইতে ভাষার নাম “সংস্কৃত” দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হইতেই উহাতে জটিল রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধির ঘটনা, সমাসের বাহুল্য প্রভৃতি তা আছেই; তা ছাড়া অনেক স্থলেই এমন ভয়ঙ্কর ছয়বয়র বে, অনেক টানিয়া হেঁচড়াইয়া পদে পদে যোগ করিয়া অর্থ করিতে হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত কেবল একটা সাহিত্যের ভাষা

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, উহা কথাবার্তার ভাষা ছিল না। যে সময়ে ঐ ভাষাটির নাম হইয়াছিল ‘সংস্কৃত’, তখন এদেশে অনেকগুলি ‘প্রাকৃত’ বা লোকব্যবহারের স্বাভাবিক ভাষা ছিল। সেই সকল স্বাভাবিক ভাষা বা প্রাকৃত ভাষাও ছান্দস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। লোকব্যবহারের ভাষা যখন পণ্ডিত-ধরণে ঘষিয়া মাজিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ছান্দস বা বৈদিকে অব্যবহৃত অনেক নূতন জিনিষ আমদানি করা হইয়াছিল, তখনই ঐ ভাষার নাম হইয়াছিল সংস্কৃত বা সংস্কার-পূত। যে ভাষা ‘দাধারণতঃ’ লোক-ব্যবহারে অপ্ৰচলিত ছিল, তাহা যে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়া নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই সংস্কৃতে রচিত হইত; কিন্তু লোকে কথাবার্তা কহিত আপনাদের দেশপ্রচলিত প্রাকৃত ভাষায়।

সংস্কৃতির সন্ধির সূত্রগুলি হইতে ঐ ভাষার অক্ষাচীনতা এবং প্রাচীনতর ভাষাগুলির প্রকৃতি, কিছু কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ বলিয়া যে শ্রেণীবিভাগ, ওটা হইল ভাষার একটা বিজ্ঞান হইবার সময়কার সৃষ্টি। স্বতন্ত্র ঃ স্বাধীন অ, আ প্রভৃতির উচ্চারণ ত ছিলই, তাহার পর আবার বর্ণগুলির শেষ স্থায়ী উচ্চারণ, আওয়াজ বা স্বরের সহিত ঐ অক্ষরগুলির আওয়াজের সমতা ধরিয়া লইয়া বর্ণগুলির নাম হইল স্বরবর্ণ। ‘আ’ অকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হইলেও, অত্র দীর্ঘ উচ্চারণের সহিত উহার একটু পাথকা আছে। কিন্তু দাবিডী উচ্চারণ ধরিলে ই, ঈ-র মতই অ এবং আ বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘতার ভেদই পাওয়া যায়। দক্ষিণপ্রদেশের উচ্চারণের হিসাবে ‘আ’কারকে যথার্থই ‘অ’কারের একটু দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র পাই। প্রাচীনকালে সেইরূপই ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

ঋ এবং ঌ কিরূপে উচ্চারিত হইত যে উহারা স্বরসংজ্ঞা পাইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লওয়া শক্ত। এখনও উত্তর অঞ্চলে উহাদের উচ্চারণ রি, লি; কিন্তু দক্ষিণের উচ্চারণ, রু, লু। ভার্য্য পক্ষে যে কোন উচ্চারণ ধরিয়া লহলেই চলে। ঋকারান্ত শব্দের বিকৃতিতে, প্রাচীন কালের প্রাকৃত ভাষায় উ এবং ই উভয়বিধ আওয়াজই ধরিতে পারা যায়; যথা—সংবৃত্ত স্থলে সংবৃত্ত পাই; আবার ঘূতের স্থলে ঘিঅ পাই।

স্বরবর্ণের উচ্চারণভেদে প্লুতসংজ্ঞা নির্দেশ দেখিয়া, মাস্তাজপ্রদেশের “এ” “ও” প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণের একটা প্রাচীন মূল ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। পাণিনির ৮২।১০৬ এবং ৮২।১০৭ সূত্র হইতেও ইহাই অনুমিত হয়। বৈদিক ছন্দঃপাঠে এই প্লুত উচ্চারণ বর্ণেই আছে, ঐ সকল উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিলে “এ” এবং “ও”কে বৃক্স্বর বলিতে হয়। বৈদিক ব্যাকরণে ঐ, ও, চারিষাভাবিশিষ্ট ( সিদ্ধান্তকোঃ বৈঃ প্রঃ ৩৬২৫ হ )।

“এ” যেন অ+ই অথবা আ+ই মিলিত হইয়া উচ্চারিত; উচ্চারণ একটু তাড়াতাড়ি করিতে হয়, নহিলে “ঐ”কারের ঋ ধ্বনি হয়। ঐরূপ আবার “ও”কারটি যেন “অ” বা “আ” পরস্মিত “উ”র মিলিত ধ্বনি। অকার কিবা আকারের সহিত “এ” বৃক্স্বর হইলে যে

উচ্চারণ হয়, তাহা হইল “ঐ”; এবং “ও” যুক্ত হইলে হইল “ঔ”। এই উচ্চারণ যে সন্ধির নিয়মের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তাহা পাঠকের বুদ্ধি দেখিতে পাইতেছেন।

এই উচ্চারণ বা স্বরবর্ণের স্বাভাবিক আওয়াজ হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, পদগুলি উচ্চারণ করিতে গেলে স্বভাবতঃ যাহা ঘটিত, অনেকগুলি স্বরসন্ধির স্ত্রে তাহাই বিধিবদ্ধ। যথা—“অকারের পর আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; অকারের পর ইকার থাকিলে একার হয়, উকার থাকিলে ওকার হয়; অ কিম্বা অকারের পর এ কিম্বা ও থাকিলে যথাক্রমে ঐ এবং ঔ হয়; ইত্যাদি।” উচ্চারণ যদি প্রাচীনকালের মত থাকিত, তবে এই সন্ধির স্ত্রগুলি কাহাকেও মুখস্থ করিতে হইত না। বলিয়া দিলেই হইত যে, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ মিলিত হইলে যুক্ত উচ্চারণকেই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে।

তুইটি আওয়াজ এক সঙ্গে মিশিলে একটা মিশ্র আওয়াজ হইবেই; সাধারণতঃ শেষের আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়া ফেলে, অথবা একটু হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দেয়। সন্ধির নিয়মে সর্বত্র তাহাই। এই নিয়মটি সম্বন্ধে দু’একটি কথা পরে বলিতেছি। এখন ঋ-কারের সন্ধির বিচার করি। প্রথমেই বলিয়াছি, যে “ঋ” ও “ৠ” প্রথমে কিরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা এখন কোন প্রদেশের উচ্চারণ হইতেই ধরা যায় না। ঋকারের পর ঋ থাকিলে, আকারটি একটু খর্ব হইয়া “অ” হইয়া গেল, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু মিলিত উচ্চারণটি অর্ হইল কেন? ঋ-কারের উচ্চারণ কি “ঔ” ছিল? যদি সম্ভব “রি” কিম্বা “রু” উচ্চারণ থাকিত, তাহা হইলে শেষের স্থায়ী আওয়াজটি “ই” বা “উ” হইত। স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হইত না। ঋ-কারের স্থানে অনেক স্থলে যেমন “অর্” হয়, তেমনি আবার “ইর্”ও হইয়া থাকে; কিন্তু সন্ধির নিয়মের স্ত্রটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, সন্ধির নিয়মে স্বরগুলির যেরূপ বিকৃতি ঘটে, স্বরের বুদ্ধিতেও ঠিক তাহাই ঘটে; তখন “ঋ” স্থানে “আর্” দেখিয়া সন্ধির উচ্চারণের “অর্”ই ঋ-কারের আদিম উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। একে “অর্” ঠিক ‘র’ নয়, তাহার পরে আবার অন্তঃস্থ বর্ণগুলি যে ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রভাবে স্রষ্ট নূতন বর্ণমাত্র, তাহাও দেখাইতেছি। “ঋ” “ৠ”র প্রাচীন উচ্চারণসম্বন্ধে আমার অনুমানটি, স্রষ্টাগণের বিচারের জন্ত উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে এক কথাও বলিয়া রাখি, ঋ-কারের অর্ উচ্চারণ ছিল মনে করিয়া লইলে বৈদিক ব্যাকরণের দুইএকটি স্থলের ঋ-কারের বিকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে ধরিতে পারা যায়; তাহার অন্ত স্ত্র গড়িতে হয় না। পাণিনির “বিতাবর্জোহুসি” স্ত্রের ব্যাখ্যায় পাই যে, বৈদিক ভাষায় যদি ইঠ, ইমন, ঈয়স্ প্রভায় পরে থাকে, তাহা হইলে “ঋজু”র ঋকার র হইয়া যায় (সিঃ কোঃ বৈদিকগ্রন্থাঙ্ক ৩৫৫৫ সূ)।

অন্তঃস্থ বর্ণগুলি (অর্থাৎ য, র, ল, ব) যে মৌলিক বর্ণ নয়, স্বরমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা দেখাইতেছি। “য”এর উচ্চারণ হইল “ইঅ”; বালা এবং ওড়িয়া ছাড়া এখনো সর্বত্রই ঐ প্রকার উচ্চারণ হইয়া থাকে। আবার “য”এর “জ” উচ্চারণ করি বলিয়া, “ইঅ”

উচ্চারণের “য”এর নীচে ফোঁটা দিয়া থাকি। “উহ” শব্দটিকে আমরা উচ্চারণ করি, “উহ্”, আর অত্র প্রদেশে উহার উচ্চারণ “উ-ই-হ”। ই+অ উচ্চারণ সংযোগে যেমন “ব”, উ+অ উচ্চারণ সংযোগে ঠিক তেমনি অন্তঃস্থ ব। সন্ধির স্ত্রগুলিতেও, য এবং ব কেবলমাত্র উক্ত স্বরসংযোগ, আর কিছু নহে।

যে নিয়ম য এবং ব সম্বন্ধে খাটিতেছে, ঐ নিয়ম, ঘারাই র, ল শাসিত। “ঋ”র পরে স্বরবর্ণ থাকিলে যখন “র” হয়, তখন “র”কারের উৎপত্তি “য” এবং “ব”এর গত বলিয়া মনে করা সম্ভব। এক্ষণে অবস্থায় ঋ এবং ৯-কারের প্রাচীন কালের ঘেরূপ উচ্চারণ ছিল বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা সম্ভব হইবার সম্ভাবনাই খুব অধিক।

যখন দুইটি স্বর বা আওয়াজ মিলিলে একটা স্বাভাবিক মিশ্র আওয়াজ হয়, তখন শেষের আওয়াজটি বেশী তীব্র হইলে প্রথম আওয়াজটিকে একেবারে চাকিয়া ফেলিবে, এবং বেশী তীব্র না হইলে প্রথম স্বরটিকে একটুখানি হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দিবে। কারণ দুটি স্বর সমান প্রাধান্য রাখিয়া উচ্চারিত হইতে পারে না। এইজন্যই সন্ধির স্ত্রে পাই যে, শে+অনম্ হইলে শয়নম্, কিন্তু প্রথমের অতি দীর্ঘ ঐকারের বেলায়,—বিনে+অকঃ হইলে বিনায়কঃ। অর্থাৎ ঐকারের একটু দীর্ঘতা থাকিয়া যাওয়ায় একেবারে “অ” হইয়া গেল না। এ স্থলে “অ”কারের পরিবর্তে যে “ঋ” পড়িয়া থাকে, তাহা পরবর্তী যুগের “সুবিধার” উচ্চারণ; নহিলে “অ”ই থাকিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ‘সখ আগচ্ছ’ ‘সখায়গচ্ছ’ এই বিকল্পের রূপ দুইটি লক্ষ্য করিলেই চলিবে। প্রাকৃত ভাষায় কিন্তু এসকল স্থলে “র” হয় না, “অ”ই থাকে। কিন্তু প্রথমের আওয়াজে যদি বেশী দোর দেওয়া যায় (অর্থাৎ যদি তাহাতে Accent থাকে) অর্থাৎ উদাত্ত হয়, তাহা হইলে পরবর্তী স্বরকে তেমন আবার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়া চাই, শেষের স্বর বেশী জ্বলন হইলে প্রথমের Accent-যুক্ত স্বরকে লোপ করিতে পারে না, বরং নিজে অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। যখন সম্বোধনের পদে, কবে, সখে, গুরো প্রভৃতি উচ্চারণ করা যায়, তখন ঐ শব্দগুলির স্বরে যে Accent থাকে তাহা বুঝাইতে হইবে না। কাজেই সখে-অর্পর, প্রভু-অনুগ্রহণ, প্রভৃতিতে বার্থ সন্ধি না হইয়া কেবল “অ”কারের অন্ত উচ্চারণ রাখা হয় মাত্র। কিন্তু “আ” “ই” প্রভৃতি স্পষ্ট অথচ তীব্রস্বর পরে থাকিলে প্রথম নির্দিষ্ট নিয়মই ঘটে। শে+অনম্ এবং সখে+ইহ প্রভৃতিতে স্ত্র পার্থক্য করিবার প্রয়োজন নাই; এই নিয়মের মধ্যে ধরিয়া লইলেই চলে। উ+উত্তিষ্ঠ, প্র+ঋজতে, অপ+ঋজতি, প্র+এজতে প্রভৃতি স্থলে বৈদিক ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। পদপাঠে সর্বত্রই ওগুলি স্বতন্ত্র থাকে; নহিলে ছন্দঃপতন পর্য্যন্ত হয়। কেবল মাত্র একটা সাধারণ সন্ধির সৃষ্টি করিয়া সকল শব্দকে এক নিয়মে বাধিবার অভিপ্রায়েই পরবর্তী যুগে সন্ধির নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক স্বর অব্যয়ে সন্ধি করিলে শব্দ বড় জটিল হইয়া পড়ে বলিয়া বৈদিক বিধিই রক্ষা করিয়া বিশেষ স্ত্রে উ+উত্তিষ্ঠ প্রভৃতিকে অব্যয়ে রাখা হইয়াছে। এখানে বিশেষ স্ত্রই মৌলিক সাধারণ স্ত্র।

সন্ধি করিলে যেখানে এক বচন দ্বিবচন বুঝিবার গোল হয়, কিম্বা একটা Accent নষ্ট হইয়া

যায়, সেখানেও বৈদিক নিয়ম রক্ষা করিয়া, সন্ধি যোগের হত্বে রচনা হয় নাই। তাই এখনো কবি+ইমো, অমী+অখাঃ প্রভৃতি পূর্বকালের মতই আছে।

ইহার পর বিসর্গের সন্ধির কথা বলিব। অত্র ব্যঞ্জন-সন্ধি অপেক্ষা ভাবাত্মক ঐটির বেশী প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিসর্গের সন্ধির কথা বলিবার পূর্বে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের কথা বলিব। যে ভাষা “সংস্কৃত” নামে আখ্যা পাইয়াছে, উহাতেই বিসর্গের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন উচ্চারণ পাওয়া যায় এবং সে উচ্চারণটি এ কালে অধিক পরিমাণে “হ” বর্ণটির উচ্চারণের কাছাকাছি। এই স্বতন্ত্রতা থেকে উহা একটা বর্ণ বলিয়া গণিত হইয়াছে; নহিলে য, র, ল, ব প্রভৃতির মত উহার বর্ণসংযোগে জাত ‘আওয়াজ’ মাত্র। পার্শ্বাধীন ব্যাকরণে ২ ও ৩ বর্ণমালার মধ্যে স্থান পায় নাই, পরে পাইয়াছে। ২ এবং চন্দ্রবিদ্যুৎ অনুনাসিকের উচ্চারণভেদ মাত্র। যেখানে মিশ্র আওয়াজে অনুনাসিকের খর্ব্ব উচ্চারণ, সেইখানেই সন্ধির সূত্রে ২ এবং ৩। সাধারণতঃ বলিতে গেলে স অক্ষরের স্থানবিশেষের উচ্চারণই বিসর্গ। “র”জাত বিসর্গের কথা পরে বলিব। প্রাচীনকালের প্রাকৃতের উচ্চারণ-ধ্বনিতর ঐতিহ্যে সাধারণ শ্রেণীর লোক কোথাও কোথাও “হুঃখ” কথাটিকে “হুঃখ্” উচ্চারণ করিয়া থাকে। বিসর্গের সাধারণ মূর্ত্ত উচ্চারণ ‘স’; শ, ষ, স তিনটির মধ্যে একটা সাধারণ আওয়াজ আছে, যাহার জন্ত তিনটিই একনামে পরিচিত হইয়াছে; সেই সাধারণ আওয়াজটুকু ভাবিয়া লইতে হয়, লিখিয়া বুঝান যায় না। তালু হইতে উচ্চারণ করিলে ‘শ’ যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাতে যে ধ্বনিটি তেলেগু তামিলের ‘চ’ উচ্চারণের কাছাকাছি যায়, তবে ‘শ’ উচ্চারণটি আর একটু কঠোর রকমের ফিস্-ফিস্ আওয়াজের সহিত যুক্ত। তামিলে ‘শ’ একটু ক্রোমল করিয়া উচ্চারণ করে বলিয়া ‘চ’ এবং ‘শ’ এ কোন প্রভেদ নাই; একই অক্ষর উভয়ের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের চ ও ছ বর্ণের উচ্চারণ প্রায় দ্বিভু-উচ্চারণের কাছাকাছি। মহারাষ্ট্রের চ, ছ ও প্রায় তেলেগু তামিলের মত উচ্চারিত সন্ধির নিয়ম দেখিয়া মনে হয়, পূর্বকালে চ ছ প্রায় দ্বিভুধরণে উচ্চারিত হইত। সে কথা দেখাইতেছি। ষ টি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে থ হইয়া গিয়াছে, আমরাও ক+ষ ‘ক্খ’ উচ্চারণ করি, আমাদের ভাবার জননী পালিতেও ঐ উচ্চারণ। প্রাচীনতর উচ্চারণে একটা গভীর ধ্বনি স্থচিত হইত। তাহার প্রমাণ দিতেছি। অতি প্রাচীন কালে, “ব্”, “কং”, “ব্” প্রভৃতি দ্বারা; যাহাকে “অনমেটাপাইটিক্” শব্দ বলে, তাহা গড়া হইত। যথা :—ব্হ, ব্হং, ব্হংহতি; ঘোব ( ঘঃ ঘণ্টা অর্থে + ব্; ঘণ্টাতে আরও শব্দ যোগ আছে ), মেব ( ‘মে’ + ব বা ধ্বনি ) ব্হ, হ্বেবা, হ্ৰ্ব, ভাব, মহিব, রোব ( রু + ব ); কং ( বা কণ ) + ব হইতে কাং, কল শুকাইবার সময়কার শুব্ধ্বনি হইতে শুব্ধ্ব ইত্যাদি। সিদ্ধান্তকৌমুদীর সঙ্গে মিলিতেছে না দেখিয়া হয় কেহ কেহ এ নূতন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ হইতেছেন। অভিনিবেশ করিলে বিরক্তির কারণ থাকিবে না। তবে আমার এ ব্যাখ্যা লইয়া যদি ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটুখানি রচনাসের স্রষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে আমি

বিলক্ষণ রাজি আছি। অর্ধাচীন সংস্কৃতে এবং একালের ভাষায় তীক্ষ্ণ শব্দ বুঝাইবার অক্ষর হইল ড। সলিত বাবু বলিতে পাণ্ডেন, যে, সেই জন্তই ভীমের স্ত্রী হিড়িম্বা। বৈদিক প্রয়োগেও ‘ড’ দ্বারাও যন্তু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়। অনেকের অজ্ঞান যে, সে শব্দগুলিও অতি প্রাচীন বৈদিক শব্দ নয়। আমরা যেমন কথা ডবল করিয়া কড়, কড়, হড়, হড়, ব্যবহার করি, সেরূপে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন হইলে বৈদিক সময়ে কেবল য একটু ঘন উচ্চারিত হইত। বলিয়া রাখি যে, ডবল না করিয়াও আমরা ড দ্বারা তীব্রতাব্যঞ্জক শব্দ বুঝাই; যথা—ঝড়, তোড় (বেগ অর্থে), দৌড় (‘ধা’+ড), মেড়, ভেড় (শেষ ছুটি অর্ধাচীন সংস্কৃতেও ব্যবহার আছে) ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক রূপে অপ্ৰাসঙ্গিক কথা বলি নাই। “শব্দ” বুঝাইতে হইলে, আমরা মুদ্রা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশী বুঝাইয়া থাকি। ‘ব’ অক্ষরটির উচ্চারণ মুদ্রা হইতে করিলে অনেক পরিমাণে প্রাচীন আওয়াজ পাওয়া যাইবে। স ট, মহারাষ্ট্রে সর্বদাই বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হয়; ওড়িয়া উচ্চারণও প্রায় ঠিক। “আন্তে” প্রভৃতি শব্দে আমরাও তালুর উচ্চারণ কথঞ্চিৎ ঠিক রাখিয়াছি।

এখন বিসর্গের সন্ধির নিয়মগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ফেলিয়া দেখাইতেছি যে, উচ্চারণের রীতি ধরিয়া লইলে বিনা সূত্রেই বিসর্গ-সন্ধির সূত্র অধীত হইতে পারে। স্বত্রের সুবিধার জন্ত প্রথমতঃ বর্ণমালা হইতে ক, খ এবং প, ফ; দ্বয়ে রাখিয়া দিব। বিসর্গের সাধারণ মূর্ত্ত উচ্চারণ “স্”। প্রথমতঃ ঐ বিসর্গের পর চ, ছ; ট, ঠ; ও ত, থ থাকিতে পারে। তিনটি “স্”এর generalised একটা কিছু উচ্চারণ নাই বলিয়া কথটা লিখিয়া বুঝাইতে কষ্ট হইতেছে। ‘সেই তিন ‘স্’এর এক অভেদ মৌলিক আঘাট, চ, ছ-যুক্ত হইলেই ‘শ’ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে; ট, ঠ যোগে ষ এবং ত থ, যোগে স হইবে। উপরের বর্ণিত উচ্চারণ থেকেই ইহা স্থম্পষ্ট হইবে। স্বত্রের প্রয়োজন নাই। (২) বিসর্গের পর, শ, ব, স থাকিতে পারে। এস্থলে সমান শ্রেণীর আওয়াজে মিলিয়া অল্প সন্ধির মত, আওয়াজ ডবল হইবে মাত্র, উহার বিকৃতি হইবে না। বিকল্পে বিসর্গ বজায় থাকার নিয়ম, আওয়াজের হিসাবে অর্থশূন্য। এখন বাকি রহিল ব্যঞ্জননের মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণগুলি এবং ব র ল ব হ। উহাদিগকে অন্তর্বিধ শ্রেণীবিভাগে কেলিতেছি। বিসর্গ “অ”কারের পর, “আ”কারের পর অথবা অন্ত্যন্ত স্বরের পর থাকিতে পারে; এবং বিসর্গের পর অ, অথবা আ, অথবা অন্ত্যন্ত, অথবা ব্যঞ্জননের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ ও ব র ল ব হ থাকিতে পারে।

(৩) অর্ধাচীন সংস্কৃতির পূর্ববর্তী প্রাকৃত- (অর্থাৎ পালিভাষায়) দেখিতে পাই যে, সকল অকারান্ত শব্দই কর্তৃকারকে ল প্রথমায় প্রকরণে ওকারান্ত হইয়া উচ্চারিত হয়; যেখানে সংস্কৃতির হিসাবে বিসর্গ থাকিবার কথা এবং না থাকিবার কথা, এ উভয় স্থলেই ঐ রূপ উচ্চারণ হয়। নরো, নিকবুতো, ধম্মো, কম্মো ইত্যাদি। একালের প্রাকৃতগুলির মধ্যে কেবল বাঙ্গালার প্রাচীন প্রাকৃতের ও-যেবা উচ্চারণ ব্রজিত আছে। পালি উচ্চারণ বৈদিক সময়ের উচ্চারণের অনুরূপ ছিল বলিয়া বসে করিবার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃতির

ব্যাকরণের নিয়ম অপেক্ষা, পালির ব্যাকরণের অনেক নিয়ম বা রীতি, বৈদিক ভাষার বেশী নিকটবর্তী। বৈদিক ভাষার পরবর্তী ব্রাহ্মণযুগের ভাষার সহিত পালির ব্যাকরণের মিল অতিশয় অধিক। সন্ধির নিয়ম হইতে প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছি। অথ ঋত্ ; বৈ ঋচঃ (বৃহদেবতা ২।১৩ ও ১।১৮) প্রভৃতি স্থলে যেমন সন্ধি নাই, পাণ্ডিতেও তেমন। দৃশতে + অন্নাঃ = দৃশতেহন্নাঃ (বৃঃ ১।৮), হে + অনুমতেঃ = হেহনুমতেঃ (বৃঃ ৪।৮) প্রভৃতিতে পালির মত নিয়ম রহিয়াছে। তাঁর পর শব্দরূপে সৃষ্টি: শব্দ, পালির মত “সুদাস” রূপেই লেখা পাঠ (বৃঃ ২।১৩৪)। আবার ওই পালির মত বৃহদেবতা গ্রন্থে চতুঃস্তুতি: স্থলে চতুর্ভিঃ, প্রথম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে অন্তশাসতি, অসমাপিকাক্রিয়া বৃদ্ধাইতে “য” স্থানে “ত্বা” এবং তা স্থলে “য” ইত্যাদি ইত্যাদি পাইয়া থাকি।

এখন যদি উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে এই মাত্র বলা চলে যে, পালির মত যদি অকারান্ত শব্দের ও-ঘেঁষা উচ্চারণ হইবেই (বিসর্গ পরে থাকাতোই হয় ত সেই প্রকার উচ্চারণের সৃষ্টি) তাহা হইলে সর্বত্রই বিসর্গের উচ্চারণের লোপ, এবং ও-কারের উচ্চারণের প্রাধান্য থাকিবে। “অ” পরে থাকিলে লুপ্তচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোন অক্ষরই লোপ পায় না; কেবল প্রথম পদে যুক্ত উচ্চারণ টুকুরই তীরতর প্রাধান্য থাকে। বিসর্গের পর অক্ষর ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে প্রথম শব্দটিতে ‘ও’ আওয়াজ রাখা অসম্ভব; পূর্বে তাহা অত্র স্থত্রের বিচারে বলিয়াছি। তাই স্থত্রে কেবল বিসর্গ লোপের ব্যবস্থা আছে। গ-হ ব্যঞ্জন পরে থাকিলেও কেবল ওকার রহিয়া যায়। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই হইল না। যেমন ছিল, তেমন রুহিল। ঠিক ঐ রূপ আবার আকারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং বিসর্গের পর স্বরবর্ণ এবং গ-হ ব্যঞ্জন থাকিলে কোন সন্ধিই না। বিসর্গের উচ্চারণ ঐ স্থলে বিশেষত্ব পাইয়া ফুটিয়া উঠিতে পথ পায় না; এই পর্য্যন্ত। তাহা হইলে বিসর্গের একটা সন্ধিই রহিল না, অথচ ঐ সন্ধি সুখস্থ করিতেই বসত গোল ঘটে।

ক, খ, প, ফ প্রভৃতি পরে থাকিলেও বৈদিকে কোন সন্ধি হইত না; তবে যে সময়ে বিসর্গের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, তখন বিসর্গের মূর্ত উচ্চারণ “স” রাখিতে হইয়াছে মাত্র। সাধারণ সন্ধির নিয়মে উহাই পাই। কাজেই এখানেও কোন স্থত্রের প্রয়োজন হইল না। কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া সর্বত্রই ঐ ব মূর্ধ্য। ক, খ, প, ফ পরে থাকিলে কঠোর উচ্চারণই স্বাভাবিক; কিন্তু নমস্কার প্রভৃতি অল্প কয়েকটি শব্দে মৌলিক স উচ্চারিত হয় এই মাত্র। হয় ত ওগুলি নিত্যব্যবহৃত শব্দের নরম আওয়াজের ফল।

কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কোন একটা বিশেষ রীতিসিদ্ধি (idiomatic use) অনুসারে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরের বিসর্গের স্থানে প্রাচীন কালে “র” হইত, দেখিতে পাই। এই নিয়মটি বেদের পদপাঠের প্রতি লক্ষ্য করিলে বৈদিক যুগে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণসাহিত্যের সংস্কৃতে এ সন্ধি আছে। পাণ্ডিতে আবার

এমন অনেক স্থলে সন্ধিতে “র” আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে না আছে বিসর্গ, না আছে “র” এর সঙ্গে দূরসম্পর্কযুক্ত অস্ত্রু কিহুঁ। তবুও কেন হয়? র পরে থাকিলে বিসর্গ বিকৃতির যে সূত্র আছে, সেইরূপ কার্য্য হইবে বলিয়া আশা করা যাইত; অর্থাৎ বিসর্গের পর একটা কেবল দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে পারিত। কেন না ঐ স্থলে স্ ও র এর একটা সংযুক্ত কঠোর উচ্চারণ পরিহার করিবার কথা মাত্র। যেমন নীরস, পিতারক্ষ প্রভৃতি হয়, তেমনি যদি নীভয়, নীধন প্রভৃতি হইত, তবে আমাকে মাথা ঘামাইতে হইত না। এখানে রামমাণিক্যের সি, সিঙ্, সিম্ মনে পড়িতেছে। যেমনটি চাই, ঠিক তাই ঘটে কৈ? বিসর্গের সন্ধি আদ্যে নাই বলিয়া খালাসের চেষ্টায় ছিলাম এবং “ভো যত্নপতে” এবং “স হসতি” বলিয়া আরো দুটি সূত্র ধ্বংস করিতে পারিতাম; কিন্তু দায়ে ঠেকিয়াছি। একটা অনুমানের কথা বলিব। অনুমান অনুমানমাত্র—সিদ্ধান্ত নহে। নিঃ+ভয় প্রভৃতিতে পালি ভাষায়, আমাব আশার অনুরূপ ডবল উচ্চারণ (দীর্ঘের প্রকারভেদ মাত্র) হইত। যথা—নিরভয়, নিদধন ইত্যাদি। পালিতে, অর্থাৎ সেকালের সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় রেফ্ লোপ করিলেও দীর্ঘ উচ্চারণ হইত; এখনো বাঙ্গালায় উহা প্রচলিত আছে। যথা—ধর্ম্ম স্থলে ধম্ম, কর্ম্ম স্থলে কম্ম ইত্যাদি। হইতে পারে, যে যখন প্রাকৃতকে ঘষিয়া মাজিয়া সাধু বা সংস্কৃত করা হইয়াছিল, তখন সাধারণ একটা নিয়ম বা সূত্রের মধ্যে একচেহারায় সকলকে ফেলিবার উদ্দেশ্যে: “ধর্ম্ম” প্রভৃতির Analogyতে নিরভয় প্রভৃতিকে নির্ভয় করিয়া নূতন সূত্র গড়া হইয়াছিল। আমার অনুমানটি পণ্ডিতসমাজে যদি দৈবাৎ গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেও একটা ধটকা রহিয়া যাইতেছে। “

যদি এমন হইত যে, যেগুলি র-জাত বিসর্গ সেইগুলির স্থলেই র হয়, তাহা হইলে সহজ সিদ্ধান্ত হইত। কেন না বৈদিকযুগে র-জাত একটা বিসর্গ নয়; সহজ রকমে র-অক্ষরে হ্রস্ব উচ্চারণ মাত্র। বৈদিকযুগের বহু পরবর্তী সময়েও পুনর, প্রাতর, অন্তর প্রভৃতি ঝাঁজা শব্দ ব্যবহার হইত; কাজেই সন্ধিতে র জুড়িয়া দিবার সময় বিসর্গের সূত্র ভাবিবার দরকার ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যেই যখন প্রাতর প্রভৃতি ছাড়া স-জাত বিসর্গের স্থলে “র” আগমনের কথা পাই; স্বয়ং পাণিনিকেই যখন বিশেষ সূত্র রচনা করিয়া—অন্নস্ উধস্ অবস্ স্থলে রেক্ হ্রস্ব হয়, বলিয়া একটা বিশেষ সূত্র লিখিতে হইয়াছে, তখন আর প্রাকৃত নিয়মের তুড়িতে একটা সূত্রকে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। বিভাগের ছাত্রের মুখস্থের জন্য ঐটি জীবিত থাকুক। অষ্টগুলির মত একটা উচ্চারণের নিয়মের বশবর্তী করিয়া উহাকে প্রাকৃত আওয়াজ বা শব্দব্রহ্মে বিলীন করিতে পারিলাম না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার



# নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা

নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে যে সকল পরিভাষা মনোনীত হওয়ায় সংগ্রহ করিলাম তাহাদের পশ্চাতে সাক্ষেপিক চিহ্নদ্বারা গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইল।

(১) মাধবনিদান—কবিবাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দিগের দ্বারা প্রকাশিত।

(২) কবিবাণি শিক্ষা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রণীত।

(৩) বৈদ্যকশব্দসিদ্ধ—শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক সংকলিত।

অংগশোষ—Arthritis of the shoulder joint

অক্লিন্নবস্ত্র—Acute palpebral conjunctivitis.

অগ্নিমান্দ্য—Anorexia (২) (১)

অগ্নিবোহিণী—Amulny carbuncle

অগ্নিবিদগ্ধ—Cutaneous erysipelas

অজকাজাত—Staphylococci

অজগল্লিকা—Stomatulus

অজীর্ণ—Dyspepsia (২)

অজ্জনি—Hordeolum (২)

অতিসার—Diarrhoea (১) (২)

অধিজিহ্বা—A tumour on the tongue (৩)

অধিমহ্—Uveitis (১); catarrhal ophthalmia (২)

অধিমাংসক—Inflammation of the gum round the wisdom tooth.

অধিমাংসার্শ্ব—Episcleritis

অধ্রুশ্ব—Inflammation of the hard palate.

অনন্তবাত—Trigeminal neuralgia (১)

অনাবর্তী—Amenorrhoea

অনিলজ্বর—Ague

অমুশরী—Abscess of the foot

অন্তরাশায়—Emprosthotonus

অন্তর্বিভ্রাণি—Internal abscess

অন্তর্ভ্রাণি—Rupture, hernia (২)

অন্ততোবাত—Supra-orbital neuralgia

অন্তোহৃদজ্বর—Quotidian fever (২)

অপটী—Tubercular lymphadenitis

অপতন্থক—Apoplectic fit (২)

অপতনক—Hysterical fit (২)

অপবাতক—Stiffness of the shoulder joint (১)

অপম্মার—Epilepsy (২)

অপীনস—Chronic rhinitis

অভিঘাতজ শোথ—Cutaneous emphysema

অভিঘাতজ্বর—Traumatic fever

অভিগ্ৰাসজ্বর—Ardent fever (২) (১)

অভিঘান্দ—Conjunctivitis, ophthalmia

অধ্রুশ্ব—Inflammation of the palate

অম্লপিপ্ত—Acidity (২) (১), acid dyspepsia

অম্লান্ধাঘাত—Iritis (২) (১)

অরিষ্ট—Death signs

অরুংঘিকা—Porrigo

অরোচক—Anorexia

অর্জুন—Chemosia

অর্দ্ধিত—Facial paralysis (২)

অর্দ্ধাবভেদক—Migraine (২)

অর্ধশূল—Pterygium

অর্ধদ—Tumour (১)

অর্শ—Pile (১)

অলস—Chilblai

অলাস—Glossitis ( ১ )  
 অবপাটিকা—Paraphymosis ( ২ )  
 অর্শ—Pile  
 অত্রণশুর—Opacity of cornea, leucoma  
 অশ্মরী—Stone, gravel  
 অশ্মরীরোগ—Nephrolithiasis  
 অশ্মরী শর্করা—Urinary sand  
 অষ্টীলা—Phantom tumour  
 অশ্রুদগর—Leucorrhoea  
 অস্থিছলিকাতণ্ড—Splintered fracture  
 অক্ষিপাকাতায়—Total corneal opacity  
 আগন্তুকজ্বর—Traumatic fever  
 আটোপ—Borborismus  
 আশ্বান—Gastric tympanitis  
 আমবাত—Acute rheumatic fever ( ২ )  
 আমাতিসার—Acute diarrhoea  
 আমাজীর্ণ—Acute dyspepsia  
 আক্কেপ—Convulsion  
 ইন্দ্রলুপ্ত—Alonacia  
 ইন্দ্রবিকা—Herpes ( ২ )  
 ইন্সুমেহ—Glycosuria  
 ইরিবেল্লি—Carbuncle of the scalp ( ২ )  
 উৎপাত—Abscess of lobus auris  
 উৎপিঠিসঙ্ঘি—Contusion of joint  
 উৎসঙ্গপিড়িকা—Meibomian cyst  
 উদ্ভূ—Scarlet fever ( ৩ )  
 উদকমেহ—Hydruria  
 উদাবর্ত—Dysmenorrhoea  
 উন্নয়ক—Haematoma auris  
 উন্মাদ—Insanity ( ২ )  
 উর্পকুশ—Pyorrhoea alveolaris  
 উপজিহ্বা—Ranula ( ২ )  
 উপদংশ—Venereal disease  
 উপনীর—Nodular iritis  
 উপশর—Therapeutics  
 উন্নত—Paraplegia ( ২ )  
 এককূট—Ichthyosis ( ২ )  
 একবৃন্দ—Granular pharyngitis  
 একাদবাত—Hemiplegia

ককুণক—Ophthalmia neonatorum  
 কচ্ছপ—Palatal exostosis  
 কচ্ছ—Itch, scabies ( ১ )  
 কণ্ঠশালুক—Enlarged tonsil  
 কদর—Corn ( ২ ) ( ১ )  
 কন্দরোগ—P. olapsus uteri ( ২ )  
 কপালিকা—Salivary calculus  
 কফজ্বর—Catarrhal fever ( ২ )  
 কফস্রাব—Blennorrhoea  
 কবাল—Malformed teeth  
 ককটিক—Bending of bone  
 কর্ণকণ্ডু—Eczema of ear  
 কর্ণক্লেড়—Tinnitus aurium  
 কর্ণপাক—Otitis externa  
 কর্ণপালী—Lobus auris  
 কর্ণপ্রতিবাহ—Otitis media  
 কর্ণশূল—Oralgia  
 কর্ণস্রাব—Otorrhoea ( ২ )  
 কর্ণিনী—Polypus uteri  
 কর্দমবিসর্প—Cellulitis  
 কলায়থঙ্গ—High-Stepping gait  
 কাণ্ডভগ্ন—(ক) Fracture  
 (খ)—Fracture with lateral displacement  
 কামলা—Catarrhal jaundice  
 কালমেহ—Melanuria  
 কাস—Cough  
 কিটিম—Keloid ( ২ )  
 কুঞ্জন—Tonic blepharospasm  
 কুনখ—Onychia  
 কুন্তকামলা—Chronic jaundice  
 কুন্তিকা—Hordeolum  
 কুমিদন্তক—Caries ( ১ )  
 কোঠি—Urticaria evaniva  
 কোবদুহি—Hydrocele  
 কোষ্ঠাশ্রয় কামলা—Hepatogenous  
 jaundice  
 কোষ্ঠশীর্ণ—Synovitis of the knee joint ( ২ )  
 কবধু—Sneezing

কতোদর—Peritonitis

কিপ্তসন্ধিভয়—Upward dislocation

খঞ্জনিকা—Spastic paraplegia (২)

খাঞ্জ—Lameness (২)

খালিবর্দ্ধন—Wisdom teeth (২)

গণ্ডমালা—Lymphadenoma, scrofula

গষ্ঠীরিকা—Posterior synechia

গর্দভিকা—Roseola annulata

গর্ভস্রাব—Abortion (২)

গর্ভপাত—Miscarriage

গলগণ্ড—Goitre, bronchocele (২)

গলবিভ্রমি—Phlegmonous pharyngitis

গলগুণ্ডিকা—Tonsillitis (২)

গুদভ্রংশ—Prolapsus ani (২)

গম্ব—Abdominal tumour (২) (১)

গৃধ্রসী—Sciatica (২)

গ্রহণী—Chronic diarrhoea (১)

গ্রীবাক্তভন—Wryneck

হ্রষ্টব্রণ—Lacerated wound

চতুর্থক—Quartian fever

চন্দ্রকীল—Wart (২)

চন্দ্রদল—Impetigo (২)

চন্দ্রখা—Scleroderma

চাতুর্থ—Quartian (২)

চিঙ্গা—Paronychia

হৃদি—Vomiting (২)

হিঙ্গভ্রম—Punctured fracture

হিঙ্গব্রণ—Incised wound

হিঙ্গবাস—Cogged-wheel breathing

জতুমণি—Noevus (২)

জলোদর—Ascites (২)

জালগর্দভ—Cutaneous erysipelas (২)

জিহ্বাক্তভ—Paralysis of the tongue (২)

তমকবাস—Hurried respiration

তালুশাক—Abscess of the palate (২)

তালুগুম্ভ—Swelling of the palate

তালুশোথ—Inflammation of soft  
palate

তিবিম—Cataract (২)

তির্ঘাগ্গত সন্ধিভয়—Transverse dislocation

তিলকালক—Mole (২) (১)

তীক্ষ্মাঘি—Bulaemia (২)

তুণ্ডীকেরী—Quinsy (২)

তৃতীয়কজ্বর—Tertian fever (২)

দস্তাপতানক—Tonic spasm

দস্তপুপ্পুট—Gum boil (২) (১)

দস্তবেষ্ট—Acute periodontitis

দস্তবিদ্রমি—Alveolar abscess

দাক্ষণক—Scarf

দালন—Toothache (২)

দাহজ্বর—Bilious fever

দুষ্টব্রণ—Sloughing ulcer

ধমুঠেকার—Tetanus (২)

নকুলাক্ষ—Astigmatism

নভাক্ষিতা—Hemeralopia

নগণ—Blepharo-atheroma

নাসানাহ—Acute rhinitis

নাসাশোষ—Turbinal erection

নাসাহণ্ড—Anosmia

নাসাস্রাব—Rhinorrhoea

নিমেষ—Clonic blepharospasm

নিকটপ্রকাশ—Stricture of urethra

নীলিকা—Cataract

নেত্রপাক—Panophthalmitis

খল্লম—Chloasma (২) (১)

পক্ষবধ—Hemiplegia

পচ্যমানজ্বর—Septic fever

পঙ্কু—Spastic gait

পদ্মিনীকটক—Lichen papillaris

পরিদর—Spongy gum

পরিপোটক—Inflammation of lobus  
auris (২) (১)

পরিপ্ততা—Vaginismus

পরিপ্তাণি ভিমির—Ophthalmospin-  
therism

পরিপেদী—Chronic aczema of ear

পরিবর্তিকা—Phymosis (১)

পক্ষী—Spring catarrh  
 পক্ষকোপ—Trichiasis  
 পক্ষশাত—Ophthalmia tarsi (২)  
 পরিশ্রাবাদর—Peritonitis  
 পাণ্ডু—Mild jaundice  
 পাদদারী—Cracked sole (২) (১)  
 পাদদৰ্শ—Peripheral neuritis  
 পানাজীর্ণ—Alcoholic gastritis  
 পানাতায়—Alcoholism (২) (১)  
 পামা—Eczema (২) (১)  
 পাৰাণগদ্বিত—Acute parofitis (২) (১)  
 পিচ্চিতভগ্ন—Depressed fracture  
 পিচ্চিতভ্রণ—Contused wound  
 পিত্তকাশ—Stomach cough  
 পিত্তজ্বর—Bilious fever (২) (১)  
 পিত্তলাঘোনিরোগ—Vaginitis  
 পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি—Nyctalopia  
 পিত্তাভিযান—Acute mucopurulent  
 conjunctivitis  
 পিষ্টক—Anterior staphyloma of sclera  
 পিষ্টমেহ—Oxaluria  
 পীনস—Atrophic rhinitis  
 পূত্রয়ী—Habitual abortion (২)  
 পুতিনস্ত—Ozoena (২)  
 পুতিকর্ণ—Purulent otorrhoea  
 পূৰ্বসংকেত—Premonitory symptom  
 পূরালস—Acute dacryocystitis  
 পোথকী—Trachoma  
 প্রক্লিষ্টবস্ত্র—Subacute palpebral con-  
 junctivitis  
 প্রতমকশাস—Stertorous breathing  
 প্রতিজ্ঞা—Nasal catarrh  
 প্রতীনাহ—Nasal obstruction  
 প্রত্যাঘাত—Intestinal tympanitis  
 প্রবাহিনী—Third Houston's valve  
 প্রলাপ—Delirium  
 প্রলেপক—Hectic fever  
 প্রবাহণ—Tenesmus  
 প্রবাহিকা—Dysentery (২)

প্রস্রাবসিনী—Prolapsus vagini  
 প্রস্তাঘাত—Croupous conjunctivitis  
 প্রীহোদব—Enlarged spleen, leukaemia  
 বন্ধ্যা—Sterility (২)  
 বলাস—Pingicula  
 বহলবস্ত্র—Follicular conjunctivitis  
 বহিরাগাম—Opisthotonus  
 বালরোগ—Diseases of children  
 ভগনদর—Fistula in ano  
 ভস্মকাগ্নি—Bulæmia  
 ভিন্নব্রণ—Punctured wound of a viscus  
 ভ্রমরোগ—Vertigo  
 মকল—Afterpain  
 মজ্জাগত ভগ্ন—Impacted fracture  
 মহাপদ্বি—Infantile erysipelas  
 মহাশোষির—Necrosis of jaw  
 মহাশ্বাস—Sighing respiration  
 মাংসতান—Oedematous laryngitis  
 মাংসসজ্জাত—Sarcoma of palate  
 মাষক—Wart (১)  
 মুগ্ধদৃষ্টি—Acne (১)  
 মুচ্ছগত—Obstructed labour  
 মূত্ররুদ্ধ—Strangury (২) (১)  
 মূত্রসাদ—Ardor urinae  
 মূত্রাঘাত—Retention of urine  
 মূত্রোৎসঙ্গ—Stricture of urethra  
 মূৰ্ছা—Fainting  
 মেদোরোগ—Obesity (২)  
 মোহ—Fainting  
 বর্ধকাল্যাদর—Enlarged liver  
 বক্ষা—Phthisis (১)  
 রক্তপিত্ত—Haemorrhage (২)  
 রক্তবমন—Haematemesia  
 রক্তগতমহুরিকা—Haemorrhagic small-  
 pox  
 রক্তজবুজি—Haematocele (২)  
 রক্তাদি ধাত্বপ্রকাশনা—Toxic jaundice  
 রক্তমেহ—Haematuria  
 রক্তাক্ষ—Adenoma of palate

রক্তাতিসার—Blood diarrhoea  
 রক্তাশ্ম—Pterygium vasculosum  
 বসণতমসুরিকা—Chicken-pox  
 রাজঘৃক্ষা—Galloping phthisis  
 রূপ—Symptom  
 বোমাণ্ডী—Measles (২)  
 লক্ষণ—Symptom  
 বক্রভঙ্গ—Greenstick fracture  
 বহু বস্তক—Oedema of eyelid  
 বহু শর্করা—Blepharo-lithiasis  
 বহু ঈর্ষ—Blepharonecus  
 বস্তিকুণ্ড—Atony of the bladder  
 বসামেহ—Chyluria  
 বম্বীক—Rupia eruption  
 বাতকটক—Sprain of the ankle (২) (১)  
 বাতকাশ—Dry cough  
 বাতপর্যায়—Ophthalmalgia  
 বাতব্যাধি—Nervous disease (২)  
 বাতগুম্ম—Phantom tumour  
 বাতগ্ৰীবা—Ovarian tumour  
 বাতাহত বহু—Blepharoplegia  
 বাতাত্তিষ্যন্দ—Mild catarrhal conjunctivitis  
 বিচক্ষিকা—Psoriasis (২)  
 বিচূর্ণিত ভঙ্গ—Comminuted fracture  
 বিদগ্ধাজীর্ণ—Acid dyspepsia  
 বিদারী—Phlegmonous pharyngitis  
 বিদ্ধব্রণ—Punctured wound (১)  
 বিদ্রুধি—Diffuse abscess  
 বিরস্তিত সন্ধিভঙ্গ—Complete dislocation  
 বিশ্লিষ্টসন্ধি—Subluxation of joint  
 বিষমজ্বর—Intermittent fever (২) (১)  
 বিসর্প—Erysipelas (২) (১)  
 বিসর্জনী—Second Houston's valve  
 বিস্ফটিকা—Cholera (২)  
 বিস্ফোট—Boil  
 বুবণকঙ্ক—Pruritus scroti (২)  
 বেশথু—Paralysis agitans (২)  
 বৈদৰ্ভ—Septic gingivitis

ব্যঞ্জন—Symptom  
 ব্রণগ্রস্তি—Sore  
 ঐণবোথ—Abscess (২)  
 বিঘ্ণচী—Monoplegia (of arm)  
 শঙ্গ্যক—Temporal neuralgia  
 শতপোনক—Fistula en croosoir  
 শনৈনৈহ—Frequent micturition  
 শর্করাকন্দ—Carcinoma  
 শিবাঙ্গপিড়িকা—Phlyctenular conjunctivitis  
 শাবীবব্রণ—Ulcer (২)  
 শিরাজাল—Pannus  
 শিরাজগ্রহি—Suppurating gland  
 শিরোহস্তন—Cephalalgia  
 শিবা প্রহর্ষ—Acute seropurulent conjunctivitis  
 শিবাগ্রহ—Rigidity of neck  
 শিবাংপাত—Acute haemorrhagic conjunctivitis  
 শিবোবোগ—Headache (১)  
 শিলায়ু—Post-pharyngeal fibroma  
 শীতপিত্ত—Urticaria (২) (১)  
 শীতপূর্বজ্বর—Ague  
 শীতদ—Scurvy (২) (১)  
 শুক্রিকা—Spring catarrh  
 শুক্রাশ্মরী—Seminal calculus, Prostatic calculus  
 শুক্রাশ্ম—Pterygium  
 শুক্রমেহ—Spermatorrhoea (১)  
 শুষ্কান্ধপাক—Xerophthalmos  
 শুদ্ধব্রণ—Healthy ulcer  
 শূলরোগ—Colic (২)  
 শোণিতার্শ—Blepharocarcinoma  
 শোথ—Dropsy, oedema (২) (১)  
 শোষির—Gingivitis  
 শ্যাবদন্ত—Black teeth (২) (১)  
 মৌপদ—Elephantiasis (২)  
 বাসরোগ—Asthma (১)  
 বহু—Leucoderma

হেমেরালপিয়া—*Hemeral opia*  
 শৈথিল্যকাস—*Mucous cough*  
 সংরোহণ ভ্রণ—*Healing ulcer*  
 সংস্থান—*Symptom*  
 সংক্রামকরোগ—*Contagious disease*  
 সত্ততজ্বর—*Biquotidian fever* (২) (১)  
 সন্ততজ্বর—*Remittent fever* (২) (১)  
 সত্তোত্রণ—*Wound* (২) (১)  
 সন্ধিপাতজ্বর—*Adynamic fever*  
 সন্ন্যাস—*Apoplexy* (২) (১)  
 সন্ধিভঙ্গ—*Dislocation*  
 সন্ধান্তি—*Infection*  
 সর্কাসরোগ—*Landry's paralysis*  
 সর্ষপী—*Third Houston's valve*  
 সত্তণতরু—*Corneal ulcer*

সশোথনেত্রপাক—*Gonorrhoeal*  
*ophthalmia*  
 সিকতামেহ—*Phosphaturia*  
 সুর্যমেহ—*Pyuria*  
 সান্নিপাতিক মূচ্ছ—*Coma*  
 হতিকারোগ—*Peruicious anaemia after*  
*delivery*  
 স্পর্শহানি—*Anaesthesia*  
 শ্রায়ুশ্ম—*Chronic pterygium*  
 স্বল্প—*Acute laryngitis*  
 স্বরভেদ—*Hoarseness*  
 ক্ষুটিভঙ্গ—*Fissured fracture*  
 চতুর্দিশ—*Panophthalmitis*  
 হুমুগ্রহ—*Trismus*  
 হলীমক—*Malignant jaundice* (২) (১)  
 হিকা—*Hiccough* (১)

ঐ একেজনাথ দাস ঘোষ ।

## কুন্তিবাসের জন্মশক

বাঙ্গালী সাম্রাজ্যকার কুন্তিবাস পণ্ডিতের জন্মশক সম্বন্ধে দুই মত দেখিতে পাই। সন ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ প্রকল্পচক্রে বন্দ্যোপাধ্যায় কুন্তিবাসের বংশাবলী বিচার করিয়া তাঁহার জন্মশক ১২৫৭ অনুমান করিয়া ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া “বিশ্বকোষকার” শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, কুন্তিবাস ১৩৩৫ শকের মধ্যে বিজয়মান ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, কুন্তিবাস খৃঃ ১৪৪০ অব্দে কি তৎসম্বন্ধিত অগিয়াছিলেন। ইহাতে জন্মশক ১৩৬০ পাই।

একদিকে ১২৫৭ শক, অন্যদিকে ১৩৬২ শক। উভয়ের অন্তর প্রায় এক শত বৎসর।

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” (২য় সংস্করণ) দীনেশবাবু কুন্তিবাসের আত্মবিবরণ নামে একটি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আছে,

“আদিত্যবার ত্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।

তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কুন্তিবাস।”

ইহাতে জানা বাইতেছে, কুন্তিবাস মাঘ মাসের শেষদিনে (২২ কি ৩০ মাঘ), রবিবার ত্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন ১৩১০ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় খনা নামক প্রবন্ধের পাদটীকায় আমি লিখিয়াছিলাম, ঐরূপ ঘটনা ১৩৫২ কি ১৩৭৮ শকে ঘটিতে পারিত। পরে জ্যোতিষগণনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই শকই ভুল। শক ১২৫০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে কোনও বৎসরে কান্তন (কুন্ত) সংক্রান্তি রবিবারে ত্রীপঞ্চমী তিথিতে পড়ে নাই। এই হেতু আত্মবিবরণ এবং শ্লোকের অর্থে সন্দেহ হইতেছে।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, তিনি বদনগঞ্জের ৮হারাধন কুন্তিবিনোদের নিকট আত্ম-বিবরণটি পাইয়াছিলেন। এই সংবাদে বদনগঞ্জে কুন্তিবিনোদের বাড়ীতে পুণ্ডীথানা দেখিতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করি। তিনি নিজে বদনগঞ্জে বাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন, ৮হারাধন দত্তের বাটীর নিকটবর্তী স্থানে এক জন ধুব বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার নিকট হইতে ৮হারাধন দত্ত তাঁহার সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব ত্রীমতী নগেন্দ্রবালা দানীকে বিক্রয় করেন। ■ ■ ■ কিন্তু এক প্রস্ত করিয়া নকল তাঁহার বাটীতে আছে। আপনি যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উক্ত হস্তলিখিত নকলেও উহা ঠিক ঐরূপ আছে, কোন ভুল নাই। সন ১৪২৩ শকে সে পুঁথিটি প্রথমে হাতে লেখা হইয়াছিল।”

অতএব শ্লোকটি অন্ততঃ ঐকান্ত পুঁথিতে আছে। সে পুঁথিও পুরাতন, ১৪২৩ শকে লেখা।

আবার, বিজ্ঞান এম

১। পরিষদের বামায়ণ-প্রকাশ-সমিতি যে ৩৫০ বৎসরের পুরাতন পুথী আদর্শ করিয়াছেন তাহাতে কিংবা অত্র কোন পুথীতে শ্লোকটি আছে কি না ?

২। যদি কেহ শ্লোকটি ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা করিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কল জানাইলে আমার গণনা মিলাইতে পারি।

আমি গণনার নিমিত্ত স্বীকার করিয়াছি —

১, পূর্ণমাঘমাস ১৯ কি ৩০ মাঘ অর্থাৎ কৃষ্ণ সংক্রান্তি।

২, সংক্রান্তিদিন পূর্বমাসে যায়, পরমাসে গণ্য হয় না। ( ওড়িশায় পরমাসের প্রথম দিন হয়। )

৩, শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা হয় না, ষষ্ঠীযুক্তা হইতে পারে ( রঘুনন্দন )।

শক ১২৫০ হইতে ১৪৫০ গণান্ত, উইশত বৎসরের মধ্যে শক ১৩৫৯, ১৩৭০, ১৩৫৪, এবং ১৩৬৭ এই চারি বৎসরে শ্রোতকন লিখিত যোগ ঘটেতে পারিত। কিন্তু কৃষ্ণসংক্রান্তি দিন।

১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ ববিবার তিথি চতুর্থী ( ৫৫ দং )

১২৭০ „ ১৯ „ রবিবার। কিন্তু ক্ষুদ্ররাত্রির পরে তত্তরাত্রে ৩০ মাঘ রবিবার মাস শেষ হয়। সে দিন কিন্তু তিথি ষষ্ঠী ( ৩৫ দং )।

১৩৫৪ „ ১৯ „ রবিবার তিথি চতুর্থী ( ৩৮ দং )।

১৩৬৫ „ ২৯ „ রবিবার তিথি ষষ্ঠী ( ৩৯ দং )।

অতএব একদিনও শ্লোকলিখিত যোগ ঘটে নাই। রুতিবাস পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কি তিথি গণনায় ভুল করিয়াছিলেন? পূর্ণ মাঘ মাস অর্থে যেন ৩০ দিনে মাস শেষ মনে হয়। তাহা হইলে ১২৭০ শক পাই। কিন্তু সেদিন রবিবার হইলেও পঞ্চমী নহে। ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীপঞ্চমী হইতে পারে না। গণনার নিমিত্ত আমি ভাষ্যভী অবলম্বন করিয়াছি।

যাহারা পুরাতন ভাষ্যশাসনাদির তিথি তারিখ মিলাইয়া থাকেন, তাহারা বলিতে পারেন পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে মাসসংক্রান্তি পূর্ববর্তী কি পরবর্তী মাসে গণ্য হইত। ওড়িশায় পরবর্তী মাসে গণ্য হয় বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, হয়ত পূর্বকালে বঙ্গদেশেও এই রীতি ছিল।

■ আশ্ববিবরণটি পড়িলে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে সন্দেহ হয় না। যখন ১৪২৩ শকের পুথীতে ছিল, তখন আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন্ শকে রুতিবাস জন্মিয়াছিলেন?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

■ প্রবন্ধটি কলিকাতায় হারাইয়া গিয়াছিল। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে একটা নকল পাইলাম। এই হেতু পরিষদে উপস্থিত করিতে বিলম্ব হইল।

—প্রবন্ধ-লেখক।



## ত্রিনাথের উপাখ্যান

প্রবাসীতে ত্রিমুখমূর্তি ( ২২৭ পৃষ্ঠা, ১৩১৭ সাল ) ও বোম্বাই অঞ্চলে এই শব্দ-সাদৃশ্যের নাম দেখিয়া আমি “ত্রিনাথ” শব্দটি অর্থশূন্য অনার্থ্য ভাবার অঙ্গ বা পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের নামের সংজ্ঞা-বিশেষ না বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নাম যেমন বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, তদ্রূপ ত্রিনাথও হইতে পারে। সাধারণের বিবেচনায় এই শব্দ দ্বারা সাকার দেবতা বা নিরাকার ঈশ্বর যাহাট্ কিছু অরুচিত শুঁক না কেন, এ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ত্রি=ত্রি বা তিন ( অর্থাৎ ত্রিসংসার=স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের যিনি নাথ অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু, তিনিই ত্রিনাথ—সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্তা )। এই ত্রিনাথ শব্দে সর্ব, রজঃ ও তমঃ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি ত্রিবোধক বাবতীয় শব্দের সমষ্টিসম্মত অর্থ এক ঈশ্বরই এই ত্রিনাথ শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হইতে পারে। অনেক মনে করিতে পারেন, ত্রি-শব্দ থাকায় চরাচর বিশ্বের অধিপতি এক ঈশ্বর সমর্থিত হইতে পারে না ; কিন্তু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি স্থির ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন, ত্রি-শব্দ পূরণবাচক শব্দ নয়, ইহা সংখ্যাবাচক শব্দ। ত্রিসংসার বলিতে বাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব জ্ঞাপিত হয়। এশিয়া, ইয়ুরোপ বা আমেরিকাদি দেশের নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। এক্ষণে এই ত্রিনাথ শব্দে এক উপাখ্যান-পাঠে পাঠক কোতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

কোনও জনপন্নীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষারতিদ্বারা আপন পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতেন। একে ভিক্ষোপজীবী তাহাতে একাকী, ব্রাহ্মণ সংসার-ভারাক্রান্ত হইয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত ও প্রপীড়িত হইয়া একদা বিষম বদনে ও ছিন্নবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কোন এক ধনী বণিকের দ্বারস্থ হইলেন। সায়ংকালে বণিকের পুরী লোকে লোকারণ্য। তিনি কোতূহলাবিষ্ট ও ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দ্বারে উপবেশন করিলেন। লোকজন ক্রমশঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোবাকে ভূষিত হইয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রার্থির আশায় বঞ্চিত হইয়া তথায় কোন এক আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ বণিকের বাটীতে এত স্বীপুরুষের আনন্দোৎসব কিসের ?” আগন্তুক ব্যক্তি দরিদ্র অথচ সরল ও পবিত্রচেতা ব্রাহ্মণের নিরতিশয়পূর্ণ প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলিলেন “আজ বণিক বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ ■ মণিরত্নাদি এবং পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জাহাজ নিকটবর্তী সমুদ্রোপকূলে সংলগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে তিনি বাটীতে পৌছিয়া আপন আত্মীয়স্বজন ■ বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি লইয়া শ্রীশ্রী ত্রিনাথের পূজার মানস ও তাঁহার মেলায় আয়োজন করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ■ অতিথি ইত্যাদি পৌছিলে, তিনি স্বীপুরুষ সংযত

মনে পুত্রকন্যাদির সহিত ত্রিনাথের মানসিক পূজা সমাধা করিয়া বিদেশে বাণিজ্যালব্ধ ধনরত্নাদি গৃহে আনয়ন করিবেন এবং পণ্যদ্রব্যাদির বিকিকিনি ( ক্রয়-বিক্রয় ) করিবেন ।”

ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের মহোৎসবের আয়োজনাংশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন, ‘ভক্তিতাবে ঈশ্বর পূজা করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়; সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও দরিদ্রতা দূরীভূত হইয়া দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর পূজা মানসিক করিলে, যে কোন প্রকার অন্তর্ভুক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পীড়াদি এবং দুর্বলতা দূরীভূত হয়। পশু পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, বোবা ও বাকশক্তি পাইতে পারে, অন্ধ ও ত্রিনাথের মহিমায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে; শ্রেয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ত্রিনাথের পূজা করিলে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল লাভ হইতে পারে।’ ত্রিনাথের এবস্থি মহিমা অবগত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ আনন্দে গদগদ হইয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত প্রভু ত্রিনাথের আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ও মানসপূজার সঙ্কল্প করিয়া সে রাত্রি বণিকের আতিথা গ্রহণ করিলেন। ‘প্রভু ত্রিনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বণিক প্রভু ত্রিনাথের মহিমায় নিজে কি প্রকার দুঃখদুর্দশা হইতে উদ্ধার হইয়া সামান্য দীনদরিদ্র বণিকের অবস্থা হইতে আজ ক্রোড়পতি হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিলেন। বণিক ও ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণের বিপদ আপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ত্রিনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতে ও নিয়মিত উপচারে তাঁহার পূজা করিতে পরামর্শ দিল। ব্রাহ্মণ স্বতঃই আপনার দারিদ্র্য-ভারে প্রপীড়িত ছিলেন ও বণিকের নিকট প্রভু ত্রিনাথের এবস্থি মহিমা শ্রবণ করিয়া প্রভাতে আপন গৃহে ফিবিয়া আসিলেন। ত্রিনাথের পূজার খরচ অতি সামান্য। নিতান্ত দীন দরিদ্র ব্যক্তির উপরও ত্রিনাথ ঠাকুরের দয়ার এই অক্ষুণ্ণ প্রমাণ। খাদ্য, দুর্বাদল ও পত্রপুষ্পের সহিত তিন কপর্দক প্রয়োজন। বাহ্য উপচারের জন্ত কিছু মিষ্টান্ন ও ঘৃত দীপাদির জন্ত কিছু রায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ এমনই দরিদ্র যে, এই তিন কপর্দকেরও সংস্থান ক্রীড়ার নাই। তিনি বণিকের ঘর হইতে ফিবিয়া আসিয়া ত্রিনাথ ঠাকুরের সমস্ত উপাখ্যান ব্রাহ্মণীর নিকট বলিলেন, কিন্তু উভয়েই এই তিন কপর্দকের সংস্থানের উপযুক্ত কোন কিছু আপন ঘরে পাইলেন না। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। ত্রিনাথের পূজার মানস করিয়াছেন, ভিক্ষাদি দ্বারা যে কোনও প্রকারে ইউক প্রভুর উৎসব সম্পাদন করাই চাই। ব্রাহ্মণের হৃদয় ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে পরিপূর্ণ। ভক্তবৎসল ত্রিনাথ কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তিনি যে দীনবন্ধু, ভক্তের প্রাণধন, অন্তর্ধ্যামী, বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর, ঈশ্বর রূপাঙ্গী দীন ধনী সবারই উপর সমান। ভক্তের আকুল ক্রন্দনে হৃদয়ের দৃঢ় প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাবল্য কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? দীন ব্রাহ্মণের ভক্তি ও আগ্রহের বেগে তাঁহার অটল সিংহাসন কম্পিত হইল। অন্তর্ধ্যামী প্রভু ব্রাহ্মণের প্রতি সদয় হইলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পশ্চিমদো আসিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট স্থানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পার্শ্বেই বেনাঝাড়েব মধ্যে তিন কপর্দক দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ বকিলেন—ইহা দেবতার দয়া, যাহার শরণ লইয়াছেন, ইহা তাঁহারই দয়া। এইরূপে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিনাথের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে ত্রিনাথের পূজা দিবস জন্ত ব্রাহ্মণ কপর্দক লইয়া বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় কারবার জন্ত “পঞ্চা” নামক জনৈক কলুর দোকানে আসিয়া এক কপর্দকের তৈল প্রার্থনা করিলেন। এই পঞ্চাকলু বহুদিন পরে ব্রাহ্মণকে এক কপর্দকের তৈল খরিদ করিতে দেখিয়া মনে ভাবিল, ইহাকে ঠকাইতে হইবে। সংকল্প করিয়া পঞ্চাকলু ব্রাহ্মণকে তৈলের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন “আমি প্রভু ত্রিনাথের পূজা দিবস জন্ত আজ সমস্ত রাত্রি এই তৈল জ্বালাইব।” পঞ্চা কলু ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ব্রতভঙ্গের জন্ত (অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি যাহাতে বাতি বা প্রদীপ জ্বালাইতে না পারে) একরূপ কম চোঙ্গায় তৈল মাপিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যদিও জানিতে পারিলেন না, কিন্তু সন্তুষ্ট্যায়ী প্রভু ত্রিনাথ সমস্তই জানিতে পরিগেলেন। পঞ্চা কলুর ঠাকামি বুঝিয়া তাহাকে শাস্তির সচিৎ শিক্ষা দিবস মানসে ত্রিনাথ ঠাকুর স্বয়ং উহার তৈল অপহরণ করিলেন। পঞ্চাকলু কম মাপের চোঙ্গায় তৈল মাপিতে মাপিতে সমস্তই নিঃশেষ করিল, কিন্তু চোঙ্গা পূর্ণ করিতে পারিল না। তৈলভাণ্ড শূন্য হইল, অথচ চোঙ্গা ভরে না দেখিয়া পঞ্চাকলু আপনার শঠতার শাস্তি বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের পা ধরিয়া কাদিতে লাগিল। কলুকে পা ধরিয়া কাদিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ?” পঞ্চাকলু আপন শঠতার কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তিনি কলুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত চোরা হইয়া ইহা ত্রিনাথ ঠাকুরেরই লীলা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেমে গদগদ হইয়া পড়িলেন। পঞ্চাকলুকে ত্রিনাথের মহিমা বুঝাইয়া বলিলেন এবং তৈল ফিরিয়া পাইবার জন্ত পূজা দিতে পরামর্শ দিলেন। এক কপর্দকেরও কম তৈল লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপচারে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত সাংকালে প্রভু ত্রিনাথের পূজা সম্পন্ন করিলেন। ত্রিনাথ ঠাকুরের কৃপায় কম তৈলেই ব্রাহ্মণের প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিল। ত্রিনাথের উৎসব সমাধা হইবার পর হইতে তাঁহার দিন দিন সর্ববিধ উন্নতি হইতে লগিল। প্রভু ত্রিনাথের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার—ধনজন দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দরিদ্রতা পাশ হইতে উদ্ধার হইয়া ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মোটামুটি ত্রিনাথ ঠাকুরের পরিচয় দিলাম। পাঁচালিখানির এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।

### চৌধুরী বিশ্বরাজ ধনন্তরি

■ ত্রিনাথের পাঁচালী লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা হইবে।

প্রতিকা-সম্পাদক।

# প্রাচীন পুথির বিবরণ

৫০০ । ইমাম-সাগর

আমি যে “ইমাম-সাগর” খানি পাইয়াছি, উহা নকল। আসলখানা কতদিনের রচিত, তাহা অবগত হইতে পারি নাই। ১২ পৃষ্ঠার একস্থানে লিখিত আছে :—

... ..  
... ..  
আম্মা রহুলের যদি রূপা দৃষ্টি পাত্ত ।  
বাক্সালা হইতে ইমাম সাগর ( পুস্তক ) গুনাত্ত ॥  
শেখ বুঝাকু আলী ( ? ) সে বিদিত সংসার ।  
তাহার তনয় শেখ ফরিদ খোন্দকার ॥  
রচিল চুড়ান আলী ( ? ) তাহার তনয়ে ।  
শেখ পহোরি ( ? ) আমার “কুরুছি” কুল হএ ॥  
ইমাম সাগর পুথি পরে যে ‘মমিন’ ।  
অবশ্য দেলের ভেদ পাইবে সে জন ॥

ইহাদের সম্বন্ধে ( এখানে ) কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ১২৮ পৃষ্ঠার আছে :—

... ..  
... ..  
আমার আরজ এক সভার হজুরে ।  
পুস্তকে তাকিব হইয়া নিবে সবে সিরে ॥  
তহকিক করিয়া সবে সিরে নিবে তাই ।  
কমি বেশি কর যদি আম্মার দোহাই ॥  
হাদিছে ত লেখা আছে গুনহো মমিন ।  
... ..  
... ..  
করিত্ত সাইরি পুতি ( পুথি ) বড়ই মুন্সিলে ।  
ইমাম সাগর নাহি মিলে কাকিনা সংসারে ॥  
বাক্সালা কবানে নাঈদী পুতি ( পুথি ) এমামের ।  
তাহাতে করিত্ত সেকি ( ? ) কর বরাবর ॥  
কুরসোএ পচার্ডর মজিলের পরে দিন ।  
তামার হইল পুতি জানিবে মমিন ॥

ইমাম হুছনের পুঁথি হেইল তামাম ।  
 গোমানিন (?) হৈল বুচিলো কবি জানিবে এছলাম ॥  
 গোলামি কতেন ভাবি নবির পদসার ।  
 আল্লা মহাম্মদ বিনে, গতি নাহি আর ॥  
 ইতি ইমাম সাগর পুস্তক হৈল সমাপ্তন ।  
 আল্লা আল্লা বোল ভাই 'দিনের' মোসলমান ॥  
 তোমার কদমে ছালাম কতো কিছু তার ।  
 বনিজ মামুদ নাম জানিবে আমার ॥  
 সাকর ( আখর ) বেশি কমি হৈলে না ধরিবা আর ।  
 গুণা খাতা মাফ করি লইবা আমার ॥  
 পুঁতি সমাপ্তন হৈল ( রোজ ) মঙ্গলবার ।

সন ১২৭৫ সাল তাং ৩২ ( ? ) বৈশাখ মাস জানিবা ॥

“জিঃদার বনীজ মহাম্মদ সাং গোপাল রায় । জথা দিশ্‌টং তথা লিখিতং । লিখিকো দোসক নাস্তি । ইস্তক সন ১২৭৪ সাল চৈত্র নাগাদ সন ১৩০৫ সালের বৈশাখ । তারিখ ৩২ ( ? ) বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার । মোকাম কাকিনা পুস্তক লেখা হইল । বেলা আছর সময়ে । আমলদারি কাকিনা শ্রীজুত সেডুকুলা বাটী তালুক গোপাল রাঃ চাকোলে কাকিনা হস্ত রক্ষর শ্রীজুত রাজে মহম্মদ । বসত মোকাম বাণীনগর বাটী জানিবা । আর অধিক কি লিখিব আমি গুণাগার । আমার পুঁতির সঙ্গে হুইশত সাত পাত জানিবা ।”

পুস্তকখানি বড় এবং ছই পৃষ্ঠার লেখা । হস্তাক্ষর ও পুস্তকের তুলট কাগজের অবস্থা দেখিয়া অনেকদিনের পুঁথি মনে হয় । লেখকের ভাষাজ্ঞান আদৌ ছিল না বলিলেই হয় । নকলের দোষেও এমন বিকৃত হইতে পারে । পুস্তকে যে রাজে মহম্মদের নাম আছে, তাহার বিবরণ অনুসন্ধানে কিছুই জানিতে পারিলাম না । এই বাণীনগর,—কাকিনা হইতে ছই মাইল উত্তরে—ষ্টেশনের সম্মুখিত । বর্তমান সময়ে সেখানে একটি ঐ নামের অগ্নিতিপ্পর বৃদ্ধ আছে । তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু বলিতে পারিল না । গ্রন্থোল্লিখিত রাজে মহম্মদ সে নিজে নহে, তাহাও বলিল । তবে তাহার কাছে ছইজন ঐ নামের ঐ স্থানের লোকের কথা শুনিলাম । ইহাদের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানিত না । অপর রাজে মহম্মদই ইহার নকলনবিস কিনা তাহা সে বলিতে পারিল না । তবে সে লেখাপড়া জানিত, একথা সে বলিল । সুতরাং এ গ্রন্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । কবি বনিজ মামুদ সম্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু সে বলিল, আমি গোপালরায় ঐ নামের কোন লোক ছিল বলিয়া জানি না । ( এই ) গোপাল রায় বাণীনগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ।\*

\* পরে মুনসী সাহেব আমাকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—“তাহার ব্রী ও ছইপুত্র এখন কাকিনার অধিবাসী ; কিন্তু তাহার পিতৃগুণের অধিকারী হইতে পারে নাই । নীচভাবে আমাদের খানিকটা জমি জমা লইয়া

## ৫০১। গোসানী-মঙ্গল

“গোসানী-মঙ্গল + অর্থাৎ রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত ;—কোচবিহার বা এতৎ প্রদেশের আদি কাব্য। ৬রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত। ইহা ঠিক কোন্ সময়ে রচিত, তাহা বলা যায় না।

আমাদের কাছে ১৩০৬ সালের মুদ্রিত, কলিকাতা আলবার্ট কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ৬কৃষ্ণ বিহারী সেন্ এম্ এ মহোদয়ের অত্মত্যানুসারে গোসানী-মারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তক আছে। এখানি বিপুল সংস্করণ। সম্প্রতি আর একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছি। উহা কোচবিহারের অন্তর্গত বড় মরিচা নিবাসী মোলবী আমানত উল্লা চৌধুরী জমিদার সাহেবের পুস্তকাগারে সন্নিবেশিত আছে। আমরা এখনও উইখানি পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। ... .. তবে উক্ত আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি, মুদ্রিত পুস্তক খানির সহিত স্থানে স্থানে পাঠের অমিল আছে। ... .. যাহা হউক, সে পুস্তকখানি সন্নিবেশিত আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিব। শেষোক্ত পুস্তকখানি একটি হিন্দু বৈরাগীর কাছে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শুনা যায় সে লোকটি প্রত্যহ পুথিখানির পূজা করিত।

কবির ৬রাধাকৃষ্ণ দাসের পিতা ৬করুণাকর দাস কোচবিহারপতি মহারাজ হুজুর নারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন। কবি “মঙ্গলাচরণে” গাহিয়াছেন :—

হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা,                      বেহারে পালেন প্রজা,  
যাঁর যশ ঘোষে সর্বজন।  
সেই রাজ্যে করে ঘর,                      সাধু সে করুণাকর,  
পরম বৈষ্ণব গুণধাম ॥  
তাহার তনয় এক,                      পাইয়া চৈতন্ত ভেক,  
চিন্তে হরি-চরণ-কমল।  
তাহে আদেশিলা দেবী,                      কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,  
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল ॥

গোসানী-মারিতে কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্তিকলাপের চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে। কবি যে গোসানী দেবীর একজন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত সুললিত কাব্য হইতেই বেশ অনুমিত হয়।

আছে। লেখকের গ্রীষ্ম মুখে শুনিলাম,—প্রৌঢ় বয়সে বনিজ মানুষের মৃত্যু হয়। লোকটা মুনীগোছের ছিল। বলা বাহুল্য, প্রহেলিকাখিত গোপালদাসেরই তাহার বাড়ী ছিল।”

‘গোসানী’ কি ‘গোদামিনী’ শব্দ-জাত ?

গ্রন্থখানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, স্বাভাবিক, পরিষ্কৃত। গ্রন্থায়ত্তে কবি বলিতেছেন :—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী ।  
সেই গ্রামে জামরক্ষ আছে সারি সারি ॥  
সুবর্ণ বরণ জাম ফলে বারমাস ।  
শ্রীফল-বেলাদি তথা চির পরবাস ॥  
পার্কীতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে ।  
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে ॥  
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন ।  
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্বজন ॥  
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে ।  
ঘরে ঘরে শিব দুর্গা পূজে কুতূহলে ॥  
চণ্ডী কহে বর দাও তোলা মহেশ্বর ।  
এই রাজ্যে রাজা হ'ক নাম কান্তেশ্বর ॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর ; মাতার নাম অঙ্গনা । অঙ্গনা—

তত্ত্ব মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ ।  
কথার প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন ॥  
স্বামী-মুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য ।  
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ ॥

তারপর চণ্ডী আসিয়া দম্পতীকে স্বপ্ন দেখাইলেন :—

শুন শুন ভক্তীশ্বর, শুনহ অঙ্গনা ।  
তোমাঘর হতে প্রিয় নাহি কোন জনা ॥  
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর ।  
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর ॥  
সত্য করি কহি বার্থ না হবে বচন ।  
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন ॥  
রাধিবা পুত্রের ভূমি কান্তনাথ নাম ।  
একথা কহিরা চণ্ডী হ'ল অস্তর্দান ॥

■ চণ্ডী-পূজার দ্বারা অঙ্গনার গর্ভে সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন । তৎপর কান্তেশ্বর—

অন্নকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন ।  
বাল্যেই সংস্কৃত শিখে কহিরা বচন ॥

ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত ।

তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত ॥

সুতরাং এমন রাজা আয়পন্নয়ন ধর্ম্মাহরক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? ইনিই গোসানী সংস্থাপন করেন । কবি বলেন :—

সসৈন্তে সাজিয়া রাজা করিল গমন ।

চতুর্মুখপেতে আসি দিল দরশন ॥

পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান ।

সিংহ-পৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন ॥

গোসানীর ‘আসন’ দেওয়া শেষ হইলে, ভক্ত রাজা লক্ষ বলির আদেশ দিলেন । মহাসমা-  
রোহে সমুদায় কার্য্য শেষ হইল ।

এই দেবীর সেবাহিতদিগকে ‘দেউরী’ বলে । পুস্তকের শেষে কবি বলিতেছেন :—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায় ।

ধন জন পুত্র সে আনন্দে বেড়ায় ॥

গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ ।

হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ ॥

ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস ।

অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ ॥

নিবংশ হইবে সে গোসানীর কোপে ।

দরিদ্র হইবে সেই গোসানীর শাপে ॥

পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস ।

গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস ॥

গোসানীর নামে ভাই না করিও হেলা ।

নৌকার বিহনে যাও সাগরে বাকি ভেলা ॥

গোসানী-মঙ্গল নাম তরী অনুপম ।

স্বরণ লইলে তার সিকি হয় কাম ॥

গোসানী আদেশে ভাই ভজ হরি পায় ।

গোসানী-মঙ্গল গীত রাধাকৃষ্ণ গায় ॥

মুদ্রিত পুস্তকখানি ডিম্বাই ১২ পেজি ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ।”

৫০২ । আমছেপারার অনুবাদ

“সম্প্রতি আমি একখানি অতিপ্রাচীন পাথরে ছাপা আরবী ও হতাকরের ২২ বাক্য



ছাপা “আমছেপারার” ■ কবিতার অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজি সাইজের ৬৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু অগ্রপশ্চাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম-ধাম, সন-তারিখ নাই। গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান। আমি জানি না, এ গ্রন্থ কোন অদ্ভুত প্রেসে মুদ্রিত। একই প্রেসে,—বাল্লা ও আরবী অক্ষরে এই প্রকার গ্রন্থ ছাপা হওয়া, প্রাচীন কালের পক্ষে বিচিত্র। প্রত্যেক “আয়েতের” পৃথক অনুবাদ আছে। গ্রন্থকার যে রংপুরবাসী কোন মহাজন, তাহা সুনিশ্চয়। কারণ, গ্রন্থে এতৎ প্রদেশ-প্রচলিত অনেক শব্দ আছে। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থখানি “ইসলাম-প্রচারকে” অবিকল প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

গ্রন্থারম্ভে—

ডর ( সুর ? ) এই কেতাবের নামেতে আল্লার।

দয়াময় দয়ালু বহুত রহম জাহার ॥

সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার।

পালোনেওয়ানা সেই সারা সংসার ॥

শেষ :—

আর যতো কাকের কহে তাহার সবে।

হায় হায় মাটি হৈতাম হৈতো ভালো তবে ॥

কঃ ( ? ) মাটি রৈলে হেছাব কেতাব নাহি দিতে হোতো।

আজ এতো ডক্ক তবে নাহি মিলিতো ॥

গ্রন্থের ছাপা বেশ পড়া যায়। আমার বিশ্বাস, এদেশে বাল্লা টাইপ প্রচলনের পূর্বে এ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল।”

### ৫০৩। হংস-বিলাস পাঁচালী

“১৭৮৭ শকাব্দে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬।

আরম্ভ :—

ত্রীভুর্গে জয় ভুর্গে মম ভাগ্যে সদয় ভুর্গে ■ ( হও ) শিবকন্ডী।

তুমি জগৎতারাল কালসংহরা পরাংপরা ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজ(গ)ৎ কত্রি ॥

( ছড়া )

দীর্ঘ দীঘি সরোবর,                      যেন নিধি রত্নাকর

মনোহর পদ্ম সুশোভয়।

কি কব দীঘির শোভা,                      সুনিজন মনোলোভা

হইলে ভাঙুর প্রভা প্রভাত সময় ॥

কবির পরিচয় :—

\* কোরাণসরিকের অংশবিপণের নাম ‘আমছেপারার’।

ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি, বিরচিত কাব্য কবি,  
রবিশ্রুতে হইল নিস্তার ।

চংখুরাণী গ্রাম ধাম, অমৃত ভজহারি নাম,  
গিরিধারী মাতুল পরিবার ॥

শেষ :—

ঈশ্বর চন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাদুর ।

ঠাকুর গেলেন কচু বনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥

এ চংখুরাণী গ্রাম কোথায়, জানেন কি ? ... ... এ গ্রন্থকার অবশ্য রংপুরের লোক নহেন ।”

পুর্কালোচিত ‘ইমাম সাগর’ ‘গোসানী-মঙ্গল’ ‘আমছেপারার অন্তবান’ ও ‘হংস-বিলাস পাচালী’ এই চারিখানি পুথির বিবরণ রঙ্গপুর—কাকিনানিবাসী বজ্রবর মুনসী সেখ কজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলী হইতে সংকলিত করিয়া দিলাম । তিনিও পরিষদের একজন সদস্য ও পুথি-সংগ্রহ-কাধ্যে ব্যাপ্ত আছেন । পুথিগুলি তাঁহারই হাতে আছে ।

#### ৫০৪ । নামহীন পুথি

কেবল ১ম পাত আছে । তদ্বারা এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না । কাগজ একবারে পচিয়া গিয়াছে ।

আরম্ভ :—

১৭ নমো গনেশায় ।

বেদে রামায়ণে—ঈত্যাদি শ্লোক ।

কলির মোচন জদি কৈলা নারায়ন ।

করজোরে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুর নন্দন ॥

যুন যুন নারায়ন প্রভু গুণনিধি ।

কলিজুগ অবতারে কৈলা কোন বিধি ॥

ছষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয় ।

কহ কহ নারায়ন কৃষ্ণ মোহাশএ ॥

কিরূপে হইব ছিষ্টি কেমত প্রকার ।

করিলেক কোন কার্য্য কেমত আচার ॥

নৃপতি সকলে কোন ধর্ম্ম আচরিল ।

প্রীথিবিভে প্রজাগণ কেমতে বাকিব ॥

#### ৫০৫ । যজুনাথ-বারমাস

আরম্ভ :—

যজুনাথ বারমাস ।

যজুনাথ কুল নিবেদন ।

তেজিরম বসতি আশা তোমার কা(র)ণ ॥

বৈসাথে বহে বাণ্ড মলআ সহিত ।

জন্মনাথ বিনে মোর স্তির নই চিত ॥

নানা রিত নাট করে বৈসি বৃন্দাবনে ।

বিতোল ( বিভোল ? ) হইবম মুই ঋতপতি বিনে ॥

শেষ :—

চৌত্র চাতকি পক্ষি ডাকি পীআ পীআ ।

সর্বক্ষন স্থির নহে আশাব জে জিউ ॥

ভণিতা :—

বারমাসের তের খোসা লওরে গণিআ ।

এই গিত জোরাই আছে শ্রীধর বাণীআ ॥

তারিখাদি নাই । সম্ভবতঃ ১২৩২।৩৩ মঘীর লেখা । অতি কদর্য্য হস্তাকর । পদ-  
সংখ্যা—প্রায় ২৪ ।

### ৫০৬ । জয়নবের চৌতিশা

বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাসনের স্ত্রী । তাঁহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর  
অন্তঃকরণে যে বিদেষ-বহি প্রজ্বলিত হয়, সে আগুনে হজরত ইমাম হাসন ভস্মীভূত হইলেন,—  
সমস্ত নবী-বংশ ছারখার হইয়া যায় ! সেই মন্ব্যস্তিক দুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না !  
সুতরাং আমরা পুথিখানি লইয়াই ছোট কথা বলি ।

ইহা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র ;—পদ-সংখ্যা ৬৮ । কাগজ একবারে তাম্রকূটপত্র আর কি !  
তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই । ভণিতারও অভাব । পত্রসংখ্যা ৬ ; দুই পিঠে লিখিত ।

আরম্ভ :—

‘৭ কালে বিবি জএনবে জে হাছনের শোকে ।

কালিনী সমুদ্র মাজে ডুবাইলা মোকে ॥

কুকিলা কুহরে জেন বসন্ত সমএ ।

কুলিস আফির জলে ধারারূপে বহে ॥

খীন হৈল তম্ব মোর বিচ্ছেদে তোমার ।

খেমাই রাখিতে চিন্ত ন পারিএ আর ॥

খোদাএ করিল মোরে এথ বিরহন ।

খাইলা দারুণ বিস আমার কারণ ॥

শেষ :—

ফেলিলুম নামান খেইল হাছনের সনে ।

ক্ষেণে ক্ষেণে সেই কথা উঠে মোর মনে ॥

ক্ষিণ হৈল তম্ব মোর বসন মলিন ।

ক্ষেতিত পাপিষ্ঠ জীউ রহে কথ দিন ॥

ইতি জএনবের চৌতিশা সমাপ্তঃ ॥

### ৫০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ

এই নামের আর একখানি পুথির পরিচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। (১৪শ পৃথি দ্রষ্টব্য।) তাহার সঙ্গে অঙ্ককার পুথিখানির কিছুমাত্র ঐক্য দেখা যাইতেছে না। ইহার কেবল ১ম ও ১১শ পাভাটি পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

৭ ত্রিভুগা। নারায়ণ নমস্কৃতং ইত্যাদি।  
 ত্রিভুগিষ্ঠির স্বর্গআরহন লেকন।  
 জগজ্জএ জিঙ্গাসিলা ব্যাসের গোচর।  
 পূর্ব পুরুষ কথা কহ মুনিবর ॥  
 আক্ষার প্রপিতামোহ ধর্ম নরপতি।  
 রাজ্য ত্যাগিআ কেনে গেলে স্বর্গপতি ॥  
 এহি রাজ্য হোতে হৈল গোত্রের বিনাস।  
 এই রাজ্য পাইতে করিল হাবিলাস ॥  
 তাহান সারথি আছিল নারায়ণ।  
 তবে কেন রাজ্যত্যাগি গেল মোহোজন ॥  
 প্রসন্ন বদনে মোরে কহ মুনিবর।  
 এতি কথা কহো মুনি আক্ষার গোচর ॥ ইত্যাদি।

### ৫০৮। নামহীন পুথি

ইহার কেবল নাম নাই এমন নহে, ১ম ও দ্বিতীয় পাত ভিন্ন অপর পত্রগুলিও নাই। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তারিখাদিও জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রাচীন। কি একখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ হইবে। পুথিখানি আকারে নিতান্ত ছোট ছিল, বোধ হয় না। প্রাপ্তাংশ হইতে কতকটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় পুথির অস্তিত্ব-চিহ্ন রাখিলাম; কথা :—

৭ ত্রিভুগা। নমো গনেশায়।  
 প্রেমম (প্রথম ?) বন্দম গুরু বৈষ্ণবচরণ।  
 জাহার প্রসাদে হৈল বাক্তি পুরন ॥  
 ... ... করি লক্ষ্যকার।  
 জাহার প্রসাদে ভূমি ? করিব প্রচার ॥  
 সিরে বৈস সরস্বতি কঠে দেও পাণ্ড।  
 জিহ্বা ... ... কর সরস্বতি মাণ্ড ॥

এহোলোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা ।  
 অন্তকালে প্রাণ জাইতে রামনাম (বোলাইবা ?) ॥  
 শ্রীগুরুচরণ বন্দম্ মনে করি সার ।  
 তাহান চরণে মোর কটি (কোটা) নমস্কার ॥  
 সভা করি বসি আছে রাজা কংস (রাঁয় ?) ।  
 অক্রোর মূনিরে রাজা সাক্ষাতে আনাএ ।  
 রাজা বোলে জাও মূনি গকুল নগরে ।  
 জগ্গিআছে কৃষ্ণ বলাই নন্দ ঘোসের ঘরে ॥  
 কৃষ্ণ বলাই তই শিশু আনি দেও মোরে ।  
 আন্ধা ... ... সে জাও গকুল নগরে ॥ ইত্যাদি ।

৫০৯ । পত্র লিখিবার ধারা

আরম্ভ :—অথ পত্র লিখিবার ধারা ।

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিআ মস্তকে ।  
 পাতিয় নিঅম্ব কিচু কহিব সংক্ষেপে ॥  
 পিতার চরণে করি অসংখ্য প্রনতি ।  
 একান্ত সেবক বলি লিখীবেক পাতি ॥

শেষ :—

সমানে ২ লীথে ত্দিআ বলিআ ।  
 সমভাবে লিখে তাহাকে নমস্কার করিআ ॥  
 কিস্তিত কহিল এই সংক্ষেপে অক্ষরে ।  
 সর্বত্র লিখীব পত্র এই অনুসারে ॥

“হাতি সন ১২৫৫ বাঙ্গলা তারিখ ১৫ অশ্বিন ।” পদ-সংখ্যা—৪২ মাত্র । ভণিতা নাই ।

৫১০ । নীলার বারমাস

এই নামের আর একখানি বারমাসের পরিচয় পূর্বে দেওয়া গিয়াছে । ( ১৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য । ) মিলাইয়া দেখিলাম, দুইখানি এক নহে ।

আরম্ভ :—অথ নিলার বারমাস । নম গনেশায় ।

কাক্তিক মাসেত নিলা নিসিন্ধর রাত্রি ।  
 আজি নিসি পরবাশী দেখিবন্তু জুবতি ॥  
 লগরে কর্পুর তাবুল দোসের পীরিতি ।  
 হাররে কপট মারা মুই মাগম জুরতি ( সুরতি ? ) ॥  
 ওরে সাধু ওরে কুমার মুই বলম্ তৈমারে ।  
 ধর্ম চাহিতে শুনা খেমা করহ ॥ ১ ॥

শেষ :—

আর জদি কিছু বলম্ জনামু আউলানী ।  
 লর্জা পাইবা সাউধের কুমার হারাইবা জে প্রাণি ॥  
 আশ্বীন মাসেত নিলা দুর্গা থাএ খানা ।  
 বুজিলং নিল তোর সস্তিবানা ( সন্তীপনা ) ॥

... ..  
 হাতে লৈল চুআ চন্দন মাথে দিল তৈল ।  
 হেলিতে চলিতে কন্যা বাপের বারিত্ গেল ॥  
 কি করহ বিদ্ধু ( বদ্ধ ) মা বাপ কি কর বসিআ ।  
 কার খাইলা পানগুআ কারে দিলা বিচা ॥

... ..  
 হাতে লৈল গুআ লাটী কান্দে লৈল ছাতি ।  
 ধিরেং জাএ বুরা জামাই চাইত বলি ॥  
 কোথাএ ছিল মাও বাপ কোথা ছিল ঘর ।  
 কি নাম জে মাও বাপ কি নাম তোর ॥  
 ডাকাপুরে বারি মোর কৈলাশপুরে ঘর ।  
 মাও মোর কলাবতি বাপ বিস্তাধর ॥  
 বুজিলামং নিলা তোর নিজপতি ।  
 আউলাই মাথার লেশ করহ বশতি ॥

ভণিতা :—

বার মাসের তের ঘোশা (ল)ওরে গণিআ ।  
 এই গীত জোরাই আছে শ্রীধর বানীআ ॥

“সমাপ্ত । ইতি ১২৩২ সং তাং ১২ মাঘ রোজ মঙ্গলবার । লিখক শ্রীঅভয়া চরণ শেন ।”  
 পদ-সংখ্যা .-৪৫ ।

### ৫১১ । ফাতেমার ছুরৎনামা

পূর্বে ৮৭ সংখ্যক পুথিতে একবার ইহাব বিবরণ দেওয়া গিয়াছে । ইহাও ঠিক সেই পুথি হইলেও ভণিতার পার্থক্য দেখা যাইতেছে । পূর্বের পুথিতে সাহা বদিয়ুদ্দিনের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে ; আর আজ পাওয়া যাইতেছে শের-ভদ্দ নাম কবির । এ রহস্য গাঢ় তম্বিত্রায়ত ;— উদঘাটন সূকঠিন । এক পুথি হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পাঠ পার্থক্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য । নিম্নে একটু একটু দেখুন :—

আরম্ভ :—

বিচম্বিজাহেরহমানিরহিম ।

প্রথমে আজায় নাম করিএ স্বরণ ।

মুই চরণে মুই মাগি নিবেদন ॥ .

শুন নর সব আশ্রি এক কথা বলি ।  
 জেন ফাতেমার রূপ দেখিলেন্ত আলি ॥  
 এক দিন আলি গেল বন্ধুর ঘর ।  
 দরজাতে জাই আলি ডাকে উচ্চস্বব ॥ ইত্যাদি

ভণিতা :—

কিতাবে সুনিআ গাথা      রচিল তত্ত্বা কথা  
 কথ পথ করিলুম রচন ।

শেষ :—

ছুরং দেখিআ আলি সন্তোষ হইলা ।  
 আলার নামে ছই রকাত নমাজ পড়িলা ॥  
 ছীন শের তম্ব এ কহে ভাবে করতার ।  
 সুনিআ এ সব কথা কিতাব মাজার ॥  
 কিতাবে এই কথা কল্পে সুনিআ ।  
 আলাকে স্বরিয়া কিছু রাখিছে লেখিয়া ॥  
 গুণিগণ পদে আশ্রি করি নিবেদন ।  
 জদি দোস হই থাকে খেমব সর্ব জন ॥  
 অশুক হইলে তাকে শ্রদ্ধা করিবা ।  
 গরিব দেখিতে দোস সমুখে খেমিবা ॥

“এই ত বিবি ফাতেমার ছুরত সমাপ্ত । ইতিন সন—১২০৩ অব্দি তারিখ ১১ বৈশাখ সোম  
 বুক্রবার । লেখীতঃ শ্রীমাহাঃ আলি সাকিম্বে খড়না । এই পুস্তক মালিক শ্রীমহিফর পীছরে  
 দেবান আলি সাং মাহাদাবাদ ।” পত্রসংখ্যা ১৪ ; ছই পিঠে লেখা । বাঙ্গালা কাগজ,—দুহ  
 আকার ।

### ৫১২ । মান-গান

ইহার আদ্যস্ত কিছুই ঠিক করা যায় না । দৃতী-সংবাদের ও মানভজনের গান বলিয়া  
 বোধ হয় । পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন না হইলেও কলে তাহাই হইয়া গিয়াছে । একরূপ নষ্ট  
 হুইয়া বাওয়ার মধ্যে । ২১ পাত উদ্ধার করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ । ইহাতে ছড়া,  
 কথা ও গান আছে । প্রাপ্ত ১ম পত্রটির প্রথম পৃষ্ঠার মকর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ও মধ্যস্থল  
 ছিঁড়িয়া গিয়াছে । ২য় পত্র হইতে :—

ঠাকুরের কথা ।

চক্রাবলি আর থাকিতে পারি নাহে ।

ঠাকুর এখন জাও কি থাক ॥ তোমার দ্বিমে

কোন প্রিয় ( প্রয়ো ) জন নাই হে । সে কেমন হুন

বলি : । গান ভাল আর খেমটা ।

জাও দে জেথায় আছে প্রিয়জন : আর তো  
 নাই প্রিয়জন : জে জন ওতামার প্রিয়জন ॥ ৬৩  
 গো জাইএ তার প্রিয়জন : জখন চিন প্রিয়  
 জন ॥ তখনে ছিল প্রিয়জন : আর এখন কি  
 প্রিয়জন : নতনে নতন প্রিয়জন ॥ ১৯ ।

মদ্যস্থলে :—গান, তাল ঠেকা ।

রাধে ২ বল বিনে প্রবল বিনে ॥

রাধে আমার ধ্যান জ্ঞান রাধে বিনে জানিনে :

জে ছিল মোর প্রেমে বান্দা সে প্রেমে পৈরাছে বাধা ॥

জার তরে বৈই নন্দার বাধা আমি মরি সেই রাধা বিনে ॥

শেষ :— গান, মিলন ।

শ্রাম যজ্ঞে হিলন দিয়ে ধ্বনি দ্বাড়াইল রে ॥

লইয়ে প্যারি বাকা ঠেয়ে দ্বাড়াইল রে :

আপনাব বন্দুয়া রৈলে ধনি দ্বাড়াইল : .

সাম চান্দে রাই চান্দে চান্দেয়া গণিল : \*

দুই চান্দে একই হৈএ চান্দেয়ে ঘিরিল ॥ ৪৬ ।

সামের বামে রাই দাড়াইল : একবার বদন্ত ভেড়ে হরি বল ॥ ৪৭ ।

“ইতি মানগান সংপূর্ণ হৈল । ইতি সন ১২৭০ সাল রোজ বুক্র বার বেইল ৩ তিন প্রহর  
 সময়ে হস্তযক্ষর শ্রীগোবিন্দ দাস বৈরাগি ॥”

পত্রসংখ্যা—৮ ; দুই পিঠে লেখা । এই আটপাতের পর “হুতীর সহিত ঠাকুরের কথা”  
 লিখিত আছে । উহার ভাষা গুণ্ড ও পুণ্ডে মিশ্রিত । সেই অংশ পশ্চাৎ সমালোচিতব্য ।

এই পুথিখানি রঙ্গপুর কাকিনা হইতে বন্ধুৱর মুন্সী সেখ ফজল করিম সাহেব সংগ্রহ  
 করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

### ৫১৩ । ভানুমতীর বিবাহ

তত ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রন্থ নহে । রয়েল ফরমের কাগজ । দুই পৃষ্ঠায় লিখিত । পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭৭

আরম্ভ :—

শ্রীজয় ভূর্গাপদ শ্রীভূর্গা ভরসা ।

অথ ভানুমতীর বিবাহ লীখতে ।

/৭ নম গণেশায়ঃ সরস্বতী নমঃ ত্রিপদী :

প্রনমামি গণদেব :

বাসুদেব মহাদেব ॥

সূর্য্যদেব দেব যবন্দীনি :

\* অর্থ ‘চান্দে রাগালিল’ হয় কি ?



সষ্টদেব অগ্রভব :                      রমাধব উমাধব :

ছায়া সঙ্গাধব বিধবনী : ইত্যাদি ।

ভণিতা :—

আনন্দিত ভানুমতী স্তনি দৈববাণী ।

বিরচিত গৌরীকান্ত ভরসা ভোবানী ॥

শেষ :—

রাজা বোলে ভানুমতি কর উপহাস ।

আমার নাহিক দোস সুন কালিদাস ॥

বেঙ্গ করি কথ কথ কহিল আমাএ ।

যিস্তা (ঘৃণা) করিলাম আমি তাহার কথাএ ॥

যুগা ভেসে আসি দেখা দিল দুই জনে ।

কুজা মাআ আমি বুজিব কেমনে ॥

এইরূপ কথোপকথন দুই জনে ।

বিরচিএ গৌরীকান্তে ভনে ॥

“ইতি ১৮৫০ ইং তাং ১৯ সেপ্তেম্বর মতাবেক সন ১২১৪ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন বোজ রবিবার অমুদ্র হইলে পদ যুদ্ধ করি দিবা । মুই অধমেরে এবং মুণেরে মন্দ নহি বলিবা । স্ত্রুনের পুত্র তোমারা পণ্ডিত স্ত্রুজন । এই পুস্তক লিখীতং শ্রীরাম কুমার সেন ॥ সাং কত্রপারা ॥ সমাপ্ত হইল ॥”

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম থরন্দীপ মুদ্রা ইংরেজী স্কুলের হেডপণ্ডিত বক্তবর শ্রীযুক্ত বাব পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

৫১৪ । হরিশ মঙ্গল-চণ্ডী-পাঁচালী

ইহা একখানি চণ্ডীকাব্য । মলাটে উক্ত নাম লেখা আছে । ক্ষুদ্র পুথি । অতি প্রাচীন ও জীর্ণ তুলোট কাগজ । পত্রসংখ্যা ২৩ ; দুই পিঠে লেখা ।

আরম্ভ :—নম গণেশায় : নম । নম শ্রীগুরুবে নম নম চণ্ডিকায়ে নম । নায়ায়ণ নমস্ততাং ইত্যাদি শ্লোক ।

বন্দ্যোম শ্রীগুরুনাথ :                      জোড় করি দুই হাত :

অষ্টাঙ্গিতে হৈয়া ভূমিগত ।

প্রথমহো লক্ষ্মীপতি :                      গড়ুর পৃষ্ঠেতে স্থিতি :

স্বরনে পাতক হএ হত ॥

... ..

মঙ্গলচণ্ডিকা পাএ :                      দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে কএ ॥

দয়া কর জগত জননি ।

স্নো ক ভক্তি পদবন্দ :                      রচিলেক ধূপছন্দ ॥

রচে গিত ভাবিয়া ভবানি ॥

( প্রস্তাবারম্ভ । )—পঠ মঞ্জলি রাগ ।

শুন সর্বজন : কহি বিবরণ :

পৃথিবিতে স্থান খানি ।

উজানি নগর : জানে সর্ব নর ॥

ইন্দ্রের অমরা জিনি ॥ ইত্যাদি ।

শেষ ও ভগ্নতা :— ধনপতি সাধু গিয়া খুলনারে কএ ।

তোমার ত্রৈলোক্য দেখাও আমাএ ॥

সাধুর বচনে ঘট দেখাইল যুবতি ।

অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল সাধু ধনপতি ॥

নানা বিধি প্রকারেতে পুঞ্জিল চণ্ডিকে ।

ধন বসে ধনপতি রহিল কৌতুকে ॥

দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভনে চণ্ডির চরণ ।

মঞ্জলচণ্ডির গীত কৈল শম্পার্পন ॥

“ইতি শন ১২৩০ সন তারীখ ২২ জৈষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা ছএ দণ্ড থাকিতে ছপারিয়া ঘরে বসিয়া পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ : ॥ : : ”

এই পুঁথিখানি কলিকাতা—কড়িয়া নিবাসী ‘ও নবনূর’ পত্রের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুন্সী আসাদ আলিসাহেব তদীয় অনেক বন্ধু হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

## ৫১৫। নামহীন পুথি

( ক্রিয়া-যোগসার ? )

ইহা ঠিক ‘ক্রিয়া-যোগসার’ কি না, বলিতে পারি না, আরম্ভে উক্ত গ্রন্থের সহিত বিশেষ মিল দেখিতেছি না । ৩৫শ পত্র পর্যন্ত মাধব ও সুলোচনার কাহিনী গুনিতেছি । মাধবের বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্টা নামক কোন সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল ; মাধব নানা কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ; উক্ত পত্রগুলিতে এইরূপ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে । তার পরে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই ‘ক্রিয়া-যোগসার’ গ্রন্থের অন্ততঃ অংশবিশেষ । আমরা আজও ‘ক্রিয়া-যোগ সার’ পাঠ করিতে অবসর পাই নাই ; তাই জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার হরণ বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত ? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পুথির হস্তাক্ষর প্রভৃতির অভিন্নতা-হেতু হই পুথিকে এক মনে করিয়া আমরা নিশ্চয় প্রত্যয়িত হইয়াছি ।

অনন্তরাম ঠাকুর ইহার প্রণেতা । ‘বিশারদ’ অভিধেয় কোন মহাজনের আদেশে অনন্তরাম তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে কথা এখন সকলেই জানেন । কবির যে বিস্তারিত ‘আত্ম-পরিচয়’ পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এই খণ্ডিত পুথিতে তাহা পাইলাম না ।

পুথিখানা অসম্পূর্ণ। যাহা আছে, তাহার সবটুকু উদ্ধারের আশা নাই। কালী উঠিয়া যাওয়ায় অনেক স্থানেই এই চৰ্ম-চক্ষুঃ প্রভার বিস্তার করিতে পারে না। হস্তাক্ষরও নিতান্ত কদর্যা। কেবল ১, ৩, ২৩-৩৫, ৪৯-৫৯ এবং ৭৪, ৭৬ সংখ্যক পত্রগুলি আছে। তারিখাদি নাই। শ্রীরামপ্রসাদ দাস, দাস, শ্রীরামচন্দ্র আউচ দাস, শ্রীরাজারাম সেন দাস, শ্রীবল্লভরাম দেবশর্মা ও শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্তী এই পুথির নকলনবিস। খুব প্রাচীন, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নমো গনেশায়ঃ । নম সরস্বতি নম ।

নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি ।

বেদে রামায়ণে ইত্যাদি ।

প্রনমোহ নারায়ন অনাদি নিধন ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহ্নব সৃজন ॥

তদন্তরে প্রনমোহ ... .. ।

আত্মশক্তি গোহামায়া জগত জননি ॥

ত্রিনয়ন প্রনমোহ ত্রিজগত কর্তা ।

... .. ভক্তি মুক্তি দাতা ॥

ভগিতা :—

( ১ ) কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ স্মৃতে,  
হরি পদে গতি তার মন । ( ২৩শ পত্র । )

( ২ ) কহেন অনন্ত দত্তে, সে জে রঘুনাথ স্মৃতে,  
হরি পদে ভক্তি রৌক মন । ( ৩০শ পত্র । )

( ৩ ) সত্যবতি স্মৃত বাস বিষ্ণু অবতার ।  
সেন্নাক বন্দে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥  
সেই সেন্নাক বাখান করিয়া পদবন্দে ।  
কহিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে ॥  
বিসারদ পদে সেহ রেণু অবিপাএ ।

পদবন্দে রচিলেক সপ্তম অধ্যাএ ॥ ( ৫১ পত্র । )

( ৪ ) ঐ ঐ ঐ  
পদবন্দে ... .. অষ্টম অধ্যাএ ॥ ( ৫২ পত্র । )

( ৫ ) ঐ ঐ ঐ  
পদবন্দে ... .. একাদশ অধ্যাএ ॥ ( ৭৬ পত্র । )

আমার নিকট ‘ক্রিয়াযোগ-সার’ যে পুথি আছে, তাহা তত্ত্ব রহৎ নহে। উহা কিন্তু অতি রহৎ বলিয়াই আমি গুনিয়াছি। সেরূপ একখানা পুথির সমাচারও আমি জানি; কিন্তু সুযোগাভাবে তাহা আজও দেখিরা আসিতে পারি নাই।

এই প্রবন্ধোক্ত ৫০৪-৫১৫ সংখ্যক পর্যন্ত পুথিগুলি আমার নিকট আছে। ( ক্রমশঃ )

শ্রীআবদুল করিম

# বঙ্গে পৰ্তুগীজ-প্রভাব

## বঙ্গভাষায় পৰ্তুগীজ-পদাঙ্ক

পৃষ্ঠার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে দুইটি চির-স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, বাহা উত্তর কালে সমগ্র সভ্যজগতেব ঐতিহাসিক স্রোতেব গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি কলঙ্কস্ কর্তৃক আমেরিকার আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়টি ভাস্কো ডি গামা কর্তৃক উত্তরাংশ অন্তরীপের পথ দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আগমন। সে সনয়ে ইউরোপেব পশ্চিম সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্রতম পৰ্তুগাল রাজ্য নৌ-বিজ্ঞান ও নৌবাহিনীে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, কলঙ্ক ভারত-যাত্রার নূতন পথ আবিষ্করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্বপ্রথমে পৰ্তুগালরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোনও কাবণবশতঃ তথায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পৰিশেষে স্পেন রাজ্যের সহায়তার ভারত-গমনের উপক্রম করিয়া ভাগ্যক্রমে নূতন পৃথিবীর আবিষ্কার করেন। এই ঘটনার পৰ্তুগাল-রাজ ইমানুয়েল্ যংপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও নম্রাভূত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে বীরপ্রবর ভাস্কো-ডি-গামাকে ভারতযাত্রার নূতন পথ নির্দ্ধাবণে নিযুক্ত করিয়া তাহাব সঙ্গে উপযুক্ত নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর পবে যখন ভাস্কো সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন লিসবন নগরীতে আনন্দ ও উৎসবের সীমা রহিল না। যত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সহিত এতকাল ধরিয়া নানাবিঘ্নসঙ্কুল স্থলপথে বাণিজ্য চালাইয়া বিনিস নগরী যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্যলক্ষী এখন অপেক্ষাকৃত সুগম সমুদ্রপথে লিসবন নগরীতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। ফলতঃ কয়েক বৎসরের মধ্যেই পৰ্তুগীজভারতের সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি আল্ফনসো আলবুকার্কের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য ও অধ্যবসার-শুণে পৰ্তুগীজ আধিপত্য একদিকে পাবন্তোপসাগরবর্তী অমর্জ দ্বীপে ও অপর দিকে মালাক্কা উপদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই গোয়া নগরীর অভ্যুদয়ের স্বত্রপাত হয় এবং উহা অচিরেই এসিয়াখণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বপ্রথম ইংরাজ পর্য্যটক র‍্যালফ্ ফিচ্ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ার উপবনভূমিষ্ট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন বাণিজ্যের জন্ত লিসবন হইতে পাঁচ ছয় থানি বড় বড় জাহাজ প্রতি-বৎসর গোয়ায় আসিত।। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক—জন ক্রামার গোয়ার প্রস্তরনির্মিত সুবিশাল দেবমন্দির ও উপবনশোভিত সুরমা হর্ম্যরাজি দেখিয়া উহাকে রোমনগরীর সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আলবুকার্ক শৌর্য্যশুণে “পৰ্তুগীজ মাস” (Portugese Mass) “অর্থাৎ পৰ্তুগীজ রণদেব” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাহার ত্রায়াভুগর্ত শাসনশুণে তদীয় ভারতবাসী প্রজাগণও তাহার প্রতি এত

অনুরক্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুতে তাহারা তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সহিত সমভাবে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল এবং যখন তাহারা পরবর্ত্তী শাসনকর্তাদিগের নৃশংস অত্যাচারে ব্যথিত হইত, তখন তাহারা আক্ষেপ সহকারে আলবুকার্কের মহানুভবতা ও গ্রামপরতা কীর্তন করিত। বস্তুতঃ আলবুকার্কের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পর্তুগীজ সৌভাগ্য-রবি জন্মের মত অস্তমিত হইল। যে সকল কাবণে পর্তুগীজদিগের অধঃপতন ক্রমশঃ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তাবে উল্লেখ কবা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ডাক্তার ফ্রায়ারের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ের পূর্বেই ঐ অধঃপতন ঘটয়াছিল। তিনি গোয়া-নগরীর বিস্তীর্ণ রাজপথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বয়্যুগুলি যেরূপ পরিস্কৃত ও পবিচ্ছন্ন ছিল, গোয়াবাসী সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজদিগের প্রাসাদেব ছাদগুলি সেরূপ পরিষ্কৃত ছিল না, কারণ তথায় তাঁহারা মলমূত্রতাগ কবিত্তে কিছুনাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু তখনও তাঁহাদের ঘরের ও বাহ্য জাঁকজমকেব অভাব ছিল না। সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই বহুসংখ্যক কাক্সী ক্রীতদাস রাখিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচাব কবিত্তে সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি কবিতেন না। পাছে মস্তক হইতে টুপি গুলিয়া কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন কবিত্তে হয়, এই ভয়ে সকলেই অনাবৃত মস্তকে রাজপথে বিচরণ করিতেন; দাসবর্গ নিজ নিজ শ্রমের মস্তকোপবি ছাতা ধরিয়া চলিত। অধিকাংশ ভদ্রলোক পাকী চাঁড়িয়া—কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে—নগর ভ্রমণ করিতেন। কেহ কোন ভদ্রলোককে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন কবিত্তে অবহেলা কবিলে তদগুণেই দণ্ডিত হইত। অত্যুচ্চ বাতায়ন ও প্রশস্ত বাবান্দা সৌদামুহেব শোভা সম্পাদন করিত। যদি কেহ কোন বারান্দাধিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মল্লিকাঁব প্রীতি দৈবাৎ দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতে সাহসী হইত, তাহা হইলে গৃহস্বামী আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ কবিতেন যে, ঐ ব্যক্তির রক্তদর্শন না করিয়া ক্রান্ত হইতেন না। রমণীগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতেন এবং বাটীর বাহিরে বাইতে হইলে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন। বাটীর অভ্যন্তরে ধনীদিগের গৃহিণীগণ স্বর্ণযৌপ্য-নির্মিত সুদীর্ঘ জপমালায় ও নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিরাজ কবিতেন। তাঁহারা বাহুগুণে স্বর্ণনির্মিত কেয়ূর, গলদেশে মুক্তার মালা, কবরীতে হীরকখচিত মাথার কাঁটা এবং কর্ণগুণ্ঠে দুলা পরিতেন। দেহের অধোভাগ ঘাগরায় আচ্ছাদিত থাকিত; কিন্তু কটদেশ পর্য্যন্ত লঘমান উত্তরীয় পরিচ্ছদ এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্রে নির্মিত হইত যে, উহার ভিতর দিয়া সমস্ত গাত্রের চর্ম দেখা যাইত। বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে, উহার উপর একটা জ্যাকেট আঁটা হইত। মোজা পায়ে দেওয়ার প্রথা ছিল না, কেবল এক প্রকার বহুমূল্য চটিজুতা ব্যবহৃত হইত। গোয়ার সীমন্তিনীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে ও বীণা-বাদনে পটু ছিলেন, তদপেক্ষা রন্ধনে ও নানা প্রকার ফলের ষোয়কা ও আচার প্রস্তুতকরণে অধিক দক্ষ ছিলেন। ডাক্তার ফ্রায়ার তাঁহাদের তৈয়ারি আমের আচারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, পর্তুগীজ শিশুগণ নগ্নাবস্থায় বাড়ীর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের লজ্জার উদ্বেক না হইত, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বিবস্ত্র থাকিত।

যদিও বঙ্গে পৰ্তুগীজ-প্রভাবের নংকিঞ্চিৎ বিবৃতিই বর্তমান প্রবন্ধেব মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি আমি প্রসঙ্গক্রমে ফ্রান্স-বর্ণিত গোয়াবাসী পৰ্তুগীজদিগের বিবরণ এই জন্ত উপবে উদ্ধৃত করি-  
য়াছি যে, বঙ্গীয় পৰ্তুগীজদিগের সম্বন্ধে সেক্ষপ চিত্রের অভাবে উক্ত বিবরণ হইতে তদ্বিষয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তবে এই দুইটি কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোয়া রাজ-  
ধানীতে পৰ্তুগীজেরা যেরূপ জাঁতজমকে থাকিত, বঙ্গে অবশ্য তাহাব অনেকটা হাস হইয়াছিল এবং  
গোয়ায় যে অল্পসংখ্যক পৰ্তুগীজ রমণী বাস করিত, বঙ্গে সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও নান-সংখ্যক  
পৰ্তুগীজ-সীমস্তিনী দৃষ্ট হইত। পৰ্তুগীজেরা এইজন্ত প্রথম হইতেই বহুল পরিমাণে এতদেশীয়  
কামিনীর সহিত দাম্পত্য-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এককপে স্বরূপকালের মধ্যেই একটি মিশ্র-  
জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দেব কিছু পূর্বে বা পরে পৰ্তুগীজেরা সর্ব-প্রথমে বঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার করে।  
তখন ভাগীরথী বা ভগলী নদীৰ অগভীর জলে তাহাদেব বড় বড় জাহাজ চালাইবার সুবিধা  
হইত না বলিয়া ঐ সকল জাহাজ মুচিখোলাব নিকট নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থিত করিত এবং মাল-  
পত্র ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই হইয়া সপ্তগ্রামে প্রেবিত হইত। সপ্তগ্রাম তখন একটি বাজকীয়  
বন্দব ও প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে পৰ্তুগীজ বাণিজ্য-নিবন্ধন  
ভাগীরথীৰ পশ্চিমকূলবর্তী শিবপুৰেব সন্নিহিত বেতড় গ্রামে একটি হাট বসিল। ঐ হাটে  
যে সকল দেশীয় বণিকদিগের সমাগম হইত, তন্মধ্যে কলিকাতার আদিনিবাসী সুবিখ্যাত শেঠ  
বসাতেরা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাহাবা সপ্তগ্রামের ভগ্নদশার উপক্রম দেখিয়া সে স্থান  
পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতাব দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে, যেখানে বর্তমান ফোর্ট  
উইলিয়াম কেল্লা প্রতিষ্ঠিত, তথায় আসিয়া বাস কবেন এবং কলিকাতার উত্তবে হতাহুটীর হাট  
প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় পৰ্তুগীজদিগের সহিত কিছুকালের জন্ত কারবার চালান। কয়েক  
বৎসর পরে পৰ্তুগীজেরা যখন বেতড় পরিভ্রমণ করিয়া নদী বাহিয়া আরো উত্তরে গিয়া  
উপনিবেশ স্থাপন করিল; তখন বেতড়ের সমস্ত বাণিজ্য হতাহুটীতে স্থানান্তরিত হইল এবং  
ইহাকেই কলিকাতা মহানগরীর ভাবী সৌভাগ্যের পূর্বসূচনা বা সূত্রপাত বলিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে পৰ্তুগীজেরা কিয়ৎকাল সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিয়া তাহাদিগের প্রধান উপনিবেশ  
ভগলীতে স্থাপন করে। সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর  
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রোমকেরা ইহাকে “গ্যাঙ্গেস্ রিজিয়া” (Ganges Regia) আখ্যা প্রদান  
করিয়াছিলেন। বঙ্গে মুসলমানাধিকারের প্রথম যুগে সপ্তগ্রাম নিয়বঙ্গের রাজধানী ছিল এবং  
তথায় রাজকীয় মুদ্রা নির্মিত হইত। পুণ্যতোয়া গঙ্গার ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা নামে যে  
তিনটি বেণী বা শাখা হইতে ত্রিবেণীর নামকরণ হয়, তন্মধ্যে সরস্বতী সপ্তগ্রামের সান্নিধ্যে  
প্রবাহিত হইয়া উহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। পরিশেষে যখন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ  
সরস্বতীর ধরপ্রোত ক্রমশঃ মলীভূত ও মৃতকর হইল, তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রসিদ্ধ বন্দরেরও  
অবশ্যস্বার্থী অবনতি ঘটিল।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ডি ব্যারম্ বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সবস্বতী ও যমুনা ভাগীরথীর দুইটি বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমান। ভ্যাঙেন্ ব্রুক বিবচিত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, তখন যমুনা একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু সরস্বতী তখনও একটি বেশ বড় শাখানদী। বিংশতি বৎসর পূর্বে আমি একবার সপ্তগ্রামে গিয়া তথায় সরস্বতীর জলের লেশনাত্র দেখিতে পাই নাই; সমস্ত নদীটি মিশিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়; উহাতে কবি সপ্তগ্রামকে “মহাস্থান” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সপ্তগ্রাম তখনও একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সময়ে র্যালফ্ ফিচ্ সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ও সকল প্রকাব পণ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কথিয়া লিখিয়াছেন। পর্দুগীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য-সংস্থাপন করিবার কয়েকবৎসর পরেই সম্ভবতঃ ১৫৩৭ কি ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামেব অনতিদূরবর্তী বর্তমান বাঙল ও হুগলীনগরে “গোলিন” (Gollin) নামে একটি উপনিবেশ, দুর্গ ও বন্দর প্রতিষ্ঠিত করে। সে সময়ে মোগল সম্রাট হুমায়ুন বিজোহী শেবশাহেব সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপ্ত থাকায় দুর্গ-নির্মাণে কোনদূর ব্যাধাত ঘটে নাই। এই নূতন উপনিবেশের একদিকে নদী ও তিন দিকে বল থাকায় পর্দুগীজদিগের বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং সপ্তগ্রামের সমস্ত বাণিজ্য ক্রমশঃ হুগলীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সম্ভলিত আইন আকবরী গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সে সময়ে সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সরকার সপ্তগ্রামে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশাদ-ব্যবহিত দুইটি বন্দরই ফিরিস্দিদের তন্তু ছিল, তন্মধ্যে কেবল শেষোক্ত বন্দর হইতে রাজস্ব আদায় হইত। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপিত হইবার পর, কিছুকাল শাস্ত্রভাবে বাণিজ্য করিয়া পর্দুগীজেরা ক্রমেই তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ উদ্যত ও দুর্বৃত্ততার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি অপরাপব ইউরোপীয় বণিকদিগের সহিত সম্বন্ধে কারবারে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অবশেষে অথথা উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। হুগলী ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রজাবর্গের উপর বোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া অথবা বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া ভারতের নানাস্থানে দাসত্ববৃত্তির জন্ত চালান দিতে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল বাণিজ্য-সাহাজ বা নৌকা হুগলীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, পর্দুগীজেরা নবাবের বিনা অনুমতিতে তাহাদিগের নিকট গুরু আদায় করিতে লাগিল। পর্দুগীজেরা ক্রিষ্টীয় শতবর্ষ কাল হুগলীতে এইরূপ অথও আধিপত্য করিয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে দিল্লির ভাবী সম্রাট শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া হুগলীর পর্দুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিগেজের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছুর রড্রিগেজ্ পরিণামে জাহাঙ্গীরেরই জয় হইবে বুঝিতে পারিয়া, শাহ জাহানকে সাহায্য দান করিতে অন্বীকৃত হন। কিন্তু কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া এরূপ অবজ্ঞাহচক বাক্যে স্বীয় অধীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,

তাহাতে শাহ জাহান আপনাকে বিলক্ষণ অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী সুবিখ্যাত বেগম মমতাজ মহলও পৌত্তলিক পৰ্তুগীজদিগের ঘোরবিদ্বেষী ছিলেন। বাদশাহী তক্তে অধিষ্ঠিত হইবার কতিপয় বৎসর পবেই শাহ জাহান বঙ্গেশাসনকর্তা কাসিমখাঁ জোবানীকে হুগলী হইতে পৰ্তুগীজদিগকে একেবারে দূরীভূত করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাইয়া কাসিম খাঁ বিশেষ চতুৰতা ও মূৰ্ত্তকতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি হুগলীর দুৰ্গ অবরোধ করিয়া জয় করিতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগিয়াছিল। পৰ্তুগীজেরা দুৰ্গরক্ষার জন্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে এবং অবরোধকারীদিগের উপর অজস্র গোলা-বর্ষণ করিতে ক্রটি করে নাই। পরিশেষে মোগলেরা বাঙেল-গির্জার সম্মিহিত সঙ্গীর্ণ ও স্বল্পতোয় পরিখা একস্থানে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বে নিকটবর্তী একটি উচ্চ বুরুজ আক্রমণেব চল প্রদর্শনপূর্বক তহুপরি বহুসংখ্যক যুযুত পৰ্তুগীজ-সেনা সমবেত করিয়া সর্বসমেত বুরুজটি উড়াইয়া দিল। এইরূপে বিজয় পৰ্তুগীজবীর নিহত হইল এবং মোগলেরা হস্ত কবিত্ত দুৰ্গ দখল কবিল। বিজিত পৰ্তুগীজেরা অনেকে মোগলের অস্বাধাতে প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে পলায়ন কবিত্তা জাহাজে আশ্রয় লইতে গিল্ল নদীর জলে ডুবিয়া মবিল। যাহাবা কোনও মতে জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহারাও জলযুদ্ধে মোগলের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মোগলেবা পূর্বাভেই তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং নৌসেতু নির্মাণ করিয়া পলায়নের পথ রোধ করিয়াছিল। পৰ্তুগীজদিগের সর্বাপেক্ষা বড় জাহাজে দুই হাজার স্ত্রী পুরুষ ও তদীয় সন্তানসন্ততি নিজ নিজ ধনদৌলত সঙ্গে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের হস্তে আত্মসমপণাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর ভাবিয়া ঐ জাহাজের কাপ্তেন বারুদখানার আগুন লাগাইয়া জাহাজ উড়াইয়া দিলেন; অস্ত্রাশ্রয় অনেক জাহাজও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল। চৌবটি খানা বড় জাহাজ, দুই বা তিন মাস্তুল বিশিষ্ট সাতারখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুইশতখানি একমাস্তুলী ছোট জাহাজের মধ্যে কেবল একখানি মাঝারি ও দুই খানি ছোট জাহাজ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রায় সার্ব চারি সহস্র পৰ্তুগীজ স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা বন্দী হইয়াছিল; তন্মধ্যে জন কতক পাদ্রি এবং পাঁচশত সুদৃঢ় বালকবালিকা আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুরূপা কুমারীগণ বাদশাহ ও তাঁহার ওমরাহগণের অন্তঃপুরে স্থান পাইল এবং বালকগণ মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইল। পাদ্রিদিগকেও মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সন্তত না হওয়ার কয়েক মাস কারাবাসের পক্ষ পূর্ণ করি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মোগলেরা হুগলী দখল করিবার পর তথায় একজন কোজদার মিয়ুক্ত হইল, হুগলী একটি রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইল এবং সরকারী দপ্তরখানা সন্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হইল। বর্তমান কালে হুগলীকে পৰ্তুগীজদিগের অতীত প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাঙেলের গির্জা। ঐ গির্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে নির্মিত হয়; তৎপূর্বে বঙ্গ



কোনও খৃষ্টীয় ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু বর্তমান গির্জা সম্পূর্ণরূপে নূতন নির্মিত, পুরাতন গির্জার কোনও চিহ্নই নাই। এখনও এখানে প্রতিবৎসর “নভেনা” (Novena) বা “নয়-দিবস-ব্যাপী” ধর্মোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয় এবং তত্পলক্ষে কলিকাতা ও অগ্রাণ্ড স্থান হইতে অনেক ক্যাথলিক যাত্রাব সমাগম হয়। বাগ্গেলের সর-পনীর (Cream-cheese) এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। সাত বৎসর হইল আমি একবার বাগ্গেলের গির্জা দেখিতে গিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভাগীরথীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এই রমণীয় ধর্মমন্দিরটিকে রমণীয়তর করিয়া তুলিয়াছে।

এক সময়ে পর্তুগীজেরা কলিকাতার অতি সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইংরাজ-দিগের কলিকাতায় আধিপত্য স্থাপনের প্রথম যুগে উক্ত রাজধানীর দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বরাহনগর ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং সে সময়ে অনেক বিলাসপ্রিয় ইংরাজ বরাহনগরের ওলন্দাজ বিবিদিগের সচিত্র নৃত্য-গীত ও অগ্রাণ্ড আনন্দপ্রমোদে যোগ দিতেন। ওলন্দাজদিগের বরাহনগরবাসের পূর্বে পর্তুগীজেরা তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজেরা মাতলা নদীর মোহানায় প্রতিষ্ঠা হইয়া বর্তমান পোর্ট ক্যানিং অতিক্রম করিয়া বিছাধরী নদীর তীরবর্তী এবং বাদার নিকটবর্তী তাড়া নামক স্থানে—জোব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা পত্তনের বহুপূর্বে—শতাধিক বর্ষ বাস করিয়া বিশেষ লাভজনক বাণিজ্য চালাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া সুন্দরবনে অতি জঘন্য দাস-ব্যবসায় বাহুল্যরূপে চালাইতে লাগিল। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে রমণীয় নদীতীরে তাহা-দিগের চরেরা অমূল্য ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পূর্ববয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে তাহা-দিগের আবাসভূমি হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়া হয় গোয়ার দাসহটে চালান দিত, নতুবা নিজ দলভুক্ত করিয়া লইত। এই মনুষ্য-মৃগয়ায় এবং জলদস্যু-বৃত্তিতে আরাকানবাসী মগেরা অনেক সময়ে পর্তুগীজদিগের সহচর হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর একস্থানে পর্তুগীজ জলদস্যুদিগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

“ফিরান্নির দেশখান বাহে কর্ণধারে।

রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডেরে ॥”

“হরমা” শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধ্যা মতভেদ হইতে পারে ; কিন্তু আমার বোধ হয় উহা দস্যু-বাচক আরবী “হরামী” শব্দের অপভ্রংশ।\*

দাস-ব্যবসায় ■ নৌদস্যবৃত্তি, এই দুইটি পর্তুগীজদিগের দুঃখপনের কলঙ্ক। পশ্চিম বঙ্গে পর্তুগীজেরা সর্বপ্রথমে বণিকবেশে আসিয়াছিল এবং অনেক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য কার্যে ব্যাপ্ত ছিল, যদিও তাহারা পরিণামে উপরোক্ত দুইটি ঘোর কলঙ্কেই কলঙ্কিত হইয়াছিল।

\* কবিকঙ্কণের প্রাচীন পুথিতে ‘হারামদ’ পাঠ আছে। উচ্চারণানুযায়ী armada শব্দেরই রূপান্তর, অর্থ সেনাবাহিনী জাহাজ। ( সা-প-প-সম্পাদক )

কিন্তু বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব উপকূলে তাহারা প্রায় প্রথম হইতেই যোদ্ধাবশে দেখা দিয়াছিল। তখন পূর্ববঙ্গে চক্ৰবর্তী, শ্রীপুর, স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ঐ সকল রাজ্যের অধিপতিরা মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন না এবং আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত নিজ নিজ সৈন্যবল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। উপকূলবর্তী রাজ্যের নৌবলের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং তাহারা বাণিজ্যব্যাপদেশে আগত নৌ-সমরকুশল পৰ্তুগীজদিগের সহিত প্রথম হইতেই সদ্ভাব সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। র্যাল্ফ্ ফিচ্ যখন (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব বঙ্গ ভ্রমণ করেন, তখন সুবিখ্যাত ইছা থা— ঐহার রাজধানী স্বর্ণগ্রামের ন্যূনাদিক দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল—ঐ অঞ্চলের সর্কাপেক্ষা প্রবলপ্রতাপ রাজা ও খৃষ্টীয়দিগের বন্ধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ফিচ্ পৰ্তুগীজদিগকে ঐ অঞ্চলে বাস করিতে ও প্রভূত প্রভুত্ব খাটাইতে দেখিয়াছিলেন। বঙ্গোপ-সাগরের উত্তর-পূর্বোপকূলবর্তী ত্রিপুরা ও আরাকানের স্বাধীন রাজ্যরাও পৰ্তুগীজদিগের প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন। আরাকান তখন “মগের মূলুক” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রাম পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল; ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আরাকান-রাজ্যের অন্তর্গত বহুসংখ্যক পৰ্তুগীজ চট্টগ্রামে এবং আরাকানের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে দেশীয় রাজাদিগের অধীনে সৈনিকের কক্ষে নিযুক্ত হইয়া নৌযুদ্ধ-নিপুণতা ও অকুতোভয়শৌর্য্যগুণে উচ্চ পদ, প্রভূত ক্ষমতা এবং বিপুল ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী যেমন পৰ্তুগীজদিগের প্রধান উপনিবেশস্থান ছিল, উত্তর-পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামও সেইরূপ ছিল; পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিদূরিত হইবার বহু বৎসর পরেও তাহারা এখানে বাস করিয়াছিল। চট্টগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার যেরূপ সুবিধা ছিল, হুগলীতে সেরূপ সুবিধা ছিল না বলিয়া পৰ্তুগীজেরা চট্টগ্রামের নাম “পোর্টো গ্রান্ডো” (Porto Grando) বা “বড় বন্দর” এবং হুগলীর নাম “পোর্টো পেকুইনো” (Porto Pequeno) বা “ছোট বন্দর” রাখিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত আইন-আকবরী গ্রন্থে চট্টগ্রাম একটি তরুচ্ছায়াসম্বিত সমুদ্রতীরবর্তী বৃহৎ নগর এবং খুষ্টান ও দেশীয় বণিকদিগের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত। পশ্চিম বঙ্গে পৰ্তুগীজেরা বাণিজ্যে তাদৃশ মনোবোগ না দিয়া যেরূপ ঘৃণিত দাস ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ পূর্ববঙ্গে সনপ্রকৃতি মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হুগলীতীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্নার্ডো পৰ্তুগীজদস্যুদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহারা কেবল সমুদ্রোপকূলে দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্ষান্ত হইত না, নদীমুখে প্রবিষ্ট হইয়া বাট সত্ত্বর কোশ দুর্বর্তী গ্রামে পর্য্যন্ত বাইয়া লুণ্ঠ তরাজ করিত। গ্রামকে গ্রাম জালাইয়া দিত এবং তাহার অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া বাহিত, বৃদ্ধদিগকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়া দিত এবং তরুণদিগকে দাঁড় টানিবার জন্য নিজদলভুক্ত করিয়া লইত। তাহারা এইরূপে পাদরিদিগের অপেক্ষা বেশী লোককে খৃষ্টীয়ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল বলিয়া বড়াই করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে জাহাঙ্গীর বাদশাহের

আমলে সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালিন্ নানক একজন পরাক্রান্ত পৰ্তুগীজ দস্তাদলপতি সনদ্বীপের মোগল রাজপুরুষকে নিহত করিয়া ঐ দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল এবং তথায় একজন স্বাধীন রাজার স্থান সাত আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। গঞ্জালিন্ অল্পকালের মধ্যেই এক হাজার পৰ্তুগীজ ও দুই হাজার দেশীয় সৈন্ত, দুইশত অধারোহী সৈন্ত এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত অশ্বাসংখ্যক ছোট বড় জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছিল। দ্বাবাষাট ৩য় ভীত হইয়া নিকটবর্তী রাজ্যের অধীশ্বরেরা তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া গঙ্গার পূর্বপ্রাচীর মোহানায় শাহবাজপুর প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ বলপূর্বক দখল করিয়াছিল এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক আবাকান রাজ্য পন্যন্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল; কিন্তু তথায় পরান্ত হইয়া পরিশেষে আরাবাকান রাজ্য কর্তৃক স্বরাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। গঞ্জালিনের পতনের পর পৰ্তুগীজেরা কিছুকাল শান্তভাবে চট্টগ্রামে বাস করিয়া ক্রমে আবার মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। মগদিগের দৌরাঙ্গ্য পুঙ্খবদে উত্তরোত্তর এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের নাম শুনিলে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। দ্বাবাষাট ৪য় কোনও স্থান আক্রমণ করিত, তত্রত্য পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া স্ত্রী ও শিশুগণকে দাসত্বজন্তি জন্ত সঙ্গে লইয়া যাইত। স্ববিখ্যাত নবাব শায়েস্তা খা বঙ্গের স্ববাদারী পদে নিযুক্ত হইয়াই এই অত্যাচার নিবারণের স্বন্দোবস্ত করেন। তিনি সনদ্বীপের মগদিগের বিরুদ্ধে কেবল বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্ত পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; বস্তুতঃ তিনি কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহার আদেশানুসারে যে সকল পৰ্তুগীজ চট্টগ্রামে বাস করিত এবং বাহারা আরাবাকানরাজ্যের বেতনভোগী ছিল, তাহাদিগের উভয়কেই বিস্তর প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া মোগলসৈন্তভুক্ত হইতে সম্মত করা হইয়াছিল। একথা আবাকানরাজ্যের কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি অবিলম্বে পৰ্তুগীজদিগকে সমূলে বিনাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুতরাং তাহার প্রাণভয়ে ধনদৌলত পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি রাত্রিযোগে জাহাজে উঠিয়া সনদ্বীপে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পলাতকেরা সনদ্বীপে নিরাপদে পৌছিলে মোগল-সেনাপতি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে বাহারা যুদ্ধক্ষম ছিল, তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া অপর সকলকে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাহাদিগের বাসার্থ ঢাকা হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে যে স্থান নিরূপিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ফিরিঙ্গিবাজার বলিয়া খ্যাত।

পৰ্তুগীজদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে মোগলেরা মগদিগের সহিত জলযুদ্ধে কদাপি জয়ী হইতে পারিতনা। মগেরা পরাস্ত হইলে, মোগলেরা অবিলম্বে চট্টগ্রামে গিয়া মগদিগের দুর্গ আক্রমণ করিল। যদিও ঐ দুর্গ সুদৃঢ় প্রকার ও বহুসংখ্যক কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, দুর্গবাসীরা অকীম নৌবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া এক্ষণে ভীত হইল যে, তাহারা দুর্গরক্ষণ চেষ্টা না করিয়া রজনীযোগে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগল সৈন্যদের পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া দুই দশ পলাতককে ধৃত ও পরিত্যক্ত

দাস বলিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, যে সকল পৰ্তুগীজ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল কেবল তাহারাই নহে—ওলন্দাজেরাও চট্টগ্রাম বিজয়ে মোগলদিগের সহায়তা করিয়াছিল। মোগলেরা এইরূপে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দখল করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখিল। সেই অবধি পৰ্তুগীজেরা তাহাদিগের এতকালের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইল।

পৰ্তুগীজেরা বঙ্গের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াও অনেক দিন এদেশে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানিকাহ করিয়াছিল। বর্তমান সুন্দরবন পৰ্তুগীজ ও মগ দস্যু-নাট্যের প্রধান রঙ্গভূমি ছিল। পুরাবিদগণের অবিদিত নাই যে, এক সময়ে ঐ সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশ বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর দ্বারা সুশোভিত ছিল। প্রচণ্ড বাত্যা, ভূমিতলের অধোগতি প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণ গণনা করিলেও উক্ত প্রদেশের অবস্থা বিপর্যয়ের মুখ্যতম কারণ যে, মগ ও পৰ্তুগীজ জলদস্যুদিগের বহুকালব্যাপী ভীষণ অত্যাচার, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ডায়মণ্ড-হাক্কীরের নিকটবর্তী একটি নদীতে পৰ্তুগীজ দস্যুদিগের পতি-বিধি ছিল বলিয়া, ইংরাজেরা উহাকে “রোগুস্ বিভাব” (Rogue's River) বা “দস্যুনদী” বলিতেন। সে সময়ে কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ইংরাজেরা মগদস্যুদিগকে এবং অনেক সময়ে তৎসহচর পৰ্তুগীজদস্যুদিগকে—এত ভয় করিতেন যে, পাছে দস্যুরা নদীমুখ দিয়া আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করে এই ভয়ে তাহারা মুচিখোলার নিকটবর্তী নদীকে একটি প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে পৰ্তুগীজদিগের মিশ্র বংশধরেরা ইংরাজদিগের অধীনে গোলন্দাজ সৈনিকের বা গার্দিয়া ভূত্যের কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পাচকের কার্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল, কেহ কেহ কেরানীর কৰ্ম্মেও নিযুক্ত হইত, কেহ বা স্ত্রীপুং বেহালাবাদক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখন যেমন সাহেবেরা দেশীয় ভূত্যদিগের সহিত হিন্দুস্থানী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন, দেড় শত বৎসর পূর্বে অপভ্রষ্ট পৰ্তুগীজভাষা সেইরূপ একটি “লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা” (Lingua franca) বা সাধারণের বোধগম্য ভাষা বলিয়া ব্যবহৃত হইত। পৰ্তুগীজভাষার যে সকল শব্দ প্রচলিত বঙ্গভাষায় স্থান পাইয়াছে, আমি যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহাৰ করিব, কিন্তু তৎপূর্বে পৰ্তুগীজদিগের নিকট আমরা আরও কি কি পাইয়াছি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। পৰ্তুগীজেরা বড় উত্থান-প্রিয় ছিল এবং ভারতের ফলের বাগান তাহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী। আনারস, পেয়ারা, আতা, নোনা, সুপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুন, কাজু বাদাম, চীনের বাদাম প্রভৃতি অনেকগুলি দক্ষিণ আমেরিকার ফল, সম্ভবতঃ পৰ্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম এদেশে অনেন করি। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ‘সুন্ডরা’ নামে যে এক প্রকার নারঙ্গী বা কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মে, খুষ্ট সম্ভব যে পৰ্তুগীজেরা অন্তঃপাতী সিরা (Cintira) নগর হইতেই উহার নামকরণ হয়। বন্দাবন-দাস রচিত চৈতন্য-ভাগবতে “সমতারা” ফলের উল্লেখ আছে। আনারস লুপ্ত জাহাঙ্গীর

বাদশাহের আয়াজীবনীর এক স্থানে লিপিত আছে যে, তাঁহার পিতামহ বাবর শাহ আগার সম্মুখবাহিনী যমুনার ওপারে একটি বিস্তীর্ণ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় নানাবিধ বিদেশী ফলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ফিরঙ্গি-দ্বীপ হইতে আনীত “আনানস্” নামক সুস্বাদু ফল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পর্তুগীজদিগের যত্নে ভাবতের সর্বোৎকৃষ্ট ফলও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের “আল্ফনসো” বা “আফুস” জাতীয় আম্র এখনও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। আইন-আকবরীতে লিপিত আছে যে, সপ্তগ্রাম দাড়িম্বের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল ; বোধ হয় পর্তুগীজেরাই ঐ প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। পর্তুগীজেরা ফলের মোরব্বা ও আচার প্রস্তুতকরণ প্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। আমি এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রায়াবের সাক্ষ্য পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বার্নায়ার তাহার বঙ্গভ্রমণ-বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পর্তুগীজেরা ফলের মোরব্বা প্রস্তুতকরণে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তাহারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় বিস্তীর্ণরূপে চালিতে। বার্নায়ার কলম্বু বা কাটুয়ালেবু, পাতিলেবু, আম্র, আনারস, হরিতকী প্রভৃতি বিবিধ ফলের এবং আদক ও শতমূলীর মোরব্বার কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। পর্তুগীজেরা সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, মুকুট ফুল, বিলাতী তুলসী, পীতকরবী, গাদা প্রভৃতি অনেকগুলি মেক্সিকো দেশের ফুল এদেশে আনিয়া আমাদের ফুলের বাগানের শোভাবর্দ্ধন এবং কপি, ওলন্দা কড়াইমুটি প্রভৃতি ইউরোপীয় তরিতরকারির চাষ করিয়া আমাদের সবজিবাগানেরও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল। সালসা, আয়াপান, জোলাপ প্রভৃতি ঔষধের গাছগাছড়াও সম্ভবতঃ তাহারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে এদেশে আনয়ন করে। পর্তুগীজদিগের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কদর্য রোগেরও আনদান হইয়াছিল। ভাবপ্রকাশ নামক প্রামাণিক কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগ্রন্থে ঐ রোগটী “ফিরঙ্গ” নামে অভিহিত—

“গন্ধরোগঃ ফিরোঙ্গং যং জায়তে দেহিনাং ক্রবম্।

ফিরঙ্গিগোহতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥

ফিরঙ্গসংস্রক্তে দেশে বাহুল্যেনৈব যদুবেৎ।

তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধিঃ ব্যাধিবিশারদৈঃ ॥”

এই রোগ ফিরঙ্গ দেশীয় পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে উৎপন্ন হয় এবং ইহা উক্ত দেশে বহুল প্রচার বলিয়া ব্যাধি-বিশারদেরা ইহার নাম ‘ফিরঙ্গ’ রাখিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব বর্ণিত আছে, আমি বাহুল্যভয়ে তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন যে পাশ্চাত্য ব্যাধি-বিশারদ পণ্ডিতেরা “সেকেন্ডারি সিফিলিস্” (Secondary Syphilis) রোগের যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক সেইগুলি ভাব-প্রকাশে ফিরঙ্গ রোগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—যথা বিফোটক, অস্থির (বিশেষতঃ নাসা ও ভালুর অস্থির) বিকৃতি ইত্যাদি। ভারতের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে উক্ত রোগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ফলতঃ কলম্বুসের স্পেনদেশীয় সহযাত্রিগণ আমেরিকার অন্তঃপাতী হিস্পানিয়োলা

দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গদোষে দুষ্ট হইয়া ঐ রোগ সৰ্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন কৰে এবং তৎপরে পৰ্তুগীজেরা উহা ভাৰতে বিস্তার করে ।

রোগীর পথ্য পাউকটি ও বিকুট প্রস্তুত করিতে আনরা পৰ্তুগীজদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা কৰি । পাকরাজেশ্বৰ নামক আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে “কিরল্লরোট” বা পাউকটি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিশেষ বিবৃত আছে । ঐ গ্রন্থে পাক করিবার চুল্লী অৰ্থে “তুন্দুব” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু উহা সংস্কৃত শব্দ নহে—একটি পৰ্তুগীজ শব্দের অপভ্রংশ, তাহার প্রকৃত অর্থ চুল্লী নহে—যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা নদী কটির আকারে গঠিত হয়, তাহাই বুঝায় ।

যে তামাকুর ধূমপান কবিতা ভারতের কোট কোট শ্রমজীবীর শ্রান্তি দূৰ কৰে এবং কি ধনী কি নিধন সকলেই আনন্দলাভ করে, ইউরোপে তাহার প্রথম বীজ বোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মেক্সিকো রাজ্যের অন্তর্গত যুকাতান প্রদেশ হইতে আনীত হয় । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে ভারতে তামাকুর প্রথম আমদানি হয়, সম্ভবতঃ পৰ্তুগীজেরাই ঐ আমদানি করিয়াছিল । বঙ্গীয় যাত্রাদলের প্রাণস্বরূপ বেহালাও পৰ্তুগীজেরা সৰ্ব্বপ্রথমে এদেশে আনে । এক সময়ে এদেশের পুরুষদিগের মধ্যে লবেদার এবং তুন্দরীদিগের মধ্যে ফিরিঙ্গি খোপার খুব চলন ছিল, ছোটই পৰ্তুগীজদিগের অনুকরণের ফল । আলমারি, কেদারা প্রভৃতি পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার প্রথম পরিচয় আমরা পৰ্তুগীজদিগের কাছে প্রাপ্ত হই । পৰ্তুগীজেরাই আমাদেরকে প্রমারা, বিস্তি ও কুপন খেলিতে শিখায় এবং মুষ্টি নিলাম দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা তাহারাই এদেশে প্রথম প্রবর্তিত করে । বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা অতাপি পৰ্তুগীজদিগের অনুকরণে বীণামাতা মেরির নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করে ; “মাইরি” শব্দের অর্থ মেরির দিব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে । রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে “ম্যারি” ( Mary ) শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইত ।

পৰ্তুগীজেরা কাকাতুয়া পক্ষী, কিরিচ, সাগুদানা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য মলয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আনয়ন করে এবং এইরূপে পৰ্তুগীজভাষার ভিতর দিয়া মলয়দেশের কয়েকটি কথা বঙ্গভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতার সাহেবেরা টানাপাখা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন । কিন্তু তৎপূর্বে স্পেনরাজ্যে টানাপাখা ব্যবহৃত হইত এবং উহা পৰ্তুগীজেরাই সৰ্ব্বপ্রথম এদেশে প্রবর্তিত করিয়াছিল ।

আমি এখন আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পৰ্তুগীজ শব্দের একটি তালিকা প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব ।

পৰ্তুগীজমূলক বাঙ্গালীশব্দ ।

আনারস

আয়া

আলকাংরা

মূল পৰ্তুগীজশব্দ ।

Ananaz (Brazilian Nana)

Aia

Alcatrao<sup>1</sup>

আলমারি	Almario, armario
আলপিন	Alfinite
ওলগা ( কড়াইস্টি )	Hollanda ( হলণ্ড দেশ )
কপি	Couve.
কাকাতুয়া	Catatua ( Malay kakatua )
কাজুবাদাম	Cajú.
কাতুর ( প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত )	Qnadra.
কানেষ্ট্রা	Canastra.
কাপি, কাপিথানা	Calé
কাফ্রি	Cafre.
কামরা	Camara.
কামরাঙ্গা, কাম্বরঙ্গ (আধুনিক সংস্কৃত শব্দ, বিদেশী শব্দের অন্তর্করণ-জাত)	Carambóla ( বৈজ্ঞানিক নাম <i>Acerrohea</i> <i>Carambola</i> )
কিরিচ	Cris. ( Malay kris )
কুপন ( খেলা )	Coupon.
কেদারা	Cathedra.
কোরেজা ( প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত )	Quarenta
গরাদে	Grade
গামলা	Gamella ( বৃহৎ দারুণময় খোরা )
গির্জা	Egreja, Igreja
চাবি	Chave
জানালা	Janella
জালা	Jurra
জোলাপ	Jalapa
টৌকা	Touca ( বিবিট টুপি )
তামাক, তামাকু, তাম্বকুটক (আধুনিক সংস্কৃত শব্দ, বিদেশী শব্দের অন্তর্করণজাত )	Tabaco ( আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষা হইতে গৃহীত )
■ তলুয়া ( তোলো হাঁড়ী )	Talha ( জল, তৈল প্রভৃতি রাখিবার বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র )

■ সংস্কৃত ভাষায় হণ্ডা, হণ্ডী, হণ্ডিকা, হণ্ডিকাস্ত, প্রভৃতি হাঁড়ীর অন্তর্গত ভেদে যতগুলি নাম পাওয়া যায়, তাহার কোনটার সহিত তোলো ও তিজেলের সাদৃশ্য নাই।

* তিজেল	Tigela ( পায়স প্রভৃতি খাটবার মুগ্ধরপাত্র )
তুন্দুর, তুঁতুল	Tendedeira ( যে কাষ্ঠফলকে ঠাসা ময়দা কটির আকারে গঠিত হয় )
তেরেস্তা ( প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত )	Trinta
তোয়ালিয়া	Toalha.
নিলাম	Leilao
নোনা ( আধুনিক সংস্কৃত নাম গণ্ডগাত্র )	Annona (বৈজ্ঞানিক নাম <i>Annona Reti- culata</i> )

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আতা ও নোনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আতার আধুনিক সংস্কৃত নাম সীতাকল।

পরাত ( বড় থালা )	Prato ( প্লেট )
পাদরি	Padre.
পাউরুটি	Pão
পিপা	Pipa.
পিস্তল	Pistola.
পেরু ( গৃহপালিত পক্ষীবিশেষ )	Peru.
পোস্তা	Posta.
প্রমারা	Primeiro
প্রেক	Prégo
ফর্ম্যা	Forma
ফিগু ( প্রমারা খেলায় ব্যবহৃত )	Figura
ফিতা	Fita
ফেস্তা ( উৎসব অর্থে ছগলী অঞ্চলে ব্যবহৃত )	Festa
বয়া	Boia
বরগা	Verga, Virga (দণ্ড, যষ্টি ) অথবা Bar- rote ( বরগা, কড়ি )
বাণ্ড ( বাগি )	Bubão
বালুতি	Balde
বিন্তি	Vinte
বিস্কুট	Biscoito
বের্দি ( সবুজ রঙ্গ )	Verde
বেসালি ( দুধদোহনের পাত্র )	Vasilha ( পাত্র )



বেহালা	Viola
বোতল	Botelha.
বোতাম	Botao
বোমা	Bomba
বোম্বেটিয়া	Bombardeiro ( গোলান্দাজ সৈনিক )
মাইরি	Maria ( বীণাজননী )
মার্ক	Marca.
মাস্তল	Mastro, Masto
মেরিণো	Merino
যীশু	Jesu.
বেস্ত	Resto ( অবশিষ্ট, দাতক্ৰীড়াব পণ )
লবেদা	Loba ( চিলা পরিচ্ছদবিশেষ ) ও abada ( পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ গুটান )
সপেটা	Sapotilla (Mexican sapotl)
সাগু	Sagu ( Malay sagu )
সাবান	Sabao
সায়	Saia
সালবোট ( রেকাব )	Salva
সালসা	Salsaparrilha.
সাঁকালি ( থলিয়া )	Sacola ( দুইটি থলিয়াবিশিষ্ট ব্যাগ )
একটি প্রচলিত দেহতত্ত্বের গানে আছে—	

“ওরে দুইমুখো সাঁকালি ! ( অথাৎ উদর )

সারাদিন ওব্রাতবা আর কোরোঁ কত ?”

সুর্তি	Sorte
সেঁকো [ বিষ ]	Arsenico

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ ।

# রাণক কুলস্তুভের তাম্রশাসন

(মূলের প্রতিকৃতি সহ)

উদ্ভিষায় যে ১৮টা গড়জাতরাজ্য আছে, তন্মধ্যে তালচের একটি। এই স্থান বহু পূর্বকাল হইতে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; আলোচ্য তাম্রশাসনেও তাহার কিছু নিদর্শন বিদ্যমান। ক একবর্ষপূর্বে এক কৃষক ভূমিতে হলচালনকালে এই তাম্রশাসনখানি পাইয়া তালচের-রাজ্যের বর্তমান মহারাজকে অর্পণ করিয়াছিল। তালচেরের মহারাজ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ময়ুরভঞ্জাধিপতির নিকট পাঠোদ্ধারের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারই যত্নে তাম্রশাসনখানি আমার হস্তগত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের গত ১৩১৫ সালে ৭ই ভাদ্রের মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রশাসনখানি প্রথম প্রদর্শিত হয়। তৎপরে অল্পদিন হইল, সংস্কৃত ও মহারাজ-ময়ুর-ভঞ্জাধিপতির আনুকূল্যে প্রকাশিত Mayurabhanja Archaeological Survey, Vol. I. p. 157ff. পুস্তকে ও তৎপরে ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বৈষ্ণবকণ্ঠ’ ৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রফলকের অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই তাম্রশাসনখানি দৈর্ঘ্যে ১০ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ৭ অঙ্গুলি। ইহাতে সংলগ্ন যে গোলাকার মুদ্রা আছে, তাহা ৪ অঙ্গুলি। ইহার দুই পৃষ্ঠা উৎকীর্ণ। ইহার অক্ষরগুলি আরতনে ৬ ইঞ্চ। ইহার অক্ষরবিজ্ঞান আলোচনা করিলে, ইহা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী বা কিছু পরবর্তী কালের লিপি বলিয়াই মনে হইবে। ইহা সংস্কৃতভাষায় রচিত ও বহু লিপিকরপ্রমাদপরিপূর্ণ। তাম্রশাসনের সম্মুখদিগের মুদ্রার শিরোভাগে দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন চালুক্যবংশের লাক্ষ্মন আদিবরাহ ও অক্ষুশ চিহ্ন এবং তাহার নিম্নে বড় বড় অক্ষরে “শ্রীকুলস্তুভদেবস্ত” উৎকীর্ণ আছে।

এই তাম্রশাসনে কুলস্তুভের পূর্বপুরুষ “ত্রিভুবনবিদিত শুক্লীকাংশবংশভূষণ” (সম্মুখভাগ ২য় পংক্তি) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এসিয়াটিক-সোসাইটীর পত্রিকায় শুক্লীবংশের দুইখানি তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন।\* তাঁহার মতে এই শুক্লীবংশ দাক্ষিণাত্যের প্রাচ্য-চালুক্যবংশেরই এক শাখা। তাঁহার সম্পাদিত উভয় তাম্রশাসনই পুরীধামের রাধবর্মণ হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং এই উভয় তাম্রশাসনেই লিখিত আছে— “স্তুভেশ্বরীলক্ষবরপ্রসাদ শুক্লীকুলভূপাধিপতিপ্রখ্যাতশ্রীমান্ কুলস্তুভদেবঃ কেদালো... কচ্ছদেব”। আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসনে উক্ত কেদাল কচ্ছদেবের নাম

নাই, কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য কলহস্তস্ত এবং তাঁহার বংশধর 'রূপস্তস্ত' অপর নাম 'রাগক কুলস্তস্ত' নাম পাওয়া যাইতেছে। এই বংশের অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্তম্ভেশ্বরী। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশের গৌরবরবি অন্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে এই বংশের কোন কোন মহাত্মা উৎকলেয় নিরাপদ পার্শ্বভ্যাদ্রদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার 'শুকী' বা 'শুকীক' এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমি 'কেদাল' বা 'কেদার' নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই বংশ 'দাক্ষিণাত্য' হইলেও পরবর্তীকালে ইহাদেরই একজন বংশধর মেদিনীপুর জেলার আসিয়া বাস করেন, অত্য়াপি তাঁহাদের বংশধরগণ 'শুকী' বা 'শুকী' নামে পরিচিত। এই শুকীবংশের তিন শত বর্ষের প্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই বংশ 'শুলাকী' নামেও পরিচিত এবং উৎকলের উক্ত 'কেদাল' জনপদ 'পশ্চিমকেদার' নামে বিদ্যুত হইয়াছে। ইত্যাদি নানা কারণে এই তায়শাসনখানি একান্ত আলোচ্য ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি। নিম্নে সংশোধিত পাঠ ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

## ( প্রতিলিপি )

## সম্মুখভাগ

- (১ম পংক্তি) ওঁ স্বস্তি । জয়তি ভূজগভোগপরমাণবঃ সর্ববজ্রঃ সর্বকুদ্ভাপিহরপ-  
 ২য় " দাজ্জরেণবঃ স্বস্তি ত্রিভুবনবিদিতে শুকীকংশবংশভূষণো রাজো-  
 ৩য় " তমসীতকাক্ষনসুভননিজভূজবজ্রবিনির্জিতদুর্ধরবৈরী<sup>১</sup> বারগণিগরী<sup>২</sup>  
 ৪য় " বাজ্জাতংসতো<sup>৩</sup> মহানুপতিঃ শ্রীমৎবীক্রমাদিত্যঃ<sup>৪</sup> পরমনামধিপ<sup>৫</sup>  
 ৫য় " শ্রীমৎকলহস্তঃ<sup>৬</sup> তস্মাদসাদ্যধরণসাহস্রাজতঃ<sup>৭</sup> প্রতাপ-  
 ৬য় " তস্মীকৃতবৈরিবীগ্রহঃ<sup>৮</sup> শ্রবগ্গসম্মানিতঃ<sup>৯</sup> সাধুসম্মতঃ পৃথিব্যাং  
 ৭য় " ততো ব্যজায়ত সকলভূপালমৌলীমালালালিতচরণযু-  
 ৮য় " গলো নীর্মলঃ<sup>১০</sup> করবালকিরণকলাপভাসুরো কেদালোধিবাসী<sup>১১</sup>  
 ৯য় " শ্রীস্তুস্তেশ্বরীলক্ষবরপ্রভাবো মহামুভাবঃ পরমমাহেশ্ব-  
 ১০য় " রো মাতাপিতৃপাদামুখ্যায়ী সমধিগতপঞ্চমহাশঙ্কো ম-

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈষ্ণবকাণ্ড ২৪০ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অনুতপাঠ—১ ভূজগ ।	২ রাজোত্তমঃ ।	৩ শোভন ।	৪ বৈরিবারণ ।
৫ গিরিশ ।	৬ জাতোৎপত্তো ।	৭ বিক্রমাদিত্যঃ ।	
৮ পরমনামধিপঃ ।	৯ তস্মাদসাদ্যধরণসাহস্রোজতঃ ।	১০ বিগ্রহ ।	
১১ সম্মানিতঃ ।	১২ নীর্মল ।	১৩ কেদালোধিবাসী ।	





- ১১ ■ হারাজাধিরাজঃ শ্রীরগস্তংভ পরমনামধিপঃ পরমভট্টরকঃ<sup>১৪</sup>  
 ১২ „ শ্রীকুলস্তংভ রাগকঃ কুশলী মণ্ডলেন্মিবর্তমানভবিষ্যজ্ঞাহা<sup>১৫</sup>সা-  
 ১৩ „ মংত্ররাজপুত্রাম্মিযুক্তদণ্ডপাশিকানন্তাপিরাজপ্রসাদিনঃ<sup>১৬</sup> চাট্টিভট্ট-  
 ১৪ „ মহাসামংতভাগজনপদাচ্ছানধিকরণজনান্ যথাইং মানয়তি বো-  
 ১৫ ■ ধয়তি সমাদিশতি জ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাং পশ্চিমথগুপ্-

## পঞ্চাঙ্গ

- ১ „ নববিষয়ে সিদ্ধগ্রামচতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ তাত্ত্বশাসনঃ চন্দ্রাক-  
 ২ „ ক্রিতিসমকালং মাতাপিত্রোরাঙ্কনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃক্ষয়ে ॥ ভট্ট-  
 ৩ „ পুত্র বিস্বরূপঃ<sup>১৭</sup> ঔতথস্ত গোত্রায় ত্রৈয়ারেষয়ঃ<sup>১৮</sup> শ্রীবরোঃ<sup>১৯</sup> ভবতাং<sup>২০</sup> ম-  
 ৪ „ জলবিলাবিনির্গতঃ<sup>২১</sup> ভট্টপুত্র যদুস্তুতঃ<sup>২২</sup> অগন্তরূপস্তুতঃ দণা-  
 ৫ „ যনঃসংক্রান্তো । আক্ষয়ঃ<sup>২৩</sup>নিধিধর্মেনাকরহেন প্রতিপাদিতঃ উ-  
 ৬ „ ক্তক ধর্মশাস্ত্রে বহুভির্বিস্তৃধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যন্ত যন্ত  
 ৭ „ যদা ভূমিস্তুস্ত তন্ত তদা ফলং ॥ মাভূদফলশকা বঃ পরদন্তে-  
 ৮ „ তি পার্থবাঃ<sup>২৪</sup> ॥ স্বদত্তাঃ<sup>২৫</sup> ফলমানন্ত্যঃ<sup>২৬</sup> পরদত্তানুপালনে ॥ স্বদত্তাঃ<sup>২৭</sup> প-  
 ৯ „ রদত্তাপরম্পরদত্তান্মাঃ<sup>২৮</sup> যো হরত বস্তুক্ষরাঃ ॥ স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূত্বা  
 ১০ „ পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সংকেপাদিদমুচ্য-  
 ১১ „ তে ॥ স্বল্পমায়ুশ্চলা ভোগা ধর্মো লোকদয়ক্ষমঃ<sup>২৯</sup> ॥ ইতী<sup>৩০</sup>  
 ১২ „ কমলদলানুবিন্দুলোলাঃ শ্রীয়মমুচিস্ত্যঃ<sup>৩১</sup> ॥ এত্যাঃ<sup>৩২</sup>সিদ্ধগ্রামঃ ভূ-  
 ১৩ „ গল্পূতিক প্রাপ্ত (৭)<sup>৩৩</sup> ২॥ দূর্বদাসেন উৎকীর্ণঃ ইতি ॥ চতুঃসীমাপর্ষ

উপরে যে মূলের অনুলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, লিপিকল্পপ্রমাদেই হউক অথবা যিনি এই তাত্ত্বশাসনের থসড়া করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত-

১৪ ভট্টরকঃ ।	১৫ ভবিষ্যজ্ঞাহা ।	১৬ প্রসাদিতান্ ।	১৭ বিস্বরূপ ।
১৮ ত্র্য্যর্ষেয় ।	১৯ এবরায় ।	২০ ভবতে ।	২১ বিদর্গিতঃ ।
২২ যদুস্তুতঃ ।	২৩ দক্ষিণায়ন ।	২৪ আক্ষয়নিধি ।	২৫ পার্থবাঃ ।
২৬ স্বদত্তাঃ ।	২৭ ফলমানন্ত্যঃ ।	২৮ স্বদত্তাঃ ।	
২৯ ‘পরদত্তাঃ’ । পাঠ হুইবার না হইয়া একবার হইবে ।			
৩০ লোকদয়াক্ষমঃ ।	৩১ ইতি ।	৩২ শিবরমুচিস্ত্য ।	৩৩ কিছু অশষ্ট ।
■ চিহ্নিত অংশ অশষ্ট হওয়ার প্রকৃত পাঠ বুঝা গেল না ।			

ভাষায় উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের অভাবেই হউক—কি ভাষা কি শব্দবিশ্বাস অথবা কি বানানে যথেষ্ট ভুল থাকিয়া গিয়াছে, এই কারণে এই তাম্রশাসনের অবিকল অনুবাদ একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি তদ্রূপ অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

### (অনুবাদ)

ওঁ স্বস্তি। ভূজগভোগপরায়ণ মহাদেবঃ ও (সেই) সর্বজ্ঞ সর্বকৃত্ত্ব ও সর্বব্যাপী হরের পদাঙ্ক রেণুসমূহের জন্ম হউক। গিরিশের অংশে শুক্লীকবংশের ভূবনস্বরূপ নৃপশ্রেষ্ঠ শুভ্র কাঞ্চনবৎ প্রদীপ্ত নিম্ভূজবজ্রপ্রভাবে যাহার নিকট চক্ৰবর্ষ বারণরূপ শত্রুবর্গ পরাজিত, যে মহানুপতি শ্রীমৎ বিক্রমাদিত্য পরম নাম রাজশ্রী কলহস্তন্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হউক। তাঁহার অসাধারণসাহসোত্তম ও প্রতাপে বৈরিগণ ভয়ীভূত হইয়াছে ও পৃথিবীতলে সাধুসম্মত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্গ কর্তৃক যিনি সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে মহানুভব পরম

(১) মূলে 'পরমাণবঃ' আছে। অণুশব্দের একটা অর্থ শিব, সুতরাং 'পরমাণু' শব্দে পরমশিব বা মহেশ্বর অর্থ করা যাইতে পারে। প্রশস্তার্থে এখানে বচন।

(২) গিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের অংশে শুক্লীকবংশের উৎপত্তি,—মেদিনীপুরবাসী শুক্লীদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতেও এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে—

“কাশীপুরে বিশ্বনাথের চরণ কৈল পূজা।

সদয় হইয়া বর দিল দেবরাজা॥

সেখান হইতে গতে গয়াভূমে গেল।

পিতার উদ্দেশ্য হেতু কলহস্ত হইল॥

ব্রহ্মবংশচূড়ামণি পুরোহিত তথা।

পত্রে লিখিয়া দিল পিণ্ডের ব্যবস্থা॥

যজ্ঞেতে আমার জন্ম জ্ঞানিবে কারণ।

তাহা বুঝি কৈল বিপ্র মঙ্গল আবাহন॥

যজ্ঞের লক্ষণ সব বহুমান হইয়া।

বসিলেন পিণ্ডদানে চৌদিকে বেড়িয়া॥

দ্বিজরূপে বসিয়াছেন দেব বিশ্বনাথ।

দেখ দেখ তোমাদের পিতা যে সাক্ষাৎ ॥ ... ..

... ..

যজ্ঞে জন্ম হইল তার দেবমুষ্টি দেখি।

মহেশ্বের মানসপুত্র বড় হইল স্বৰী॥” (শতালপত্রের কুলজী)

[ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ও ১ম ভাগ ২৪৫ হইতে ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ]

মাহেশ্বর মাতাপিতৃপাদান্তরত সমধিগত-পঞ্চমহাশব্দঃ মহারাজাধিরাজ শ্রীরণস্তম্ভদেব জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার নিৰ্ম্মল করবালের কিরণসমূহ সর্বদা উজ্জ্বল, সকল রাজগণের শিরোমাত্ৰা যাঁহার চরণযুগলে লালিত, কেদালঃ নামক স্থানে যাঁহার বাস, যিনি দেবী স্তম্ভেশ্বরীর বরলাভে সবিশেষ প্রভাবান্বিত, যে রাজার পরম নাম পরমভট্টারক শ্রীরণস্তম্ভ রাণক, তিনি কুশলে থাকিয়া এই মণ্ডলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহাসামন্ত, রাজপুত্র এবং তন্নিস্কৃত দণ্ডপালিক প্রভৃতি অত্যাচ্ছ রাজ-প্রসাদভোগীদিগকে এবং চাট্ট ভট্ট ও মহাসামন্তগণের অধীন জনপদাদির অধ্যক্ষগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, প্রবোধ দিতেছেন, আজ্ঞা করিতেছেন ও জানাইতেছেন যে, আপনারা সকলে অবগত হউন—পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব বিষয়ে (এই) তাম্রশাসনবর্ণিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সিন্ধগ্রাম চন্দ্রহর্যা ও পৃথিবী যতকাল তত কালের জ্ঞাত মাতা, পিতা, আপনার পুত্রা ও যশোরক্ষির জ্ঞাত দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষে ভট্টপুত্র যত্নর স্নাত অনন্তরূপের পুত্র (যাঁহার) উত্থা গোত্র জ্যেষ্ঠের প্রবর ভট্টপুত্র বিধরূপকে অক্ষয়নিধিধর্ম্মানুসারে নিকররূপে প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, সগরাদি বহু রাজাই ভূমিদান করিয়াছেন, যাঁহার যাঁহার যেখানে ভূমি, তাঁহার তাঁহার সেখানে ফল। হে রাজগণ! পরদত্ত ভূমির জ্ঞাত অফলের আশঙ্কা করিও না। নিজদত্ত অপেক্ষা পরদত্তের রক্ষায় অনন্ত ফল। স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যে ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া থাকে। বেণী আর কি বলিব, সংক্ষেপে বলিতেছি। আয়ু অন্ন, ভোগ অস্থায়ী, ধর্ম্মই কেবল ইহলোক ও পরলোকে অক্ষয়, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় সম্পদ চিন্তা করিয়া। এই সিন্ধগ্রাম ত্রুণপুতি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল। ২ ॥ দুর্দাস কর্তৃক (এই তাম্রশাসন) উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

(৩) 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' অর্থাৎ যিনি পঞ্চমহাশব্দ লাভ করিয়াছেন। পূর্বকালে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিগণ এই শব্দে বিশেষিত হইতেন। সাধারণতঃ মহাসামন্তগণই এইরূপ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। কোন কোন স্থলে মহারাজাধিরাজও 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' দ্বারা আখ্যাত হইয়াছেন। (Fleet's Gupta Inscriptions, p. 297)। লিঙ্গারভটিগের প্রাচীন 'বিবেকচিন্তামণি' গ্রন্থে শূর, ভদ্রট, শব্দ, ভেরী ও জয়বটী এই পঞ্চবাক্যনিই 'পঞ্চমহাশব্দ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) কেদাল—উক্ত তালপত্রের কুলগ্রন্থে এই কেদাল শব্দ 'পশ্চিম কেদার' নামে বর্ণিত হইয়াছে।



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উদ্দেশ্য ও

## কার্যনির্বাহ-প্রণালী

১। কোনরূপ মৌলিক অমুসন্ধানের পরিচয় না থাকিলে কোন প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। মৌলিক অমুসন্ধান দ্বিবিধ—(ক) লুপ্ত তথ্যের উদ্ধাব, (খ) অভিনব সত্যের আবিষ্কার।

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নলিখিত বিষয়ে মৌলিক অমুসন্ধান বিশেষভাবে প্রার্থনা করি :—

(ক) ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অভিধান, প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ, পরিভাষা ইত্যাদি।

(খ) প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, অমুদ্রিত বাঙ্গালা পুঁথি প্রকাশ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি।

(গ) পুরাতত্ত্ব, প্রাচীনকীর্তির বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ ইত্যাদির আলোচনা।

(ঘ) কথা, কাহিনী, প্রবচন প্রভৃতি গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা।

(ঙ) উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, বসায়ন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও পদার্থবিদ্যাবিষয়ক আলোচনা।

৩। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক প্রবন্ধ-নির্বাচন করেন।

৪। সাধারণতঃ প্রবন্ধের প্রথম লেখকগণের নিকট পাঠান হয় না, সুতরাং লেখকগণ কাগজের এক পিঠে প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যে সমুদয় নূতন আবিষ্কৃত সত্য এবং মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয়, তাহাও সহিত পবিচিত হওয়া প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষীর অবশ্য কর্তব্য। বাঙ্গালা-সাহিত্যে এট উদ্দেশ্য-সাধনার্থ আর কোন দ্বিতীয় পত্রিকা নাই। এই পত্রিকার পুষ্টিবিধান ও বহুল প্রচারকল্পে সকলকে আয়াস স্বীকার করিতে সাহসনয় অনুরোধ করা যাইতেছে।

৬। ডাকমাস্তুল সমেত সর্বত্র বার্ষিক মূল্য ৩৮০ আনা। ইহা ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকমল সিংহ

প্রকাশক।

## বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পাঠশোধন

গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থ সংখ্যায় “নবাবিকৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন” শীর্ষক প্রবন্ধে ২৩৪ হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠায় তাম্রশাসনের যে পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পাঠপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এই অংশ মুদ্রণকালে মূল তাম্রশাসন অথবা তাহার অবিকল আলোকচিত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই। পাঠ মুদ্রিত হইবার পর আলোকচিত্রখানি আমাদের হস্তগত হয় এবং তাহার সহিত মুদ্রিত পাঠ মিলাইয়া দেখা গেল যে কএক স্থলে অবিকল পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। প্রাচীন-তাম্রশাসন প্রকাশকালে প্রথমতঃ অবিকল পাঠ প্রকাশ করাই সম্ভব। এ জন্ত সাধাবণের অবগতিব জন্ত মুদ্রিতপাঠ ও মূল তাম্রশাসনের প্রকৃত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পত্রসংখ্যা	পংক্তি	মূল প্রকৃত	মুদ্রিত
২৩৪	২৯	দ্বিস্বর্ষাদ	নির্মর্ষাদ
”	৩০	শ্রেয়োদ্ধ	শ্রেয়োহু
২৩৫	৬	সুত্মীবল্লভঃ	সুত্মী বল্লভঃ
”	৭	সদাচারচয়া	সদাচারচয়া
”	১০	বাজপুত্রাঃ	বাজপুত্রাঃ
”	১২	সুধধুনী	সুধধুণী
২৩৬	১৫	দেবপাদানুধ্যাত	দেবপাদানুধ্যাত
২৩৭	৩	গোমহিসাজাবিকাদি	গোমহিসাজাবিকাদি
”	১৬	পশ্চিমগর্ডি	পশ্চিমগর্ডি
”	১৮	আউড়াগর্ডি	আউড়াগর্ডি
”	১৯	পর্যন্ত	পর্যন্ত
”	২১	নাড়িনা	নাড়িনা
”	২২	মোলাউন্দী	মোলাউন্দী
”	২৫	বৃষভশঙ্করনলেন	বৃষভশঙ্করনলীন
২৩৮	২	পর্যন্ত	পর্যন্ত
”	৪	প্রপৌত্রায়	প্রপৌত্রায়
”	৫	পৌত্রা	পৌত্রা
”	৬	পুত্রায়	পুত্রায়
”	১৯	বসুধা	বসুধা
”	২০	সুগয়াদিভিঃ	সুগয়াদিভিঃ
”	২২	স্বর্গ	স্বর্গ

পত্রিকা-সম্পাদক।

## প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ

( प्रक्षान्तिवृत्ति )

৬ষ্ঠ । গোবিন্দদাস কবিরাজ

ଅନୁ-ସଂସ୍କୃତି ୫୭୯ ।

[illegible]



প্রথম প্রকাশক, সুলেখক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্ট নত্যাশ্রয় এ বিষয়ে যেরূপ বহু ও পবিত্রান স্বীকার করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহই করেন নাই। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু তাহার “গৌরপদ-তরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থের সুবিস্তৃত উপক্রমণিকায়, অধিকাংশ বৈষ্ণব-কবিগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু গোবিন্দদাসের জীবন-ঐতিহাসিক ঘটনা জানা যায়, প্রায় সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুর কতিপয় ঘটনা। কৌতুহলী পাঠক “গৌরপদ-তরঙ্গিনীর” উপক্রমণিকার গোবিন্দদাসের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবেন। (গৌ-প-ত ৬০-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমরা এখানে সেই বিবরণের সার মৰ্ম্ম উদ্ধৃত করিব।

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শাকে (কাচাব মতে ১৪৪৭ শাকে) তেলিয়া-বৃন্দবীগ্রামে বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে, গোবিন্দেব প্রায় অর্ধেক বয়স পর্য্যন্ত তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন তিনি ভগ্নানক গ্রন্থীরাগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন। একদিন যুমুধু অবস্থায় নিজ উষ্ট্রদ্বারা ভগবতীকে স্মরণ করিতেছিলেন—এমন সময়ে—

“আকাশবাণীতে দেবী কহে বাব বাব।

গোবিন্দ-শরণ লও পাইবা নিস্তার।” (ভ-মা)

ইহাব বহুপূর্বেই গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক শক্তি-উপাসনা ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; এক্ষণ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া গোবিন্দও উক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত আচার্য্যকে নিজালয় বৃন্দবীগ্রামে লইয়া আসার জন্য অনুনয় করিয়া অগ্রজের নিকট পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে আচার্য্যপ্রভু রামচন্দ্রের সহিত বৃন্দবীগ্রামে গমন করিয়া গোবিন্দকে ‘রাধাকৃষ্ণ’ চতুশাস্ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে, আচার্য্যপ্রভু গোবিন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পদ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ—

“ভজহঁ রে মন নন্দনন্দন

অভয় চরণারবিন্দ য়ে।

হৃদয় মায়াব জন্ম সংসঙ্গে

তরহ এ ভব-সিদ্ধি যে ॥” (প-ক-ত, ২১৭০ পৃষ্ঠা)

ইত্যাদি পদটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন এবং ইহাই গোবিন্দদাসের প্রথম পদ-রচনা। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ অত্যাশ্রয় স্থললিত পদাবলির সহিত তুলনা করিলে, এই পদটি তাহার প্রথম রচনা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে, কারণ “জন্মসংসঙ্গে” বাক্যটিতে যে প্রতি-কটুতা দোষ ঘটিয়াছে, গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সেব কোন পদে সেইরূপ ক্রটি দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষণ ক্রটি সত্ত্বেও এই পদটি গোবিন্দদাসের প্রথম উপস্থিত রচনা হইলে, ইহা যে তাহার ভাবী কালের অসামান্য কবিত্বের সূচনা করিয়াছিল, তাহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। কথিত আছে যে, আচার্য্যপ্রভু কিছুদিন পরে গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করি-

বার জন্ত তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন— গোবিন্দদাস সেই পদ এমন সুন্দরভাবে পূরণ করেন যে, আচর্ষ্যপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে ‘কবিরাজ’ উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া তথায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উক্ত গোস্বামি-প্রভৃদিগকে স্বরচিত “সঙ্গীত-মাধব” নাটক ও পদাবলী শ্রবণ করাইলে, তাঁহারা গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত জগদন্ম বাবু গোবিন্দদাসের কবিত্বের জন্তই “কবিরাজ” উপাধি পাওয়ার আখ্যায়িকাটি প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাস তাঁহার কবিত্বের জন্ত “কবিরাজ” উপাধি লাভ করার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অগজ তাদৃশ কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন না হইয়াও “রামচন্দ্র কবিরাজ” নামে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্বত্র কথিত হইয়াছেন দেখিয়া, বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের “কবিরাজ” উপাধিটি বংশগত উপাধি বলিয়াই আমাদেরিগেব সন্দেহ হইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মতে—পদ-কল্প-তরুর উল্লিখিত—

“কবি-নৃপ-বংশজ                      ভূবন-বিদিত-যশ,  
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।” ( প-ক-ত )

একই ব্যক্তি। ‘কবি-নৃপ-বংশজ’ বাক্যের অর্থ কবিরাজ-বংশ-জাত। সুতরাং রামচন্দ্র ও গোবিন্দের “কবিরাজ” উপাধিটি বংশগত ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে, অল্প উপাধিসম্বন্ধেও সাধারণ “কবিরাজ” উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন—অদ্যাপি বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র ইহা দেখা যায়; সুতরাং গোবিন্দদাসের “কবিরাজ” উপাধিলাভের আখ্যায়িকাটি অমূলক এবং গোবিন্দদাস প্রসিদ্ধ ষট্‌গোস্বামীদিগের দ্বারা বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ মহাশয়-ব্যঞ্জক কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই—ইহাই আমাদেরিগের অনুমান হয়।

কথিত আছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র ও গোবিন্দদাসের প্রিয়বন্ধু রাজা সন্তোষ দত্তের অহুরোধে গোবিন্দদাস সংকৃত ‘সঙ্গীতমাধব’ নাটক রচনা করেন এবং তৎসময়ে বিদ্যাপতির কোন কোন পদ অসম্পূর্ণভাবে বঙ্গদেশে প্রচারিত হওয়ায়, তিনি সেই সকল পদ পূরণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির “প্রেমক-অঙ্কুর, আত জাত ভেল” ইত্যাদি পদটি এইরূপেই পূর্ণ হয়। বিদ্যাপতি ঐ পদের কোন্ অংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ-গোবিন্দদাস কর্তৃক বিদ্যা-দাদুই বা কোন্ অংশ পূরণ করিয়াছেন—তাহা বুঝা যায় না। পতির অসম্পূর্ণ পদের পূরণ। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতির অঙ্কুরগণে পদ-রচয়িতৃগণ-মধ্যে গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ; ইহার অনেক পদই বিদ্যাপতির পদ হইতে রচনা-দর্শনে পৃথক্ করা হুঃস্যাধ্য

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির যে কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিয়াছেন, তাহাদের ভণিতায়

বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামও সংযুক্ত করিয়াছেন এবং তৎকর্তৃক পদপূরণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

“বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব

গোবিন্দদাস রসপূৰ্ণ।” ( প-ক-ত, ১১৮৭ পৃষ্ঠা )

“মুদিত নয়নে চিয়া ভুজ-মৃগে চাপিণী”—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটির ( প-ক-ত ৭১ পৃষ্ঠা ) ভণিতা ; যথা—

“বিদ্যাপতি ভণ মিছা নহে তাপি।

গোবিন্দদাস কহ তুহঁ তহিঁ সাগি ॥”

পদ-কল্প-তরু-গ্রন্থে “ভাণি” ও “সাগি” স্থলে “ভাতি” ও “সাগী” পাঠ আছে, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার “পদামৃত-সমুদ্রের” টীকায় লিখিয়াছেন, “বিদ্যাপতিবচং মিথ্যা ন ভণামি। ভো গোবিন্দদাস তত্র ভ্ণ সাক্ষী। অহস্তদম্বরাগোহস্তি নাস্তীতি কথং ভ্ণঃ। পক্ষে বিদ্যাপতি-ঠাকুরস্ত গীতপূরণং গোবিন্দদাস-কবিনাজেন কৃতমিতি গমাতে।” ( প-স, ১১০ পৃষ্ঠা ) রাধামোহন ঠাকুরের গমীত পাঠ ও অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। বস্তুতঃ যে পাঠই গ্রহণ করা যাউক না কেন, এই প্রসিদ্ধ পদটিও যে গোবিন্দদাস পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির বহু পরবর্তী লোক স্মৃতিবাং উভয়েব একযোগে পদ-রচনা করা অসম্ভব। তবে এই গোবিন্দদাস যদি বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিল কবি হন—তাহা হইলে সেরূপ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ কোন মৈথিল গোবিন্দদাসের পদাবলি বাঙ্গালা বৈষ্ণব কবির পদাবলির সংগ্রহে স্থান পায় নাই—বিদ্যাপতিব মৈথিল পদাবলি-সংগ্রহেও এইরূপ যুগল ভণিতায়ুক্ত কোন পদ দেখা যায় না ; স্মৃতিবাং গ্রন্থে গোবিন্দদাস পদপূরণের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও, ইঙ্গিতে তাহাই বুঝাইয়াছেন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সে যাহা হউক, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ২৭টি অসম্পূর্ণ পদের পূরণ করিয়া থাকিলেও, পদাবলির লেখক কিম্বা গায়কদিগের সহিত পড়িয়া কোন কোন পদের ভণিতায় অকারণেও যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা পদ-কল্প-তরু “ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর” এই প্রসিদ্ধ পদটির ( প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা ) সহিত পদামৃত-সমুদ্রের “সুন্দরি রমণি জনম ধনি তোর” ( প-স, ১১১ পৃষ্ঠা ) পদটি তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে। উক্ত দুইটি পদই বিদ্যাপতির একটি পদের রূপান্তর মাত্র। প্রথম পংক্তিতে দুই একটি শব্দের প্রভেদ ও পদ-কল্প-তরুতে ভণিতার পূর্বে “হসইতে কব তুহঁ দশন দেখায়লি” ইত্যাদি চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে। তারপরে ভণিতা লইয়াই গোলযোগ দেখা যায়। পদ-কল্প-তরুর ভণিতা যথা,—

“এতহঁ নিদেশ কহল তোহিঁ সুন্দরি,

জানি ইহ করহ বিধান।

দুদয়-মুতলি তুহঁ

সো শুন কলেবর

কবি বিদ্যাপতি ভাণ।” ( প-ক-ত, ৫১ পৃষ্ঠা )

পদ্যমৃত-সমুদ্রের ভগিতা :—

“তাকর অন্তর

জলই নিরন্তর

বিদ্যাপতি ভালে জান ।

ক্লিষ্ট কাল

কলপ করি মানই

গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥” ( প-স, ১১২ পৃষ্ঠা )

বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পদাবলি যে গোবিন্দদাসের প্রিয় ছিল এবং তিনি যে সেই পদাবলির অল্প-গোবিন্দদাসের উপর বিদ্যা করণে ও সেই প্রণালী অনুসারেই অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন ; পতির পদের অভাব। ইহা তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পদ্যমৃত-সমুদ্রে গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদটি দেখা যায়। যথা—

“পেখলু অপকুব রামা ।

কুটিরা বংশ লাথ শর বরিথান মন বাঙ্কল বিম্ব দামা ॥৫

পহিল বয়স ধনি মুন-মন-মোহিনী গজবর জিনি গতি দন্দা ।

কনকলতা তহু বদন ভান জহু উয়ল পুনিমক চন্দা ॥

কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দৌ কুচ চুচু মরকত শোভা ।

কমল কোরে জহু মধুকর শূতল তাহি বহল মনলোভা ॥

বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল রাধা রসময় দন্দা ।

গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল যো হেরি লাগয়ে দন্দা ॥” (প-স, ১০০ পৃষ্ঠা)

এই পদটি বিদ্যাপতির স্মপ্রসিদ্ধ—

“অপকুব পেখলু রামা ।

কনকলতা অবলম্বনে উয়ল

চরিণ-হীন হিম-ধামা ॥”

ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত হইয়াছে এবং কবি “বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল” স্বাক্ষর দ্বারা তাহাই জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের প্রায় সকল উৎকৃষ্ট পদ বৈষ্ণবদাসের পদ-কল্প-তরু-গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও, এই পদটি উক্ত গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। রাধা-মোহন ঠাকুর বলেন, ইহাও গোবিন্দকৃত বিদ্যাপতির পদপূরণ। যাহাই হউক, পদটি বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট অনুকরণ ও পদ-কল্প-তরুতে নাই বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত করিলাম।

গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ আর যাহা জানা যায়, তাহা এই যে, তিনি প্রসিদ্ধ খেতুরীর মহোৎসবে সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য পদকর্তৃগণ-সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোবিন্দদাস কীর্ত্তিনিরার মুখে গোবিন্দদাসের পদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া—

“শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ছুটি করে ধরি ।

খেতুরীর মহোৎসব ।

কহে তুরা কাব্যের বাংলাই লৈয়া শরি ॥” (ভক্তিরঙ্গাকর)



কথিত আছে যে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদাস মিথিলাদেশের অন্তর্গত বিস্ফীগ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি-মন্দির দর্শন করেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

কথিত আছে, গোবিন্দদাস ১৫৩৫ শকের চান্দাবনির কৃষ্ণাপ্রতিপৎ তিথিতে মানবলীলা সংবরণ করেন; সুতরাং তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। নবহরি চক্রবর্তীর “ভক্তি-বহুধার” পাঠে জানা যায়, কবি শেষ বয়সে—

“নির্জনে বসিয়া নিজ পদ-রত্নগণে।

করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥”

অতএব গোবিন্দদাসের শেষ বয়স যে, পরম শান্তিতে কাব্যালোচনা ও কাব্যবাসনাদে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গোবিন্দদাসের জীবন-চরিত্রের ঘটনাবলি এই খানেই শেষ হইবে; কিন্তু যিনি শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার পদাবলীর সমালোচনা হই চারি কথায় শেষ করিলে চলিবে না। তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা এইক্ষণ তাঁহার পদাবলির বিস্তৃত আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। গোবিন্দদাসের পদাবলির ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব ইত্যাদির প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিগণের কাব্যের সহিত তুলনা ব্যতীত হইতে পারে না, এজন্য বাধ্য হইয়াই আমরা আমাদের বক্তব্য সুদীর্ঘ করিতে হইবে। আমরা এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথা বলিব, যাহা উক্ত কবিদ্বয়ের সমালোচনাকালে আর পুনরুক্তি কবিত্তে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের পূর্বে হইতেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অতুলনীয় পদাবলি বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি                      রায়ের নাটক-গীতি

গোবিন্দদাসের  
পদাবলীর বিশেষক।

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে                      মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥”

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি অসাধারণ কবিত্ব ও মধুরতার জন্য পূর্বেই সহস্র শিক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তারপর তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য হইয়া তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট অতি প্রিয়তম বস্তু হইয়া পড়িল; সুতরাং গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর উপরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রকৃতিগুণে উত্তম প্রভাব সমান কার্যকর হয় নাই। বিদ্যাপতি দুর্কোধ্য মৈথিল ভাষায় পদরচনা করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা বিস্তৃত বাঙ্গালা—ইহা দেখিয়া যদিও গোবিন্দদাসের দ্বার

বাঙ্গালী-কবির উপবে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক থাকা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু কার্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক স্থলেই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য;—এমন কি তিনি যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই—পক্ষান্তরে তাঁহার উপরে চণ্ডীদাসের অল্পমাত্র প্রভাব থাকিলেও, অনেক স্থলেই তাহা লক্ষ্য করা কঠিন। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? আমাদের বিশ্বাস গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র হইতেই ইহার সম্ভাব্যজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত-সাহিত্যে নিত্যন্ত পারদর্শিতা ও প্রৌঢ় বয়সে পদ-রচনাই বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কারণ বটে। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাপতির সংস্কৃতমূলক মৈথিলভাষা আয়ত্ত করা কঠিন নহে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগোবিন্দের মাতা-বৃন্দের অনুকরণে ~~অসংখ্য~~ <sup>অসংখ্য</sup> চন্দঃ প্রয়ুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের স্থায় লঘুগুরুবর্ণের প্রভেদবশতঃ ভাষার সজীবতা ও ছন্দের ঝঙ্কার যেরূপ বঞ্চিত হইয়াছে—তাহাতে সংস্কৃত-কাব্য-স্বলভ অনুপ্রাসাদি প্রতিমধুর শব্দালঙ্কার ও উপমারূপক প্রভৃতি মনোহর অথালঙ্কার যেরূপ লক্ষিত হয়, আর কোন ভাষা-কাব্যেই সেইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং আজীবন সংস্কৃত-সাহিত্যে আকর্ষণ-নিমগ্ন গোবিন্দ কবিরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ যে চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলির আদর্শে পদ-বচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চণ্ডীদাসেব পদাবলীতে সেইরূপ অলঙ্কারের ছটা না থাকিলেও, তিনি তাঁহার সরল ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকাব যে স্তমধুর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তিনি তাঁহাদিগেব মুখ দিয়া প্রেমের যে গভীর উচ্ছ্বাসময়ী উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট—বাঙ্গালা ভাষার নিকট তাহা অমূল্য; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষাব সেই শৈশব-অবস্থায় বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের অবিমিশ্র স্বাভাবিক বাঙ্গালা ভাষার মাহাত্ম্য বুঝার সাধ্য কাহারও ছিল না; কোন ভাষার আদি কবির প্রকৃত মাহাত্ম্যই সমকালীন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত-ভাষার রচনাই অধিক স্বাভাবিক ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রেমাবতাব ও বিনয়ের আদর্শ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অল্প কোন ভাষায় তাঁহার মনের উৎকর্ষ ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাক্য না পাইয়া শিখরিণীচ্ছন্দে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রুজল-প্রাবিত-বদনে গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—“জগন্নাথ-স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।” কিন্তু যেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রভাব তাঁহার পরবর্তী সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই, সেইরূপ স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও পরবর্তী কবিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল না—তাই আমরা দেখিতে পাই যে, গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস অনিচ্ছা-সঙ্গেও যেন অবিমিশ্র বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের এইরূপ বিস্তৃত পদাবলীর সংখ্যা খুব অল্প। পদ-কল্প-তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদের

মধ্যে ঐরূপ পদের সংখ্যা ৮১০টির অধিক হইবে না। তত্ত্বিন্ন আর সমস্ত পদের তাহাই বিত্তক কিম্বা মিশ্র মৈথিলী। ইহাই পরবর্তী সময়ে, চলিত কথায় “ব্রজবলী” নামে আখ্যাত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাবে সমস্ত বিষয়েই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার পদাবলির ভাষায় ও ভাবে তাঁহার এইরূপ একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আমরা রাধামোহন ঠাকুর, বলবাম দাস প্রভৃতি অগ্রাগ্র অনুকরণকারী কবিগণের কবিতায় খুঁজিয়া পাই না। এইখানেই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব; ইহাই তাঁহার কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সফলতা। আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি একটি একটি কবিতা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষার অনুকৃতি হইলেও, বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, বিদ্যাপতি তাঁহার স্বদেশের প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ-রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ঐ ভাষার প্রচলিত ‘তত্ত্বাব’ ও ‘দেশজ’ শব্দের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার স্বাভাবিক রীতি (idiom)

গোবিন্দদাসের  
পদাবলির ভাষা।

তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার রচনা স্বাভাবিকতায় তাঁহার স্বদেশীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অন্যদিকে তাহা ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট দুর্বোধ্য হইয়াছে; সেই জন্যই বিদ্যাপতির পদাবলির স্থানে স্থানে অর্থ-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এত গোলযোগ দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপতির সমকালিক মৈথিল ভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি জানা ব্যতীত, সেই ভাষার ‘তত্ত্বাব’ ও ‘দেশজ’ শব্দাবলি কিম্বা রচনা-রীতিতে সেইরূপ পারদর্শিতা লাভ করা বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না; সুতরাং তিনি মৈথিল ‘তত্ত্বাব’ ও ‘দেশজ’ শব্দের পরিবর্তে যে ‘তৎসম’ অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবেন, ইহাই নিত্য স্বাভাবিক বোধ হয়। সে যাহা হউক, গোবিন্দদাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাঁহার পরবর্তী পদকর্তৃগণও পূর্বোক্ত কারণে এই প্রণালীতে পদ-রচনা করায়, তাঁহাদিগের প্রবর্তিত ‘ব্রজবলি’ বিদ্যাপতির ভাষার জায় দুর্বোধ্য হয় নাই। সংস্কৃত-ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষার কতকগুলি নিয়ম জানা থাকিলে, সহজেই এই ভাষা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। মৈথিল ভাষার নিয়মাত্মক কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির এবং পরিমাণ ‘দেশজ’ ও ‘তত্ত্বাব’ শব্দের সহিত প্রচুর পরিমাণ সংস্কৃত-শব্দের ব্যবহারে এই যে নূতন লিখিত উপভাষার প্রচলন হয়—ইহাই পরে “ব্রজবলি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা মৈথিল, হিন্দি, ব্রজভাষা প্রভৃতি উপভাষার জায় কখনও কখনো পদে ব্যবহৃত হয় নাই।

গোবিন্দদাসের পূর্বে অল্প কোন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক-কবি এই “ব্রজবলি”তে পদ-রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাহুদেব বোধ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক

পদকর্তৃগণ সকলেই বিত্ত্বক বাঙ্গালা-ভাষায় অধিকাংশ পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ২১টি পদে কচিং ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হইতেই পদাবলি-সাহিত্যে আমরা “ব্রজবুলি”র প্রাধান্য দেখিতে পাই, যদিও গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কবি জ্ঞানদাসের পদাবলিতে কোন কোন স্থানে “ব্রজবুলির” ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার “সহজে হুনিক পুতলী গোরি। জাবল বিরহ আননে তোরি।” (প-ক-ত, ৩৭ পৃষ্ঠা) এবং “দেখবি সখি ছামচন্দ, ইন্দু-বদনী রাধিকা” (প-ক-ত) ইত্যাদি ব্রজবুলির পদগুলির রচনা ও ভাব বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু এরূপ পদের সংখ্যা নিতান্তই কম। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি-পদের জন্য বিখ্যাত নহেন—তিনি গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্থললিত সরল বাঙ্গালায় চণ্ডীদাসের আদর্শে যে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পদ ছাড়া যে পদের তুলনা সমস্ত পদাবলী-সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই পদাবলির জন্যই জ্ঞানদাস বিখ্যাত। ত্রিচৈতন্যপ্রভুর পূর্ববর্তী যুগে যেমন বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস—পরবর্তী যুগে সেইরূপ গোবিন্দদাস আর জ্ঞানদাস ;—যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি; সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ সাম্য ও বৈষম্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, পূর্বোক্ত কারণে গোবিন্দদাস কবিরাজকেই পদাবলি-সাহিত্যে ব্রজবুলির প্রধান প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

গোবিন্দদাসের প্রবর্তিত ব্রজবুলির এই নূতনত্বই একমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি তাঁহার রচনার প্রচুর পৰিমাণে সংস্কৃত-শব্দ গ্রহণ করায়, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার ন্যায় তাঁহার রচনা অল্পপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্যে অনেক স্থলে এরূপ শক্তিমধুর হইয়াছে যে, গোবিন্দদাসের জয়দেবের রচনা ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ লক্ষিত হয় না। অল্পপ্রাস-পটুতা। গোবিন্দদাসের পদ-মাধুর্য্য ও অল্পপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র ;—সম্ভব পাঠক তাঁহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদেই ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতূহলী পাঠকবর্গকে পদ-কল্প-তরুর চতুর্থ শাখায় যড়-বিশং পল্লবের ৫৮।১২।১৩।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬ সংখ্যক শ্লোকের রূপ-বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গোবিন্দদাসের—

“অঞ্জন-গঞ্জন                      জগ-জন-রঞ্জন

জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।

তরুণারূপ-থল                      কমল-দলারূপ

মঞ্জীর রঞ্জিত-চরণা ॥” (প-ক-ত, ১৬৮৯ পৃষ্ঠা)

“মুকুলিত-মরী                      মধুর-মধু মাধুরী

মালতী-মঞ্জল-মাল।

মন্দ-মকরন্দ-                      সুদিত-মন্ত-মধুকর

মণ্ডিত-মৌলি-মন্দার ॥” (ঐ, ১১৯৯ পৃষ্ঠা)

ইত্যাদি সমধুর রূপ-বর্ণনা সমূহের তুলনামূল্য কেবল গীতগোবিন্দেই পাওয়া যায়—কিন্তু

গোবিন্দদাসের অমুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বৃষ্টি জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এরূপ কতকগুলি পদ আছে, যাহাতে পদের আরম্ভ তহঁতে শেষ পর্য্যন্ত একই বর্ণের অমুপ্রাস চলিয়াছে। যথা ;—

“কুবলয়-কন্দল-                      কুমুদ-কলেবর  
কালিম-কান্তি কলোল।

কোমল-কেলি                      কদম্ব-করষিত  
কুণ্ডল কাণ্ড কপোল ॥

জয় জয় ক্রমঃ কমলেশ।

কালিয়-কেলি-                      কংস-করি-কর্ষণ  
কেশব কৃষ্ণিত-কেশ ॥ ৩৭।

কুল-বনিতা-কুচ                      কুঙ্কমাঞ্চিত  
কুম্মিত কুণ্ডল বণ্ড।

কালিন্দী-কমল                      কলিত-কর-কিশলয়  
কৌতুক-কন্দল-কন্দ ॥

কমলা-কেলি                      কলপতরু কামদ  
কামিনী-কোটি-করীন্দ্র।

রূপণ রূপা কর                      কলি-কলুষধ্বংস  
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥”

ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া এইরূপ অমুপ্রাস-যোজনা করা অল্প কোন কবি করিতে পারিয়াছেন কি? আমরা ২১টি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যাইতে পারে।

পরবর্তী কবি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ প্রভৃতি অনেকে গোবিন্দদাসের এই সংস্কৃত-বহুল রচনা-পদ্ধতি ও অমুপ্রাসচ্ছটার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু এ বিষয়ে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার নিকটেও আসিতে পারেন নাই। সুতরাং পদ-মাধুর্য্য ও অমুপ্রাস-প্রাচুর্য্যে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির পদাবলি পাঠ করিয়া—তিনি বিত্তক বাঙ্গালার যে কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের একরূপ হতাশ হইতে হয়। তাঁহার ব্রজ-বুলির পদাবলির তুলনার বাঙ্গালা-পদসমূহের সংখ্যা বেক্স অল্প, রচনা-পারিপাট্যও তাহার তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে। গোবিন্দদাসের তলিতায়ুক্ত কয়েকটি পদ আমরা রাধামোহন ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তীর-রচিত বলিয়া জাদিতে পারিতেছি, তন্মিত্ত গোবিন্দ-

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা পদাবলি। দাসের ভণিতায়ুক্ত অপর বাঙ্গালা-পদগুলি সমস্তই গোবিন্দ কবি-রাজের রচিত কি না বলা যায় না ; কিন্তু ভ্রমধ্যে কয়েকটি যে তাঁহার রচিত, রচনা-প্রণালীদর্শনে তাহা নিশ্চিত অনুমান হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, গোবিন্দদাস সংস্কৃতবহুল ব্রজবলি রচনার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেও, তিনি চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা-পদের সরল গাভীয়া ও মধুবতার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়াই, চণ্ডীদাসের অনুকরণে ঐ বাঙ্গালা-পদগুলি রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের—

“খীর বিজুরী বরণ গোরী

পেখন ঘাটের কূলে।

কানড়া ছাঁন্দে কবরী বান্ধে

নব মল্লিকার মালে ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত, ৫৪ পৃষ্ঠা )

সুমধুর পদটি বোধ হয় পদাবলির প্রায় পাঠকগণেরই কণ্ঠস্থ আছে। গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় ঐ ধরণের দুইটি পদ দেখুন—

“চিকণ কালা গলায় মালা

বাজন নুপুর পায়।

চুড়ার কূলে ভ্রমরা বুলে

ভেরছ নয়নে চায় ॥

কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই

ছলিয়া নাগর কান।

ঘরমু যাইতে নারিনু সই

আকুল করিল প্রাণ ॥

চাঁদ বলমলি ময়ূরের পাখা

চুড়ায় উড়য়ে বায়।

ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাশরি

মধুর মধুর গায় ॥

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে

কেলি কদম্বের হেলা।

কুলবতী-সতী যুবতী জনার

পর্যায় লইয়া খেলা ॥

শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল

পিঙ্কন শিঙল বাস।

স্নাতা উৎপল চরণ-মুগল

মিছনি গোবিন্দ দাস ॥”

“ঢল ঢল কাঁচা                      অঙ্গের লাবণী

অবনী বহিয়া যায় ।

ঈষৎ হাসির                      তরঙ্গ হিলোলে

নদন মূৰ্ছা পায় ॥

কিবা সে নাগর                      কি খেনে দেখিত

ধৈর্য রহল দূরে ।

নিরবধি মোর                      চিত বেয়াকুল

কেন বা সদাই বুঝে ॥

হাসিয়া হাসিয়া                      অঙ্গ দোলাইয়া

নাচিয়া নাচিয়া যায় ।

নয়ান-কটাক্ষে                      বিষম বিশিখে

পরাণ বিক্লেতে ধায় ॥

মালতী ফুলের                      মালাটি গলে

হিয়ার মাঝারে দোলে ।

উড়িয়া পড়িয়া                      মাতল ভ্রমরা

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে ॥” ( প-ক-ত, ১১৩ পৃঃ ) ইত্যাদি

শব্দ চিত্রে গোবিন্দদাসের ক্ষমতা অসাধারণ বলিয়া তিনি এইরূপ বর্ণনায় স্থলর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-প্রধান রসোদ্যোগের রচনা—

“অবলা কি জানি গুণ ধরে ।

রসিক মুকুট-মণি                      নাগর হইয়া গো

এত না আদর কেনে করে” ॥ ৫ ॥ ( প-ক-ত, ৪৯৯ পৃঃ )

ইত্যাদি পদ কোনরূপেই চণ্ডীদাসের ঐ শ্রেণীর পদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ।

বিজ্ঞাপতি তাঁহার পদাবলিতে যে সকল সমমাত্রিক ও বিষমমাত্রিক স্তম্ভর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন—গোবিন্দদাসের পদাবলিতেও প্রায় সেই সমস্তই দেখা যায়,—তাহা ছাড়া হই একটি নূতন ছন্দও আছে ।

প্রথমতঃ—বিজ্ঞাপতির ষোড়শমাত্রিক চোপাই ছন্দাঙ্কক “শৈলব-যৌবন ছহঁ মিলি গেল” ইত্যাদির অনুকরণে লিখিত গোবিন্দদাসের—

“গুনইতে চমকই গৃহপতি রাব ।

তুয়া মঞ্জীররবে উনমতি ধাব ॥” ( প-ক-ত, ৩১ পৃষ্ঠা )

“সুসত নিয়াসে ধয়ল পহঁ পাণি ।

গোবিন্দদাসের পদাবলির ছন্দ

করে কর বারই তরল নয়ানী ॥” ( প-ক-ত, ৩২ পৃষ্ঠা )

ইত্যাদি পদগুলির ছন্দ প্রায় বিজ্ঞাপতির ছন্দের মতই নির্দিষ্ট বটে । এই ষোড়শমাত্রিক চোপাই

ছন্দ হইতেই বাঙ্গালা পসার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্তই আমরা বিশেষরূপে এই ছন্দটির আলোচনা করিব। এই ছন্দটি কোন সময় হইতে ভাষা-সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ চৌহান নৃপতি পৃথ্বীরাজের সভাসদ কবিচাঁদ বরদাই স্বরচিত “পৃথ্বী-রাজ-রাসো” নামক গ্রন্থে এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন।\*

ইহা হইতে প্রাচীনতম কোন ভাষা-কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং চৌপাই ছন্দের ইহাই প্রাচীনতম প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী রামায়ণের অধিকাংশই এই চৌপাই ছন্দে রচিত। আমাদের বিবেচনায় গীতগোবিন্দের “স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।

সা মনুতে ক্লশতমুরিব ভাবম্ ॥”

ইত্যাদি কতিপয় বোড়শমাত্রিক গীতের ছন্দ হইতেই এই হিন্দী ও মৈথিল চৌপাই ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গীতগোবিন্দের “রসিক-প্রিয়া” টীকার কবিতা নৃপতি কুন্তকর্ণ এই ছন্দটিকে “মাত্রা-চতুস্পদী” নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত “চতুস্পদী” শব্দের অপভ্রংশ—“চউপই” “চৌপাই” হইয়াছে।

এই মাত্রা চতুস্পদীর সহিত সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বর্ণিত পঞ্জাটিকাছন্দের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃত পঞ্জাটিকাছন্দের প্রত্যেক চরণে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম নাই। মোটের উপর চতুস্খাত্রিক গণ বা অংশ বিভাজ্য ষোলমাত্রা ও প্রত্যেক দুই দুইটি চরণে অক্ষরের মিল (rhyme) থাকিলেই হইল, কিন্তু প্রত্যেক চরণের শেষ চারিটি মাত্রা—চারিটি লঘুবর্ণে গঠিত না হইয়া হয় দুইটি গুরুবর্ণ না হয় একটি গুরুবর্ণ ও দুইটি লঘুবর্ণে গঠিত হওয়া আবশ্যক। হিন্দি, মৈথিল ও ব্রজবুলির চৌপাই ছন্দেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। সংস্কৃত পঞ্জাটিকাছন্দটি যে আখ্যা প্রভৃতি অগ্ৰান্ত মাত্রাবৃত্ত হইতে আধুনিক, ইহার প্রমাণ এই যে আমরা কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যে কুত্ৰাপি এই ছন্দের ব্যবহার পাই নাই। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুগগের আমরা ইহার প্রথম ব্যবহার দেখি। মোহমুগগের “মা কুরু ধনজন যৌবনগর্ভং”

ইত্যাদি শ্লোকগুলি এতই প্রচলিত যে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা

বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য বৃষ্টির অষ্টম শতাব্দীর লোক, সুতরাং এই শতাব্দীতে কিবা তাহার কিছুপূর্ব হইতেই এই ছন্দটি প্রচলিত হইয়াছে, জানা যায়। সংস্কৃত মাত্রাছন্দের অধুকেরণে হিন্দী ভাষায় যে লোহা, চৌপাই ইত্যাদি মাত্রাছন্দ প্রচলিত হইয়াছে—তাহাতে একটি গুরুবর্ণ দুইটি লঘুমাত্রার সমান—এই সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের নিয়মটি রক্ষিত হইয়াছে—কিন্তু মৈথিল ভাষাতেই ঐ নিয়মের

\* খারাপসীর “মেডিকেল হল” গ্রন্থে বৃত্তিত, পঞ্চদশশতাব্দীর সভা হইতে প্রকাশিত “পৃথ্বীরাজ রাসো” গ্রন্থের ২য় অঙ্কের ৪৪ পৃষ্ঠায় “হরি মুনিবচন মোগ বন ইবং।” ইত্যাদি উক্ত্য।



কিছু ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপতির ছন্দে কৃতশ্রম ব্যক্তিমাগ্নেই অবগত আছেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলিতে অনেক স্থলে “আকার” “একার” “ওকার” প্রভৃতি গুরুস্বর বর্ণগুলিও লঘুবর্ণের স্থায় উচ্চারিত হয়, দৃষ্টান্তের ~~আ~~ আমরা বিজ্ঞাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

“শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ ।

আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম ।

হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম ॥

পরশিতে দুহঁ করে বারধি পাণি ।

মৌন করবি পহঁ করাইতে বারী ॥

যহ হাম সোঁপব করে কর আপি ।

সাধসে ধনবি উলটি মোহে কাঁপি ॥

বিজ্ঞাপতি কহ ইহ রণ ঠাট ।

কামগুরু হঠ শিপায়ব পাঠ ॥” (প ক ত ৪৩ পৃষ্ঠা )

এই পদটির প্রথম ছত্রের লঘু গুরু উচ্চারণ ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছত্রের “আজু হাম” ও “তোহে” শব্দের সমস্ত দীর্ঘ স্ববর্ণগুলি হিন্দির ধরণে গুরু উচ্চারিত না হইয়া বাঙ্গালার স্থায় লঘু উচ্চারণ করিতে হইবে, নতুবা ছন্দঃপতন অনিবার্য। তৃতীয় ছত্র ঠিক আছে। চতুর্থ ছত্রের “হেরইতে” ও “পিয়া” শব্দের দীর্ঘস্বরগুলি হ্রস্ব উচ্চারিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞাপতির প্রত্যেক পদেই পাঠক এইরূপ স্বেচ্ছাধীন লঘুগুরুবর্ণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। বিজ্ঞাপতির মৈথিল পদাবলির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ গিয়াসদ্ সাহেব ও বঙ্গীয় পদাবলির সম্পাদকগণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। বিজ্ঞাপতির মৈথিল পদাবলি ও তদনুরূপিত বাঙ্গালার ব্রজবুলিতে এইরূপে লঘুগুরুবর্ণের উচ্চারণভেদ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইলেও বাঙ্গালা ভাষার যে কারণেই হউক—সংস্কৃতভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়াছে, দেখা যায়। চোপাইর সহোদর বাঙ্গালা পয়ার বখন প্রথম প্রচলিত হইল, তখন মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পয়ারের প্রত্যেক চরণের অক্ষরসংখ্যা কঠিন কম বেশী করা হইত—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে মাত্রার হিসাবে গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণের উচ্চারণ বখন সমান দাঁড়াইল—তখন পয়ারের প্রত্যেক চরণের ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হিন্দী ও মৈথিল চোপদীর অনুকরণে ছন্দের ভঙ্গী রক্ষার জন্য শেষ চারি মাত্রার পরিবর্তে দুইটি দীর্ঘস্বর রাখিয়া বাকি সব মাত্রার পরিবর্তে লঘুগুরু-নির্বিণ্ণেবে চারটি অক্ষর—অর্থাৎ মোটের উপর চৌদ্দ অক্ষরের পুয়ারই ঐ পয়ারের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে শেষ দুইটি অক্ষর সর্বদা গুরু থাকারও আবশ্যকতা রহিল না। এই ১৪ অক্ষরী পয়ার এক দিনে হয় নাই—

মাত্রাচতুশ্চরী হইতে  
পয়ারের উৎপত্তি

ক্রমপরিবর্তনের কালে—সংস্কৃত পঙ্খটিকা ছন্দ হইতে হিন্দি ও  
মৈথিল চৌ-পাইত্রীর ভ্রায় বাঙ্গালা পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। “বঙ্গ-

ভাষা ও সাহিত্য”-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়—সংস্কৃত অমুঠুপ্ ছন্দের শ্লোক হইতে  
বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি হওয়া অনুমান করিয়াছেন—কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে  
কোনই আলোচনা করেন নাই। আমরাদিগের মতে অক্ষর-বৃত্ত অমুঠুপ্ ছন্দ মাত্রা-বৃত্ত  
প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্। অমুঠুপ্ ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি কোন  
মতেই স্থির করা যাইতে পারেনা। অমুঠুপ্ ছন্দ হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইলে অমুঠুপ্  
ছন্দের ভ্রায় পয়ারে ষোলটি কিম্বা অন্ততঃ চৌদ্দটি অক্ষরের সংখ্যা ঠিক থাকিত—কিন্তু কুন্তিবাস  
ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের পয়ারে অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা আছে কি? কিন্তু  
তাই বলিয়া চণ্ডীদাসের,—“ভাল হৈল আরে বাবু আই-লা সকালে” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের  
নিম্নলিখিত পংক্তি গুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি?

“সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।

এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে ॥

চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।

চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না গুচে ॥”

ইত্যাদি শ্রুতিমধুর পংক্তিগুলিতে ছন্দ পতন হইয়াছে, নিতান্ত বেতালা লোক ছাড়া অল্প  
কেহ একথা বলিতে পারেন কি? বস্তুতঃ এখানে উদ্ধৃত ছত্রগুলির অক্ষরসংখ্যা যাহাই  
থাকুক, তাহাতে মাত্রার পরিমাণ ঠিক থাকায় ছন্দ পতন না হইয়া—উহা নিতান্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন  
হইয়াছে। কুন্তিবাসের সুবিখ্যাত “অঙ্গদ রায়বারের” ছন্দও এইরূপ মাত্রা বৃত্ত বটে আমরা  
“মাত্রা-ত্রিপদী” ছন্দের গুণসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব।

ষাদশ মাত্রিক চৌপাই ছন্দ

একবার ষোড়শ মাত্রিক চৌপাই ছন্দের প্রচলন হইলে সেই  
দৃষ্টান্তে ষাদশ-মাত্রিক চৌপাইও রচিত হইতে লাগিল। যথা,—

বিজ্ঞাপতির পদাবলিতে—

“এ ধনি কর অবধান।

তো বিহু উনমত কান ॥

কারণ বিহু কশে হাস।

কি কহসে গদগদ ভাষ ॥” ( প-ক-ত, ৭২ পৃঃ )

গোবিন্দ দাসের যথা,—

“গহন বিষহ গহ লাগি।

রজনী পৌহায়ই জাগি ॥

করতহি ভৌহারি ধোয়ান।

তো বিহু আকুল কান ॥” ( প-ক-ত, ৭০ পৃঃ )

ষোড়শ ও দ্বাদশ মাত্রায়ক চোপাই ছন্দের মিশ্রণে বিষম-পদী চোপাই হইয়াছে।

বিষ্ণুপতির যথা:—

“শুন শুন গুণবতি রাধে।

বিষমপদী চোপাইছল

মাধব বধিলে কি মাধাবি সাধে ॥

চাঁদ দিশতি দীনচীনা।

“সোপ্ন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা” ॥ ইত্যাদি (প-ক-ত ৭০ পৃঃ)

গোবিন্দদাসের যথা:—

“হের তৈতে হেরি না হেরি।

পুছইতে কহই না কহ পুন বেবি ॥

চতুর সখী সঞে বসই।

রস-পরিহাসে হসই না হসই—” ইত্যাদি (প-ক-ত ৬৬ পৃঃ)

এই বিষমপদী চোপাই ছন্দে অযথা পংক্তিগুলিতে বার মাত্রা ও দুই পংক্তিগুলিতে বোল মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়।

আমরা বিষ্ণুপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক চোপাই ছন্দের উদাহরণ দিয়াছি, ত্রিমাত্রিক চোপাই ছন্দের ২১টি দৃষ্টান্ত দিব এবং এই ত্রিমাত্রিক চোপাই হইতেই যে বাঙ্গালা একাবলি ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইব। যদিও চতুষ্পদী বা চোপাই ছন্দের চবণ-

ত্রিমাত্রিক চোপাই ছন্দ

গুলি চতুর্মাত্রিক চারিটিগণ বা অংশে বিভাজ্য বলিয়াই এই ছন্দের

নাম প্রথমে চতুষ্পদী বা চোপাই হওয়া অনুমান হয়, কিন্তু যখন

বিষ্ণুপতি ও গোবিন্দদাসের চতুর্মাত্রিক তিনটি গণবিশিষ্ট দ্বাদশ মাত্রায়ক—ছন্দকেও উপ-যুক্ত নামান্তরের অভাবে চোপাই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে—ত্রিমাত্রিক চারিটি গণে বিভাজ্য, নিম্নলিখিত ছন্দটিকেও আমরা ত্রিমাত্রিক চোপাইই বলিব। চতুর্মাত্রিক চোপায়ের রীতি অনুসারে এখানেও শেষ তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি লঘু বর্ণ ব্যবহার না করিয়া চরণের সর্বশেষ বর্ণটির গুরু কি লঘু উচ্চারণ করা ছন্দঃশাস্ত্রকাবগণের মতে ইচ্ছাধীন বিষয় দুইটি গুরু বর্ণ কিম্বা একটি গুরু ও একটি লঘু বর্ণে শেষ তিন মাত্রা গঠিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই ত্রিমাত্রিক ছন্দের পদ-রচনায় কি বিষ্ণুপতি কি চণ্ডী দাস অক্ষরের লঘুগুরু উচ্চারণ প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রায় সর্বত্রই লঘুগুরুনির্বিশেষে তিনটি অক্ষর তিন মাত্রা ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কেবল পাশাপাশি দুইটি গুরুবর্ণ ব্যবহার করেন নাই।

বিষ্ণুপতির ত্রিমাত্রিক ষোড়শ মাত্রায়ক চোপাই যথা:—

“আজি কেন তোমায় এমন দেখি।

সবনে হুগিছে অরুণ আখি ॥

ক্লান্ত মোড়া দিয়া কহিছ কথা।

না জানি কহিলে কি ভেল ব্যথা ॥

স্বপ্নে গগণে গনিছ তারা ।

দেব অবধাত হৈয়াছে পারা ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১৬৯ পৃঃ )

গোবিন্দদাসের যথা :—

“একলি যাঠিতে বয়না-ঘাটে ।

পদচিহ্ন মোব দেগিয়া কাটে ॥

প্রতিপদ-চিহ্ন চুম্বিয়ে কান ।

তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ৫০৮ পৃঃ )

বিজ্ঞাপতি ও গোবিন্দদাসের ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দ পরবর্তী সময়ে একাবলী ত্রিমাত্রিক চৌপাই হইতে ছন্দনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞাপতিব—“আজি কেন একাবলী ছন্দের উৎপত্তি তোমায় এমন দেখি ।” ইত্যাদির ছন্দেব সহিত ভারতচন্দ্রের—“একি লো মালিনি কি তোর বাতি” ইত্যাদি বিজ্ঞাব সুমিষ্ট ভৎসনার ছন্দের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে বিজ্ঞাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ছন্দে আমরা সর্বত্র বর্ষ ও নবম অক্ষরের পর যতি অর্থাৎ ৬ + ৩ + ৩ = ১২ অক্ষর দেখিতে পাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের একাবলীতে ৬ + ৩ + ৩ = ১২ অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন পংক্তিতে ৬ + ২ + ৩ = ১১ + কিম্বা ৫ + ৪ + ২ = ১১ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়, যথা,—

“নহে মাজা ক্ষীণ কুচ কঠোর ।”

“সুন্দর পড়িল প্রেম-তবঙ্গে ॥” বিজ্ঞাসুন্দর ।

নিয়মের কঠোরতার পরিবর্তে শিথিলতার দিকে গতিই অপভ্রংশভাষা ও ছন্দ আদির উৎপত্তির মূলসূত্র বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদগণ নির্দেশ করেন, সুতরাং এস্থলেও সেই সাধারণ নিয়মের ক্ষিয়া বশতঃই যে ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের ষষ্ঠ ও নবম অক্ষরের শেষের যতিটি উঠিয়া বাইরা উহা বর্তমান একাবলীছন্দে পরিণত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা দ্বারা ঐ ছন্দ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-গণের ত্রিমাত্রিক চৌপাই ছন্দের স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্যের যে হানি হইয়াছে, তাহা উত্তরবিধ ছন্দের কবিতা পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে। নবম অক্ষরের পর যতির অভাব বয়ঃ কথঞ্চিৎ সহনীয়, কিন্তু বর্ষ অক্ষরের পর যতি না দিয়া পঞ্চম অক্ষরের পর যতি দেওয়ায় “মাতিল বিজ্ঞা বিপরীত রঙ্গে” চরণটি যে কিরূপে শ্রুতিকটু হইয়াছে, তাহা কেবল অমুভব দ্বারাই জ্ঞেয় বটে।

গোবিন্দদাস আরও এক প্রকার ষোড়শ মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত

তোটকছন্দ

ছন্দঃশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ‘তোটক ছন্দ’। তোটকে ৩ মাত্রা চতুশদীর

তায় প্রত্যেক চরণে চারিটি চতুর্মাত্রিক গণে বিভাজ্য ষোল মাত্রা

আছে কিন্তু ইহার সকল চতুর্মাত্রিকগণ বা অংশগুলিই দুইটি লঘুবর্ণ = পয়ে একটি গুরুবর্ণ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ইহার অক্ষরসংখ্যা  $৩ \times ৪ = ১২$  নির্দিষ্ট থাকায় ইহা ছন্দঃশাস্ত্রে অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে লঘুগুরুভেদে

অক্ষর বিজ্ঞাস ব্যতীত তোটক ছন্দ হইতে পারে না। ব্রজবুলীতে প্রায় সর্বত্র অক্ষরের লঘুগুরু ভেদ রক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং তোটকছন্দটি ব্রজবুলীর পক্ষে নিতান্ত অমুকুল সন্দেহ নাই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পদাবলি-সাহিত্যে তোটক ছন্দের দৃষ্টান্ত অধিক নাই, আমরা বিজ্ঞাপতির পদাবলিতে তোটকছন্দ খুঁজিয়া পাই নাই। পদকল্পতরুর সংগৃহীত গোবিন্দদাসের সাড়ে চারিশতের অধিক পদাবলির মধ্যে আমরা একটি মাত্র তোটক ছন্দের পদ পাইয়াছি। এই পদের অনেক স্থলেই তোটকের নিয়মানুযায়ী লঘুগুরু উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখা যায়। গোবিন্দদাসের গ্রাম সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে সামান্য একটি তোটকছন্দের রচনার অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করিবেন, ইহা অসম্ভব, সুতরাং লিপিকরদিগের দোষে ঐ পদটিতে অনেক অন্তর্ভুক্তিপ্রবেশ করিয়াছে, কিম্বা ব্রজবুলীতে ঠিক সংস্কৃতের গ্রাম স্বরবর্ণের লঘুগুরু উচ্চারণ বিধেয় নহে, এই বিবেচনার গোবিন্দদাস ইচ্ছা করিয়াই উচ্চারণবিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা এই উভয় বিধ কারণই এস্থলে কাব্যিকর হইয়াছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত গত্যাগুর দেখা যায় না।

ঐ পদটি হইতে লিপিকরদিগের লিখাব দোষ এবং গোবিন্দদাসের সময়ের উচ্চারণপদ্ধতি নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে, এজন্ত আমরা সম্পূর্ণ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ধনী কানড়া ছান্দে বাধে কবরী।

নব মালতী মাল তাহে উপরি ॥

দলিতাজন গঞ্জ কলা কবরী।

থেনে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥

ধনি সিন্দূর বিন্দু ললাট বনি।

অলকা বলকে তর্জি নীলমণি ॥

তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ডাণ্ড পাতা।

ভূরু ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা ॥

নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।

তাহে কাজরশোভিত নীল ছটা ॥

তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা।

কনকাতি ভাতি বলকে মুকুতা ॥

ধনী সুন্দর শারদ ইন্দু-মুখী।

মধুরাধর পল্লব বিষ লধি ॥

গলে মোতিম হার সুবঙ্গ মালা।

কুচ্ কাকন শ্রীফল তাহে খেলা ॥

নর বৌবম তার ভরে গুরুমা।

ভর্জি অঙ্কে স্থলেশন গরু চুমা ॥

ক্ষীণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী ।  
 কটি কিঙ্কিনী জারু হেমকদলী ॥  
 পদ পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা ।  
 মণি-মঞ্জীব তোড়ল মল্ল পাতা ॥  
 নখ-চন্দ্র ছটা বলকে অমুপাম ।  
 হেরি গোবিন্দদাস তহি পরণাম ॥”

প্রথম পংক্তির ‘কানড়া’ সম্ভবতঃ ‘কানড়’ ছিল। লিপিকর দোষে “কানড়া” হইয়াছে।  
 কবরীর উপমা-স্থল ‘কানড়’ সর্প-বা পুষ্পবিশেষ, যাহাই হউক না কেন—পদাবলি-সাহিত্যে  
 ‘কানড়া’ ও “কানড়” উভয় পাঠই দেখা যায়। ‘কানড়া’ যথা :—

“কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ থানি  
 তিলেক নয়নে যদি লাগে” ( প-ক-ত ৫৮২ পৃঃ )  
 “কানড় কুসুম হেরি শর্চা নন্দন  
 করতলে মুখশর্শা আপি ।” ( প-ক-ত ১১৭ পৃঃ )

কানড়া যথা :—

‘কানড়া ছান্দে কবরী বান্দে  
 নব মল্লিকার মালে ।” ( প-ক-ত-১৫৪ পৃঃ )

এখানে ‘কানড়’ না হইয়া ‘কানড়া’ হইলে ছন্দঃপতন হয়, সুতবাং ‘কানড়’ শুদ্ধ পাঠ জানা  
 যাইতেছে।

সেইরূপ প্রথম পংক্তির ‘ছান্দে’ শব্দের স্থলে ‘ছান্দ’ শুদ্ধ পাঠ জানা যাইতেছে—কারণ  
 বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তিব ‘একার’ হিন্দী ; মৈথিল ও ব্রজবুলীতে এমনি অনেক সময়ে লোপ  
 হইতে দেখা যায়—ছন্দের ক্ষত কথাই নাই। লিপিকারগণ বোধ হয় তাহা অন্তর্জ্ঞ ভাবিয়া  
 ‘একার’ যোগ করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ ‘একার’ যোগ করায় উদ্ধৃত পদটির নিম্নলিখিত  
 স্থানগুলিতে ছন্দঃপতন ঘটিয়াছে। যথা—

‘থেনে উচ্চ বৈঠে তাহে ভ্রমরা’ স্থলে হইবে ‘খন উঠত বৈঠ তহি’ ভ্রমরা’। ‘তহি অঙ্গে  
 স্নলেপন গন্ধ চুয়া’ স্থলে হইবে ‘তহি অঙ্গ স্নলেপন গন্ধ চুয়া’। ‘পদপঙ্কজ পাশে শোভে  
 আলতা’ স্থলে হইবে “পদ পঙ্কজপাশ শুভে আলতা” ইত্যাদি ইত্যাদি।

‘থেনে,’ ‘বৈঠে,’ ‘অঙ্গে’ ও ‘পাশে’ শব্দগুলির স্থলে ‘খন’ ‘বৈঠ’ ‘অঙ্গ’ ও ‘পাশ’ শব্দের  
 প্রয়োগ যে অন্তর্জ্ঞ নহে তৎসম্বন্ধে পদাবলি-সাহিত্য হইতে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পারে।  
 এইরূপ লিপিকারদোষে তহি’ স্থলে ‘তাহে’ ‘খিন’ স্থলে ‘ক্ষণ’ লিখিত হওয়ার অষ্টাদশ ও  
 ঊনবিংশ চরণে ছন্দঃপতন হইয়াছে। এইরূপ অত্রান্ত ভুলগুলিও প্রায় সমস্তই লিপিকারদোষে  
 সংঘটিত হইয়াছে। বাহ্যাবশতঃ আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইলাম না।

মাত্রা চতুস্পদী বা চৌপাই ছন্দের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া আমরা এক্ষণ গোবিন্দ দাসের

মাত্রা ত্রিপদী ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু তৎপূর্বে গোবিন্দদাসের পয়ারছন্দের ২১১টি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যিক।

চণ্ডীদাসের পয়ার যেমন চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডিতে আবদ্ধ নহে, গোবিন্দদাসের পয়ারও সেই রূপ বটে ;—তবে চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসে চৌদ্দ অক্ষরী নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক কম দেখা যায়।

“গোলক ছাড়িয়া পহ কেন বা অবনী।

কালারূপ কেন হল গোরাবরণ থানি ॥

হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহ কান্দে।

না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম কান্দে ॥” (প-ক-ত-১৫৭৮ পৃঃ)

ইত্যাদি পদের দ্বিতীয় পংক্তিতে ১৫ অক্ষর ও তৃতীয় পংক্তিতে ১৩ অক্ষর আছে দেখা যায়—কিন্তু উভয় স্থলেই চৌপাই এর নিয়মানুযায়ী মাত্রা ঠিক আছে—ইতরাং ছন্দঃপতন বা শ্রুতিকটুত্ব ঘটে নাই। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিলে চৌপাই ছন্দ হইতে বর্তমান পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারেনা।

বাক্সলা অক্ষর-বৃত্তের নিয়মানুযায়ী দশঅক্ষরী পয়ার ও গোবিন্দদাসের পদাবলিতে দৃষ্ট হয় যথা :—

“এই ত বিরদা-বন পথে।

গোবিন্দের দশ অক্ষরী পয়ার।

নিতি নিতি করি গতায়তে ॥

হাতে ধরি লই যাই সোণা।

তুমি কে না কহে কোন জনা ॥” ইত্যাদি (প-ক-ত-২৭৪ পৃঃ)

মাত্রা ত্রিপদীছন্দের সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে এই ত্রিপদী নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ছন্দটিও যে খুব প্রাচীন তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ত্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতকবিগণের কাব্যে এই ছন্দের কোন ব্যবহার দেখা যায় না।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের “ললিত-লবঙ্গ-লতা পরিলীলন-  
মাত্রা ত্রিপদীছন্দ।

কোমল-মলয় সমীরে” “চন্দন-চর্চিত-নীল কলেবর-পীত-বসন

বনমালী” “রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহরবেশং” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ স্তমধুর গীত-সমূহে আমরা সর্ব-প্রথমে এই ছন্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এই ত্রিপদী মাত্রা অনুসারে গঠিত বলিয়া অক্ষরসংখ্যার স্থিরতা নাই এবং মাত্রা অনুসারে বিভাগ করিলে অনেক স্থলেই শব্দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না বলিয়া বাক্সলা ত্রিপদীর নিয়মানুসারে পংক্তিগুলি তিন থাকে লিখিত না হইয়া এক থাকে কিম্বা দুই থাকে লিখিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বলে “ললিত লবঙ্গ-লতা” ইত্যাদি পংক্তিটি গ্রহণ করা যাউক। মাত্রা অনুসারে এই পংক্তিটি তিন থাকে লিখিতে গেলে এইরূপ হয়, যথা:—

“ললিত লবঙ্গ-

লতা-পরিশীলন

কোমল-মলয়-সমীরে ।”

এই ভাবে লিখিলে শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অর্থ-প্রতীতির নিতান্ত ব্যাঘাত করে । কিন্তু মাত্রা-ত্রিপদী যে চতুর্মাত্রিক সাতটি গণ বা অংশ বিভাজ্য তাহার চারিটি গণের পরে অর্থাৎ ষোল মাত্রার শেষে সর্বত্র যতি থাকায় এই পংক্তিগুলি ছুই থাকে স্বচ্ছন্দে লিখা যাইতে পারে যথা—

“ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন

কোমল-মলয়-সমীরে ।” ইত্যাদি

এস্থলে বলা আবশ্যিক যে বিনা প্রয়োজনে পরবর্তী ত্রিপদীর পংক্তিগুলি তিন থাকে লিখা হয়নাই । আমরা গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই যে, জয়দেব তাহার মাত্রা-ত্রিপদীতে কোন কোন স্থলে প্রত্যেক চয়নের অংশগুলির মধ্যে মিত্রাক্ষর (Rhyme) ব্যবহার করিয়াছেন যথা—

“রতি-সুখ-সারে গতমতিসাবে

মদন-মনোহর-বেশং ।”

বলাবাহুল্য যে এক্রপস্থলে পংক্তিটি তিন থাকে লিখিত হইলেই পড়িবার ও দেখিবার পক্ষে ভাল হয় ; কিন্তু সংস্কৃতরচনায় এইরূপ মিত্রাক্ষরযোজনা কবা নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় জয়দেবের কোন গীতেই আগাগোড়া এইরূপ মিত্রাক্ষর রক্ষিত হয় নাই । দৃষ্টান্তস্থলে গীতগোবিন্দের

“সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে

চুষন-বলিতাধরে ।

মৃগমদ-তিলকং লিখতি সপ্লবকং

মৃগমিব রজনীকরে ॥”

ইত্যাদি গীতটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই মাত্রা ত্রিপদীর আটটি কলিতেই মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেবের ন্যায় কবিও হীন-মিগন ছাড়াইতে পারেন নাই । যথা—

“মনিসর মমলং তারক-পটলং”

“ঘনচয় রুচিরে রচয়তি চিকুরে”

“মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং” ইত্যাদি ।

জয়দেবের অল্পকরণে বিভ্রাপতি যে মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে মিত্রাক্ষরতা রক্ষার জন্য সমধিক চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও তাহার অভাবই সাধারণ নিয়ম বটে । গোবিন্দদাসের সর্ষক্কেও এই কথাই বলা যাইতে পারে । সে যাহা হউক, যেমন মাত্রা-চতুস্পদীর শেষ চারিমাত্রাস্থলে চারিটি লঘু বর্ণ ব্যবহার না করিয়া প্রায় সর্বত্র দুইটি গুরুবর্ণ এবং কচিং একটি গুরু ও দুইটি লঘুবর্ণ ব্যবহার করিতে দেখা যায়, মাত্রা-ত্রিপদীতে তাহা অবিকল দুই হয় । কিন্তু [ সংস্কৃত মাত্রা-চতুস্পদী ] মাত্রা ত্রিপদীর প্রত্যেক পংক্তির



শেষ চারিমাাত্রার সম্বন্ধে এই নিয়মের সৃষ্টি হয় তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদগারের ব্যবহৃত পদ্যটিকা কিম্বা জয়দেবের ব্যবহৃত মাত্রা-চতুষ্পদী সর্বত্রই দুই দুইটি পংক্তির শেষে মিত্রাক্ষরতা দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের সনাতন নিয়ম “নাপদং প্রযুক্তীত” অর্থাৎ বিভক্তি ছাড়া শব্দ প্রয়োগ করিবেন না। অধিকাংশ সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দ প্রথমা বিভক্তিতে ‘ং’ ‘ঃ’ যুক্ত, “আকারান্ত” কিম্বা “ঈকারান্ত” হয়—বিশেষ্য শব্দের বিতস্ত্যন্ত রূপ সেইরূপ। ‘ং’ ‘ঃ’ যুক্তবর্ণ, আকারান্ত ও ঈকারান্তবর্ণ চন্দঃশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ‘গুরু’ বলিয়া গণ্য হয়, স্ততবাং চারিমাাত্রার মধ্যে একটি গুরুবর্ণ দুইমাাত্রা পরিমিত হইলে বাকী দুই মাাত্রা স্থলে একটি গুরুবর্ণ কিম্বা দুইটি লঘুবর্ণ বাতীত আব কিছু হইতে পারে না। স্ততবাং প্রথমে ব্যাকরণেব নিয়মবক্ষ্যাব জ্ঞাত এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও ক্রমে তাহা অভ্যাসবশে নিয়মে পরিণত হওয়ার প্রতিমধুব বোধ হয় এবং কোনস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্ণপীড় উৎপাদন করে, এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; বস্তুতঃ, যে কারণেই এই নিয়ম প্রচলিত হউক না কেন, জয়দেবের মাত্রা ত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত মৈথিল মাত্রা-ত্রিপদী ও হিন্দী ‘সবাই’ ছন্দেও এই নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে, এবং সেই দৃষ্টান্তেই যে বর্তমান বাঙ্গালা ত্রিপদীর শেষ চতুর্য়্যাত্তিক গণটি দুইটি বর্ণদ্বারা গঠিত হওয়ার নিয়মে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনট সন্দেহ নাই। মাত্রা-ত্রিপদীর প্রতিচরণে অক্ষর-সংখ্যাব স্থিতি নাই—মোটের উপর আটাইশ মাত্রা হইলেই হউল।

বাঙ্গালা ছন্দে বর্ণের লঘু গুরু পর্ত্তব্য নহে—স্ততবাং ১৮ মাাত্রায় ২৮টি অক্ষর ধরিয়া দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ৮+৮+১২=২৮ অক্ষর ব্যবহৃত দেখা যায় এবং পূর্বোক্ত কারণে উহা তিন থাকে লিখা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা কবি চণ্ডীদাস প্রভৃতির দীর্ঘ-ত্রিপদী-ছন্দের আলোচনা করিলে বর্তমান সময়ের নির্দিষ্ট ২৮ অক্ষরস্থলে কতিং কম বেশীও দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন পয়ারে কম বেশীর স্থায় মাত্রা গুরু বলিয়া তাহা ছন্দোভ্রষ্ট বা ঐতি-কটু নহে। ছন্দেব অক্ষরের এই কমী বেশীর জ্ঞাত প্রাচীন কবিদিগের প্রতি অসন্দেহ না হইয়া কৃতজ্ঞ হওয়াই সঙ্গত—কারণ এই কমী বেশীট বাঙ্গালা ছন্দের আকারের দিকে যেন অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আমাদিগেব মনোযোগ পরিচালিত করিতেছে। মাত্রা-ছন্দ হইতে বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা মৈথিল “মাত্রা-ত্রিপদী” ও হিন্দী ‘সবাই’ ছন্দের ২১টি উদাহরণ দেখাইয়া গোবিন্দ-দাসের নানাবিধ ত্রিপদীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্বাপতির মাত্রা-ত্রিপদী যথা,—

“আজু রজনী হাম                      তাগে পোহারু”  
পেথরু পিয়া মুখ-চন্দা।

জীবন-যৌবন                      সকল করি মানহু”

দশদিশ তেল আননা ॥” ইত্যাদি (প-ক-৩ ১৪০৪)

ধূয়ার গঠনে একটু বিশেষত্ব আছে। তাহাতে চারি চরণের পরিবর্তে প্রায় সর্বত্রই গীতগোবিন্দের অনুকরণে তিনটি চরণ দেখা যায়।

গীতগোবিন্দের ধূয়া যথা,—

“বিরহতি হরিরিহ সরস-বসন্তে  
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি  
বিরহি-জনন্তু ছরন্তে ॥”

বিদ্যাপতির ধূয়া ;—

“সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘ-মালা-সঞে তড়িত-লতা জন্ম

হৃদয়ে শেল দই গেল ॥” ( প-ক-ত ১৪৫ পৃষ্ঠা )

গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণও প্রায় সর্বত্রই এই প্রণালীরই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ত্রিপদী যথা ;—

“বিদ্যাপতি-পদ-মুগল-সরোরহ

নিসান্দিত-মকরন্দে।

তছু মঝু মানস মাতল মধুকর

গিবইতে কর অনুবন্ধে ॥

হরি হরি আব কিরে মঙ্গল জোয়।

‘রসিক-শিরোমণি নাগর নাগরী

লীলা ক্ষুরব কি মোয় ॥ ৫ ॥” ( প-ক-ত ৯পৃষ্ঠা )

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলিতে চতুর্মাত্রিক অষ্টাবিংশ মাত্রায়ক ত্রিপদীই অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে অন্তবিধ বিচিত্র বিচিত্র মাত্রা-ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। জয়দেবের ত্রিপদীছন্দ সুবিখ্যাত—

“বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কোমুদী

হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরং।

ক্ষুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা

রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥”

ইত্যাদি গীতের তিন থাকে লিখিত চরণের মোট ৩৪টি মাত্রা ও তাহার নিম্নলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয় যথা—

২+৩+২+৩      ২+৩+২+৩

২+৩+২+৩+২+২

শেষের চারিমাত্রা কিন্তু সেই ছটি গুরুবর্ণেই ঘটিত বটে। চতুর্মাত্রিকগণের পরিবর্তে এইরূপ ঝাঁপতালের দ্বারা পঞ্চমাত্রিকগণ ব্যবহৃত হওয়ায় এই গীতের ছন্দটি কিরূপ চমৎকার বৈচিত্রবৃত্ত হইরাছে, তাহা হক্সোজ পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

বিদ্যাপতির উদ্ভাবিত ২১টি নূতন ছন্দও অতি সুন্দর। একটির নমুনা দেখুন—

“এ সখি হামারি ছুথের নাহি ওয়।

এ ভরা বাদর                      মাহ ভাদর

শুন মন্দির যোর ॥৩॥

ঝড়া ঘন গর-                      জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিখণ্ডিয়া।

কান্ত পাহন                      কাম দারুণ

সঘনে খর-শব হণ্ডিয়া ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১২৪৮ পৃষ্ঠা )

এই মাত্রাধিপদীর ধূয়া ছাড়া অজ্ঞাত কলিতে তিন থাকে লিখিত চরণে মোটে ২৫ মাত্রা ও তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়।—

৩+৪                      ৩+৪

৩+৪+৪

ইহার শেষ চারিমাত্রা আগে একটি গুরু ও পরে দুইটি লঘুবর্ণ দ্বারা গঠিত। ইহাতে শেষ চারি মাত্রা ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ তেওড়া তালের ছায় লয় প্রতীত হয়।

গোবিন্দদাসের নিম্নের পদটি প্রায় ইহার অনুরূপ, কেবল শেষ চারিমাত্রাস্থলে দুইটি গুরুবর্ণ আছে যথা—

“পরখি পেখলু”                      পুরুষ-উত্তম

পুরুষ পাহন জাতি।

প্যারি পামরী                      পিরিতি পারকে

পৈঠ পউগক ভাতি ॥” ( প-ক-ত ১২৫১ পৃঃ )

বিদ্যাপতির পদাবলিতে মাত্রা ত্রিপদী ব্যতীত প্রচলিত বাঙ্গালার ২৮টি অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদী দেখা যায় না, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে চণ্ডীদাসের অনুরূপে ২৮ অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদীও দৃষ্ট হয়, কিন্তু এস্থলেও ধূয়াতে চারি চরণের পরিবর্তে তিনটি চরণই প্রায়শঃ পাওয়া যায় যথা ;—

গোবিন্দদাসের দীর্ঘত্রিপদী—

“এইত মাধবীতলে                      আমার লাগিয়া পিয়া

যোগী যেন সদাই ধোয়ায়।

পিয়া বিনা হিয়া কেনে                      কাটিয়া না পড়ে গো

নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥

সখি হে বড় ছুঃখ রহল মরমে।

আশারে ছাড়িয়া পিয়া                      বধুরা রহল গিয়া

এই বিধি দিখিল করবে ॥ ৩ ॥

আমারে লইয়া সঙ্গে      কেলি-কোতুক-রঙ্গে  
ফুলতুলি ফিহরই বনে ।

নব কিশলয় তুলি      শেজ বিছায়ই

রস-পরিপাটীর কারণে ॥” ইত্যাদি ( প-ক-ত ১২০৮ পৃঃ )

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দের এই পদটি একাধারে সরল ভাষা ও গভীর ভাবের জন্য প্রশংসনীয় । এই পদের আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কবি খাটি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে যাইয়াও বেন নিজের অজ্ঞাতসারেই “রহল” “বিহরই” “বিছায়ই” প্রভৃতি ব্রজবুলি ত্রিগুণপদের ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন ; “কেলিকোতুক রঙ্গে” ও শেজ “বিছায়ই” বাক্য-দ্বয়ে অক্ষরের একটি দীর্ঘস্বরের মাত্রা দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছেন । বাঙ্গালা দীর্ঘত্রিপদী যে মাত্রা-ত্রিপদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাব উৎকৃষ্টতাব উদাহরণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ?

মাত্রা ত্রিপদী ও তদুৎপন্ন দীর্ঘ-ত্রিপদীর পরেই ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী ও তদুৎপন্ন বাঙ্গালা লঘু-ত্রিপদীর উল্লেখ করা সম্ভব । মৈথিল ও ব্রজবুলির মাত্রা ত্রিমাত্রিক ত্রিপদী ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদীর যে সম্বন্ধ-মৈথিল ও ব্রজবুলির ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদীর সহিত বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদীরও অবিকল সেই সম্বন্ধ ।

বিশ্বাপতির ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী যথা—

“সজনি না বোল বচন আন ।

‘ভাল ভাল হাম      অলপে চিকুন্ন

যেছন কুটিল কান ॥ ৫ ।

কাঠ কঠিন      করল মোদক

উপরে মাথিয়া শুড় ।

কনক কলস      বিথে পুরাইয়া

উপরে দুধক পূর ॥”

ত্রিমাত্রিক চোপাই ছন্দের স্থায় ত্রিমাত্রিক ত্রিপদীতেও প্রায়শঃই লঘুগুরুবর্ণের পার্থক্য আদৃত হয় নাই । এই রহস্তের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে যে, এই ছন্দের ত্রিমাত্রিক অংশ-গুলির জন্য সর্বত্র তিনটি লঘু বর্ণযুক্ত ক্রিয়া একটি গুরুবর্ণ ও একটি লঘুবর্ণযুক্ত শব্দ দু’জিয়া পাওয়া কঠিন, অতএব মৈথিল ও ব্রজবুলিতে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনেক পরিমাণে ইচ্ছাধীন বলিয়া বর্ণের লঘুগুরু বিচার না করিয়া তিনটি মাত্রার স্থলে তিনটি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । বস্তুতঃ, যে কারণেই বর্ণের লঘুগুরু উপেক্ষিত হউক না কেন, “কাঠ কঠিন করল মোদক” ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক ত্রিপদী হইতে লঘু পংক্তিতে “কাঠ” শব্দের দুইটি অক্ষরে তিনটি মাত্রা ধরা হইয়াছে ত্রিপদীর উৎপত্তি দেখিয়া এই ত্রিপদীর উৎপত্তি ও বে—ত্রিমাত্রিক মাত্রা ত্রিপদী হইতেই হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না । রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালাভাষার নিয়মাবলী

স্থলিত লঘু ত্রিপদী ছন্দ-রচনায় যিনি বিগত পাঁচশত বৎসরমধ্যে কাহারও নিকটে পরাস্ত হইবেন না, বাঙ্গালা কবিতাকুঞ্জের সেই বল-কণ্ঠ-কোকিল চণ্ডীদাসও সেইরূপ বিশ অক্ষরী লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতা রচনা করিতে যাইয়া যেন অজ্ঞাতসারেই লিখিয়া বসিয়াছেন—

“থীর বিজুরী                      বরণ গোরী  
পেখলু ঘাটের কূলে।

কানড়া ছান্দে                      কবরী বান্ধে  
নব মল্লিকাব মালে ॥” ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, সুমধুর লঘু ত্রিপদীর “থীর” “গোরী” “ছান্দে” ও “বান্ধে” শব্দগুলিতে প্রথম অক্ষরটি গুরুবর্ণ বলিয়া ছই মাত্রা ধরায় ও “গোরী” “ছান্দে” ও “বান্ধে” শব্দের শেষের “ঈকার” “একার” স্বৈচ্ছাক্রমে লঘু অর্থাৎ একমাত্রাপরিমিত গণ্য করায় ছন্দোভঙ্গ না হইয়া বরং তদ্বারা ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের “থীর বিজুরী” ইত্যাদি পদের অনুকরণে রচিত গোবিন্দদাসের—

“চিকণ কালা                      গলায় মালা  
বাজন নুপুর পায়।  
চুড়ার ফুলে                      ভ্রমর বুলে  
তেরছ নয়নে চায় ॥”

ইত্যাদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদটিতেও ঠিক ঐরূপ কোন স্থলে অক্ষর-সংখ্যার ও কোন স্থলে মাত্রার প্রতি সমানর দেখা যায়। কেহ মনে করিবেন না যে, এটি প্রচলিত ২০ অক্ষরী লঘুত্রিপদী নহে, ১৮ অক্ষরী কোন নূতন রকম লঘুত্রিপদীছন্দঃ হইবে, কারণ প্রথম কলিতে মাত্রার হিসাবে ১৮ অক্ষরের ব্যবহার হইয়া থাকিলেও অষ্টাশ্র কলিতে প্রচলিত ২০ অক্ষরের প্রয়োগ দেখা যায় যথা :—

“চাঁদ বলমলি                      ময়ূরের পাখা  
চুড়ায় উড়য়ে বায়।  
ঈষৎ হাসিয়া                      মধুর বাশরী  
মধুর মধুর গায় ॥” ইত্যাদি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, চণ্ডীদাসের বহুসংখ্যক লঘুত্রিপদীর পদে আধুনিক নিয়মিত অক্ষর-সংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা যায় না—কোতূহলী পাঠক পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার তৃতীয় পল্লবেস্ত ৬৭৮১০৭১১ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দোতাবিষয়ক অপূর্ব পদগুলি পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গোবিন্দদাসের বাঙ্গালা পদের সংখ্যাই অল্প, আবার তাহাতে পদ্যের দীর্ঘত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহারবশতঃ বাঙ্গালা লঘু ত্রিপদী পদের সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তথাপি আমরা তাঁহার ছই তিনটি পদে আধুনিক অক্ষর-সংখ্যার কোন ব্যতিক্রম পাই নাই। সুতরাং স্বরূপ তাঁহার

“এই মনে বনে দাসী হইয়াছে  
ছুইতে রাধার অঙ্গ।” ইত্যাদি ( প-ক-ত ৯৭৫ পৃঃ )

“কাহারে কহিব কাহুর পিরীতি  
তুমি সে বেদনী সহ।” ইত্যাদি ( প-ক-ত ৫০৬ পৃষ্ঠা )

গোবিন্দদাসের লঘুত্রিপদী  
পদ দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গোবিন্দদাসকে পদাবলির প্রায় সর্বত্র বিজ্ঞাপিত হইতে অমূল্য করি-  
তেই দেখিয়াছি, কিন্তু গোবিন্দদাসের গ্রাম শক্তিশালী কবি কেবল উত্তম অমূল্য করিতে  
পারিয়াই সম্বলিত থাকি। সম্বলিত নহে, তাই আমরা দেখিতে পাই তিনি প্রাচীন মাত্রা ত্রিপদী  
ছন্দের ২৮ মাত্রার স্থলে চারিমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ঐ ছন্দের নূতন আকার প্রদান করিয়াছেন  
যথা ;—

গোবিন্দদাসের উদ্ভাবিত  
নূতন মাত্রা-ত্রিপদী হলা কাল-বধন বসন মলোরম

অলিকুল-মিলিত-ললিত-বনমালা ॥” ( প-ক-ত ১৬৯৭ পৃঃ )

যেহেতু ২৮ অক্ষরী মাত্রা ত্রিপদী হইতে বর্তমান ২৬ অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদীর উদ্ভব, তজ্জপ এই ৩২  
অক্ষরী মাত্রা-ত্রিপদী হইতেই বর্তমান ৩০ অক্ষরী দীর্ঘত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এই ৩০ অক্ষরী বাঙ্গালা দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দটি ভাববিস্তারের পক্ষে অমূল্য বলিয়া বর্তমান  
যুগে বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ইহার আমরা গোবিন্দদাসের নিকট ঋণী। ৩০ অক্ষরী  
দীর্ঘ ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত যথা ;—

“বিহঙ্গিনীগণ তথা গাছে বিছাধরী যথা,  
সঙ্গীত সুধায় পুরে নন্দন-কাননে,  
কুসুম-কুল-কামিনী কোমলা কমলা যিনি,  
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদনে।”

( মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য। )

আমরা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি ছন্দের আলোচনা করিয়াছি, এইবার তাঁহার চৌপদী  
ছন্দের কথা বলিলেই গোবিন্দের ছন্দ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইবে।

চৌপদী ছন্দ যদিও নানা প্রকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্যে দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী  
এই দুই রকম চৌপদী ছন্দই পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের  
নিকট ভারতচন্দ্রের সুমধুর চৌপদীর মাধুর্য্য অজ্ঞাত নহে, বস্তুতঃ তাঁহার—

“নয়ন প্রমত্তনদী,  
নিজ পতি বিনা কতু অস্ত্র দিকে চারনা।  
চৌপদী হলা হস্ত অমৃতের নিধি তুলার বিছাৎ ইন্দু  
কদাপি অধর বিনা দিকে ধায় মা ॥” ( রসমঞ্জরী )

ইত্যাদি স্বীয়া নারিকার মধুর বর্ণনা প্রেমিকা স্বীয়া নারিকার মত বসন্ত ব্যক্তিদিগের চিত্ত হরণ করে। সুন্দরকে বর্ধমান বকুলতলায় দর্শন করিয়া রসিকা পুর-নারীগণ যে সুকোমল আবেগ-ময়ী ভাবায় মনের অভিলাস প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ সেই সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করার জন্য মলিন। চিত্ত-বৃত্তি গুলির ব্যাকুল বাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার এইরূপ অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলিলেও এখানে আমরা সেই নাগরীগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের সুকৃতি-প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিবাদ বাধাইব না। কিন্তু চণ্ডীদাসের ২৪টি পদের কথা ছাড়িয়া দিলে উহা অপেক্ষা অধিক স্থললিত ও কোমল কবিতা সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্যে আর আছে কি না আমরা বলিতে পারি না। এই দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী ছন্দ বঙ্গ সাহিত্যে কাহার কর্তৃক প্রথমে কিরূপে প্রবর্তিত হয় বলা কঠিন। কিন্তু কিরূপে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। আমাদের বিশ্বাস যে, সেই প্রাচীন মাত্রা চতুষ্পদী বা চৌপাই হইতেই ৩২ মাত্রার ত্রিপদী ও ঐ ত্রিপদী হইতে ৩১ মাত্রার চৌপদী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কথ্যটি একটুকু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। গোবিন্দদাসের একটি পদের প্রথম চারি পংক্তি যথা ;—

“জয় জয় জগজন-লোচন-কান্দ।

রাধারমণ বৃন্দাবনচান্দ ॥

অভিনব নীল

জলদতনু-চলচল ॥

পিঙ্ক-মুকুট-শিরে সাজনিরে।

কাঞ্চন-বসন,

রতন-ময় আভরণ—

নুপুর রণরণি-বাজনিরে ॥” ২

একটু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, এই পদের ধ্রুয়াটি চৌপাই ছন্দে ও কলিটি মাত্রা ত্রিপদী ছন্দে গঠিত হইলেও চৌপাই ছন্দের ধ্রুয়াটির মিত্রাক্ষর (Rhyme) বর্জন করিলে এবং ত্রিপদীর কলির শেষের দুইটি ‘রে’ শব্দের মাত্রা একটি দীর্ঘবর্ণের পরিমার্ণ (বাক্সালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষরের পরিমাণ) বাড়াইলেই এই চৌপাই ও ৩২ মাত্রার ত্রিপদীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই প্রণালীতে চৌপাইএর ৪টি পংক্তি ছন্দ তাক্সিয়া লিখিলেই ত্রিপদীর ৪ পংক্তি হইবে। গোবিন্দদাসের—

“অঙ্গণিত চরণে

রণিত মণি-মঞ্জীর

আধ আধ পদ চলনি রসাল।

কাঞ্চন বক্ষন

বসন মনোরম

অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥”

ইত্যাদি পদে আমরা ৩২ মাত্রাযুক্ত ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। এক্ষণ যদি এই ছন্দের আরও একটু সুকুন ভঙ্গী দেওয়ার জন্য শেষের মিত্রাক্ষর শব্দ দুটি হইতে মাত্রার হিসাবে একটি অক্ষর কিম্বা বাক্সালা ছন্দের হিসাবে একটি অক্ষর উঠাইয়া লওয়া ॥ এবং বাক্সালার রীতি

অনুসারে অংশগুলির মধ্যেও মিত্রাকরতা রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে এই ত্রিশ মাত্রাস্থক ত্রিপদীই চৌপদী ছন্দ হইয়া পড়ে। এই ‘ছন্দটি যে বর্তমান হিন্দীসাহিত্যের ‘কবিত্ত’ ছন্দ হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দীসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চন্দ বরদাই-প্রণীত ‘পৃথ্বীরাজ-রাসো’ নামক কাব্যে এই ‘কবিত্ত’ ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। পরবর্ত্তী সময়ে যে ছন্দ ‘ছপ্পৈ’ নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহাই পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থে ‘কবিত্ত’ ছন্দ নামে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মোগলসম্রাট মহাশ্বা আকবরের সমসাময়িক প্রাচীন কবি কেশব দাসের ‘কবি-প্রিয়া’ গ্রন্থে আমরা ‘কবিত্ত’ ছন্দ দেখিতে পাই, ইহার পরবর্ত্তী সময়ের হিন্দীসাহিত্যে এই ছন্দের এত অধিক ব্যবহার দেখা যায়, যে বোধ হয়, যেন সেই জন্তই ইহা হিন্দীসাহিত্যে ‘কবিত্ত’ ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ‘দোহা’ ‘চৌপাই’ ‘সবাই’ প্রভৃতি বহু ছন্দ থাকিলেও হিন্দী কবিতা যেন ‘কবিত্ত’ ছন্দেরই একাধিকার সাম্রাজ্য। এ

হিন্দী (কবিত্ত) ছন্দ।

স্থলে ইহাও বিশেষভাবে বক্তব্য যে, হিন্দীতে প্রায় সকল ছন্দেই অক্ষরের লবু গুরু গণ্য করা হইলেও এই কবিত্ত ছন্দে সেইরূপ না করিয়া প্রত্যেক চরণে নির্দিষ্ট ৩১টা অক্ষরের ব্যবহার করা হয়। আমরা এখানে পূৰ্ব্বোক্ত “কবিপ্রিয়া” নামক গ্রন্থ হইতে একটি কবিত্ত ছন্দের কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—যথা,—

“কোমল বিমল মন	বিমলাসী সখী সাথ
কমলা জেঁগা লীড়ে হাল	কমল সনালকে।
নুপুরকী ধ্বনি স্তনি	ভোরের কলহংসনকে
চৌকি চৌকি পরে চারু	চেটুবা মরালকে।
কচনিকে ভার কুচ	ভাবন সকুচ ভার
লচকি লচকি জাত	কটি-তট বালকে।
হরে হরে চলতি হ	লোকতি হরেই হরে
হরে হরে চলতি হ	রতি মন লালাকে।” (ষষ্ঠপ্রভাব ৩৭শ্লোক)

ভারতচন্দ্রের পূৰ্ব্বোদ্ধৃত “নয়ন অমৃতনদী” ইত্যাদি চৌপদীর সহিত এই কবিত্ত ছন্দের কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে এই চতুর্ভাজিক কবিত্ত চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু তাহার পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। মহাপ্রভুর ভক্ত সচর

ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদী

বাহুদেব ঘোষের একটা—

গৌরচন্দ্র দোহা	“দ্বীত-চোর	গৌর মোর,
	প্রেমে মত্ত	মগন ভোর,
	আকিঞ্চন-জয়	কোর
		পতিত-অধুন-বঁধুরা।
	ভূমন্তারণ,	কারণ নাথ,



জীব লাগিয়া  
প্রকট হইলা,

তেজল ধাম,  
নদীয়া-নগরে,  
যেছে শরদ-ইন্দ্রা ॥ ইত্যাদি

( প-ক-ত-২৪২ পৃষ্ঠা )

এই ত্রিমাত্রিক মাত্রা চৌপদীতে নিম্নলিখিত রূপ মাত্রা আছে, যথা—

৩+৩                      ৩+৩  
৩+৩                      ৩+৩  
৩+৩                      ৩+৩  
৩+৩+৩+১

প্রচলিত চৌপদীর নিয়মানুসারে উদ্ধৃত সাতটি পংক্তিকে চারি পংক্তিতেও লিখা যাইতে পারে। যথা—

“চীত-চোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভাব  
আকিঞ্চন-জন কবত কোর, পতিত-অধম-বন্ধু ॥” ইত্যাদি—

এই প্রণালীতে মাত্রা যথা—

৩+৩+৩+৩                      ৩+৩+৩+৩  
৩+৩+৩+৩                      ৩+৩+৩+১

অর্থাৎ হিন্দী কবিত্ব ছন্দের প্রত্যেক ২ মাত্রার স্থলে ইহাতে ৩ মাত্রা আছে। এইরূপ ত্রিমাত্রিক গণ-দ্বারা গঠিত হওয়ার এই ছন্দটীতে যে একটি অপূর্ণ গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাসুদেব ঘোষের পূর্বে আর কেহ যে এই স্তম্ভুর ছন্দে কোন পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নাই। যদি বাসুদেব ঘোষ কেবল এই একটা মাত্র পদ রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু যেমন ভারতচন্দ্র বহু বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের পদানুসরণ করিয়াও নিজের অসাধারণ শক্তির গুণে তাঁহাদিগের অধিকার যশ নিজে গ্রহণ করিয়াছেন,—এই স্থলেও গোবিন্দদাসের নিকট বাসুদেব সেইরূপ পরাজিত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের ঠিক সেই ছন্দের—

“শারদ-চন্দ                      পবন মন্দ  
বিপিনে ভরল                      কুসুম-গন্ধ,  
ফুল মল্লিকা                      মালতী যুগী,  
   মত্ত-মধুকর-ভোরণী।  
হের রাতি                      ঐছন ভাতি  
জাম মোহন                      মদনে মাতি  
দুরলী গান                      পঞ্চম তাম

কুলবতী-চিৎ চোরণী ॥ ইত্যাদি (প-ক-ত ২০৫ পৃঃ)

স্থূললিত পদাবলী মাধুর্য্যগুণে বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। বর্তমান সময়ের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্র-নাথ বৈষ্ণব কবির এই পদমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাদিগের সুরেই সুর মিশাইয়া গাইয়াছেন—

“গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে

মুহুর মধুর বংশী বাজে

বিসরি ত্রাস লোক-লাজে

সজনি আও আও লো।” ইত্যাদি।

যতদিন বঙ্গভাষা বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই স্থূললিত গীতের সুরমধুর সুর-লহরী বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণের স্মৃতি চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র ছন্দ-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদেরি ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে অল্প পর্য্যন্তও বঙ্গ-ভাষালা ভাষায় নূতন

ভাষায় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ছন্দ হইতে উৎকৃষ্টতর কোন ছন্দের প্রবর্তন নূতন ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের যে কি অপরিমীম পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। তবে এখানে ইহা বলা সম্ভব যে, অপূর্ব্ব নূতন ছন্দের উদ্ভাবন ও নবীন ভাবের বিকাশ দ্বারা গৌরব-ব্রট বঙ্গ-সাহিত্যের সমুন্নত নূতন যুগ প্রবর্তন করার জন্ত ঐনুলসাধারণ কৃতিত্ব ■ প্রশংসা যদি কোন ব্যক্তির সমুচিত প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার ত্রায় স্বাধীনচেতা কবিও ব্রজাঙ্গনা গণের সহকারে প্রেমের মোহন নিকুঞ্জে বিচরণ করিতে যাঠরা বৈষ্ণব-কবিগণের পদ্যস্বরেরই অনুসরণ করিয়াছেন, আমাদেরি বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিগণের শ্রেষ্ঠতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গেই পরিচয় দিয়াছি। বস্তুতঃ, তাঁহার রচনায় আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থাল-

গোবিন্দদাসের পদাবলীর স্বাদের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতের স্তায় প্রায় সকল

অলঙ্কার অপভ্রংশ ভাষাতেই অল্প-প্রাসাদি শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ সুস্বাদ্য

হইলেও দ্ব্যর্থক শব্দ-যাটত শ্লেষালঙ্কারের সংঘটন নিত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; সেই জন্তই মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের নিত্যন্ত প্রিয় ও বৈচিত্র্যময় শ্লেষালঙ্কারটীর প্রয়োগ ভাষা-কাব্যে নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না; কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীতে উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পাঠক-বর্গের কোতুলক নিবারণের জন্ত আমরা এখানে দুই একটি উদাহরণ দিব।

সখী মানিনী ত্রীরাধার কোতুক উৎপাদনদ্বারা তাঁহার মান-ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বলিতেছে—

“যো গিরি-গোচর

বিপিনহি সক্ষম,

কৃশ-কণ্ঠ কক অবগাহ।

চক্রক-চাক

শটা-পরিমণ্ডিত,

অরুণ কুটিল দিটি চাহ ॥

শব্দ-স্বেষ ও অর্থ-স্বেষ ।

সুন্দরি ! ভালে তুহুঁ হরিণী-নয়নী ।

সো চঞ্চল হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি,

কৈছনে ধরলি সেয়ানি ॥ ৫ ॥”

অর্থাৎ ক্লেশ-কটিনিশিষ্ট যে প্রাণীটি, পর্বত গোচারণ-ভূমি ও কাননে প্রবেশ করিয়া সঞ্চরণ করে, যে ময়ূরপুচ্ছের চম্ভাকৃতি চিহ্নের দ্বায় বর্ণ-যুক্ত, কুঞ্চিত কেশরাজিতে শোভিত ;—যে আরক্তিম বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে,—হে সুন্দরি ! তুমি সেই চঞ্চল হরিকে ( এক অর্থে কৃষ্ণ অথবা সিংহ ) জনন-পিঞ্জরে ভরিয়া রাখিয়াছ; ইহাতে বুঝা যায় যে, তুমি সামান্ত হরিণ-নয়না নহ ( এক অর্থে মৃগলোচনা অথবা হরিণী ) । ‘যো গিরিগোচর’ ইত্যাদি কলিতে হরির যে বিশেষণ-গুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ দ্বারা কৃষ্ণ ও সিংহ উভয়েরই প্রতীতি হয়, শব্দ পরিবর্তন করিয়া সমার্থক অথবা শব্দ প্রয়োগ করিলে সেই অর্থের কোন ব্যত্যয় হয় না । সুতরাং শব্দগত ও অর্থগত দ্বিবিধ স্লেষালঙ্কার-মধ্যে ঐ অংশে অর্থগত স্লেষের এবং ধুরাত্তে দ্ব্যর্থক ‘হরি’ ও ‘হরিণী-নয়নী’ শব্দের প্রয়োগবশতঃ শব্দগত স্লেষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে ।

মানভঙ্গের পর ত্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলনান্তে প্রেমোন্মাদ-পুলকিতা ত্রীরাধা কোতুক করিয়া হৈমালীর ভাবায় সখীর নিকট প্রিয়-সমাগমের বর্ণনা করিতেছেন যথা,—

“শ্যাম-তনু কিয়ৈ তিমির বিরাজ ।

সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ৈ আরকত মাজ ॥

ভরল-তার কিয়ৈ টুটল হার ।

নথ-পদ কিয়ৈ নব শশীক সঞ্চার ॥

ঐছে দোষাকর হেরইতে কাণ ।

প্রাতের পহিল বজনী ভেল তান ॥

সেবানুপ্রাণিত সন্দেহালঙ্কার  
ও রূপক ।

পুন অহুমানিতে হাম ভেল ভোর ।

টীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥

তবহ যতন করি করইতে মান ।

হাস-কুমুদে তহি সব কক আন ॥

মানিনী-মান-গয়ব ভেল চুর ।

নাগর আপন মনোরথ পুর ॥

তবহ না জানল দিন কিয়ৈ রাতি ।

সোবিল্লাস কহ সমুচিত শাতি ॥”

অর্থাৎ “ঐক্লপ দোষাকর কৃষ্ণকে ( এক অর্থে দোষের আকর কৃষ্ণ, অপর অর্থে কৃষ্ণ-রূপ চক্রকে ; দোষা—দিশা, দোষাকর—নিশাকর অর্থাৎ চক্র ) দেখিলে প্রভাতকেই আমার

সন্ধ্যা বলিয়া অনুমান হইল। ( আমার সন্দেহ হইল ) এ কি শ্রাম-তমু কৃষ্ণ না তিমির বিরাজ করিতেছে ? এ কি ( অন্ধ নারিকার ) 'সিন্দুরের চিহ্ন না আরক্তিম ( সন্ধ্যারাগ ) ? এ কি চঞ্চল অর্থাৎ স্থানান্তরিত তারকা ( সমুহ ) না ( শ্রীকৃষ্ণের ) ছিন্ন হার ! এ কি ( নারিকার ) নথের চিহ্ন, না নূতন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্দ্র-কলার উদয় হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুমান করিতে করিতে আমি আশ্চর্য-বিস্মৃত হইলাম,—শঠ কানাই আমাকে ক্রোড়ে লইল। তখন ( চেতনা পাইয়া ) আমি মান করিতে চেষ্টা করিলাম ( কিন্তু ) তাহাতে ( সেই কানাই ) হস্তরূপ কুমুদের ( বিকাশ ) দ্বারা ( আমার ) সকল ( চেষ্টা ) অত্যাধিকারিণী ফেলিল। মানিনীর মানের গর্ভ চূর্ণ হইল,—নাগর আপন মনোরথ পূর্ণ করিল। তখনও জানিলাম না ( ইহা ) দিন কি রজনী। গোবিন্দদাস কহে ( ইহাট ) সমুচিত শাস্তি।”

এস্থলে কবি ‘স্রষ্ট’ অর্থাৎ দ্ব্যর্থক “দোষাকর” শব্দের ও সেই শ্লেষাত্মক প্রাণিত সন্দেহালঙ্কার ৷ রূপকের প্রয়োগ দ্বারা যে বিচিত্র ভাবরাজির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার তুলনা পদাবলি-সাহিত্যে দুর্লভ। প্রিয়-সমাগম-সুখে প্রেমিকা শ্রীরাধার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; দিবারাত্রি জ্ঞান ছিল না; এই প্রকৃত কথাটা লজ্জায় গোপন করিয়া শ্রীরাধা সেই কৌতুকজনক হেয়ালী রক্ষা করিয়াই বলিতেছেন “তখনও আমার সেই ভুল;—দিন কি রজনী বুঝিতে পারিলাম না।” কবির ভনিতার অর্থ ততোধিক মধুর,—কবি কহিতেছেন—এরূপ নারিকার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত শাস্তি। “তবু না জানল কিরে দিন রাতি” পংক্তিটিতে

“নীবিং প্রতি প্রগিহিতে তু করে প্রিয়েণ

সখাঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥”

এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোকের ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু গোবিন্দদাস সেই পুরাতন ভাবটিকে যে বিচিত্র নবীন সৌন্দর্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহার তুলনাও নিতান্ত সুলভ নহে। এখন গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কারের আলোচনা করা যাউক। উপমা, রূপক, অর্থান্তর-ন্যাস প্রভৃতি কয়েকটি অর্থালঙ্কার সকল কবিগণেরই সাধারণ সম্পত্তি। গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কার।

কালিদাসের উপমা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। বিদ্যাপতির উপমা ৷ রূপকগুলির সৌন্দর্য্যও বড় কম নহে। গোবিন্দদাসের অর্থালঙ্কার কিছু স্বতন্ত্র রকমের। অলঙ্কারের ব্যবহারে কালিদাসের সহিত পরবর্তী কবি মাধব, শ্রীহর্ষ কিংবা জয়দেবের যে পার্থক্য, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দের অলঙ্কারের মধ্যেও সেই রকম পার্থক্য দেখা যায়। কালিদাসের উপমা প্রভৃতি এমন প্রাঞ্জল যে তাঁহার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মন্নিম্বাধকে আমরা প্রায় কখনও কালিদাসের অলঙ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি নাই; কিন্তু মাধব-কাব্য ও নৈষধের অধিকাংশ শ্লোকের টীকাতেই মন্নিম্বাধের স্বল্প অনুধাবন-শক্তির প্রয়োগ করিয়া ঘনীভূত অলঙ্কারের জটিল-গ্রন্থি উন্মোচন করিতে হইয়াছে। গোবিন্দদাসের অলঙ্কারের অবস্থাও কতক পরিমাণে সেইরূপ বটে। অভিজ্ঞ আলঙ্কারিক ব্যক্তিও তাঁহার অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব সম্পূর্ণ অনুভব করা সাধারণ পাঠকের সাধ্যাত্ত

নহে। ইহা সত্য বটে যে, মাঘ, নৈমঘ প্রভৃতির অপৰ্য্যাপ্ত অলঙ্কারের পারিপাট্য সত্ত্বেও আমরা কালিদাসের পর্যাাপ্ত উপমাদিরই অধিক অমরকৃত, তথাপি এক শ্রেণীর সমালোচকের নিকটে মাঘের কাব্য কালিদাসের কাব্য হইতেও প্রীতিকর হইয়াছে।

“উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।

নৈমঘে পদলালিতাং মাঘে সন্তি জ্যো গুণাঃ ॥”

এই প্রসিদ্ধ উদ্ভট-শ্লোকটাই তাহার প্রমাণ। অতএব সেইরূপ অনেক ব্যক্তি যে, বিদ্যাপতির পদাবলী হইতেও গোবিন্দদাসের পদাবলির সমধিক প্রশংসা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা বাহুল্যভরে গোবিন্দদাসের সাধারণ উপমা-রূপকাদি ত্যাগ করিয়া তাহার জটিল অলঙ্কারের ২১১টি উদাহরণ দিব।

শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাণ্যে শ্রীরাধার মান অপনোদন করিবার জন্ত বলিতেছেন :—

“ননমথ-মকর ভরহি ভর-কাতর

মধু মানস-ঝষ কাপ।

তুয়া হিয়া হার-তটিনী-তট কুচ-ঘট

উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥

সুন্দরি ! সম্বর কুটিল কটাখ।

কলসীক নীন বড়লী কিয়ৈ ভারসি

গোবিন্দদাসের সঙ্গ-রূপক

এ অতি কঠিন বিপাক ॥ ৬ ॥

পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল

নাভি-সরোবর মাহ।

তাহি রোমাবলী ভুজ্জী-সঙ্গ-ভয়ে,

ত্রিবলী-বেণী অবগাহ ॥

তাহি কিরত কত কতহ মনোরথ

দৈবকি গতি নাহি জান ॥

কিছিনী-জ্বালে গড়ত ভেল সংশয়

গোবিন্দদাস রসগান ॥”

অর্থাৎ ‘আমার চিত্তরূপ নীন মন্থরূপ মকরের ভয়ে ভয়াতুর হইয়া কাঁপিতেছিল; তোমার বকের (মুক্তা) হাররূপ তরঙ্গিণীর তীরে (তোমার) কুচরূপ কলসী দেখিয়া উল্লসিত হইয়া (তাহার মধ্যে) পতিত হইল। হে সুন্দরি ! তুমি কুটিল কটাক সম্বরণ কর;—কলসীর মধ্যস্থিত নীনের উপর তুমি বড়লী নিক্ষেপ করিতেছ, ইহা দারুণ দুঃস্বপ্ন। (কটাকরূপ বড়লীর ভয়ে) অস্থির হইয়া (আমার চিত্তরূপ নীন) পুনরায় যখন (তোমার) নাভিরূপ সরোবরের মধ্যে পতিত হইল, (তখন) সেখানে রোমাবলি-রূপ কাল-ভুজ্জীর সঙ্গ-ভয়ে ত্রিবলীরূপ অপ্রাপ্ত জল-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে (তাহার) কতই বাসনা

হইতে লাগিল (কিন্তু) দৈবের গতি (কেহ) জানিতে পারে না ; ( তখন সে ) কিঙ্কনীরূপ জালে পতিত হইয়া (উদ্ধার পাইবে কিনা) সংশয় উপস্থিত হইল । গোবিন্দদাস রসগান করিতেছে ” ।

উদ্ধৃত পদটির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সুবিশুদ্ধ বিচিত্র রূপক-রাজিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল-বাসনা কি অপূর্ণ কোশল ও রসিকতার সহিত পরিদ্রুত হইয়াছে ! আমরা আর একটিমাত্র অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই কান্ত হইব ।

খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র বিজ্রপের সহিত বলিতেছেন—

“নখপদ হৃদয়ে তোহারি ।

অন্তর জলত হামারি ।

অধরহি কাজর তোর ।

বদন মলিন ভেল মোব ॥

গোবিন্দদাসের অসঙ্গতি-অলঙ্কার

হাম উজাগরি রাতি ।

তুয়া দিঠি অরুণিম কাতি ॥

কাহে মিনতি করু কাণ ।

তুহঁ হাম একই পরাণ ॥

হামারি রোদন অভিলাষ ।

তুহঁক গদগদ ভাষ ॥

সবে নহ তম্ব তম্ব সঙ্গ ।

হাম গোরী তুহঁ গ্রাম-অঙ্গ ॥

অভঙ্গে চল নিজ বাস ।

কহতঁহি গোবিন্দদাস ॥”

অর্থাৎ “তোমার হৃদয়ে ( অপরা নায়িকার প্রদত্ত ) নখচিহ্ন ; (কিন্তু) আমার হৃদয় জলিতেছে । তোমার অধরে কাজল, (কিন্তু) আমার মুখ মলিন হইয়াছে ; আমি রজনী আগরণে কাটাইয়াছি ( কিন্তু ) তোমার চক্ষুর বর্ণ আরক্ত হইয়াছে । হে কৃষ্ণ ! তুমি কিজন্ত অহ্ননর্য করিতেছ, ( দেখা বাইতেছে ) তুমি আর আমি এক আত্মা । আমার ক্রন্দনের ইচ্ছা হইতেছে, ( কিন্তু ) তোমার গদগদ বাক্য নির্গত হইতেছে । শুধু ( তোমার ও আমার দেহদেহে মিলন নাই, আমি গৌরবর্ণা ; তুমি শ্রামাঙ্গ ; অতএব গোবিন্দদাস কহিতেছে নিজগৃহে বাও । ”

উদ্ধৃত পদটিকে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অসঙ্গতিনামক অর্থালঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে । এক-হানে কারণ আছে, অল্প হানে কার্যের উৎপত্তি হইতেছে—চমৎকারিণের সহিত এমন বদি কোন রিবর বলা যায়, তাহাকেই অসঙ্গতি-অলঙ্কার বলে । সম্মত ভট্ট কাব্যপ্রকাশে ইহার দৃষ্টান্তরূপ একটা সুপ্রাচীন প্রাকৃত গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সংস্কৃত অনুবাদ এই—

“যৈস্তব ব্রহ্মতৈব বেদনা ভগতি লোকস্তদুলীকম্ ।

দন্তকৃতমধয়ে বধ্বাঃ বেদনাঃ সপত্নীমাম্ ॥”

অর্থাৎ—

“ক্ষত যার তারি সে বেদনা—

বলে লোকে ;—মিথ্যা এ বচন ;

দস্ত-ক্ষত বধুর অধরে

জলে কিন্তু সপত্নীর নন !”

সম্ভবতঃ এই কবিতাটির ভাব লইয়াই জয়দেব গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা নায়িকা শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

“দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্ ।

কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুর্বেতদভেদম্ ॥”

‘তোমার অধর-গত

বটে এ দশন-ক্ষত

আমার অন্তরে কেন দেয় সে বেদন ?

এখনো যে তোমা সহ

অভিন্ন আমার দেহ

এ ধারণা মম কিহে হবেনা ভগ্নন ?” ( মৎকৃত পঞ্চানুবাদ )

সুতরাং গোবিন্দদাস যে, তাঁহার এই পদের মূলভাবটি জয়দেব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রদর্শিত একটি অসঙ্গতির স্থলে চারিটি অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন ; তার পরে জয়দেবের শ্রীরাধার মনোগত ভাবটি এই যে, যখন শ্রীকৃষ্ণের অধরে ক্ষত তাঁহার মনে বেদনা দিতেছে, তখন ইহা দ্বারা অবশ্যই উভয়ের দেহ অভিন্ন থাকাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু তিনি নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ-কারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রভেদ চিন্তা করিতে ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ এক হইবেন কেন ? গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চারিটি বিশিষ্ট কারণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের আত্মার একত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি উভয়ের দেহের একীভাব মোটেই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে আলোক ও অন্ধকারের স্থার খেতাকী ও কৃষ্ণাঙ্গের একীভাব অসম্ভব। “গৌরী” ও “গ্রাম-অঙ্গ” শব্দের ভাবার্থ দ্বারা শ্রীরাধা বোধ হয় এ কথাও বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি সাদা অর্থাৎ সরলপ্রকৃতি, আর শ্রীকৃষ্ণ কালো অর্থাৎ মলিন বা কদাচারী, সুতরাং উভয়ের মিলন হইবে কি প্রকারে ? বস্তুতঃ সেই সময়ে যে উভয়ের দেহের মধ্যে মিলন নাই, একথা শ্রীকৃষ্ণেরও অস্বীকার করার উপায় নাই ; অতএব শ্রীরাধার নিকট সম্পূর্ণ নিরন্তর ও অপ্রতিভ হইয়া গোবিন্দদাসের সুপরামর্শ অনুসারে তিনি নিজ গৃহে যাওয়া ব্যতীত আর কি করিতে পারেন ?

এস্থলে ভাববৈচিত্র্যের জগু সমধিক প্রশংসা কাহার প্রাপ্য রসজ্ঞ পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন।

প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মাজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বারা কাব্যের উপা-

গোবিন্দদাসের রস-বৈচিত্র্য

দেয়তা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু রসবত্বই কাব্যের জীবন, রস না থাকিলে শত অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত হইলেও

কোন রচনাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না।

আলঙ্কারিকদিগের এই সিদ্ধান্তের মূল বেদান্তের “রসো বৈ সঃ” ইত্যাদি তত্ত্বটি অন্তর্নিহিত আছে। সংসারের প্রেম, হাস্য, বীরত্ব, বিষয় প্রভৃতি নানারসের (Emotions) পরিচালনায় যে ক্ষণিক আনন্দ তাহা যদিও বেদান্তের বর্ণিত সেই অসীম ব্রহ্মানন্দ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু আমরা প্রথমে ক্ষণিক আনন্দের পথে চলিয়াই সেই অসীম আনন্দের বার্তা পাইয়া থাকি, এইজন্যই প্রকৃতি আমাদের আসক্তি ও স্থানান্তরিত্তি ঐ প্রেমাদি রসাত্মিকা মনোবৃত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং যে রচনায় সেই সকল রসাত্মিকা মনোবৃত্তির উদ্রেক হয় না, তাহা যে আমাদের তাদৃশ প্রীতিকর হইতে পারে না, এবং আমাদের সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে পাবে না, ইহা সহজেই বুঝা যাউতে পারে। আর মাণুআলও, কালাইল, রসকিন্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী সমালোচকদিগের মতামুসারে লোকোদ্ভূত আদর্শ সৃষ্টি দ্বারা মানবগণকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে উদ্বোধিত করাই যদি শ্রেষ্ঠতম কাব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও কেবল আমাদের স্বখ-দুঃখময় জীবনের নানা মনোবৃত্তিগুলির সাহায্যেই সেই আদর্শ আমাদের জন্মকাল হইতে পারে। সুতরাং যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, রসই যে কাব্যের প্রাণ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

গোবিন্দদাসের পদাবলিতে এষ্ট রস বিরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবকবির পদাবলি রসের অনন্ত ভাণ্ডার। তাহাতে না আছে এমন রস নাই।

গোবিন্দদাসের কবিতার রস বিশেষতঃ প্রীতিকার্য অসামান্য উপযোগী বলিয়া তাহাতে শ্রীরাধা-

কৃষ্ণের স্নানধুর প্রেম-লীলা ও সেই প্রেমের পূর্বরাগ, উৎকর্ষা, মিলন, রসোদগার, মনে বিরহ, বিরহান্তে মিলন, বসোম্মাস প্রভৃতি বিচিত্র অবস্থাগুলি যেরূপ চমৎকার স্বাভাবিকতা ও অপূর্ব কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সাহিত্যে বোধ হয় তাহার তুলনা বিরল। গোবিন্দদাস যে কেবল অলঙ্কারের পারিপাট্যেই শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ না হইলেও তিনি প্রেমের পূর্বোক্ত অবস্থাগুলির যে সমৃদ্ধ লিখাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরকাল একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সমাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় গোবিন্দদাসের কাব্য-রসের অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করার স্থান আমাদের নাই। সুতরাং আমরা তাঁহার কতিপয় রসচিত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

নবীন অমুরাগে শ্রীরাধার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

“গুনহিতে চমকই গৃহ-পতি রাব।

তুয়া মঞ্জীর-রবে উনমতি ধাব ॥

নাহ না চিকিৎসা কাল কি গৌর।

অলাদ নেহারি এমনে বস গৌর ॥



কাঁহী তুহ গোঁরী আরীধলি কান ।  
 জানলু রাই তোহে মম মান ॥  
 স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই ।  
 একলি গহন কুঞ্জ মাঠা নুঠই ॥  
 পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল ।  
 বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥  
 মুরলী-নিসান শ্রবণ তরি পিবট ।  
 গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই ॥  
 ঐচন মরম যতন অভিলাষ ।  
 কতহু নিবেদব গোবিন্দদাস ॥”

এস্থলে কবি শ্রীরাধার কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বিচিত্র কার্যের বর্ণনা দ্বারা অল্পকথায়, অপূর্ণ কোশলে তাঁহার প্রেমের যে আবেগ ও তন্ময়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই অতি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য। অল্পকথায় অনেকভাব প্রকাশ পাইলে আলঙ্কারিকগণ তাহাকে “ধ্বনি” বা “বাঞ্ছনা” বলেন। এই বাঞ্ছনাই শ্রেষ্ঠকাব্যের লক্ষণ। সখী যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলিত যে, “শ্রীরাধা তোমার প্রতি অনুবক্তা, সে তোমার প্রেমে তন্ময় ইত্যাদি” তাহা হইলে আমবা ‘অনুবক্ত’ ‘তন্ময়’ এইরূপ কতকগুলি বড় বড় কথাই শুনিলাম বটে, কিন্তু সেটী অনুরাগ আর তন্ময়তা যে কি বস্তু তাহা দেখিতে পাউতাম না। আলঙ্কারিকদিগের মতে তাহাতে “স্ব-শব্দ-বাচ্যতা” দোষ ঘটিত : কিন্তু কবি একবারও বাক্যে “অনুরাগ” “তন্ময়তা” ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার না করিয়া “শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব” ইত্যাদি বাক্যের বাঞ্ছনা দ্বারা শ্রীরাধার প্রেমের আবেগ, গভীরতা ও তন্ময়তা প্রকাশ করায় কবিতাটী কাব্যার্থে অতি চমৎকাব হইয়াছে।

প্রথম-কলহান্তে অনুতাপিতা শ্রীরাধার একটা চিত্র দেখুন। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

“কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই  
 হেরত পুন জনি কান ।  
 কানু হেরি জনি প্রেম বাড়ায়ই  
 প্রেম করই জানি মান ॥  
 সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোষ ।  
 মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসুয়ে  
 কানু সঞে কি করব যোষ ॥” ইত্যাদি। (প-ক-ত)

অর্থাৎ কোন কুলবতীই যেন নয়নদ্বারা কাহারও পানে তাকায় না ; আর যদিই বা তাকায় তাহা হইলেও যেন কানুর পানে চাহে না ; আর যদিই বা চাহে, তাহা হইলেও যেন কানুর প্রতি প্রেম বাড়ায় না ; আর যদি প্রেমও বাড়ায়, তাহা হইলেও যেন মান করে না। (আমি

এই সমস্তই করিয়াছি ) অতএব নিজের 'অপরাধ স্বীকার করি। আমার মান-দণ্ড জীবন এখনও বাহির হইতেছে না ( ইহাতে নিজের 'জীবনের প্রতি রাগ না করিয়া ) কান্থর প্রতি কি রাগ করিব? এতলে শ্রীরাধার ন্যায় কুলবতীদিগের বিষম সমস্যা, শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্য মোহিনী শক্তি, দৃষ্টিমাত্র তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার গভীর প্রেমোদ্বেগ ও সেই প্রেমের আতিশয্য 'ও তন্ময়তাবশতঃ সম্পূর্ণ আত্মাভিমানের বিসর্জন, কবি অল্প কয়েকটা কথায় ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা যেরূপ অপূৰ্ব্ব কোশলে পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার তুলনা যে কোন সাহিত্যে বিরল।

বিরহিণী শ্রীরাধার একটি চিত্র দেখুন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাওয়া ব্রজে প্রত্যাগমনের কথা যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই শ্রীরাধার সখী মথুরায় যাওয়া সখীর অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

“ভাল ভেল মাধব তুহঁ বহু দূর।

অযতনে ধনীর মনোরথ পূর ॥

কী ফল অধরে হিম-ঋতু-রাতি।

যাহাঁ স্ততলি কিশলয়-দল-পাতি ॥

কী ফল নিয়ড়ে হতাশন মন্দ।

নিতি নিতি উয়ত গগনচি চন্দ ॥

কাহে সিনায়ব উতলত বারি।

নয়নহি তাপনি সলিল উতারি ॥

ঐছন গণহিতে তুয়াগুণ কোটি।

মানল পোগক যামিনী ছোট ॥

সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীতি।

কিয়ে শীতল কিয়ে তপন-চরিত ॥

গোবিন্দদাস কহে এতহঁ সখাদ।

তমু জীবন ছহঁ ধনীর বিবাদ ॥”

অর্থাৎ “হে মাধব! তুমি দূরে রহিয়াছ ( ইহা ) ভালই হইয়াছে। ( তুমি দূরে থাকায় ) বিনা যত্নেই ধনীর ( শীত ঋতুর ) আবহুকীর কার্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে। শীত কালের ঋতু-নীতে ( অধিক ) বস্ত্রাদির কি প্রয়োজন? শ্রীরাধা সে সময়ে পল্লব-শরনে শুইয়া থাকে। নিকটে সুখোক্ষ অগ্নি রাখিয়া কি প্রয়োজন? রাজিতে ত চন্দ্রই গগনে উদ্ভিত হয়! শ্রীরাধাকে উচ্ছ্বলে কেন স্নান করাইব।—তাঁহার নয়নযুগলই তপ্তবারি বর্ষণ করিতেছে! সেইরূপ তোমার অনন্তগুণের কথা আলোচনা করিতে করিতে পোষমাসের রাজি তাঁহার নিকট ছোট বলিয়া বোধ হয়; কেবল স্বর্ঘ্যটা তাঁহার নিকট শীতল কি উষ্ণ বোধ হয় তাহাই বুঝিতে পারি না। গোবিন্দদাস কহে এইমাত্র সংবাদ বলিলেই হয় যে, ধনীর দেহ ও জীবন এই হইটায় মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে! ” এই কবিতার ভাবার্থ পরিষ্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করার আবশ্যক

নাই। ইহা অপেক্ষা তীব্রতর বিক্রপায়ক আক্ষেপের সহিত বিরহিণী ত্রীরাধার অবস্থার বর্ণনা এবং ত্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎসনা আর কিছু হইতে পারে কি? হৃদয়ের উত্তাপে ত্রীরাধা গ্রীষ্ম কিবা শীত-ভার প্রকাশ করে না, ইহার দ্বারা কবি অপূর্ব-কৌশলে দেহের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা বুঝাইয়াছেন। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমরা গোবিন্দদাসের রসবর্ণনার দৃষ্টান্ত স্থলে যে কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই কয়েকটাই বর্ণনাব ভঙ্গীতে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যকেই অলঙ্কারিকেরা অর্থালঙ্কার বলিয়া থাকেন; অর্থালঙ্কারের সংখ্যার কোন ইয়ত্তা নাই। তবে অলঙ্কারিকেরা তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রকারগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে কি কি অলঙ্কার আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই স্থলে ইহাই কেবল বক্তব্য যে গোবিন্দদাস এক্রূপ অলঙ্কারপ্রিয় ও অলঙ্কার-প্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন যে তাঁহার রসভাবায়ক কবিতাগুলিতেও নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কারের সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বিভাপতির বরঃসন্ধি, সখীশিক্ষা ও সম্ভোগের বর্ণনা অতুলনীয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ মধ্যে যদিও অনেকেই ঐ সকল বিষয়ে বিভাপতির অনুকরণে পদরচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দদাসের স্থায় রূতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তুলনা করিয়া দেখাইবার আমাদের স্থান নাই। কোতূহলী পাঠকবর্গ গোবিন্দদাসের “ধরি সখি-আচর ভই উপচয়।” (প-ক-ত ৭৫ পৃষ্ঠা) “সোরভ-আগরি রাই স্নানগবী কনকলতা-সম সাজ” (ঐ ৭৬ পৃঃ) “স্বরত-তিরাসে ধরল পহঁ পাণি।” (ঐ ৪৫ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি পদগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

গোবিন্দদাস হস্তরসের বর্ণনায়ও বেশ পটু ছিলেন। তাঁহার কোক কোন পদে হস্তরসেব সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। কোতূহলী পাঠক “আকুল চিকুর চূড়োপরি চক্কক” (প-ক-ত ২২২ পৃঃ) “সহজই গোরী রোখে তিন লোচন” (ঐ ২১৩ পৃষ্ঠা) “রামক নীলবসন কাহে পিন্ধ” (ঐ ১৭৯৭ পৃষ্ঠা) “রাধা-বদন চাঁদ হেরি ভুলল, গ্রামক নয়ন-চকোর” (ঐ ১৮০৬) ইত্যাদি পদগুলিতে গোবিন্দদাসের হস্তরসের পরিচয় লইবেন।

আমরা স্থানান্তরে গোবিন্দদাসের কোন রসের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার ভক্তি-ভাব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বিশেষ অবিচার করা হইবে। এই ভক্তি-ভাবটা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবি মাত্রেই সাধারণ সম্পত্তি। মহাপ্রভুর আদর্শ-জীবনের ইহা স্বাভাবিক ফল। পরবর্ত্তী অগাছ কবির স্থায় গোবিন্দদাসও যে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ভক্তিপূর্ণ পদাবলি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সুতরাং আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। গোবিন্দদাস যে সংস্কৃতপ্রায় সুমধুর শব্দাবলির দ্বারা ত্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অবস্থার উপযোগী বহুসংখ্যক বিচিত্র রূপ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার সম্বন্ধে ছই চারিটা কথা বলিতে চাই।

এইরূপ বর্ণনাগুলি সংস্কৃত-ভোজের স্থায় অতি সুমধুর এবং তজ্জন্ত রূকতন্তুগণের বড়ই প্রিয়। বিভাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলিতে এই জাতীয় কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং

পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাসই ইহার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক বলিয়া চিরকাল পূজিত হইবেন। আমরা গোবিন্দের অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থলে—‘কুবলয়-কন্দন-কুমুম-কলেশ্বর

কালিম-কান্তি-কলোল।’ ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি।

গোবিন্দদাসের ঐ জাতীয় রূপবর্ণনা আরও অনেক আছে। কৌতুহলী পাঠক পদকল্পিতরত্ন ৪র্থ খণ্ডায় ষড়বিংশ পল্লবেব ৫৮।১২।১৩।১৫—২৬ সংখ্যক পদগুলি দৃষ্টি করিবেন।

এখন কবিত্ব অনুসারে পদাবলি-সাহিত্যে গোবিন্দদাসের স্থান কোথায়, তাহা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। পণ্ডিতমণ্ডলী যদিও অনেক সময়েই জনসাধারণের মতামত

বড় একটা গ্রাহ্য করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহা যে তুচ্ছ করার গোবিন্দদাসের কবিত্ব।

বিষয় নহে,—অনেক সময়েই যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-বিশেষের ব্যক্তিগত

মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতই অধিক অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়—ইহার দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে বিরল নহে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি বাইরণ সেকপীয়রের অদ্বিতীয় নাট্য-কাব্যগুলি হইতেও পোপের কবিতার অধিক অম্বরগী ছিলেন। আমাদের দেশেও কোন কোন পণ্ডিতমহাশয়কে কালিদাসের কাব্য অপেক্ষা মাধব নৈষধ কিম্বা বাণভট্টের রচনারই অধিক পক্ষপাতী দেখা যায়। এই সকল স্থলে পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে জনসাধারণ যে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোন ভ্রান্তি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কবির জীবদ্দশায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন অভ্রান্ত মতামত জনসাধারণের নিকট পাইবার আশা করা যায় না; কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাউবে যে, জনসাধারণের বহুকাল-ব্যাপী মতামত কালরূপী বিরাট-পুরুষের গূঢ় ও অভ্রান্ত বাক্য বাতীত আর কিছুই নহে। কালের এই নিরপেক্ষ দোষগুণ-বিচারে আমরা যোগ্যতমের জয়ের দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই।

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক জনসাধারণ প্রায় একবাক্যে বিভ্রাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই কবিত্ব অনুসারে গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আজ সাড়ে তিনশত বৎসর হইতে চলিল—গোবিন্দের সম্বন্ধে সাধারণের এই মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলির যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে—পদলালিত্য, অনুপ্রাশচ্ছটা ও অলঙ্কার-পটুত্বে তাঁহার কবিতা পদাবলি-সাহিত্যে অতুলনীয়। কাব্যের প্রাণ রসায়কতাবিশয়ে যদিও তাঁহার কবিত্ব অপেক্ষা বিভ্রাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলেও রস-বিকাশে গোবিন্দদাস অপটু নহেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রস-চিত্র শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি কোন কোন কবির বিশুদ্ধ বাজালা পদ-রচনা অনেক স্থলেই উৎকৃষ্টতর এবং কোন কোন রস-চিত্র কোন স্থলে উজ্জ্বলতর হইয়া থাকিলেও আমাদের বিবেচনার বিভ্রাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নির্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যশচন্দ্র রায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবায়নমঃ

পাট-পর্য্যটন

এবং

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়

আমরা দেহুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতেছি, তাহার মধ্যে এই ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত পুঁথিখানিতে অনেক শ্রীচৈতন্যভক্তের জন্মস্থান এবং পাট-বাটার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে দেখিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আশা করি ইহাতে বহু সাহিত্যসেবীর বিশেষ উপকার হইবে, কারণ অনেকে বহু তত্ত্বের জন্মস্থান সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, বাসু, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের লেখক অভিরাম দাসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মূল পুঁথিখানি সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান করিতে বাসনা আছে।

( শ্রীলোচনদাসের হর্লভসার ও আনন্দলতিকা, বৃন্দাবন দাসের ভক্তি-চিন্তামণি ও তত্ত্ব-বিলাস, আনন্দলহরী, রাধিকামোহন প্রভৃতি এবং নরোত্তম দাসের আনন্দ বিলাস, ভাবামৃত ও স্মরণ-মঙ্গল প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। )

পাট পরিক্রমা যে যে করিবারে হয়।

সংক্ষেপে দিও মাত্র লিখিয়ে নিশ্চয় ॥

পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।

ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশ পাট কয় ॥

চৌত্রিশ পাট বে যে গ্রামে তার নাম কহি।

ক্রমাগত নাম সব শুনহ নিশ্চহি ॥

যেই গ্রামে যার বাস আছিল নির্দ্বার।

নাম গ্রাম লিখি মুঞি করি পরিহার ॥

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়।

কাটোড়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয় ॥

একচাকা জন্মভূমি থড়দহে বাস।

শ্রীমিত্যামন্দের চুই ধাম জানিবা নির্ধাস ॥

শ্রীঅষ্টভৈরব ধাম শান্তিপুরে ॥

এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয় ॥

অভিরাম পূর্বে সূদাস খানাকুলে স্থিতি ।  
 খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥  
 হলদা মহেশপুর সুন্দরানন্দের বাস ।  
 সুন্দরানন্দ পূর্বে সূদাম জানিবা নিশ্চয় ॥  
 কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলজিতে বাস ।  
 ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্ধাস ॥  
 অশ্বিকায় গোঁরীদাস পণ্ডিতের বাস ।  
 গোঁরীদাস পূর্বে সুবল জানিবা নির্ধাস ॥  
 আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি ।  
 কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি ॥  
 কমলাকর মহাবল পূর্ব নাম হয় ।  
 উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয় ॥  
 ছুগুলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম ।  
 উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব নাম ॥  
 সাগুণা সরডেকা সুখসাগর নিকটে ।  
 মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে ॥  
 মহেশ মহাবাহু পূর্বে জানিবা আখ্যান ।  
 বড়গাছিতে বাস শ্রীকৃষ্ণদাস নাম ॥  
 পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল ।  
 বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল ॥  
 বোদখানাতে হলদা পরগণা জানিবা সর্বজননে ।  
 সূদাম সখা পুরুষোত্তম পূর্বে আখ্যানে ॥  
 সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি ।  
 পরমেশ্বর অর্জুনসখা পূর্বে এই খ্যাতি ॥  
 মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে ।  
 হিরণ্যগাঁ সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব জনে কহে ॥  
 আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি ।  
 পূর্বেতে ললস সখা যার নাম খ্যাতি ॥  
 খোলা-বেচা শ্রীধরের দ্ববদীপে বাস ।

মধুমজল পূর্বে এই জর্নিবা নির্গাস ॥  
 এই যে দ্বাদশ পাট হইল লিখন ।  
 ভক্ত বাস যে যে গ্রামে শুনহ কথন ॥  
 ত্রীগদাধর পণ্ডিতের ত্রীহটে জন্ম হয় ।  
 প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয় ॥  
 পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র তার শাখা হয় ।  
 নয়নানন্দ মিত্র নাম ভরতপুরে রয় ॥  
 আড়িয়াদহে গদাধর দাসের বসতি ।  
 স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা স্থিতি ॥  
 স্বরূপ ললিতা পূর্বে জানিবা আখ্যানে ।  
 বিসখিকা রামানন্দ জানিবা সর্বজনে ॥  
 রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী-তীরে ।  
 দক্ষিণ দেশেতে বাস ত্রীবিজ্ঞানগরে ॥  
 পাট-পূর্ঘ্যটন মধ্যে না হয় গণন ।  
 নীলাচল গেলে তার হয়ত ভ্রমণ ॥  
 কাঁচড়াপাড়া কুমারহটে শিবানন্দের স্থিতি ।  
 পূর্বে স্থচিত্রা নাম ইঞ্জির হয় খ্যাতি ॥  
 কুলীন গ্রামেতে বসু রামানন্দের স্থিতি ।  
 চম্পকলতিকা পূর্বে যার নাম খ্যাতি ॥  
 মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ ।  
 দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটখ্যান ॥  
 অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম ।  
 এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥  
 গোবিন্দঘোষ রত্নাদেবী বাসু হৃদেবী কয় ।  
 মাধবঘোষ তুঙ্গবিজ্ঞা জামিবা নিশ্চয় ॥  
 কোঙরহটে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস ।  
 ইন্দুরেখা সখী পূর্বে জামিবা নির্গাস ॥  
 অঙ্গুরাণ বিধের নাম এইমাত্র হৈল ।  
 এখে আর বিধের নাম লেখা নাহি গেল ॥

যে যে পরিক্রমা কল্পবাসে হয় ।  
 সে সকল গ্রাম লিখি জানিহ নিশ্চয় ॥  
 গ্রাম আর ভক্ত নাম করিয়ে লিখন ।  
 অপরাধ ক্ষমা কর সর্বভক্তগণ ॥  
 শ্রীমন্ত মহাপাট জানিবা সর্বজন ।  
 শ্রীখণ্ডে অনেক ভক্ত লভিলা জনম ॥  
 শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ।  
 চিরঞ্জীব কবিরাজ আর সুলোচন ॥  
 সরকার ঠাকুর খ্যাতি করে ভক্তগণ ।  
 অনেক ভক্ত জন্মহেতু মহাপাটখ্যান ॥  
 কুলিয়া পাহাড়পুর দুইত নির্দ্বার ।  
 বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥  
 এই দুই গ্রামে তিনে সদত থাকয় ।  
 কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥  
 কাঁচড়াপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কখন ।  
 শ্রীকান্ত সেন কবিকর্ণ শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥  
 পানিহাটা গ্রামে রাঘব দয়মন্ত ধাম ।  
 রাঘবের ঝালিবলি আছেয়ে আশ্রয়ন ॥  
 বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস ।  
 সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তমদাস ॥  
 চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম ।  
 ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম ॥  
 কানীন্দ্রর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর ।  
 শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত আদি বাস সবাকার ॥  
 বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর । \*  
 বগনপাড়াবাসী শ্রীরামাঞ ঠাকুর ॥  
 গোপ্তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী ।  
 বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি ॥



জিরাটে মাধবাচার্য আর গঙ্গাদেবী ।  
 যশাডাতে জগদীশ নিত্য বিনোদী ॥  
 জালিসহর নতি গ্রামে নারায়ণী-স্মৃত ।  
 ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন-বিদিত ॥ \*  
 নতিগ্রাম জন্মান্তর স্থিতি দেবদুডাতে । †  
 ত্রিচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥  
 বরাহনগরে ভাগবতাচার্যের বাস ।  
 নৈহাটীতে রূপসনাতন আছিল নির্ঘাস ॥  
 যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয় ।  
 সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয় ॥  
 পাট-নির্ণয়-গ্রন্থে ‡ আছে বিস্তার ।  
 তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্বার ॥  
 পাটপর্যটন এই সমাপ্ত হইল ।  
 অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল ॥

ইতি পাট-পরিক্রমা পাট-পর্যটন সমাপ্ত ।

অভিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত ।  
 তা সভার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত ॥  
 খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস ।  
 কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥  
 বুঢ়নগ্রামেতে হরিদাসের বসতি ।  
 হেলাগ্রামে পাখীয়া গোপালদাসের স্থিতি ॥  
 পাকমাল্যাটিতে বাস গুণ্ড্যানারায়ণ ।  
 সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন ॥  
 দাড়িয়ামোহন নাম বলে সর্বজনে ।  
 কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলম্বণে ॥

\* শ্রীবৃন্দাবনদাসকে কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ ব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

† দেবদুড়া—ইহার বর্তমান নাম দেবুড় বা দেহুড়, এখানে শ্রীবৃন্দাবনঠাকুরের পাট এখনও বিদ্যমান ।

‡ পাটনির্ণয়-গ্রন্থ বঙ্গি কাহারও নিকটে থাকে, সন্ধান দিয়া বাখিত করিবেন ।

মহিনামুড়িতে বাস সতরাঘব নাম ।  
 সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান ॥  
 ভক্তমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম ।  
 পরম বিদ্বান্ বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥  
 দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত ।  
 সোনাতোলা রজাদেশে রজনকৃষ্ণ দাসনিষ্ঠিত ॥  
 মালদহে মুরারি দাস করেন বসতি ।  
 পানিহাটীতে ঠাকুরমোহনের স্থিতি ॥  
 রাখানগরেতে বাস যদুহালদার ।  
 হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর ॥  
 মহেশগ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম ।  
 কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥  
 পাটলাগ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ ।  
 নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথদাস আখ্যান ॥  
 চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর । §  
 পাতাগ্রামে ॥ বিদূর ব্রহ্মচারী সতত বিহার ॥  
 বিনুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণদাস নাম ।  
 গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকরদাস আখ্যান ॥  
 গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য ত্রিনিবাস ।  
 অঙ্গশাখা আচার্য্য জানিবা নির্ঘাস ॥  
 বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম ।  
 সাড়েচব্বিশ শাখার কহি নাম গ্রাম ॥  
 ত্রীরক্তেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥

ইতি অভিরামচন্দ্রের শাখা-নির্ণয় সমাপ্ত ।

শ্রীঅধিকাচরণ ব্রহ্মচারী

§ বোধ হয়, বর্তমানকালের পাতুল গ্রাম, কারণ এই স্থানে অভিরামের এক শাখার নিবাস-স্থিতি ।

॥ রসকলিকা গ্রন্থ-প্রণেতা নন্দকিশোর দাস ॥

## ছুইখানি অসমীয়া পুঁথি—কথাভাগবত ও স্কন্ধাবিষ্ণু\*

এই গ্রন্থ দুইখানিৰ মध्ये যাহা প্ৰথমে উল্লেখ কৰিতে মনস্থ কৰিয়াছি, তাহা ভাৰত-বৰ্ষীয় হিন্দুসাধাৰণেৰ সৰ্বজনবিদিত মহাগ্ৰন্থ—“শ্ৰীশ্ৰীমদ্ভাগবতশাস্ত্ৰ”। অসমীয়া ভাষায় ইহাৰ দ্বাদশস্কন্ধেৰ সুললিত এং সচজ ও স্তবোধাপূৰ্ণ পদ্মানুবাদ বিद्यমান থাকা সত্বেও ভক্তচুড়ামণি স্বৰ্গীয় ভট্টদেব গোস্বামী সংক্ষিপ্ত পদ্মানুবাদ রচনা কৰিয়া জনসাধাৰণেৰ নিকট প্ৰচাৰ করেন।

এখানে গ্ৰন্থকাৰেৰ সংক্ষিপ্ত পৰিচয়টুকু প্ৰকাশ কৰা আবশ্যক হইত্বেছে। সম্ভাৱতঃ ৮ শ্ৰীদামোদৰদেব-গুৰুৰ নাম এতদ্দেশীয় হিন্দুসন্তানগণেৰ নিকট সুবিদিত। যে সময় মহাপুৰুষ ৮ শ্ৰীশঙ্কৰদেব ধৰ্মপ্ৰচাৰ করেন, সেই সমসাময়িক কালে উপরোক্ত মহাত্মা পৌৰাণিক বৈষ্ণৱধৰ্ম্মেৰ সত্ৰ স্থাপনে যত্নবান্ হইয়া কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। বৰ্ত্তমান সময়ে আসামদেশে মহাপুৰুষীয়া সত্ৰবাদে যতগুলি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত আছে, তৎসমস্তই প্ৰায় উল্লিখিত শ্ৰীদামোদৰ গুৰুৰ অনুবৰ্ত্তী শিষ্য-প্ৰশিষ্য দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হয়। এতদ্দেশীয় মহাপুৰুষীয়া সম্প্ৰদায় জিন্ন অপৰ প্ৰায় সমস্ত অধিবাসীই দামোদৰীয়া সম্প্ৰদায় নামে সুপৰিচিত। শাক্ত-শৈৱাদি অপৰাপৰ সম্প্ৰদায়েৰ জনসংখ্যা উক্ত দুই সম্প্ৰদায়েৰ তুলনায় উল্লেখ্যৰ অযোগ্য। মহাপুৰুষীয়া সম্প্ৰদায়েৰ বড়পেটা-সত্ৰ যেকুপ কেন্দ্ৰস্থানীয়, দামোদৰীয়া সম্প্ৰদায়েৰ তত্ৰুপ কেন্দ্ৰস্থানীয় পাটবাউসী-সত্ৰ। বড়পেটা এং পাটবাউসিৰ ব্যবধান কিছুদধিক এক মাইল মাত্ৰ।

৮শ্ৰীদামোদৰদেব ইহসংসাৰ হইতে বিদায় লইবাৰ প্ৰাকালে তাঁহাৰ প্ৰিয়শিষ্য এং আত্মীয়-স্বজনৰ সমীপে যাচঞা কৰিয়াছিলেন যে, তাঁহাৰা উপাদেয় ঋণ সংগ্ৰহ কৰিয়া তাঁহাকে ভোজন কৰাইয়া পৰিতৃপ্ত করেন। এই যাচঞাৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিয়া দূৰ দূৰান্তৰ হইতে তাঁহাৰ শিষ্য-প্ৰশিষ্যোৰা এং আত্মীয়-স্বজনেৰা স্বীয় স্বীয় কল্পনা ও ক্ৰটি অনুসাৰে নানাপ্ৰকাৰ সুখাশ সংগ্ৰহ কৰিয়া তাঁহাৰ সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন এং যে বেকুপ ঋণ সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে বিজ্ঞাপন কৰিয়াছিলেন। সকলেৰ আনীত ঋণেৰ নাম শ্ৰৱণ কৰিয়া ৮দামোদৰদেব পৰিশেষে তাঁহাৰ প্ৰিয়তম শিষ্য ভট্টদেব গোস্বামীৰ সংগৃহীত ঋণাকেই পছন্দ কৰিয়াছিলেন। সেই ঋণাবল্ল অল্প কিছুই নহে, শ্ৰীশ্ৰীমদ্ভাগবত শাস্ত্ৰেৰ সংক্ষিপ্ত অসমীয়া গভ্ৰানুবাদ গ্ৰন্থমাত্ৰ। ইহা “কথাভাগবত” নামে আসামে সুপৰিচিত।

উপাদেয় ঋণ এ প্ৰকাৰে গ্ৰন্থে পৰিণত হওৱাতে এং তাহাতেই গুৰু দামোদৰদেব হই-চিত্ত হইয়া সেই নবস্ৰষ্টিত ভাগবতশাস্ত্ৰ সৰ্বজন-সমক্ষে পাঠ কৰিবাৰ জন্তু রচৰিতাকে আদেশ

\* সেইবিধি বৰ্দ্ধকহিত্যস্বৰূপী সত্যৰ প্ৰকাশ অধিব্যবহাৰে পঠিত।

প্রদান করাতে সকলেই পবনাস্তগায়িত হইয়াছিলেন। যখন ৬ ভট্টদেব গোস্বামী তাঁহার ইষ্ট-দেব এবং ভক্তজনমণ্ডলীর সাক্ষাতে সর্বপ্রথম ‘কথাভাগবত’ গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃ-মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সর্বের ত্যায় একাগ্রমনে পাঠ সমাপন পর্যান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরম শান্তি-বসে আল্লাত হইয়াছিলেন।

পাঠসমাপ্তির পর গুরু দামোদরদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি এবিধ উপায়ে খাণ্ড চাহিয়াছিলেন। সংসারবিরাগী পুরুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অপর কোন পার্থিব খাণ্ডই উপায়ে হইতে পারে না। অনেকে ব্রাহ্ম হইয়া তাঁহার জ্ঞান কণিক রসনা-তৃপ্তিকর খাণ্ড সংগ্রহ করিয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, সে জ্ঞান তিনি নিরতিশয় দুঃখিত। ভট্টদেব গোস্বামী তাঁহার জনন্যেব অভিলষিত খাদ্য-সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়াতে তিনি পরমাত্মাদিত হইয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাতক বাচ্য সনাত শিবামণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, স্বত্বাং তাঁহার অন্তর্ভুজ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ধর্মগদি-সংরক্ষণের উপযুক্ত লোক একমাত্র ভট্টদেব গোস্বামীই স্থিতিরূত হইলেন।

তাঁহার বাক্যসমাপ্তির পর সকলেই লচ্ছায় মিয়মাণ হইয়া অধোবদন হইলেন। অবশেষে গুরু দামোদর স্বকীয় গলদেশ হইতে তুলসীর মালা উন্মোচন করিয়া ৬ ভট্টদেব গোস্বামীর শিবে অর্পণ করিয়া অন্তঃস্থ শিবা এবং স্বজনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“তোমরা অজ্ঞ হইতে ভট্টদেব গোস্বামীকে আমার স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিও। আমার প্রতিষ্ঠিত পাটবাউসী সত্রে গদিতে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার অনুবর্তী হইয়া সকলেই ধর্ম-কার্য সম্পন্ন করিও। আমি এইক্ষণে তোমাদেব এবং সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।” এই উপদেশ প্রদানান্তর তাঁহার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইল।

ভট্টদেব গোস্বামী পাটবাউসী সত্রে ভাগবতপাঠক ছিলেন। তাঁহার দশটা নামের মধ্যে “ভট্টদেব” ও “বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন” নাম দুইটিই আমার জানা আছে। অপর নাম এবং আবশ্যক অজ্ঞাত তত্ত্ব পাটবাউসী সত্রে অনুসন্ধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। বর্তমান পাটবাউসী সত্রে অধিকারী গোস্বামী এবং তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ, তাঁহারই বংশধর।

পাটবাউসী সত্রে ভাগবতপাঠক ব্রাহ্মণকে সত্রে গদির ভার সমর্পণ করাতে ৬ গুরু দামোদর দেবের ব্রাহ্মণ কুল হইয়া তাঁহার পাটবাউসী সত্রে সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্বে সত্ৰস্থাপনপূর্বক ৬ দামোদর গুরুর ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সত্রে নাম অজ্ঞাপিও পোমারাসত্ৰ নামে প্রসিদ্ধ। ■

এক্ষণে কথাভাগবত গ্রন্থের রচনার পরিচয় প্রদান করিতেছি—

\* দামোদর গুরুর ব্রাহ্মবংশের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠদেব গোস্বামী সম্প্রতি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দামোদর গুরুর পাছকা কোচবিহার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নূতন সত্ৰ প্রতিষ্ঠাপূর্বক পাছকা সংরক্ষণ করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, আসামবাসী দামোদরী সম্প্রদায়ের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহার উক্ত অভ্যন্তর প্রশসনীয়।

## আরম্ভণ

শ্লোক ॥ যো লোকমোক্ষায় যশোবিততৈ চকার লীলাং ব্রজবাসীভূত্যাঃ তঃ গোপ-  
বেশং প্রণয়ামি কৃষ্ণং সঙ্কীৰ্ত্তীগীতোদ্যোগোপপৃষ্টং । শ্রীকৃষ্ণপাদযুগলাভুলুপকৃষ্ণাঃ গায়ন্তি  
সজ্জনমনোহরশাস্ত্রমুচ্চৈঃ সম্প্রদায় কথয়ামি গাথাং মদকৃতবৃন্দরটনায় সতাং জনানাং ॥

কথা ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণবিস্কৃ দেবকীনন্দন পরানন্দ গোবিন্দঃ যো জগতঈশ্বর পূর্ববোক্তনঃ  
সকললোকক রূপায় অবতারি বহুবিধ লীলাকরলঃ সেই গোপবেশ নন্দনন্দন-চরণে সহস্রকোটি-  
বার প্রণাম করো ॥ যার নাম পাপহরঃ পদনমস্কলমুকুতিদায়কঃ তাহান চরিত্র শ্রীভাগবত-  
শাস্ত্র দাদশস্কন্ধ তিনশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ তাহাব কথাবন্ধে কিছু নিবন্ধিতে চাঞা ॥  
মঞিঅন্ন-মতিঃ তথাপি শ্রীদামোদরের আশ্রয়ঃ সন্তুষ্টবদ অন্তমোদনে টিকাভাবা অনুসারি  
সম্ভোপ প্রকারে নিবন্ধিবো প্রথমে প্রথমস্কন্ধ কহো ॥ বিশ্বস্থিতিআদি নবলক্ষণে লক্ষিতঃ  
জগতর পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে নমো ॥ বেদব্যাসস্বর্গ প্রথমে নানাশাস্ত্র করিলাঃ  
তথাপি নন প্রশ্ন নটোলঃ পরম খেদত শ্রীদামোদর উপদেশেঃ শ্রীভাগবত করিতে  
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পবনেশ্বরকচিত্তস্তঃ বাহ্যাত মিছাপ্রপঞ্চ প্রকাশেঃ বাতহন্তে জগতর স্থিতিস্থিতি-  
সংহার হয়ঃ প্রকৃতিপুরুষতপর একাবোজ্ঞানদাতা সত্য সাক্ষ্য তাহাক চিন্তায়োঃ সকল  
শাস্ত্রত কবি শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠঃ যাক শ্রীনারায়ণে কহিছাঃ যাত কহে পরমেশ্বর হরিভজন  
মোক্ষতো করি শ্রেষ্ঠঃ যাত ব্রহ্মজ্ঞান অবহে হয়ঃ পরম স্তব দেইঃ তিনি তাপহরেঃ আনশাস্ত্রে  
তার উক্ত সাধনেয়ো ঈশ্বরক সত্যো হৃদয়ত স্থিতি করিতে না পাবেঃ ইহার গুহ্যমু সকলে  
তৎক্ষণে হরিক হৃদয়ত রাণেঃ বুলিবা সবে কৈনে হুগুনয়ঃ যতোপুণ্যাবিনে শ্রবণত ইচ্ছা করিতে  
নাপারে ॥ বেদকল্পতরুঃ তারফল ভাগবতশাস্ত্রঃ কেবল অনুভূতস বৈকুণ্ঠে আছিলঃ  
নারদে আনি ব্যাসক দিলঃ ব্যাসো গুরুক পড়াইলাঃ গুরুমুখে পৃথিবীত ব্যক্ত ভৈলাঃ  
আকজানি হে রসিক সব সদায় পানকরাঃ যাতো মুক্তু আদরেঃ এন জানি সমাজিকসব  
শ্রীভাগবত সাবধান মনে নিত্যে শ্রবণ কীর্ত্তনকরা প্রথমে ডাকি হরিবোল হরি ॥ ১ ॥

## প্রথম স্কন্ধ প্রথমোধ্যায় আরম্ভ

নৈমিষারণ্যত সৌনকাদি মুনিগণে বিষ্ণুপ্রাপ্তিঅর্থে সহস্রবৎসর যজ্ঞকরন্ত ॥ একদিনা  
প্রভাতে সর্বকর্ম করি পুরাণবক্তা হৃতক আদরি প্রশ্ন করন্তঃ হে হৃত তুমি পুরাণ ভারত  
ধর্মশাস্ত্রচর পঢ়ি ব্যাখ্যা করিছাঃ আরো ব্যাসাদিমুনিগণে যি জানন্ত তাকো জানা ॥ যতো  
প্রশ্নশিষ্যত গুরুসবে গুরুকো কহেঃ সেই সেই শাস্ত্রত পুরুষর একান্তিক প্রশ্নস তুমি নিশ্চয়  
করি শ্রুগমমতে কহ ॥ বুলিবা আনো বিচারি জানকঃ তাঁক নপারে ॥ যাতো কলিযুগে  
লোক অন্মায়ু অন্নমতি অন্নভাগ্যঃ আরো নানাতাপে তাপিতঃ এতেকে বহুশাস্ত্র বিভাগি  
গুনিতে লোকে নশাসে ॥ আকজানি তুমি সর্বসার উদ্ধারি লোকর কুশল অর্থে কহ ॥ যাত  
লোকর মম প্রশ্ন কইবেক ॥ আরো প্রশ্ন করোঃ ভগবন্ত দেবকীর গড়ে কি নিমিত্ত উপ-

জিল। তাকশ্রদ্ধায় শুনিতে চাঞা : যার নামে সংসার হরে : যার ভক্তকদর্শনে লোক পবিত্র হয় : যারবশে কলিমল বিনাশে : এতেকে তাহান কথা কোনে হু তুনিব : আরো স্ঠ্যাঙ্গাদিলীলা কহ : যাক নারদাদিরো গায় : আরো হরির অবতারর কথা কহ : যাকশুনি তুপ্তি নাই : যাতো ক্ষেণে ক্ষেণে স্বাদতো করি স্বাহ : আরো শ্রীকৃষ্ণর চরিত্র কহ : বলভদ্রসহিতে যে যে কৰ্ম করিছা ॥ আরো প্রশ্ন করো : ধর্মর রক্ষক কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠক গৈলে ধর্মের কাহাত শরণ পশিল : এহি চয় প্রশ্ন আমত বুঝাই কহ : হেন বুলিবা তোরা বজ্রদিত আকুল : কেমনে এতেক কথা শুনিবা : আমি কলিকাল দেখি তাক ডয়ে তরিবাক লাগি দীর্ঘসজপতি আছো ॥ এতেক শুনিতে অবজর পাই ॥ শ্রীদামোদর পাদপদ্ম মধুভূত কবিরত্নকুতারাং শ্রীভাগবতকথারাং প্রথমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ হে কৃষ্ণ রূপাময় : মহেশ্বর যাক জানিবাক লাগি ঋষি সরেচর প্রশ্ন করিলা : হেন ভগবন্ত কথা আরম্ভি তাক প্রণাম করো ॥ আকজানি সমাজিক সব ডাকি হরিবোল হরি ॥

সমাপন ।

### দ্বাদশ স্কন্ধ ত্রয়োদশোধ্যায় আরম্ভ

শ্লোক ।

দ্বাদশস্কন্ধসম্বন্ধং প্রবক্তেহু নিবন্ধিতং ।

দ্বাদশে দ্বাদশোহধ্যায়কথিতং হরিকীর্তনং ॥

কথা ॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাণর সংখ্যা কহিবা ॥ হুতে বোলন্ত জানা শোনক আবে তোমাত পুরাণর সংখ্যা : ভাগবতর দান পাঠাদির মহিমা কহ ॥ ব্রহ্মপুরাণের দশ সহস্র শ্লোক : পদ্মপুরাণের পাঞ্চমন্ড বাটহাজার শ্লোক : বিষ্ণুপুরাণত তেইস হাজার : নার্ক-ওর পুরাণত পোখরহাজার : বহুপুরাণর সেহি মান : শিবপুরাণ চব্বিসহাজার : স্বন্দ-পুরাণ একশ একাসিহাজার : বামনপুরাণ দশহাজার : কুর্খপুরাণর সতর হাজার : মন্তর চৌধ হাজার : গরুড় উনৈশ হাজার : ব্রহ্মাণ্ডে বাটহাজার : এমনে অষ্টাদশ পুরাণে চারিলাখ বুজিবা : তাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্রীভাগবত বুজিবা : যাক ভগবন্তে রূপার ব্রহ্মমাত কহিছা : যার আদি অন্ত মধ্যত বৈরাগ্য কহিছে : যার হরিলীলাযুতরসে সাধু-দেব সব আনন্দ লাভে : যাতো সর্ববেদর সারোদ্ধার এতেকে একবস্তত নিষ্ঠা করাবে ॥ কেবল তক্তিক প্রয়োজন কহে : আক যি স্বর্গ সিংহাসনত থৈয়া ভাদ্রর পূর্ণিমাত দান করে সি অবশ্রে পরম পদ পাবে তারে সে আন পুরাণ প্রকাশ করে : যাবত অমৃতসাগর ভাগবত ন শুণে যাতো আর রসে তৃপ্তজনর আনত রতি নহরে : নদীর মধ্যত যেন গঙ্গা : দেবর মধ্যত অচ্যুত ॥ বৈকবর মধ্যত মহেশ তেমনে পুরাণর মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ বুজিবা : এতেক শ্রীভাগবত বৈকব সবর প্রিয় ॥ যাত পরমজান কহে যার তক্তিরে পুরুষমুক্ত হবে : যি ভগবন্তে রূপার ব্রহ্মমাত শ্রীভাগবত কহিছা ব্রহ্মরূপেরো নারদ কহিছা : নারদরূপেরো ব্যাস কহিছা : ব্যাসরূপেরো শুককবিনা : শুকরূপেরো পরিকীর্তিত কহিছা ॥ হেন শুকবুদ্ধ

ভগবন্তক মঞ্চি চিত্তো ॥ যাক ব্রহ্মাক্রুদ্রইন্দ্রাদি স্তুতি করে : বেদেরো যাক গাবে যোগী সবে  
 ধ্যানত যাক দেখে : যার অন্ত না জানে হেন পরমেশ্বরক প্রণাম করো ॥ যি মুনিয়ে  
 পরিকীত রাজক ভাগবত শুনায়া মুক্ত করাইলা হেন যোগেন্দ্র শুকক প্রণাম করো ॥  
 শ্রীভাগবতকথারাং কবিরত্নকুতারাং দ্বাদশস্কন্ধে ব্রহ্মোদশোধায় ॥ এহিমান্নে ইকর গৈল ॥  
 হে সাধুসব মঞ্চি শ্রীদামোদরর আক্তারে সংখেপে ইকথা নিবন্ধ করিলো : ॥ যি  
 অর্থ অল্পথা হৈল তাতনোত দোষ নে দিবা যতো মুনির মতি ভ্রম হয় : মঞ্চি পুত্ৰ অতি  
 অল্পমতি : তথাপি কৃষ্ণকথা বুলি সন্তোষ হৈবা ॥ যাতে সামান্য বাক্যে হরিগুণ মিশ্র  
 হৈলে মহন্তসবে শ্রবণ কীর্তন করে : সেহি বাক্যেরো জগত শুদ্ধি করে : নারদ অকুর  
 বাক্যত আর প্রমাণ আছে ॥ এতেকে যোক অহ্মা ন করি কথাক আদর করা  
 যদি আপনার কুশল চাবে ॥ হে কৃষ্ণ রূপাসাগর পরমানন্দ তোমার চরণত কোটীবার  
 প্রণাম করো : একলেশ রূপাকরা ॥ যেমনে তবুগুণ যশত মোর বাক্য-মন-কর্ণ বিরাম  
 নহোক তেমন করা : যাতে তোমার চরণত শরণ পশিছো দীনক উপেক্ষা ন করিবা ॥  
 যাতে তুমি দীনদয়াল অনাথর বদ্ধ পতিতপাবন : এতেকে আপুনার নামক সত্থের  
 করি মোক রূপাকরা : সমাজিক সব উচ্চকরি হরিবোল হরি ॥ সমাপ্ত ॥”

এখানে কথাভাগবতের কথা শেষ করিয়া অপর গ্রন্থখানির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয়  
 দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ২য় গ্রন্থখানির মূল সর্বজন-পরিচিত “পদ্মাপুরাণ”। ইহার  
 গল্পাবলম্বনে কবির ৬ নারায়ণদেব একখানি গীতি-কাব্য রচনা করিয়া জনসমাজে  
 প্রচার করেন। গ্রন্থখানি আরতনে প্রায় রামায়ণের সমান হইবে। গ্রন্থের নাম “সুত-  
 নারি” বলিয়া এদেশে সুপরিচিত। সমস্ত গ্রন্থখানি গীতিচ্ছন্দে বিরচিত। আসাম-  
 দেশে দুর্গাপূজা এবং মনসাপূজার উৎসবোপলক্ষে গায়কেরা খুটীতাল সংযোগে উক্ত  
 গ্রন্থের আখ্যায়িকা সকল গান করিয়া থাকে। মনসাদেবীর পূজার সময় বেউলা  
 লক্ষ্মীন্দরের আখ্যায়িকা গান করা পূজার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। দরঙ্গ-  
 জিলার লোকের মধ্যেই এই গায়কের দল সমধিক। কারণ এই গ্রন্থ দরঙ্গরাজের  
 অমুজ্জায় তাঁহার সভাপণ্ডিত কবির নারায়ণদেব রচনা করেন এবং উক্ত রাজা-  
 কর্তৃক এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ লোক সংগ্রহ করিয়া গায়কের দল সংগঠনপূর্বক নবরচিত  
 গীতি সকল শিক্ষাদান করেন, সুতরাং সর্বপ্রথম দরঙ্গ জেলাতেই এই সমস্ত গীতি  
 সুর-সংযোগে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্তমান কামরূপ জিলা পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি হইয়া  
 পড়িয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিচয় আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। দরঙ্গরাজপরিবারের বংশধর-  
 গণের সমীপে অল্পমুকান করিলে তাঁহার পরিচয় জানা যাইতে পারে; দরঙ্গরাজ  
 কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা, চিলাঙ্গারের বংশধর।

এইখানে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। গ্রন্থের পরিচয় দিবার জন্য “সুতনারি” গ্রন্থ

হইতে আরম্ভণ এবং মধ্য খণ্ডের কতকগুলি পদাবলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। সহৃদয় পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

### সুকনামির গল্প-আরম্ভণ

ধূয়া ॥ আজি ঘরে রহণ না বাইনারে মুরারির গাণ শুনিয়া ॥  
 পদ বাম রাম বোল ভাই রামনারায়ণ ।  
 তযুপায়ে পদ্মাবতী লৈলোহো শরণ ॥  
 রাম রাম বোল ভাই মুক্ত হোক পাণী ।  
 অন্তকালে উদ্ধারিয়ো রাম বিষ্ণুকৃপি ॥  
 একমনে পুত্র কথা শুন বুদ্ধজন ।  
 মুনিমুখে শুনি কিছু সৃষ্টির পতন ॥  
 বান্দীকি বশিষ্ঠ আর যত কবিগণ ।  
 সনক সনাতন আর নারদ তপোধন ॥  
 হরষিত হইয়া সকল মুনিগণ ।  
 মহাযজ্ঞ আবন্তিলা লোমস তপোধন ।  
 লোমসে কহিলা কথা শঙ্করের ঠাই ।  
 পূর্বের বিবরণ কথা কহতো গোসাই ॥  
 স্বর্গ ঈশ পাতাল হইল কেনমতে ।  
 সত্ব রজ তমগুণ হৈল কার হণ্ডে ॥  
 কিমতে হইল শুনি সমুদ্রমথন ।  
 কিকারণে ভঙ্গ হৈলা দেবতা মদন ॥  
 কিকারণে ষোড়শ হৈল মহেশ্বর ।  
 কিকারণে জন্মিলা চণ্ডী হিমালয় ঘর ॥  
 কিকারণে পুষ্পধারি গৈলা ত্রিপুরারি ।  
 কেমন প্রকারে জন্ম হৈল বিষহরী ॥  
 সনকে শুনিয়া তেবে লোমশ বচন ।  
 নিরঞ্জন করমায় হৈল নারায়ণ ॥  
 সেতুই করিয়া মুখে বাহির হইল ।  
 সেহি সে সেতুকাশ্যপী নামক ধরিল ॥  
 ধরিতে চাহিলা তার পীড়িত মদন ।  
 চারিদিশ হইতে হৈল মুখের বচন ॥  
 তাতে ধরিয়া তারে বসাইলা উন্নয়ে ।



নহে স্ত্রী নহে পুরুষ অক্ষয় শরীরে ॥  
 অধোভাগে গুপ্তঅঙ্গ বিদারিলা নখে ।  
 কেলিকলা কোড়হল কবে নানা স্রুথে ॥  
 বিশ্বভৈতে গাছ হৈল রাত্রি হৈতে দিবা ।  
 সত্ত্ব রজ তমগুণে জন্মিল তিনি দেবা ॥  
 সত্ত্বগুণে নিম্নো হৈল ব্রহ্মা বজ্রোত্তমগুণে ।  
 তমোত্তমগুণে মহেশ্বর জানে ত্রিভুবনে ॥  
 ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি বিষ্ণুরূপত পালন ।  
 শিবরূপে সংহাব কবয় ত্রিভুবন ॥  
 সনকে কছিল কণা লোমশ বড়াবড় ।  
 যিবারূপে হৈল তাহা অবধান কর ॥  
 দেবীক পাঠায়া তবে মহাদেবের ঠাই ।  
 নিরাকার হৈয়া ভাসে অনাদি গৌসাই ॥  
 বটপত্রে নিতে যাবে করিয়া শয়ন ।  
 যোগনিদ্রা আরম্ভিলা তেয়াগি চেতন ॥  
 দুইপায়ক ধবিআছো সংখ্যে আঙ্গুলি ।  
 বালকরূপে দিলা হাত + + + +  
 অনেক অনন্তরে সে জলত ভাসিল ।  
 মধুকৈটভ দুই অশ্বর জন্মিল ॥  
 তার পুণকথা তুমি করিয়া শ্রবণ ।  
 কহিব তোমার আগে সব বিবরণ ॥  
 বেকতে শুনিলে হরে পাঁপর বিনাশ ।  
 রাহয়ে ছারিলে যেন চন্দ্র প্রকাশ ॥  
 একে একে যত কথা জিজ্ঞাসিয়া তুমি ॥  
 শুনহ সকলকথা কৈয়া দিবো আমি ।  
 স্কন্ধবিবলভ হয়ে দেব নারায়ণ ॥  
 এক লেচারি কহি অনাদি জনম ॥

লেখায়ি পঠমস্তরীয়াগ

শুনিয়া লোমশ বাণী                      বুজিলা সনক মুনি  
 পূর্বকথা কহি আমি তোতে ।  
 বিরূপে নিরঞ্জন                      সৃষ্টি কৈলা পতন  
 শুনহ শুনহ এ চিত্তে ॥

স্বর্গ মঞ্চ পাতাল                      নাছিল মেরুমন্দর,  
 নাছিল পবনর গতি ।  
 আত্ম অন্ত নাহি জানি              শূন্য উপজিলা বৃনি,  
 নিরঞ্জন ভৈলা উতপতি ॥  
 নাভি হৈতে জ্যোতির্ময়              জ্ঞান চৈতন্য হয়,  
 পরমপুরুষ তাত্ত্ব স্তিতি ।  
 নারূপে উতপত্তি              দ্বিতীয়া নাহিকে স্তিতি,  
 এক পুরুষ নিরঞ্জন

+   +   +   +   ইত্যাদি ।

দিহা ॥

বেফলা জাগ উঠা মোর প্রিয়া ॥  
 উঠ উঠ অহে প্রিয়া কত নিদ্রা ঘাস ।  
 মোক থাইলা কিবা নাগে চক্ষুমেলি চাস ॥  
 তত্রি হেন অভাগিনী নাই ক্রিতিতলে ।  
 অকালত রারী হৈলি খণ্ডব্রতর ফলে ।  
 কত জন্ম খণ্ডব্রত কৈলি গুরুতরে ।  
 অকালত তোকে এড়ি যাও লক্ষীন্দরে ॥  
 মাও মরিবেক মোর মরণ স্নানিয়া ।  
 অনলত বাষ্প দিয়া মরিবো পুরিয়া ॥  
 মননে পীড়িত হৈয়া চাইলো আলিঙ্গন ।  
 লজ্জার কারণে তুই হু তুশিলি মন ॥  
 লুকবি নারয়েগদেবের সরস পঞ্চাঙ্গী ।  
 লখাইর বচন বুলি এক বে লেছারী ॥

দিহা ।

উঠ কমলমুখী জাগ প্রিয়া কতনিদ্রা কবা মুখে ।

পদ ।

তোমার যতেক নিদ্রা কালনাগে দিলা ছিদ্রা

মরি যাও মই যমের ভুবন ।

আমি হুই একে সঙ্গে              মেরত আছিলো সঙ্গে,

কোন দেবে দংশিল নাজানো ॥

তোমার আমার বিহা,              বিধে মোর প্রাণ যায়,

মইলে হুখ মিলিবো অপার ।

কিনা আঙ্গুলির বিধে,              সর্কাজে অলিঙ্গা বিধে,

পুরোহিত আনহ সখর ॥

আঠমান পালাক বিবে নাজানোমোক থাইলা কিসে  
যায় বিব উজান বেঁবায় ।

উরতমান পাইলো বিবে নাজানো মোক থাইলো কিসে  
সপ'র বিব বজ্রর সমান ।

কোকাল মান পাইলা বিবে, নাজানো মোক থাইলা কিসে  
সপ'র বিব দগধে পরাণ ।

পেটমান পাইলা বিবে নাজানো মোক থাইলা কিসে,  
যায় বিব সহস্র নালায় ।

বুকত ধরিলো বিবে নাজানো মোক থাইলো কিসে  
নাট লখাইর বদনর হাস ।

নাসিকাত ধরিলো বিবে নাজানো মই থাইলা কিসে  
নাট লখাইর নাকর নিশ্বাস ।

সুমরিয়া হরিহর প্রাণ তাজে লক্ষীন্দর  
চলিপরে পালঙ্গির উপর ।

নারায়ণদেব কন স্ককবি বলভে হর ।  
কালিনাগে থাইলা লক্ষীন্দর ।

### “কথাভাগবত ও স্ককনামি প্রবন্ধের পরিশিষ্ট”

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়—আসামপ্রদেশের এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি । তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে পারিয়াছি—  
কথাভাগবত—এই গন্থগ্রন্থখানি হস্তলিখিত পুঁথিৰ আকারে অবস্থিত । অতি অল্পাংশমাত্র আসামীরা ইণ্টারমিডিয়েট ও বি, এ, পরীক্ষার্থীগণের পাঠ্যগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে । উত্তমবাবুর বাড়ীতে যে গ্রন্থখানি আছে, তাহা প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে । উহা সাটীপাতে অর্থাৎ অশুকত্বকে লিগিত, প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ভট্টদেব গোস্বামী শকাব্দা ১৪২১ সনে কামরূপের বজালি অঞ্চলে বিছানকুস গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৫০২ শকে দেবদামোদর কর্তৃক পাটবাউসি সত্বেয় অধিকারী নিযুক্ত হন এবং ১৫০৯ শকে পরলোকগমন করেন । তাঁহার বংশধর বর্তমান কেহ নাই । বর্তমান পাটবাউসি সত্বেয় অধিকার ভট্টদেবের ভ্রাতার অধস্তন দশম পুরুষ । ভট্টদেব যে সময়ে অসমীয়াভাষায় এই গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ কিছু ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, আশাকরি পরিবর্ধের কোনও অভিজ্ঞ সত্য তথ্যের আলোচনা করিবেন ।

স্ককনামি—এখানিও হস্তলিখিত পুঁথি । আজ প্রায় ৬০ বৎসর হইল উত্তমবাবুর পিতৃদেব মহাশয় একখানি প্রাচীন সাটীপাতের পুস্তক হইতে একখণ্ড পুঁথি নকল করাইয়াছেন,

ছই তিনদিন মধ্যে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার পুঁথিখানি নকল কবাইতে তাঁহাকে বহুলোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই পুঁথি কামরূপে কমই আছে, দরঙ্গ ও ছই এক স্থলে থাকার সম্ভব। সুকনান্নি নামের তাৎপর্য্য এই। ইহা সুকবি নারায়ণ দেবকর্তৃক রচিত হওয়ায় ইহার নাম ‘সুকবি নারায়ণী’ হইয়াছিল, তৎপর বর্ত্তমানে সংক্ষিপ্ত হইয়া ‘সুকনান্নি’ হইয়াছে।

আমি বালাবধি পদ্মাপুরাণরচয়িতা নারায়ণ দেবের কথা স্বদেশে (শ্রীহট্টে) শুনিয়াছি, তাঁহাকে আমাদের অঞ্চলের লোক বলিয়াই ভাবিয়াছি, তাই উত্তমবাবুকে নারায়ণদেবের জন্মস্থানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছেন যে নারায়ণ দেবের জন্মস্থান কোথায় ছিল তিনি তাহা অবগত নহেন। তবে তাঁহার রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার অল্পজ্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইমাত্র বলিতে পারেন।

কামরূপের লোকেরা নারায়ণদেবকে তাঁহাদেবই আপনার লোক বলিয়া দাবীদাওয়া করেন। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় বলেন—“আমাদেব শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রবাদ এই যে, নারায়ণদেব ও কবিরাজ শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী হাবীগঞ্জের উপবিভাগস্থিত নগর গ্রামে বাস করিতেন, উহার উভয়ে মিলিয়া পদ্মাপুরাণ রচনা করেন তাই “নাবায়ণ দেবে কয় সুকবি বলভে হয়” এইরূপ ভণিতা পদ্মাপুরাণে দেখা যায়। তৎপর কোন কারণে নাবায়ণ ও কবিরাজ বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। নাবায়ণদেব পশ্চাৎ জন্মস্থানেবই অনতিদূরবর্ত্তী ময়মনসিংহ জিলার বোরগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি আজিও তাঁহার বংশধরগণ আছেন। হইতে পারে ছইবন্ধু কবিত্যাতি সম্বল করিয়া এই আসামপ্রদেশে আসিয়া “বিদ্বান্ সৰ্ব্বত্র পূজ্যতে” এই বচনের আর একদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দরঙ্গরাজ্যের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় ভাষায় স্বরচিত পদ্মাপুরাণের এক সংস্করণ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। ক্রিয়া ও কারকের দ্বয় পরিবর্তন দ্বারা এই ভাষান্তর অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহা এই অসমীয়া ‘সুকনান্নি’ ও বঙ্গীয় নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ তুলনাব সমালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজসভায় সম্মান লাভ করিয়া নারায়ণ প্রবীণ বয়সে বোরগ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে পারেন। আবার কবিরাজ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহার বংশধরেরা রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুন্দর গজখানার চোরতাবাড়ীগ্রামে থাকিয়া আজিও পদ্মাপুরাণের গীত গাহিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন।

“সুকনান্নি” ছাড়াও কামরূপ অঞ্চলে অপর পদ্মাপুরাণ আছে তাহা অসমীয়া কবি দুর্গাবর রচিত “বিষহরীর পুঁথি”—ইহার বিষয় গোঁহাটের বঙ্গসাহিত্যচুশীলনী-সভার ঘষ্ঠ অধিবেশনে “অসমীয়া পদ্মাপুরাণ” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস মহাশয় আলোচনা করিয়া-ছিলেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আসাম অঞ্চলের নানাস্থানে পদ্মাপুরাণবর্ণিত ঘটনার স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়াজিলার হেড কোয়ার্টার ‘ধুবড়ী’ই নাকি নেতা-ধোবানীর স্থান ছিল, ধোবাবুড়ী হইতে ধোবুড়ী বা ধুবড়ী নাম হইয়াছে। সহরের একটি পাশাণময় ঘাট নেতাধোবানীর ঘাট বলিয়া আজিও পরিচিত।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে।

## চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বহাদবস যাবৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্বান্সমুন্দর ব্যাকরণ এবং একখানি উৎকৃষ্ট অভিধানের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন জন্ত বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ১৬১৭ বৎসব ধরিয়া প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, যে সকল গ্রন্থ আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি তাহারই ভাষা আদর্শগ্রন্থের ভাষা হইতে ন্যূন-ধিক পরিমাণে পরিবর্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরিবর্তিত বা অবিকৃত আকারে পাইয়াছি বলিতে পারি না। আবার যে গ্রন্থের বর্ত্ত অধিকসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, সে গ্রন্থের পাঠবিকৃতিব মাত্রাও তদনুরূপ। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা-নধো প্রক্ষেপেব আভিগোচর কথ্য ও উল্লেখ করিতে হয়। এমতস্থলে চণ্ডীদাসের পদাবলী যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বলা যায় না। পরম ভাগবত স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাতায়ে ৬জগদগু ভদ্র মহাশয় সন্ধ্যায়ে চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথাক্রমে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ও চণ্ডীদাস নাম দিয়া দুইটি পৃথক সংস্করণ বাহির করেন। রমণীবাবুর সংকলনে সন্ধ্যাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইয়াছে। অধুনা শ্রীযুক্ত নীলরতনবাবু ও শ্রীযুক্ত শিববতন বাবু চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন পদ লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ শত হইবে। প্রথমতঃ ঐ সমুদায় পদের ভাষা চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পদগুলির ভাষা যে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিধে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অপরের পদ যে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর নধো প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা কে বলিবে। কবির সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে তখন তাহার স্তম্ভমাংসা হইবে।

অতঃপর আমরা চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ 'কৃষ্ণকীর্তন' এর কথা বলিব। কৃষ্ণকীর্তন বর্ণ-জ্ঞানহীন পুঁথিলেখকদিগের হাত এড়াইয়া এবং জয়গোপালগণের চক্ষু ধুলি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। গ্রন্থখানি বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাকিল্যা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ যুথোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অবস্থে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যুথোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্রবংশধর। পুঁথি-খানি বাঙ্গালা তুলোটে কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা, ২২৬ পত্রের পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাদুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাস্তর্গত কালিরদমনখণ্ড, যমুনাক্ষণ্ড, বালখণ্ড, বংশীখণ্ড ও বাধার

বিরহখণ্ড। কৃষ্ণকীর্তন একখানি অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। অক্ষর-  
গুলি অনেকটা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অক্ষরানুরূপ।  
পুথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত  
ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এমনও হইতে পারে উহা মহারাজ বীরহাষীরের অধীনস্থ দপ্তরগণ  
কর্তৃক অপহৃত বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর অন্ততম। উহার ভাষা বর্তমানে সঙ্কলিত কবির যাবতীয়  
পদাবলীর ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। চণ্ডীদাস প্রথম বয়সে ‘কৃষ্ণকীর্তন’ রচনা করেন।  
পদাবলীর তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শব্দযোজনায় একটু পারিপাট্য ও উপহার কিছু  
বাহুল্য আছে। কৃষ্ণকীর্তনপাঠে বেশ উপলব্ধি হয় কবি তখনও পাণ্ডিত্যাভিমান  
পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রচলিত পদাবলী তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। তাহাতে  
কোথাও আড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই। এক্ষণে কবির সে পাণ্ডিত্যভিমानी পূর্বভাবে চলিয়া  
গিয়াছে। তিনি এখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা, তাই পদাবলীর ভাষা এতটা সরল,  
তরল ও প্রাঞ্জল অথচ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক। তবে উভয়ই কবিত্বের গুচ্ছল্যা ও ভাবার  
শালিত্য সমানভাবে বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণকীর্তন হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল—

জন্মখণ্ড।

সময় উপেখিঅঁ রহিলা দেবগণ।

আরম্ভ —

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

পৃথ্ভারবাধাঃ পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জরান্।

শ্রীকৃষ্ণেৰ রূপবর্ণনা এইরূপ—

ততঃ সরমসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কোড়া রাগঃ ॥ বতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

কোড়া রাগঃ ॥ একতালী ॥

সব দেবের মেলি সভা পাতিল আকাশে।

নীল কুটিল ধন মুছ দীর্ঘ কেশ।

কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥

তাঁত ময়ূরের পুচ্ছ দিল সুবেশ ॥

ইহার মরণ হএ কমল উপাএ।

চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।

সন্ধেই চিস্তিঅঁ বয়িল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥

ছই পাশে লধু মধো উন্নত বিশালে ॥ ১

ব্রহ্মা সব দেব লঅঁ। গেলাস্তি সাগরে।

সকল দেবের বোলোঁ হরি বনমালী।

স্ত্রীতীএঁ তুঘিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥

আবতার করি করে ধরনীত কেনী ॥ ৬ ॥

তোকে নানারূপে কইলোঁ আনুয়ের খএ।

স্বমেধ সুপুট নাসা নয়নকমল।

তোক্ষার লীলায়ে কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥

কামাণ সদৃশ শোভে জহিয়ুগল ॥

হেন শুনী ঈসত হাসিঅঁ ততিথণে।

ওষ্ঠ আধর যেক যমজ পৌআর।

ধল কাল ছই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥

কঙ্কযুগ শোভে যেক বরুণের জাল ॥ ২ ॥

এহি ছই কেশ হৈবে বসুন্ধের ঘরে।

ভুজযুগ করিকর জাহ্নত দূলে।

হলী বনমালী নাম দৈবকী উদয়ে ॥ ৬ ॥

করঙ্গরুবিন্দ-মাল নিশ্চিত কমলে ॥

তাহার হাতে হৈবে কংসানুয়ের বিনাশে।

মরকত পাট সদৃশ বক্ষ(ঃ) স্থল।

হেন বর পাঁজী সব দেবে গেলা বাসে ॥ ৭ ॥

ক্ষীণ মধ্য রামরস্তা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥

১ ৥ নবমঃ ৥ সুব্রহ্মাণ্ডকব্রহ্মবর্জি ৥ একাষ্ট্রত্বজাহবস্মি ৥ নবমঃ ৥ ১ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ নবমঃ ৥  
 ২ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ২ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৩ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৩ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৪ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৪ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৫ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৫ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৬ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৬ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৭ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৭ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৮ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৮ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ৯ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ৯ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥  
 ১০ ৥ একাষ্ট্রত্বব্রহ্মবর্জিতাম ৥ সাত্ত্বজাতব্রহ্মবর্জিতাম ৥ অষ্টমঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥ ১০ ৥ দ্বাঋষিঃ সত্যেন্দ্রিয়কবীত্ববর্ণনায় ৥

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কোর্ডিন পুথির ৬ পত্র (২য় পৃষ্ঠা)

চণ্ডীদামের ঐক্য-কীর্তিন পুথির ১ পত্র (১ম পৃষ্ঠা)



মাণিক রচিত চক্ৰ সম নখপাশ্ৰী ।  
 সজল জলদকুটি জিনি দেহকাস্তী ॥  
 বভ্রীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর ।  
 কংসের বধকারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥  
 নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে ।  
 পীতবসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥  
 নিতি নিতি বাছা রাখে গিঅাঁ বৃন্দাবনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥

শ্রীরাধার রূপবর্ণনা—

ধাহুযী রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥  
 কাহ্নাখিঁ রসসম্ভোগ কাবণে ।  
 লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥  
 আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার ।  
 থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥  
 তে কারণে পছমাউদরে ।  
 উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল আল রাধা ॥ ২ ॥  
 তীন ভুবন জনমোহিনী ।  
 রতিরস কামদোহিনী ॥  
 শিরীষ কুসুম কোঁজলী ।  
 অদভূত কনক পুতলী ॥ ২ ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে তনুলীলা ।  
 পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥  
 দৈবৈ কৈল কাহ্ন মনে জানী ।  
 নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥  
 দেখি রাধার রূপযোবনে ।  
 মাঅক বুয়িল আইহনে ॥  
 বড়ারি দেহ এহার পাশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াইর রূপ—

গুজরী রাগঃ ॥ বভ্রীঃ ॥  
 আইহনের মাঅ গুণী মনে ॥ আল ।  
 ঝাঁট গিঅাঁ পছমার আনে ॥ ল বড়ারি ॥

চাহি লৈল বৃত্তীর মাই ।  
 তার পিসী রাধার বড়ারি ॥ ১ ॥  
 নিয়োজিলী নানা পরকারে ॥ আল ।  
 হাটবাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ারি ॥  
 শেত চামর সম কেশে ।  
 কপাল ভাঙ্গিল ছই পাশে ॥  
 ক্রহি চুনরেথ যেকু দেখি ।  
 কোটর বাটুল ছই আখি ॥ ২ ॥  
 মাহাপুটনাশা দণ্ডহীনে ।  
 উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥  
 বিকট দন্ত কপট বাণী ।  
 ওঠ আধর উঠক জিনী ॥ ৩ ॥  
 কাঠাসম বাহুযুগলে ।  
 নাভিমূলে ছই কুচ লূলে ॥  
 কুটিল গমন ঘন কাশে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বর্ণনাটা বড়ই স্বাভাবিক ।

তান্মূল খণ্ড ।

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥  
 তোর মুখে স্নানী বাধিকার রূপ  
 আওর নব যোবনে ।  
 অহোনিশি দহে সকল পরাণ  
 আর খীর নহে মনে ॥  
 এড়িলেঁ ঘরের আশ ল বড়ারি  
 কহিলেঁ তোর চরণে ।  
 মতি হারাইলেঁ বুলিতেঁ না জানো  
 ভইলেঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥  
 না বোল না বোল নিরাস বড়ারি  
 আপণে চিস্ত উপাএ ।  
 রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ারি  
 কাহ্নাইর গ্রাণ জাএ ॥ ২ ॥

আক্ষাব বচন ধর ল'বড়ায়ি  
মনে না করিহ হেলা ।  
হুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি  
তোক্ষোসি আক্ষার ভেলা ॥  
আজি হৈতে বড়ায়ি দেব বনমালী  
তোক্ষার ভয়িলা দাসে ।  
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন  
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥  
বিথর দেখিলে বিথর শুনিলে  
বিথর তোর বএসে ।  
এতেকে এসব কাজের প্রকার  
জানহ আশেষে বিশেষে ॥  
নানাবিধ কথা কহিঅ' বড়ায়ি  
রাধারে করহ মিনতী ।  
মোর একবার কর উপকার  
খণ্ডুক রাধার বিনতী ॥ ৩ ॥  
পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি  
তাধুলে ভরাঅ' গলী ।  
মিনতী করিঅ' গাথত ধনিঅ'  
আন গিঅ' চন্দ্রাবলী ॥  
আক্ষার বচনে বোলহ রাধারে  
কাজের পুরক আশে ।  
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ'  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥  
দানখণ্ড ।  
পাহাড়ীয়া রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥  
তবে বুলিলে বড়ায়ি হাটক না জাইব  
হুর্জন মথুরাপুরী ।  
বোল দিঅ' তোএ মোরে আনিলে  
মোর আস্তরের বৈরী ॥  
দ্বুত দধি সব খাইল কাহ্নাক্রি  
পাধাঅ' মোর পসারা ।

কাঞ্চুলী ভাগিঅ' তন বিণ্ডিতল  
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১ ॥  
কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক  
কত লিখি হুখভারে ।  
তে কারণে বিণ্ডি —হুখগণ  
লেখিল সাঠাহারে ॥  
করলো খণ্ডবত আর জরমত  
ঠেঁ বা হুখিনী মোএ ।  
লনাট লিখিত খণ্ডন না জাএ  
না ছাড়ৈ নান্দের পোএ ॥ ২ ॥  
জরম গেল করমের খন্ড  
কাল কাঞ্চাক্রি'র হাথে ।  
মুকুট ভাঁগিঅ' সব পেলাইবো  
সিন্দুর মুছিবো মাথে ॥  
কিবা চাহে কাহ্ন বাটে রহাএ  
বুঝিতে নারো তার মণে ।  
বাজা কংসাসুর অতি ছরাচার  
সে জণি এহাক শুনে ॥ ৩ ॥  
এডু দামোদর বাট জাও ঘর  
দিআর মোকে মেলানী ।  
রাজা কংসাসুর সুণিলে পাছে  
কল পাইবে চক্রপাণী ॥  
উলটি বসিঅ' সুন্দরি রাধা  
ছাড়এ দীঘ নিশাসে ।  
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ'  
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥  
নৌকাখণ্ড ।  
দেশাগ রাগঃ ॥ সবুশেখরঃ ॥  
মথুরাং মথুরাং নেভুং জরতী কপটে পটুং ॥  
কুস্ত বচসা প্রাহ শীজং রাধামিনং ॥ ১ ॥  
যে বোল তোরে বোলো মোএ রাধা ল  
তাত না করহ আন ।

অজিত না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল

এহা সরূপেসি জাণ ॥ ১ ॥

চিরদিন মথুরাক না জাহা ল

কেছে নঠ কর দহী ॥ ৫ ॥

গোআল জরম আস্কে শুণ

দধি ছুধে উতপতী ।

এবেঁ তাক উপেখহ কেহ

তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২ ॥

আনহ সকল সখিজন

মেলী করিউ যুগতী ।

তবেঁ মথুরাক জাইএ

সক্ষে হঅঁ একমতী ॥ ৩ ॥

পসার সাজিউ দধি ছুধে

সেসি জীবর উপাএ ।

বাসলী চরণ শিবে বন্দী, রাধা ল

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভারথশু ।

শোরী রাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

গ্রহরেক বেলি ভৈল যমুনাব ঘাটে ।

কতখনে জায়িব আস্কে মথুরার হাটে ॥

যুত ছুধ নঠ হএ আশল দহী ।

সংহতী এড়িঅঁ জাএ গোয়ালিনী সহী ॥১॥

লটবেঁ না লটবেঁ ভার সুন্দর মুরারী ।

না বহিভেঁ ভার যবেঁ ধরেঁ-আন ভারী ॥৫॥

বোলশত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ ।

তোর বোলোঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥

বোলহ উপায় কাহাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ ।

জাকে ছুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥২॥

সব সখি গেলেঁ কাহাঞিঁ হৈবোঁ একসরী ।

লোক দেখিলেঁ তবেঁ আস্কেঁ লাজেঁ মরী ॥

তোক্ষার মুখত কাহাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ ।

ফুরায়াঁ না দেহ তোঙ্গে তেঁসি একো কাজ ॥

হার বিচিব আস্কে ধরিব আন ভারী ।

বসিঅঁ থাক তোঙ্গে সুন্দর মুরারী ॥

বাহড়িঅঁ চল কাহাঞিঁ নান্দেঁর নন্দন ।

গাউল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১ ॥

ভাঠিআলী রাগঃ ॥ জীভা ॥

নিষধিভেঁ কাহাঞিঁ দধি ছুধের ভার

আপণ ইছাএ লৈবোঁ ।

পরাব নারী আকাশের চান্দ

তাহাক কেমনে পাইবোঁ ॥ ১ ॥

লড়হ না কেছে নিলজ কাহাঞিঁ

এড়িঅঁ দধির ভারে ।

যুত ছুধ দধি নঠ না কর

জাওঁ মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥

আক্ষার বচন শুণ কাহাঞিঁ

না লটহ দধি ভার ।

কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে

আপণে নিবোঁ পসারে ॥ ২ ॥

দাণ আধিকার নাহিঁক তোক্ষার

কিকে মরিষহ দাণে ।

বড়ই নিলজ নান্দেঁর নন্দন

ঘর জাহা নিজ মানো ॥ ৩ ॥

কথঁ দেখিল বাওন হাথে

তালতরু ফল পাএ ।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅঁ

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভারথশুগুস্তগত ছত্রথশু ।

রামগিরী রাগঃ ॥ আঠতাল ॥

এহে ।

দধি ছুধ যুত বোল বিকলিঅঁ রছে ।

পথ মেলি জাএ রাধা বড়ারির সঙ্গে ॥

হরষিত যনে জাএ চন্দ্রাবলীঘর ।

কাহাঞিঁকে বিড়িঅঁ মথুরানগর ॥ ১ ॥

শরতের রৌদ্রে রাধা বড়ায় বিকলী ।  
 বাটে এক তরুতলে খাণিক এক বসিলী ॥৫॥  
 বিনয় বুলি রাধা বড়ায়ির পাএ ।  
 দেখ সব সখীগণ আক্সা এড়ি যাএ ॥  
 না জানো কি বোলে তথ' আইনের মাএ ।  
 সকল ঠায়িত মোর তোকে'সি সহাএ ॥২॥  
 সখি সঘোদিয়া কিছু বুলি চন্দ্রাবলী ।  
 তোন্ধার বিদিত মোএ' যে হেন কোঁঅলী ॥  
 রৌদ পাড়িঅ' আক্সে জাইব ঘর ।  
 বুলিহ সামুড়ী থানে এসব উত্তর ॥ ৩ ॥  
 আয়াস খণ্ডিল কিছু জীতল পবনে ।  
 চারি পাশ চাহে রাধা তরণ নয়নে ।  
 দেখিল কোপিল কাহ্নাখি' রহিল ছেপাশে  
 বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বৃন্দাবন-ধণ্ডা ।

দেশবরাড়ী রাগঃ ॥ সঘুশেখরঃ ॥

তোর রতি আশোআশে' গেলা আভিসারে ।  
 সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥  
 না ॥ বিলম্ব রাধা করহ গমনে ।  
 তোন্ধার সঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥  
 কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে ।  
 তোন্ধাকে চিস্তিতে আছে নান্দের নন্দনে ॥৫॥  
 তোর তমুগত রেণু চলিল পবনে ।  
 তাহাকে করএ কারু অতি বহুমনে ॥  
 পাখি বসিতে তরুপাত চলনে ।  
 তোন্ধার গতি শঙ্কিতা রচনে শয়নে ॥ ২ ॥  
 চাহে দশদিশ কারু চকিত নয়নে ।  
 কতখনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥  
 তেজহ সুন্দরি রাধা সুখর মজীর ।  
 সবরে চলহ কুজ এ ঘন ভিমির ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে ।  
 শোভে মেঘমালাে যেহেন তড়িতে ॥  
 গলিত বসনহীন রসন জঘনে ।  
 আপণে আরোপ গিঅ' পল্লব শয়নে ॥ ৪ ॥  
 মানী বড় ভৈল কাহ্নাখি' শেষ রজনী ।  
 তার পুর মনোরথ মোর বোল সুখী ॥  
 এবে আয়ু গত বাধা বিলম্ব গমনে ।  
 গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥

পাহাড়ীরা রাগঃ ॥ জীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবে  
 দশন-রুচি তোন্ধারে ।  
 হরে হরুবার ভয় আন্ধকার  
 সুন্দরি রাধা আন্ধারে ।  
 তোন্ধার বদন, সংপুন চান্দ  
 আধর আমিঅ' শোভে ।  
 পরতেথ তোর নয়ন-চকোর  
 যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥  
 মদন-বাণে দগধ-ভৈলোঁ  
 তোর আকারণ মাণে ।  
 বদন-কমল মধুপান মিঅ'  
 রাখহ মোর পরাণে ॥ ৫ ॥  
 যবে সন্তো কোপ করিলে  
 তবে মোরে হান নয়ন বাণে ।  
 দৃঢ় ভুজযুগে বন্ধন করিঅ'  
 অধর দংশ দশনে ॥  
 তোন্ধে সে মোহর রতন ভূষন  
 তোন্ধে সে মোহর জীবনে ।  
 এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর  
 বুলি তে আভি যতনে ॥ ২ ॥  
 তোন্ধার নয়ন মলিন মলিন  
 আধার কোকনদরূপে ।

মদন বাণে কৃষ্ণক বজ্রিলেহ

মাথাব মণ্ডন মোরে।

এ তোর আশ্রুপে ॥

চরণ পল্লব আশ্রোপ রাধা

এ তোর কুচ শোভে মণি জ্বলনে

মোর মাথাব উপরে ॥

নাদ করউ রসনে।

পালাউ আশ্রাব মদন বিকাব

বৌল জদয়ত করোঁ মো তোহর

সত্তরে করহ আদেশে।

থল কমল চরণে ॥ ৩ ॥

বাসলী চবণ শিরে বন্দিঅঁ।

মদন গরল থগুন বাধা

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১ ॥

উপরি উদ্ধৃত পদদ্বয়টী ‘রতিস্থগসাবে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং’ এবং ‘বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী চরতি দরতিমিরমতিঘোরং’ পদদ্বয়ের কেমন সুন্দর অনুবাদ !

যমুনাস্তর্গত কালিয়দমনথণ্ড।

যমুনাব জলে কুন্ত ভরিঅঁ।

পাহাড়ীয়া রাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

আসিব এ বড় রঙ্গে ॥

ত্রিভুবন নাথ তোকে হরী ॥

হেন বুলী রাধা কলসী লঅঁ।

প্রভু হইয়াঁ হেন নাহি করী। ল কাহ্নাঞি ॥১॥

জাএ গজগড়ি ছান্দে।

জগত না সহে ত্রোক্ষাব দাপ। আল।

আলকেঁ শোভে বদন তাহাব

কোণ ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥

যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥১॥

তোকে নিরমিল ত্রিভুবনে।

আল।

জল থল জীবজন্তুগণে ॥ ৩ ॥

পাইল রাধা কালীদহ-কূল

সাপেরেঁ করিঅঁ বিধ দানে।

লইঅঁ সাধিসমাজে।

এবেঁ কেছে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥

ঘাটত ভেটিল নান্দের পো

সানী মোর সেবক তোক্ষার।

কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ৫ ॥

তোকে এথঁ দিলেঁ আধিকার ॥ ৫ ॥

চাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপনারীগণ

মুহ সাপ জলের ভিতরে।

লাগিলা যমুনাতীরে।

না জানিঅঁ দংশিল তোক্ষারে ॥ ৬ ॥

কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিঅঁ।

বারেক মোরে দয়া কর।

কেহো না ভরিল নীরে ॥

সানী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥

কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ

সুনিঅঁ কাহ্নাঞিঁর ভৈল তোষে।

খসিল দেহ বসনে।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

ওহার এহার মুখ চাহে সব

যমুনাথণ্ড।

কাহ্নাঞিঁর নহে মনে ॥ ২ ॥

পাহাড়ীয়া রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তখন নয়ন নিমেষ না কৈল

যাই বহুমান পানিকে আইল

দেখি প্রিয় বনবাণী।

সখি মোর সঙ্গে।

সকল গোআল যুবতী রহিলা

যেহ কনক-পুতলী ॥

এখো পাখ কেহো চলিতে নাবে  
বুলিতে নারে বচনে ।

কাহ্নাঞি নাম পৃথিবীর চান্দ  
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩

আনেক যতন করিঅঁ রাধা  
গেলি কাহ্নের সংমুখে ।

বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ  
মথি পাণি নেউ স্তখে ॥

পরিহাস রসেঁ দেব দামোদব  
যেহু নাহিঁ পরিচএ ।

তেহু মতে বুলিল বাধাক উদব  
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

বালখণ্ড ।

ধামুদী রাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥

ধ  
খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদেশ ঈশব হব  
কেশপাশে নীল বিজ্ঞানে । এআ ।  
সিসের সিন্দূর সুর ললাটে তিলক চাঁদ  
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ । ১ ॥

সুগ বড়ায়িল ।

বোল গিঅঁ গোবিন্দক বাতে । এআ ।

তীন ভুবন বীর রাধএ যৌবন ধন  
কি করিতে পারে জগন্নাথে ॥ ৫ ॥

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশে কল  
বিষ ওঠ পুষ্প ॥ ৬ ॥ সঙ্গে ।

কুচবুগ যুধিষ্ঠির বাহুদণ্ড মনোহর  
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥

বলি বসে নাভিতলে পৃথু নিতম্বযুগলে  
মারুদেশে সিংহ বিদ্যামানে ।

জঘনে বসে নৃপুরু আভিশয় রুচিগুরু  
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥

হাথে ধরী ধমুবাণে কাহ্ন আনু বিজ্ঞমানে  
তভেঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে ।  
বোল দূতা কাহ্নপাশে গাই বড়ু চণ্ডীদাসে  
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৭ ॥

বংশীখণ্ড ।

ত্রীরাগঃ ॥ ত্রীড়া ॥

নিশমা কৃষ্ণবচনঃ সুরস্বরতুরাতুরা ।

যমুনাতীরনাগতা রাধাহ জরসীমিং ॥

সুসব বাঁশীর নাদ সুনী আইলোঁ

মো যমুনার তীরে ।

শোভন কলসী কবে ধরিচাঁ

পারিলো যমুনানীবে ॥

বড়ায়িল ।

বাঁশীর নাদ না সুনী এবে

কাহ্ন গেলা কিবা দূরে ।

প্রাণে বেআকুল ভৈল এবে

কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১

বড়ায়িল ।

তোকে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে ।

কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে

কুসুমশোভিত মাথে ॥ ৫ ॥

অহোনিশি মো আন না জাগো

এত হুখ কহিব কাএ ।

কাহ্নের ভাবে চিত্ত বেআকুল

লাজে যোঁ না কান্দো রাএ ॥

যমুনা তীরে কদমের তলে

কাহ্ন মোরে দিলে কোলে ।

তাহা সঁঅরিয়া বিকলী ভৈলোঁ

কাহ্ন বিরসিল ভোলে ॥ ২ ॥

চারিম্বিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল

বহে বসন্তের বাএ ।

আষড়ালে বসী কুয়িলী কুহলে

লাগে বিষবাণ ঘাএ ॥

চান্দ সুরজের ভেদ না জাগে

চন্দন শরীর তাএ ।

কাহু বিণি মোর এবে একখন

এককুল যুগ ভাএ ॥ ৩ ॥

বাণীর শবদে প্রাণ হরিঅঁ

কাহু গেলা কোণ দিশে ।

তা বিণি সকল আস্তর দহে

যেন বেআপিল বিধে ॥

এবে আনিঅঁ দেহ নান্দেব নন্দন

পুত আন্ধার আশে ।

বাসলী চরণ শিবে বন্দিঅঁ

গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধার বিরহ ।

দেশাগ রাগঃ কীড়া ॥

তনের উপর হারে । অণ ।

মানএ য়েহেন ভারে ।

আতি হৃদয়ে থিনী রাধা চলিতে না পাবে ।

সরস চন্দন পক্ষে । আল ।

দেহে বিষম শঙ্কে ।

দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥

আল ।

তোর বিরহ দহনে ।

দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ৫ ॥

কুসুম-শর হতাশে ।

তপত দীর্ঘ নিশাসে ।

সবন ছাড়এ রাধা বসি একপাশে ॥

ক্ষেপে সজল নয়নে ।

দশম দিশে খনে খনে ।

মাগহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ ॥

দেখিল্লব শয়নে ।

আন্ধারবাশি সমানে ।

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥

বাম করেছে বদনে ।

দিঅঁ গগনে নয়নে ।

তোক্ষাক চিস্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥

খনে হাসে খনে রোষে ।

খনে কাপএ তরাসে ।

খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥

চলিতে তোক্ষার পরশে ।

নাবে মদনের রোষে ।

বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড়,

চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পদটা জয়দেব রুত 'স্তনবিনিহিতমপি হার  
মদারং' গানেরই প্রতিধ্বনি ।

বিভাব রাগঃ রূপকং ॥ যতিঝা ॥

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে ।

গবল সমান মানে মলয় পবনে ॥

করে মনসিজ-শর কুসুম শয়নে ।

ব্রত করে পায়িত্তে তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥

আল কাহাঞি ল ।

রাধা বিরহ দহনে ।

দগধিনী ভৈলী তোক্ষার শরণে ॥ ৫ ॥

অহোনিশি মদন মারে তারে শরে ।

হৃদয়ে নলিনীদল সংগ্রহ করে ॥

সবখন বস তোক্ষো তাহার আস্তরে ।

তৈসি তোক্ষা রাখিবারে পরকার

করে ॥ ২ ॥

নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার ।

রাহএ গালিল যেন চান্দ সুরধার ॥

তোক্ষাক লিখিঅঁ কাহু মদনরূপ ।

প্রণাষগণ করে কহিলোঁ সক্রপ ॥ ৩ ॥

তোক্ষাক সংযুথ দেখি আধিক<sup>১</sup> চিন্তনে । বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে ।  
 ভাষে রোমে কান্দে কান্দে ভয় করে মনে ॥ দশ দিশি দেখে বাধা চকিত নয়নে ॥  
 বর বন ভৈল তার ভাল সখিগণে । দয়া করি এবে তাক দেহ আলিঙ্গনে ।  
 নিশাশে বাচে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ১ ॥ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥ (১)  
 পদগুলি এতই সুন্দর, এতই মধুর যে কোনটা বাখিয়া কোনটা উঠাইব স্থির করা কঠিন ।  
 বাহাইউক, এখন আমরা বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবি চণ্ডীদাস ঠাকুর অঙ্কিত প্রথম  
 আলখোর একটা নিখুঁত আদর্শ পাইলাম ভাবিয়া আনন্দ করিতে পারি । আলখো-  
 থানি এতাবৎকাল অপেক্ষাকৃত বিরল অঙ্ককারের আবরণে আবৃত ছিল বলিয়া বর্ণটি বেশ  
 উজ্জল রহিয়াছে । ‘কৃষ্ণকীর্তনে’ কবির সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগেব এবং তাঁহার ছন্দা-  
 লঙ্কারপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । চণ্ডীদাস একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুগায়ক  
 ছিলেন । আমরা শুনিয়াছি তাঁহার রচিত ‘চণ্ডীর’ ( দেবীমাহায়া ) একখানি উপাঙ্গের  
 টীকা আছে । ‘কৃষ্ণকীর্তন’ কবির ভাষা বিচিত্র ; উগাতে মৈথিলপ্রভাব সমধিক  
 প্রবল । একুপ প্রাকৃত শব্দবহুল বাঙ্গালা পুস্তক আর আছে কি না আমাদের জানা  
 নাই । পুথিখানির বর্ণবিভাগ প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে ।

কবির পিতা ( ২ ) নান্দুবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাঙলীর আবাধনা করিয়া পুত্ররত্ন লাভ  
 করেন এবং সেই হেতু পুত্রের নাম রাখেন চণ্ডীদাস । কবির আব একটা নাম ছিল “অনন্ত” ।

মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ ।

দেবী বাসলীগণে ॥

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাঁএ ॥

( কৃষ্ণকীর্তন দানখণ্ড । )

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল

আনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল

দেবী বাসলী চরণে ॥

দেবী বাসলীগণে ॥

গাইল আনন্তবড়ু চণ্ডীদাসে

( কৃষ্ণকীর্তন বৃন্দাবনখণ্ড । )

‘বড়ু’ শব্দটা উপাধিবাচক । বাকুড়া অঞ্চলে ‘বড়ু’ উপাধি ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যেও  
 প্রচলিত দেখা যায় ।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে উহা কাব্যামোদীর নিকট যেক্রপ আদরের বস্তু  
 হইবে, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সকলেও সেইরূপ অথবা ততোধিক প্রীতির সামগ্রী হইবে ।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ।

( ১ ) এ পদটিও জয়দেবকৃত ‘মিন্দি চন্দমিন্দু কিরণমহুমিন্দি খেদমধীর’ পদের অনুরূপে রচিত ।

( ২ ) চণ্ডীদাসচরিতলেখক শ্রীযুক্ত ব্রজহরময় সান্ন্যাল মহাশয় ১৩৭৩ শকে লিখিত একখানি প্রাচীন  
 পুঁথির একস্থলে ভবানীচরণ নামক ব্যক্তির উরসে ও ঠেঙ্গরীদেবীর গর্ভে চণ্ডীদাসের দন্ম হয় এইরূপ কথা  
 পাইয়াছেন ।



## হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রধান পার্শ্বদ, নামমাহাত্ম্য-প্রচারক হরিদাসঠাকুর প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে পূজিত। যিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই; সাক্ষাৎ যমদূতের ত্রায় ভীষণ পাইকগণ কতৃক অপমানিত, নিগৃহীত ও প্রহারে জর্জরিত হইয়াও সংসারসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়া অদ্বৈতদেব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, যাহার প্রেম-প্রকাশ ও দৈন্ত্য ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করিত, যাহার দেহত্যাগে স্বয়ং মহাপ্রভু বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের জন্ম দ্বারা কোন্ দেশ ধন্য হইয়াছিল, কোন্ জনপদ পবিত্র হইয়াছিল, তাহা জানিতে সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে।

এতকাল বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস ছিল এবং প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দা<sup>১</sup>নদাস চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বৃন্দে হরিদাস অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইসম্বন্ধে এতকাল কোন তর্কও উঠে নাই। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া অবধি এই প্রচলিত বিশ্বাস ভ্রমাত্মক বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দ বলিয়াছেন—

“স্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছী গ্রামে।

হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পূর্বনামে॥”

জয়ানন্দের নির্দেশ অনুসারে উক্ত গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গঙ্গাতীরে কলাগাছী গ্রামে ভাটবংশে হরিদাস জন্মিয়াছিলেন। তবে বৃন্দের সহিত যে হরিদাসের বিশেষ সংশ্রব ছিল, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। জয়ানন্দও তাহাব উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাসের সেখান যে ভ্রম ছিল, জয়ানন্দ তাহার সংশোধন করিয়াছেন।

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের লেখায় ভুল নাই। জয়ানন্দেরও ভুল হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়েরা স্বর্ণনদীকে সুরনদী (পায়া) মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। স্বর্ণনদী সোনাই নামে বৃন্দে এখনও আছে। স্থানে স্থানে মজিয়া গেলেও এখনও তাহার তীরে অনেক গ্রাম আছে। নদীতে অনেক জলও আছে।

বৃন্দ একটা বৃহৎ পরগণার নাম। উক্ত পরগণা সাতক্ষীরার বাবুদিগের জমিদারীর অন্তর্গত। উক্ত নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রামও আছে, তাহাকে আজকাল লাপসা বৃন্দ বলে। ভাটকলাগাছী বলিয়া কোন গ্রাম নাই, ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সোনাইতীরে অনেক ভদ্রপল্লী এখনও আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন।

ইহারই নিকটে এক সময় বুঢ়নেৰ্' প্রসিদ্ধ ভূস্বামী “গণরাজার” বাটী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। ঠাকুর হরিদাস ‘যবন’ ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থেই তাঁহাকে যবন বলা হইয়াছে। তিনি মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার গ্রহণ করায় গোড়ের বাদশাহ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে হিন্দুর সন্তান, তাঁহার পিতা বাধ্য হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, এরূপ অনেক প্রবাদ আছে। তিনি যে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের দৌহিত্র এরূপও উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে বাদশাহ তাঁহাকে “মহাবংশ-জাত” বলায় অনুমিত হয় যে, তিনি মুসলমান কুলেই জন্মিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কাজীর ছেলে বলিয়াও অমুমান করেন। জয়ানন্দ তাহার মাতাপিতার নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহাকে হীনকুলোৎপন্ন বলিয়াছেন। খাহা হউক, সাধারণতঃ তাঁহাকে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যতদিন বলবত্তর প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, ততদিন তাহাই বহাল থাকুক।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব গাজাহান আলীর মন্ত্রী মহম্মদ তাহের (পীরালি খাঁ) বুঢ়নের অনেক প্রাক্ষণবংশকে মুসলমানধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। সোনাহাতিবর্তী হাকিমপুরের খাঁ সাহেবেরা এইরূপ ব্রাহ্মণ মুসলমান। বুঢ়নপরগণার মধ্যে এইরূপ আরও অনেক আছে। বাইঁ, পটো, ধাওয়া প্রভৃতি শ্রেণীস্থ লোকেরা এই সময়ে মুসলমান হইয়া-ছিল। হরিদাস সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীগুলি সংগ্রহ করিলে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার পিতা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার পূর্বেই হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনা যায় না। তিনি দেখিতে সুত্রী ও সুপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি ত্রীমঙাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিন পরেই তাহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। অল্পবয়সে আশ্রয়হীন হইয়া তিনি কোনও আত্মীয়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু উক্ত আত্মীয় মুসলমান হইয়া নবাবের প্রিয় হওয়ার জন্ত নিতান্ত গোড়ামী দেখাই-তেন। হরিদাসের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি প্রায় ২০ বৎসর পরে গৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলে ঘাইয়া অবস্থান করিলেন। প্রবাদ আছে যে, হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের গৃহে তিনি গৃহত্যাগের পূর্বে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, জয়ানন্দের উল্লিখিত ভাটকলাগাছী কোথায়? পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামের ঠিকানা হয় নাই। তবে ভাটলী নামে এক গ্রাম সোনাহাতিরে এখনও আছে এবং তাহার নিকট কেরাগাছী গ্রামও আছে। অনুমিত হয়, ইহাই জয়ানন্দ-বর্ণিত ভাটকলাগাছী ইতর ভাষায় কলাগাছীকে কুলগাছী বলে। এই গ্রাম বুঢ়ন গ্রাম হইতে ২½ ক্রোশমাত্র দূরে সোনাহাতিরে অবস্থিত এবং ইহার অপর পারে হাকিমপুর। প্রবাদ মিলাইয়া দেখিলে এই ভাটলী-কেরাগাছীকে জয়ানন্দের ভাটকলাগাছী বলিয়া ধারণা জন্মবে। বৃন্দাবনদাস জয়ানন্দ উভয়ে যখন বুঢ়নের সহিত হরিদাসের সংশ্রব স্বীকার করিয়াছেন, তখন বুঢ়ন হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশেষতঃ যখন স্বর্ণনদীকে গঙ্গা বলিয়া বুঝিবার আবশ্যক

হইতেছে না, বৃটনের নীচেই স্বর্ণনদী বা সোনাই পাওয়া বহিঃতেছে, তখন তাঁহার অগ্রজ বাস করনা করার আবশ্যক নাই। প্রবাদেও সোনাইতীরই হবিদাসের আদি লীলা-স্থান বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জয়ানন্দ যে ভাটকলাগাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে দুই গ্রামের নাম তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায়, পল্লী-গ্রামে এখনও কোন গ্রামের নির্দেশ কবিত্তে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অধিক দিতে হইবে না। দুই একটা দিলেই বুঝা যাইবে,—মাইনগর-মালক, পলাবাড়ী-জয়নগর, তালপাতা-মেমাবী, পানাকুল-রুক্ষনগর, জিবাট-বলাগড়, কলেন-বলা, দাঁইহাট-মেটরী, চুপী-কাঁকশিয়ালী, টাকী-শ্রীপুর, গাটুবা-গোবরডাঙ্গা, লাউপালা-সিমহাট, ক্ষীরপাই-বাধানগর, সিঙ্গ-ডুমুদহ প্রভৃতি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে জয়ানন্দ কেন যুক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ভাট শব্দ যে বংশবাচক নহে ইহা হইতে বুঝিতে পাওয়া যাইবে।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৃন্দাবনদাস কেবল বৃটনের উল্লেখ করিলেন কেন, তবে কি তিনি হরিদাসের জন্মস্থানের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পরগণার নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি এখনও লোপ পায় নাই। এখনও বিক্রমপুর, কুশদহ, চৌবাশী, হলদা ও আমরপুর নিবাস বলিয়া পরিচয় দিলে একটা গ্রাম বুঝায় না। পরগণাই বুঝাইয়া থাকে। সেকালেও তাহাই বুঝাইত। বৃটনে বাড়ী বলিলে সাধারণভাবে পরগণা বুঝাইত, বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। বৃন্দাবনদাসও সেইরূপ সাধারণভাবে পরগণার নাম করিয়া পরে বৃটন গ্রামের নাম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লাপসা বৃটনেই হরিদাস জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার বাস ভাটকলাগাছীতে ছিল। সকল বাঙ্গালী বালকই যে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করে, তাহা নহে। অনেক অবস্থাপন্ন বালক মাতুলালয়ে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রচলিত রীতি দেখিলে ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না। সুতরাং বৃন্দাবনদাসকে ভ্রান্ত মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## মালদহের পল্লীভাষা

প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গোড়, অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, কত রাজা বাদশার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, কত বিপদাপদ দ্বারা গোড়নগরী বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত কত ভিন্ন জাতীয় নরগণের শৌর্য-বীৰ্য্যপ্রকাশ এই স্থানকে চমৎকৃত করিয়াছিল, কত বিভিন্নভাষী জনগণের আলাপনে গোড় মুখরিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা ও কল্পনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অশোক-শাসনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত কতপ্রকার ভাষার পতন ও উত্থান এই স্থানকে মোহিত করিয়াছে তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সচরাচর রাজধানীতে বৈদেশিক বিভিন্নভাষী নরগণের সমাবেশ হইয়া থাকে। রাজধানীর জনসংজ্ঞের কথিত ভাষা মিশ্রভাব-দোষে ছষ্ট হইয়া পড়ে। বর্তমান কালে দেখিতে পাই,

ভাষাপার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষী নরগণ আপন গৃহে স্বজাতীয় ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকেই আবার দেখিতে পাই,

তাহাদের কথিত ভাষার স্বর টান ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষার টুকরা ঐতদেশীয় কথিত ভাষার সহিত মিশাইয়া কার্যোপযোগী কবিয়া ব্যবহার হইতেছে। এই প্রকার পূর্বকালেও যে না হইত একথা বলা চলে না।

এক দেশের কথিত ভাষা বাক্যকথনচ্ছলে শিক্ষা করা সহজ হইলেও তত্ত্বদেশীয় লিপি-মালা শিক্ষা সহজ নহে। আমরা মালদহের পল্লীভাষায় ‘লিপির’ কথা আদৌ উত্থাপন করিব

কথিতভাষা না। কথিত ভাষার সহিত গ্রাম্য কবির ভাষার তুলনা মধো মধো

ও করিতে হইবে, নচেৎ পল্লীভাষা সুন্দর হইবে না। গ্রাম্য

লিখিত ভাষা সংগীতাদিতে প্রাণের ভাষা মনের শাসন না মানিয়া উৎসের

ভাষা ছুটিয়া চলে। সুতরাং গ্রাম্যসংগীতগুলি হইতে আমরাদিগকে ‘পল্লীভাষা’ সংগ্রহ

করিতে হইবে। আবার রমণীকুলের কথিত ভাষায় ৩২ আদিমভাব বর্তমান থাকে, পুরুষের

কথিত ভাষায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রমণীগণ গ্রাম্যগণের মধ্য নিম্নত অবস্থান

গ্রী ও পুরুষভেদে করিয়া প্রাচীন কথিত ভাষাকে সজীব করিয়া রাখে। পুরুষ-

কথিতভাষার মধ্যে গণ গ্রাম্যভাষার গণ্ডী ছাড়াইয়া অন্তর্ভুক্ত কথিত ভাষাও শিক্ষা

করে বলিয়া তাহাদের কথিত ভাষা প্রকৃত প্রাচীনত্ব ভাব বহন করে না। এই জন্ত

দ্বীপুরুষভেদে কিঞ্চিৎ ভাষাভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মীলিপি, অশোকলিপি, গুপ্তলিপি, সারদা, শ্রীহর্ষ ৷ কুটিল

লিপিমালায় উদ্ভব-প্রসঙ্গ ভাষাতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

গৌড় ও পুণ্ড্রনগরে যে উপরোক্ত লিপিমালায় অবাধ প্রচলন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে

পারা যায়। অনেকে আবার বাগরী-অক্ষর বঙ্গাক্ষর হইতে অপ্রাচীন বলিয়া থাকেন।

গৌড়ীয় ভাষার

বাহাউক গৌড়ীয়ভাষা এক সময়ে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল।

আদর

গৌড়ীয় রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া একদা অনেকে

ধৃত বোধ করিতেন। গোড়নগরে বিহার, মিথিলা দেশের কথিত ভাষার সহিত বড়ই

মেশামিশি দেখিতে পাই। প্রাচীন গৌড়ীয় পদকর্তারা মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে এক

অভিনব সুন্দর ভাষার সমাবেশ করিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন।

একদিন সেই ভাষা গোড়দেশে সমাদৃত হইয়াছিল। ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত গৌড়ীয় কেশ-

পারিপাট্যের যদ্রুপ আদর নাট্যসমাজে হইয়াছিল সম্ভবতঃ গৌড়ীয়ভাষাও ততোধিক

আদৃত হইয়াছিল। যোজনভেদে ভাবভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এ কথা অনেকেই বলিয়া

থাকেন। যদি: পদব্রজে গোড় হইতে রাঢ়দেশের মধ্যদিয়া মেদিনীপুর অতিক্রমপূর্বক

উৎকলে গমন করা যায় এবং কথিত ভাষার প্রতি দৃঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করা যায়

কথিত ভাষাভেদের

তাহা হইলে কীদূশ প্রণালী অবলম্বনে ধীরে ধীরে ভাষার বেশান্তর

স্বল্পপার্থক্য

সংসাধিত হইয়াছে তাহা অক্লেশে উপলব্ধ হইবে। ভ্রমণকারীগণ

এই বাক্যের সার্থকতা সত দূর উপলব্ধি করিতে পারেন, পুস্তকপাঠে তাহার একাংশও

সংসাধিত হইতে পারে না। রেলযাত্রীর পক্ষে এ প্রকার ভাষাপার্থক্যের স্বল্পগতিবোধ

দুরাশাযাত্র।

প্রাদেশিক লিপির কথা বলিতেছি না, কিন্তু মৈথিলী, রাঢ়ী ও উৎকলী ভাষা-সংমিশ্রণে

এদেশের ভাষা গঠিত অথবা গৌড়ীয় ভাষাই তাহাদের মৌলিক আদর্শ ছিল একথা নিঃসন্দেহে

বলা চলে না।

বৌদ্ধ ও হুটল-লিপি

বৌদ্ধ পালরাজাদের সময়ে কুটিললিপি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার

করিয়াছিল। কথিত ভাষাও সম্ভবতঃ স্থানভেদে পরিবর্তিতাকারে

কথিত হইত। লিপি প্রচলন এক হইলেই যে কথিত ভাষা তদনুযায়ী এক হইবে এমন

বলা চলে না। পুস্তকের লিখিত ভাষা ও কথিত গ্রাম্যভাষা একরূপ নহে, কিন্তু বঙ্গে

এমন এক দিন চলিয়া গিয়াছে যে, লিখিত-ভাষা ও কথিত-ভাষার বড় একটা ভিন্ন ভেদ

ছিল না।

বঙ্গীয় গীতপুস্তকে

চণ্ডী, মনসা, যোগীপাল মহীপালের গীত, শিবসংগীত প্রভৃতি গ্রাম্য

প্রাচীন কথিতভাষার

কথিত ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া গড়া বলিয়া মনে হয়। খাঁটা

আদর্শ

সেকালে কথিত ভাষার আদর্শ ঐ সমুদায় সংগীতপুস্তকে ভুরি

ভুরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শূন্তপুরাণীয় ভাষা অতি আদিম বঙ্গভাষা বা গৌড়ীয়। ক্রমে

মাণিকগাঙ্গুলী, ঘনরাম, কবিকল্পণ গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

মিশ্র ভাষা

গৌড়ীয় ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা। কালক্রমে গৌড়নগর

অরণ্যে পর্যাবসিত হইলে, মালবহী ভাষা প্রাচীন গৌড়ীয় ভাষার

মৌলিকতা বজায় রাখিয়া এবং মৈথিলী, রাঢ়ী, উৎকলী ও খ্রীষ্টান্যমানে ভাষার সহিত মিশিয়া এক অভিনব ভাষায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা পুস্তক-লিখিত ভাষাও কিঞ্চিৎ স্থান গ্রহণ করিয়া প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার হারমধ্যে উজ্জল মণিকাঞ্চনের ত্রায় শোভা পাইতেছে।

মালদহের প্রাচীন পল্লীভাষার আদর্শ আমরা নিয়ে বন্দনাদি হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

বৌদ্ধযুগাবসান-  
কালের ভাষা

“স্বর্গের কপিল মর্ন্তে নামিলা।

বিশেষ্বর ব্যোত বাহনে চড়িলা ॥

নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী স্কন্ধ।

তাতে উজ্জৈ দধি ছুত বোল হুঙ্ক ॥

কহন্ত গুরু গোসাই সরস্বতীর বরে।

কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥

( গজীরা বঙ্গীয় পরিষৎ-পত্রিকা )

মালদহী মঙ্গলচণ্ডীর  
ভাষা

“টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈত।

এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ॥

নাগের নাম বাসুকি খুইল নিরঞ্জন।

তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ইতিন ভুবন ॥

জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।

আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই ॥

( মঙ্গলচণ্ডী-মাণিকদত্ত । )

“জলেতে আসন গৌশাই জলেতে বৈসন।

জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন ॥

ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন।

চৌদ যুগ বহিঞা গেল তত কণ ॥” ( ঐ )

শুভপুরাণীর মার্জিত ভাষা

উপরি উক্ত কবিতাংশ মালদহে বৌদ্ধযুগাবসানের সাময়িক

কবিতা পরিমার্জিত হইয়া ঐ প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে।

সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেকার ভাষা শুভপুরাণীর ভাবের ছিল।

বোত, গোথনে, উজ্জৈ, কহন্ত ( কহন্ত ) একগোটা, ইতিন, চিরাই, বৈসন, করিঞা,

ঠেসন, বহিঞা ইত্যাদি শব্দ পূর্ব্বেকালের কথিত ভাষার অল্পরূপ।

প্রাচীন শব্দ

ঐ সমুদায় শব্দ গ্রথিত পুঁথিলিখিত ভাষা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বহু

পূর্ব্বেবর্ত্তী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

প্রাকৃত ভাষার সহিত মৌড়ীয় ভাষার সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে আবার প্রাকৃত মৌড়ীয় ভাষাকে রাকসীভাষা বলিয়া বিজ্ঞপ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে ভাষার বনের ভাব প্রকাশ করিলাম শাস্তি প্রাপ্ত হই, তাহার হত্যার সম্ভবে না। অধিকন্তু প্রাকৃত ভাষা

বা গোড়ীয় ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা। ভাষার নিগড়রূপ বৈয়াকরণিক শাসন, কথিত ভাষার মধ্যে বড় বন্ধমূল নহে। ভাষার চিন্তিয়া কথিত ভাষা প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাশ করা হুসর। যত সহজে, সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্বপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বভাব মূলত-কথিত ভাষাই জাতীয় জীবনে আদৃত ও বন্ধমূল হইয়া পড়ে।

প্রাচীন শ্রুতপুরাণাদিলিখিত বিবরণ ক্রমশঃ পরিমার্জিত হইয়া মালদহী প্রাচীন সংগীত-পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন বিবল নহে।

“পরভুর বিষ্মতে জল হইল আচম্বিত ॥” ৫০ ( শৃঃ পুঃ )

শ্রুতপুরাণ ■ মাণিকদত্তের  
চণ্ডীর ভাষা-বিচার

“মুখের অমৃত ধর্মের থসিঞা পড়িল।

( ইষ জিনিঞা তবে সিদ্ধ উথলিল ) ( মাণিকদত্তের চণ্ডী )

“কত শত জুগ গেল এক বস্তু গেআনে ॥ ৮৪

বড় কাতর কুর্মরাজ সহিতে নারে ভর ॥

কুর্মরাজ পলাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫” ( শৃঃ পুঃ )

“চৌদয়ুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ ॥” ( মাঃ দঃ চণ্ডী )

“আপনে ধর্ম গোলাই কুর্মরূপ হৈল।

কুর্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ॥

কুর্মে সহিতে নারে প্রিথিবির ভার।

গজ কুর্মে পৃথিবি জায় রসাতল ॥” ( মাঃ দঃ চণ্ডী )

এই প্রকার সাদৃশ্য-দর্শনে আমাদের বোধ হয় শ্রুতপুরাণের প্রভাব মালদহে বিলক্ষণ ছিল।

ক্রমশঃ শ্রুতপুরাণের বৌদ্ধতাব চণ্ডীকাব্যে সংবদ্ধ হইয়া ধর্মাস্তর-মালদহে শ্রুতপুরাণের প্রাধান্য বাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে। রথি-মুকুন্দভারতীকৃত প্রাচীন হস্তলিখিত ‘জগন্নাথ-বিজয়’ দেখিতে পাই, শ্রুতবাদের আদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম-মতবাদ সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে।

“হল জল ( কুল ) নাহি ছিল নরহে” পবন।

স্বরূপ আকার নাহি ইতিন ভূবন ॥ ২

দিগ্ বিদিগ্ নাহি সৃষ্টি লোকপাল।

ঋষিগণ নাহি ছিল প্রণব বিসাল ॥ ৩

হেনকালে নিরঞ্জন সন্ন তেজিল।

কেবল প্রকৃতি হৈতে সৃষ্টে মন দিল ॥” ■ ( জগন্নাথ-বিজয় )

তবে ত্রিজগতনাথ বৌদ্ধরূপ ধরি।

প্রবেশ করিল হরি দেউল ভিতরি ॥ ৮৩

লুকাইঞা জোগথ্যানে রহিল শ্রীহরি।

দেউল গঠিঞা রাজা গেল ব্রহ্মপুরি ॥” ৮৪ ( জগন্নাথ-বিজয় )

মালদহী জগন্নাথবিজয়  
পুস্তকের ভাষা

“সকল বৃত্তান্ত আমি না জানি ভাঙ্গিতে ।  
 সুনিম্ন ইসব কথা উল্লপি সাক্ষাতে ॥ ১৪১  
 রাজা বোলে বৃক্ষরাজ কহ উপদেশ ।  
 কোথাতে উল্লুক বৈসে কহত বিশেষ ॥ ১৪২  
 বৃক্ষ বোলে সুন তুমি পুরুষ পুরাণ ।  
 চিরি জিবি নহে কেহো তাহার সমান ॥” ১৪৩  
 “তবে জোগনিদ্রাতে আছিল। নারায়ণ ।  
 পাশানে রূপিণী পাদ হৈল্যা অন্তর ধ্যান ॥ ৪৭  
 কনক করুর মধ্যে থাকিলা শিহরি ।  
 আপনা আপুনি চিন্তে জোগধ্যান করি ॥ ৪৭” ঐ

মুকুন্দ ভারতীকৃত অপ্রকাশিত জগন্নাথবিজয় গ্রন্থখানিও মানিকদত্তের চণ্ডী জগৎজীবন ও তন্ত্রবিভূতি নামক মনসাগীতের ভ্রায় বৌদ্ধমতবাদে পূর্ণ দেখিতে পাই। সুতরাং এই সমুদায় মুকুন্দভারতী মানিকদত্ত জগৎ-প্রাচীন পুঁথিগুলি অবলম্বনে আমরা তাত্ত্বিক বৌদ্ধযুগান্তের ভাবার জীবন কবির মালদহী ভাষা পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলাম। পুঁথিগুলি মালদহলেখক-গণের হস্তলিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান রহিয়াছে।

মুকুন্দ ভারতীর ব্যবহৃত শব্দ খসিঞা, ইষ, জিনিঞা, বহিঞা, নরঞা, বৃত্তান্ত, সুনিম্ন, ইসব কথা, উল্লপি, বোলে, কহত, চিরিজিবি করুর ইত্যাদি শব্দ তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

“তাহার নির্মল জল গহিম্ গম্ভির ॥” ৩৬ ( ঐ )

ইত্যাদি পদমধ্যস্থ “গহিম্—গম্ভির” শব্দ অতি উপাদেয়।

### মাণিক চাঁদের গীত

মাণিকচাঁদের গীতের ভাষা  
 “দস গিরির যাও বইন রবে স্যাথি লইবে কোলে ।  
 আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে ॥”  
 “জীবন জীবন ধন আমি কত্যা সঙ্গে গেলে ।  
 রংধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥”

### গোবিন্দচন্দ্র গীত

গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভাষা  
 “সুখাছি তোমার তত্ত গুরু বরাবরী ।\*  
 গোবিন্দাই গুরু হইব সিদ্ধা জলঙ্কার ॥২২  
 পাসান দেয়াল ঘরের লোহার কপাট ।  
 হিরার বাহনি নাই শিগিডার বাট ॥” ২৩

\* বরাবরী—মোসলমান ভাষা হইতে গ্রহীত।



“বৃত্তপদে আসি জন্ম প্রাণ লিল কাড়া।

প্রাণ পুরুষ ছাড়্যা গেল কায়া রইল পড়্যা ॥ ১১০

“জোগ সিদ্ধা ময়না মস্ত্রি দেখ্যা লাগে ধন্দ।

মায়ে পোরে জুগী হয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র ॥” ১৬৪

মাণিকচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, জগন্নাথবিজয় ও  
গীতিপুস্তকের সাময়িকতা

সাময়িক বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রামি, দিমু, স্ত্রীছাছি, বরাবরী, গোবিন্দাই, হিরায়, বাহুনি, পিপিড়ার বাট, কাড়্যা, ছাড়্যা  
পড়্যা, “দেখ্যা লাগে ধন্দ” প্রভৃতি সেই সময়ের কথিত ভাষার  
পন্নী ভাষা  
ব্যবহৃত হইত।

মালদহের পন্নীভাষার এই সমুদায় শব্দের যথেষ্ট প্রচলন বর্তমান রহিয়াছে।

এই প্রকার বৌদ্ধপ্রভাব মন্দীভূত হইলে পর বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয় হয়। যদিও বৌদ্ধ-  
দুগাঙ্গে শৈবধর্মের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যে বৌদ্ধপ্রধান সময়ের বর্ণনা  
করিলাম প্রকৃত পক্ষে উক্ত সময় শৈব-প্রধান বলিয়াই ধরিতে হইবে।

শিবসংগীত বহুলাংশে পরিমার্জিত; আমরা রামেশ্বরের শিবায়নে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই—

“ঠারি পদ্মা বলে ঠাকুরের ঝি।  
শঙ্খগর সম্প্রতি মুলোর কথা কি ॥” ( শিবায়ন )  
“ঝুটি ধরে ঝাঁটা মেয়ে দুই করে দিব।  
গলাটিপি দিয়া শাঁখা গুণগায় লব ॥  
হয় বলে হরি হরি সে শাঁখারী নই।  
সইয়ের সাধের সয়া তারে মারে সই ॥  
মহতের মাগ্ সই মহতের ঝি।  
যলে শঙ্খ পরিলে বুড়ার চারা কি ॥” ( ঐ )  
“সকল পরায়ে শেষে উজাইল বাই।  
বিগ্ন বিমোহিত কৈল বিনোদিনী:রাই ॥” ( ঐ )  
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ॥” ( ঐ )  
“হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।  
ইবহু হুপ দিল বেসারির পরে ॥” ( ঐ )  
“নাটাপাট হাতে বাটা আলাইল কেপ।  
গব্য বিতরণ কৈল জব্য হৈল শেষ ॥” ( ঐ )

“মৈনাক গোড়াল্য ধরে মা বাপু রহিল চেরে

বুক ব্যোরে পড়ে প্রের ধামা ॥” ( ঐ )

শিবায়নের  
ব্যবহৃত  
শব্দ

ঠারি, ঝুঁটি, ঘাঁটা, গলাটিপি, গুণগার, সর, সই, মাগ, ঝি,  
চার, উজাইল, বাই, রাই, হাড়িপানে, বেসারির, নাটাপাটা,  
বাটা, আলাইল, গোড়াল্য, বেয়ে ইত্যাদি শব্দ রাঢ়দেশে এবং

এতদেশেও অধিক পাই।

কবিকল্পণের চণ্ডীর ভাষা পরিমার্জিত হইলেও তাহাতে গ্রাম্য শব্দের বিপুল সমাবেশ  
দৃষ্ট হয়।

কবিকল্পণের ভাষা

“ভাদ্রপদমাসে বড় দুৰন্ত বাদল।

খালিজুলি ভরা হইল নাচলে ছাগল ॥

ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটনি।

কাঁকালে তুলিয়া বাকি মুঢ়াকানি খানি ॥” ( কবিকল্পণ )

“মণ্ডলার বেতা আইল শব্দর লায়ের বেটা।

আঙলা বাটরা যার করতলে ঘাঁটা ॥” ( কবিকল্পণ )

“নীলাধর দাস বলে, শুন রাম রায়।

পসরা করিত বাপা নাহি প্রত্যবায় ॥

কড়ীর পোটলী বাকি জাতি ব্যবহার।

এটোচোপা খাইলে নহে কুলের খাঁথার ॥” ( কবিকল্পণ )

কবিকল্পণের ব্যবহৃত  
শব্দ

খালি, জুলি, কাঁকালে, মুঢ়া, কানি, বেটা, আঙলা, বাটরা,  
মাটা, পসরা, বাপা, এটো, চোপা, খাঁথার ইত্যাদি শব্দ  
এদেশেও প্রচলিত রহিয়াছে।

কবিকল্পণ চণ্ডীর ভাষা এদেশে তত আদৃত নহে, মাণিকগড়ের চণ্ডী এদেশী ভাষায়  
লিখিত বলিয়া উহার আদর যথেষ্ট আছে। গোড়ীর বাদশাহ হোসেন শাহের পূর্ববর্তী  
ও সমসাময়িক ভাষা অতি স্কন্ধ এবং প্রাকৃতভিমুখী ছিল।

হোসেনশাহী  
আমদের ভাষা

হোসেন শাহী আমলে যে সমুদায় গ্রন্থাদির পরিচয় পাওয়া যায়  
তাহাতে মালদহের ভাষার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হয়। হস্ত-  
লিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার  
যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব।

### পল্লীভাষা

মালদহের  
কয়েকটা  
জাতি ও ভাষা

মালদহ জেলায় নাগর, ধামুক, চাই ও পলিহা জাতির সংখ্যা-  
ধিকানিবন্ধন ভাষারও পার্থক্য পরিমার্জিত হইয়া থাকে। নাগর,  
ধামুক প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা

সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণ বক্তৃতা, বাহা মালদহের নিজস্ব  
বলিয়া দাবী করা চলিতে পারে, তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

( ১ম )

মালদহে প্রচলিত কতিপয় বিশেষ্যপদবাচক শব্দের নামোল্লেখ করিলাম ; শ্রাজ্জা, ত্যালাই, মালদহের খাঁড়ী, ভুনি, ধড়ী, দাও, পাসুনি, কাঁচি, হাঁসুয়া, ব্যাসর, পল্লীভাষার টিকোলা, গোদানী, বেত্তী, খোরা, ডাবোর, চ্যারাক্, তস্বির, ব্যবহৃত শব্দ টিকিয়া, তামাকুল, হুকা, আড়া, পহি, কাম্পা, ভাঁজী, রসা, ডাজ্জা, ঝাল, পুরী, আহরশা, উথরা, ব্যাসাতি, পাতিল, ঢাকোন, চুকাই, ঝাঁজোর, হুঁই, হুঁরা, ঢোকসা, ডালি, করপা, খুঁসী, ঠুসী, বিজি, ( বংশনির্দ্দিত ) ধোকড়া, নাইদ বা নাটন্দ, গাছা, কুঠী, হাঁড়া, আঙরাক্ বা আধারখা, ফোতা, জাঁত, খুনী, টাটি, লাও, বইঠা, তজি, খলপা, বাইগ্যা, বিলাতু, পসকরী, বসী, ( বসি ) আখা, চুলা, বোতা, পেটারি, ঝাঁপি, পথৈর । উপরি উক্ত শব্দসমূহের সচরাচর গ্রাম্য চলিত কথায় নিম্নত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ব্যবসা ও ব্যক্তিগত নাম

( পুংলিঙ্গবাচক শব্দ )

ব্যবসা ও ব্যক্তিগত শব্দ ব্যাসাতি, কুঁজরা, পাঝরা, জিবনী, মেছা, লাপিত বা লাউয়া, সোণার, কামার, কুস্তার, মণ্ডল, সাহ, পোন্ধার, লাইয়া, পাইট, মালান্, পসারি, মহলাগার ।

লাপিত, লাউয়া

লাউয়া “লয়া লাউয়ারে ভাল করা কামাইও হামার বাছারে ।” ( মালদহগীত )  
লাউয়া “মালীপাড়া লাউয়াপাড়া রাঢ়িপাড়ার কাছে ।”

( রঙ্গপুরের জাগের গান পরিষৎ-পত্রিকা )

স্ত্রীলিঙ্গবাচক

স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যাসাতিনী, কুঁজরাণী, পাঝরাণী, মেছাণী, লাপিতান্ বা নাপ্তানী, সোণারণী, কামারণী, কুস্তারণী, মণ্ডলাইন, সাহন, পোন্ধারণী, মালানী, ঝবিয়াণী, মহলাদারণী, গোয়ালিনী ।

অধিকাংশ পুংলিঙ্গবাচক শব্দে আনী বা নী সংযোগে স্ত্রীলিঙ্গপদের সিদ্ধ হয় কিন্তু—

মণ্ডল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মল্যান্ ॥ মণ্ডলাইন  
সাহ সাহন বা সাহন পদসিদ্ধ হয় ।

“গোয়ালিনী বোলে সাধু তুমি থাহ দহি ।” ( চৌরচক্রবর্তী )

( শব্দা উপাদান )

কয়েকটি পল্লীভাষার শব্দা, ত্যালাই, পস্করি ।  
শব্দপ্রয়োগের পদ্ধতি শ্রাবা বিছাও = শব্দা বিছার কর ।

বস্ত্র

খাঁড়ী, ভূনি, ধড়ী, ফোতা

হামরা পাবি খাড়ী ভূনি, ধড়ী বুনতে।

অলঙ্কার

বাসব, হামুগী, টিকোলী (টীপ)

লাকেতে বাসব পিঁধেচো।

কপালে টিকোলী দিবো।

ভকা, তামাকুল, টিকিয়া, বোতা (নলিচা)

“পরসা বিনে গিয়াছি হামি তাকিয়া।

কায়নে কিনি ভকা তামাকুল টিকিয়া ॥

ব্যঞ্জন বা বেস্তুতি

ভাজি, বসা, ভাপা, ঝাল।

মৃৎপাত্র

পাতিল, তোইলা, ঢাকন, চুকাই, কাতাবি, ঝাজোর।

ঝুড়ি

চোকনা, ডালি, করপা, ঢাকী, খুঙ্গী, চুশী, বিজি।

মিষ্টান্ন

পুরী, আতরশা, বুৰী, ভষারলাড়, উখরা (ঝুড়কী)

ঋষিআনী

ঋষির স্ত্রীলিঙ্গে ঋষিআনী পদ সিদ্ধ হয়।

ঋষিপত্নীস্থলে ঋষিআনী।

“মুনিঞা ঋষিআনি আনন্দিত হৈল।” (মাঃ দত্ত চণ্ডী)

মরদ স্ত্রীলিঙ্গে মাইঞা হইবে, মরদী বা মবদিনী হয় না, এখানে ইহা নিপাতনে সিদ্ধ বলিতে হয়।

“মাইঞা লোকের কথা শুন্যা মবদ কথা চলে।”

### সম্বোধনে

ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও নিম্নত্ব বোধ-জ্ঞানসূচক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা,—  
‘হে’, ‘গে’ ‘টে’ ‘বে’ এই চারিটি সম্বোধন-বাচক অব্যয়সংযুক্ত করিতে হয়।

পল্লীভাষায়

সম্বোধন কালে

পদপ্রয়োগ ও

শব্দ-পদ্ধতি

যথা পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিতে হইলে “বাবা হে” এইরূপ  
পদসিদ্ধ হইবে। “হে” শব্দ পুংলিঙ্গবাচক।

পুত্র মাতাকে সম্বোধন করিলে “মাগে” এই প্রকার বলিতে  
হইবে। “গে” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক। পিসীগে, মামিগে, দিদিগে ইত্যাদি।

মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিবে “বেটী টে” বলিবে।

‘টে’ শব্দ নিম্নপদস্থ জীলিন্দবাচক শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহিন্ টে, সঙ্গিনী টে, কামিনী টে ইত্যাদি।

‘বে’ শব্দ জীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধনসূচক শব্দ যথা—

“হাঁবে শালা!” হাঁবে সরতা। হাঁবে বিপ্নে। ‘বে’ পুংলিঙ্গবাচক শব্দ।

সম্ভবতঃ বক্তৃ-বাক্যবকে ‘বে’ সম্বোধনসূচক শব্দদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে।

“হাঁ” শব্দ সম্বোধনে হে, বে, গে, টে, শব্দের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষভাবে নিম্নসূচক সম্বোধন বুঝায় এবং তখন উক্ত সম্বোধন-সূচক পদটী সম্বোধক শব্দের পূর্বে বসে যথা—

“হাঁহে বাবা,” হাঁহে দাদা।

হাঁবে শবৎ, হাঁবে যত্ন।

হাঁ গে মা, হাঁ গে দিদি।

হাঁটে বহিন্, হাঁটে ভাউজ। ইত্যাদি।

সচরাচর সম্বোধনসূচক হে, বে, গে, টে শব্দচতুষ্টয় সম্বোধনের পরে বসিয়া থাকে। যথা—বাবা হে, মা গে, বহিন্ টে, সরতা বে ইত্যাদি।

পদের অন্তস্থ অকার লুপ্ত করিয়া সম্বোধন করিলে অবজ্ঞাসূচক পদ সিদ্ধ হয় এবং ‘অ’ কার সংযুক্ত থাকিলে তাহা সম্মানসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়।

হলস্ত ও স্বরস্ত

পদ-প্রয়োগে

উচ্চ ও নীচতা-

জ্ঞাপকতা

যথা—“সাহন্” অসম্মানসূচক। “সাহন্” সম্মানসূচক, মোল্লাইন্

অসম্মানসূচক, “মোল্লাইন্” সম্মানসূচক বোধ হইবে। মোড়ল্

মোড়ল, দালাল্ দালাল ইত্যাদি। ক্রিয়াপদেও এই প্রকার

স্বরাস্ত ও হসস্ত প্রয়োগবশতঃ সম্মাননায় ইতর বিশেষ হইয়া পড়ে। ক্রিয়াপদ ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত হইবে।

“সোনা বহটে, রথ দেখতে চলেক্ হামার সাথে তে।

লাকে তে লাক্‌মাছি দিব।

কপালে টিকোলী দিব ॥

গায়েতে গোদানী দিলেকে ?” (ঞ)

হে, বে, গে, টে,

অব্যয় শব্দদ্বারা

লিঙ্গজ্ঞান এবং

সম্মান-অসম্মান-জ্ঞান

রথ দেখিবার ■■■ সোনা বহ অর্থাৎ স্তম্ভরী বধূকে সঙ্গে যাইবার

■■■ বলিতেছে এবং নাকে নাক্‌মাছি, কপালে “টিপ” কিনিয়া দিবে

“গোদানী অর্থাৎ উকী (Tattoo-marks) কে দিয়াছে।

“চলেক্” চল, গমন কর ইহা একটী ক্রিয়াপদ, “চলেক্” ‘ক’

হলস্ত হইলে সঙ্গিনী বা নীচতা বা অবজ্ঞাসূচক হইয়া থাকে, কিঙ্ক “চলেক্” স্বরাস্ত হইলে সম্মানসূচক হইবে।

“চলেক না মা” “চলেক না দিদি” স্বরাস্ত বলিয়া সম্মানস্থচক। “চলেক না মা” বা “চলেক না দিদি” এ প্রকার হইতে পারে না। চলেক না বেটা বা চলেক না বহিন্ হইতে পারে।

সোনাবহকে “টে” সম্বোধন করাতে “চলেক” ক্রিয়াপদটা হলন্ত হইয়াছে।

হে, বে, গে ও টে অব্যয় শব্দ ব্যতীত আর অত্র কিছু নহে হাহে, হাবে, হাঁগে, হাঁটে অব্যয়পদ।

“সোবর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা।

নাদিয়ার মধ্যে তবে ছালা সোয়াইঞা॥” ( মাণিকদত্ত—চণ্ডী )

“সমুদ্রে ভাসাঞাদিল ধন্য স্মরিতঞা।” ( ঐ )

“রূপার ঢাকুনি তবে দিল ঘুচাইঞা।

ডোহা চোহা করি ছালা কান্দিছে বসিঞা॥” ( ঐ )

ভাসাঞা, স্মরিতঞা, ঘুচাইঞা, বসিঞা, গড়িঞা, সোয়াইঞা প্রভৃতি “ঞ” অণু ক্রিয়াবাচক পদগুলির ব্যবহার যথেষ্টছিল। প্রাচীন পুঁথিগুলিতে উহারনিদর্শন বিরল নহে। “মাণিকদত্তের চণ্ডীকাব্য” মালদহের প্রাচীন কথিত ভাষার আদর্শ বলিতে হইবে।

“ডোহা” “চোহা” এদেশের চলিত কথা এবং অব্যয়-পদবাচ্য।

### সর্বনাম

( আমি )

সর্বনাম পদের  
পল্লীভাষায় কপবর্ণন

আমি, হামি, হাম্মা, আম্বি, হাম্বি।

আমার, হামার, হাম্মার আন্তাব।

( তুমি )

তুমি, তুম্বি, তুম্বি, তুঁই, তুঞি, তুঁহি, তো,

তোমার, তুমার, তুম্বার, তুম্বর, তুঁহার, তুঞির, তুঁহির, তুহার, তোহার।

( তিনি )

তিনি, তেনার, তানার, তাঁহাব, তাম্মার, তাম্মাব, তামর।

( বহুবচনে )

আমাদের, হামাদের, আমাদিগের, আম্মাঘেরে, মোরেঘেরে, তোমাদের, তোমাঘেরে, তোমাদিগের। তাহাদের, তেনাদের, তেনাঘেরে, তবহঁ।

তিনি, তামর, তাম্মর।

“হুম্বতি তৈয়ার ক’রতে তামরা বড় দড়॥”

( রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ ৪র্থ সংখ্যা )

তাম্মা = তাঁহারা।

রঙ্গপুরে যেমন তাঁহারা বুদ্ধক 'তাম্বা' শব্দের প্রচলন দেখিতে পাই তদ্রূপ মালদহেও তাম্বার বা তামর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### “মোরে ঘেরে”

“বুঢ়া হিন্দু নাইকো ফলে, “মোরে ঘেবে” কোরাণে আদম বলে”

( গম্ভীরা গাত ৩৭ধনকুম্ভ অধি )

বাশের হয় ঘাবা বাঢ়া আর ঢারা চরখী।

তাতিঘেরে লাটা হর আব দোয়ার টাঙা সড়কী।

আর ছালা ভুলা ফিড়কী ॥

হিন্দুঘেবে ধ্বজা হয়, মুসলমানের তাজিয়া

এসে বসাদ বর সাজিয়া ॥”

( গম্ভীরার গান )

“ঘেরে” শব্দান্তক  
সর্বনাম পদপ্রয়োগ

কতিপয় পল্লীভাষায়  
ব্যবহৃত শব্দ

এস্থলে “তাতিঘেবে” “হিন্দুঘেরে” পদের প্রচলন দেখিতে  
পাইবেন। ‘আমাঘেরে’ “তেনাঘেরে” অনুরূপ।

ঘাবা, বাঢ়া, ঢারা, চরখী, লাটা, সড়কী, ছালা, ফিড়কী,  
ভুলা, ইত্যাদি পল্লীভাষা শব্দ যথেষ্ট শুনিতে পাই।

### কতিপয় পল্লীভাষায় ব্যবহৃত শব্দ

বড়াপু = পিতামহ।

বোবো = পিতামহী।

ছোজ্‌নু = দেবব।

বুবু = পিতামহী বা মাতামহী।

সঘনী = বেহাই ( মুঃ ভাষা )

### ক্রিয়াপদ

সচরাচর ক্রিয়াপদগুলি অস্বাভাবিক ভাবে নিম্নায় হইয়া থাকে। বিতর্কিতযোগে  
ক্রিয়াপদ বর্তমান অতীত প্রভৃতি কালবাচক হয়।

যাওয়া, খাওয়া, লওয়া, শয়ন, দেওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বর্তমান ও অতীতে নিম্নলিখিত  
রূপ হইয়া থাকে।

কতিপয় ক্রিয়াপদের বর্তমান ■ অতীতাদির প্রয়োগরূপ	বর্তমান	অতীত
	যাওয়া	যেল্‌ছিলাম, গিলছিলাম, গিলছিল।
	খাওয়া	খেল্‌ছিলাম, খেলছিল।
	লওয়া	নিল্‌ছিলাম, নিল্‌ছিল।
	শয়নকরা	শুৎ‌ছিলাম, শুৎ‌ছিল।
	দেওয়া	দিল্‌ছিলাম, দিল্‌ছিল।

আমি গিয়াছিলাম—হামি গিল্ছিলাম্ ।  
 আমি থাইয়াছিলাম—হামি থেল্ছিলাম্ ।  
 আমি লইয়াছিলাম—হামি নিলছিলাম ।  
 আমি শুইয়াছিলাম—হামি শুৎছিলাম ।  
 আমি দিয়াছিলাম—হামি দিলছিলাম ।

এবং

সে গিয়াছিল—সে গেল্ছিল ।  
 সে থাইয়াছিল—সে থেল্ছিল ।  
 সে দিয়াছিল—সে দিল্ছিল ।

এবং

তাহারা গিয়াছিলেন—তেনাৰা গেল্ছিলেন ।  
 তাহারা দিয়াছিলেন—তেনাৰা দিলছিলেন ।

এই প্রকাৰ অতীতকালের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

‘বলা’ শব্দের অতীতে বন্দিলাম, ‘কহা’ শব্দের অতীতে কহেছিলাম, কহছিলাম, কহম্ ।

আমি কহিতেছি—হামি কহচি ।

কহন্ত, বোলন্ত, চলন্ত, ফিরন্ত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ।

‘কহন্ত গুরুগোসাঞ সন্ন্যস্তীর ববে ।’ ( গম্ভীৰাবন্দনা )

সচরাচর নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার হয় ।

( ‘য’ ফলায়ুক্ত )

১ ( ১ ) ফলায়ুক্ত পদের  
ব্যবহার ও বহুলতা

ফ্যাক্না, ভুল্যা, ভুল্যা, গল্যা, চল্যা, বল্যা, দিল্যা, দিয়্যা, ঢালা, গিল্যা, তাড়া, চাঁড়া, পড়া, গড়া, দৌড়া ইত্যাদি ।

ফ্যাক্না

“বুঢ়া ফ্যাক্না১ ” কোরা রয়াছে বইয়া ।”

কতিপয় ‘ব’ফলায়ুক্তক্রিয়া-  
পদের ব্যবহার নির্ণয়

ভুল্যা ( ভুইল্যা )

‘ভুল্যা’ গিয়াছিঘাটা২, লাগিয়াদিয়াছিঘাটা৩ ।

ভুল্যা ( ভুইল্যা )

‘ভুল্যা’ রাখাছি হাউস৩কর্যা ( সক করিয়া ভুলিয়া রাখিয়াছি )

গল্যা ( গইল্যা )

মাগীটে—? মিন্ধ্যার কথায় গিয়াছিন্ “গল্যা ।”



চল্যা ( চইল্যা )

হাবে বুঢ়া ! গেলি “চল্যা ঠোকনাঃ খাবার ডরে ।

বল্যা ( বইল্যা )

সাহন্টে । চল্লি গঙ্গাসিয়ানেচ, “বল্যা” কহা গেল্যা ভাল হ’তোটে ।

দিল্যা, দিয়্যা, ঢালা ।

“দিল্যানা” ছুধের লোটাঃ । “দিয়্যাছ” হাউস্‌রঙগেঃ গা “ঢালাগ” ।

গিল্যা

“গিল্যা” শব্দের উচ্চারণভেদে অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে ।

১ । গিল্যা—কর্দমবৎ, গলগলে ।

২ । গি ( ই ) ল্যা—গিলিয়া, গলাধঃকরণ করিয়া ।

১ । লয়া চালের “গিল্যা” ভাত ।

২ । “গিলাছি” কোঁৎকর্যা ।

ত্যাড়া বা তেঢ়া

“ছেড়্যাঃ” দিয়া ত্যাড়া ১০ ধর্যাছো ১১ ।

চ্যাড়া বা চাঢ়া

খুনি ১২ দিয়া ধর্যাছি “চ্যাড়া ১৩”

চ্যাড়া ধরবে শালা গান ।

পড়া

“পড়াঃ” পড়া শুতানঃ খাবি বে ?

পড়াছিষ্ বাটপারের শাল্লায় ।

দৌড়া

দৌড়া পালাছিষ্ কুন্ ১৬ঠে ।

“খাঁকার” ও “কোয়াক্কার” প্রভৃতি শব্দের প্রভৃত ব্যবহার হইয়া থাকে ।

“কঢ়া রাঁড়ী বলে হামার তুলাছিষ্ “খাঁকার”—অর্থাৎ বালবিধবা বলিয়া আমার কুৎসা তুলিয়াছ ।

“মড়ার, গাঙেরকুলে মরিতে বস্যাছিষ্—এখনি কোয়বো “কোয়াক্কার ।”

মৃতবৎ (মড়ার মত) নদীতীরে মরিতে বসিয়াছ—এখনি কুৎসিত গালি দিব ।

৪ । ঠোকনা—রমণকৃত্তক গণ্ডে আঘাত । ৫ । লোটা=ঘটা । ৬ । ঢালা=ঢালিয়া ।

৭ । রঙগে=রঙে । ৮ । সিয়ানে=সামনে । ৯ । ছেড়্যা=ছাড়িয়া ।

১০ । ত্যাড়া=তাড়াকরিয়া । ১১ । ধর্যাছো=ধরিয়াছ । ১২ । খুনি=খুঁটি ।

১৩ । চ্যাড়া=চাঁড়ি করিয়া, উচ্চকরিয়া । ১৪ । পড়া=পড়িয়া ।

১৫ । শুতান=শুভো যাত্রা । ১৬ । কুন্ঠে=কোথায় ।

## “এ” অন্তঃক্রিয়াপদ

“এ” অন্তঃক্রিয়াপদগুলি এক্ষণে বাকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে বিদ্যমান।  
‘এ’ অন্তঃক্রিয়াপদের ব্যবহার মালদহ জেলায় মৃতশব্দ রূপে প্রাচীন পুথির শোভা সম্পাদনার্থ বর্তমান রচিয়াছে।

এ অন্তঃক্রিয়াপদ  
করিঞা, রহিঞা, ধসিঞা, জিনিঞা, লুকাঞা, ধরিঞা, দেখিঞা,  
পাঞা, হঞা, হৈঞা, বেড়িঞা, আসিঞা, লঞা, ভাবিঞা,  
হাসিঞা, ইত্যাদি।

চক্রকলিকাগ্রন্থ\* এতদেশীয় ভাষায় লিখিত, সুতরাং আমরা “এ” অন্তঃক্রিয়াপদের পরিচয় উক্ত গ্রন্থ হইতেই প্রদান করিলাম।

করিঞা

“মুজড়া “করিঞা” দাড়াইল সনাতন।” ১৬

দেখিঞা

“দেখিঞা” সঙ্গের জুত থিকমত দার।”

ধাইঞা

“ধাইঞা চলিলা দূত সোনাতন-ঘরে ॥” ১১

\* “ঐরূপ সনাতন মুখাশ্রিত উক্তি ঐচক্রকলিকাগ্রন্থ” আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বাউল দরবেশীগণের প্রিয় গ্রন্থ, মালদহে পূর্বে অধিকাংশই শাক্তধর্মাবলম্বী-জনগণে পূর্ণ ছিল। “নেড়ানেড়ী” এদেশে এক সময় প্রাধান্য-স্থাপন করিয়াছিল। গয়েশপুরে ভট্ট সম্প্রদায়ের একটি বিখ্যাত আখড়া ছিল। বর্তমান কালে সেই স্থানে দোললক নিশ্চিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, বোধ্য তাত্ত্বিকমতাবলম্বী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল ঐ নেড়া নেড়ীরূপে প্রধাঙ্ক লাভ করিছিল। তাহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায় বীরভূমের মতাবলম্বী সম্প্রদায় বলিয়া জ্ঞান-পরিচয় প্রদান করিলেও আমাদের উচ্চ বিশ্বাস হয় না। সেই স্ট্রেডানেড়ীর যথেষ্টাচারিতাই রামকলী উৎসবে বৈষ্ণব-বিক্রম প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। সেই স্ট্রেডা নেড়ীর দল জট্টাচারী ছিল, তাহারা “বাউল” দলের মূল বলিয়া মনে হয়। এদেশে প্রবাদ আছে “ঈশান” গুরুভাগী হইয়া সনাতনের তদানীন্তন বেশ ভূষাদির অনুকরণ করিয়া বাউল দরবেশীদের নেতা হইয়া এদেশে উক্ত “বাউল দরবেশী” মতের প্রবর্তন করে। “চক্রকলিকা” গ্রন্থ উক্ত মতের উৎসমার্গের স্থলর ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে সনাতন—

“প্রোমে মন্ত হঞা খারে বাজ নাহি জানে ॥ ৪৭

এথা তিনি—

“বাউলের গতিমত চলে নরেশ্বর।”

এই বাউলের বা পাগলের গতির মত দাড়ী পোপ-বিশিষ্ট মোসলমানি-বেশ-পরিহিত সনাতন “গৌরাঙ্গ” “গৌরাঙ্গ” বলিয়া চলিয়াছিলেন। ঈশান সেই অনুকরণে যে ধর্মমতপ্রচার করিয়াছিল, সেই মতের নাম বাউল-সম্প্রদায় এবং মোসলমানগণ এই বাউলসম্প্রদায়কে “দরবেশী” সম্প্রদায় বলিত। দরবেশী বিবরণ “দিল কেতাব” বর্ণনাকালে বর্ণিত হইবে।

গিঞা

“সবে জানাইল “গিঞা” পাতসাব কানে ॥” ৮

তুনিঞা

“মুনিঞা” উকিল মুখে হইলা বিস্মিত ।”

ছাড়িঞা

চন্দ্রকলিকাগ্রন্থের “ঞ” অস্ত  
ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

“মুনি তুমি পলাইবে উজিবি “ভারিঞা ॥”

পাঠাইঞা

“তে কাবণে আনাইল দূত পাঠাইঞা ॥” ১৭

বোলাইঞা

“তাহাকে “বোলাইয়া” কহেন বাব বার ।”

পাইঞা

“হকুম “পাইঞা” হব পড়ে ছুট পায় ।”

তৎকালের বাউল-গ্রন্থে এই প্রকারের বহুল উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের নিকট এই বাউল সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের তালিকা-প্রকাশকালে তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। অত্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ এবং শক্তি ও শিব-বিষয়ক গ্রন্থেও এই “ঞ” যুক্ত পদের ছড়াছড়ি দেখিয়া সাময়িক “ঞ” রুচিব যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

দিনেন্দু, কহেন্দু, বোলেন্দু, কসেন্দু, প্রভৃতি “ন্ত” অস্তক্রিয়াপদের প্রচলন সেই বৈষ্ণব কবির “ন্ত” শব্দবিশিষ্ট ক্রিয়াপদের সময়েই বিद्यমান ছিল। মালদহে ইহাব যথেষ্ট প্রচলন থাকিলেও প্রয়োগবিধি অধুনা আর ঐ প্রকার পল্লীভাষায় নাই বলিলেই হয়। হস্তলিখিত গ্রন্থাদিতে ঐ প্রকারের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

“মায়া হৈল মুনিববেঃ কন্যাকে ‘দিলেন্দু’ ববেঃ জোজনেক হইল স্নগন্ধি ॥”

( মহাভাবত-আদিপর্ক—নিত্যানন্দ ঘোষ )

“নাচাহস্তি” সরচাপ না “চাহস্তি” টোন ॥”

( মহাঃ ভ্রোগপর্ক, শ্রীকরনন্দী )

“সর্ক সৈন্য “দহস্তি” আচার্য্য একেশ্বর ।” ( ঐ )

“কহন্ত গুরু গোসাই সরস্বতীর বরে ॥” ( গজীরা মালদহ )

বিবিধ অপ্রকাশিত পুঁথিহইতে “দেথিলেন্ত বিরসিং বাড়িতে সে গিয়া ।” ( বন-মহা শ্রীকরনন্দী )

“ন্ত” অস্তক্রিয়া-পদের উদাহরণ “আপনার সাক্ষাতে রাজা দেখিলেন্ত তবে ।” ( বন-ঐ )

“তে” = “ং”

পল্লীভাষায় “ঘোড়াতে, মোড়াতে, জুড়াতে ( ছায়াতে ) ছায়াতে, তফাতে, মুফেতে  
পল্লীভাষায় “তে” প্রয়োগ নিয়ম ইত্যাদি পদের অস্তস্থ “তে” শব্দ “ং” হইয়া যায়।

“তে” শব্দ “ৎ” হইয়া যায়  
উদাহরণ

“সে ঘোড়াৎ’ চট্যা গ্যাল ।”

“ঘোড়াৎ’ চট্যা আলি ।”

“জুড়াৎ’ যা” “ছায়াৎ’ যা ।”

“ঘোড়াৎ’ বইত্ৰা আছ ।”

“তফাৎ যা ।” ( মালদহ )

‘পাকাডালিম দিম কত কি করিম;

“মুখোৎ’ ভাসাম্ চুমা খায়া ।” (রঙ্গপুর-সা-প-প ১৩১৬ ২য়সং)

অনেক স্থলে ‘ত’ শব্দান্তে না থাকিলেও “ৎ” প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।

“চিরৎ’ কাল হইতে আলকা ( আকলা ) বনে বোসী ।”

“চিরৎ’ পদের ব্যবহার

( হস্তলিখিত সূত্রের ত্রুটকথা )

“চিরৎ’ কাল পক্ষিরাজ তথায় বৈসে ।” ( জগন্নাথ-বিজয় )

“চিরৎ” শব্দ পল্লীভাষায় নিয়ত ব্যবহার হইয়া থাকে ।

### দিল্ কিতাব

গৌড় বাঙ্গালার রাজধানী বহুকাল মোসলমান বাদশাহী শাসনেব অধীন থাকায় এবং দেশে বাদশাহীভাষায় লিখন পঠনের প্রচলন হওয়ায় দেশীয় কথিত এবং লিখিত ভাষায় বৈদেশিক ভাষা প্রবেশ করিয়াছিল, এজন্য পল্লীভাষা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সচরাচর নাগরিক বাক্যকথন ভাষায় অম্লকরণ সুদূর পল্লী-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর প্রচলন তৎকালে বর্তমান থাকিলেও তাহা যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালীর আদর্শ ছিল বলিলেও বলা চলে।

এদেশে মোসলমানী হাবভাব, আদব-কায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কথাবার্তার মোসলমানী ও পল্লীভাষায় অম্লকরণ তীব্রবেগে চলিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালার ভাষা তৎকালে বাদশাহী ভাষায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। গৌড়ীয়ভাষা ক্রমশঃ নূতন নূতন মোসলমানী ভাষায় শব্দে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এমন দিনও বাঙ্গালার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে যে, হিন্দুকে মোসলমানী কায়দা, বেশ ভাষা শিক্ষা না করিলে জীবন-সংগ্রামে স্থায়িত্বলাভের আদৌ ভরসা ছিল না। আত্মসমাজ-রক্ষার্থে বাধ্য হইয়া উদ্বুদ্ধিত জাতীর অম্লকরণ আবশ্যক হইয়াছিল। যাহা স্বভাবের শাসন-নিয়ম তাহা সঙ্গী সর্বদা ঘটিয়া থাকে। কবিকল্পণ এই জীবনসংগ্রামোপযোগী কর্তব্য পথের সূক্ষ্ম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

“যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,

সান্দিয়া, ঢেলার মায়ে বাড়ি।” ( কবিকল্পণ )

তাই বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীকে “চল্লিশ হাতের পা” এদেশীকে মস্তকে ধাবণ করিতে বাধ্য  
 মোসলমানী বেশভূষার করিয়াছিল এবং ইজার চাপকান্ পরিতে হইয়াছিল। এপ্রকার  
 সহিত মোসলমানী ভাষা করিলেও হিন্দুগণ বাদশাহী জাতির বেশভূষার অনুকরণ করিবার  
 পল্লীভাষার শোভাবৃদ্ধি ও উন্নীত জাতির সহিত পূর্ণমাত্রায় মিশিবার সুবিধা পান নাই।  
 নিয়ত মোসলমান-সমাজের সম্পর্কে অবস্থান করিয়া, বিবিধ কারণে বন্ধুত্ব-স্রষ্ট্রে আবদ্ধ  
 এবং রাজকীয় কর্মচারিরূপে অবস্থান করিয়া ইহারা ধীরে ধীরে বাদশাহী জাতির সহানুভূতি  
 আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিবার সুবিধা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে বাজাব জাতি এবং বাজধর্মাবলম্বী বাঙ্গালীর সহিত হিন্দুর মিশ্রণে একদিকে  
 যেমন বাদশাহী জাতির বেশভূষাদির অনুকরণ খববেগে চলিতেছিল, অতৃদিকে তেমন মনের  
 ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গোড়ীয় ভাষা-ভাঙারে আরবী  
 পারশাদি ভাষার অবাধ বিস্তার করিতেছিল।

সেই সময়ের হিন্দুমুসলমানের “সত্যপীরের পাচালী” ও “সত্যপীরের সিন্নির” ব্যবস্থার  
 প্রচলনে মণিকাঞ্চন-যোগেব নিদর্শন দেখিতে পাই। মোসলমান ফকীর বা পীরগণের  
 তখন প্রবল প্রতাপ বর্তমান ছিল। নবধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশে তৎকালে হিন্দু  
 মোসলমানী ধর্মভাবের মোসলমান বিদ্রোহের ভীষণ আলামালের সৃষ্টি করিয়াছিল।  
 সহিত ভাষার ভাববৃদ্ধি সেই নূতন অথচ ভীষণ অনিষ্ট-সাপন কার্যের ভীষণ পরিণাম  
 হইতে জাতীয় জীবন ও সমাজ-রক্ষার উপযোগী উপায় উদ্ভাবন আপনা আপনিই উদ্ভিত  
 হইয়াছিল। সেইটুকি কি ? না নূতন ধর্মপন্থী “বাউল দরবেশ”। ইহারা বাছ পোষাকপরিচ্ছদে,  
 আচার-ব্যবহারে ও শৌচাদি ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ মোসলমান ফকীরের মত এবং ধর্মমতে হিন্দু ধর্মের  
 কতকটা অনুবর্তী হইয়া চলিতেন। আমরা এদেশের বৃদ্ধগণের মুখে গল্পছলে শুনিয়াছি, এদেশের  
 অনেক হিন্দুকে বলে মহম্মদীয় ধর্ম দীক্ষিত করা হইয়াছিল এবং অনেকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত না  
 হইয়াও সংসর্গদোষে হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের হিন্দুধর্মে  
 আস্থা ছিল, কিন্তু হিন্দুগণের তাৎকালিক গোড়ামিবশতঃ তাঁহাদিগের প্রারশ্চিত্ত দ্বারাও  
 মোসলমানগণের হিন্দুধর্মে সমাজে গ্রহণ করা হয় নাই। যাহারা বেশভূষা আচার-ব্যবহারে  
 আস্থা ও ভাষার বিকার মোসলমান থাকিয়াও ধর্মমতে অনেকটা হিন্দুর মুখাপেক্ষী  
 ছিলেন তাঁহারা বাউল বা দরবেশী সম্প্রদায়। যাহারা মোসলমানধর্মে দীক্ষা গ্রহণ  
 করেন নাই, তাঁহারা বাউল এবং যাহারা মোসলমান হইয়াও হিন্দুধর্মে গোপনে আস্থাবান  
 ছিলেন তাঁহারা ইচ্ছাশ্রীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তাই সেই সময়ে—

“কেয়া হিন্দু, কেয়া মুসলমান, মিলজুলুকে করো সব সঁইজীকা কাম।”

জীবন-সংগ্রাম বজার রাখিতে এই মতের প্রবর্তন দ্বারা দেশের একটা বিবাদ হইতে মুক্তি  
 ভাষার পরিবর্তন পাইবার পন্থা আবিস্কৃত হইয়াছিল। আমরা এদেশের হস্তলিখিত  
 “দিলকেতাবে” তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকি।

কবিকঙ্কণে হিন্দুমোসলমানে একত্র বসবাসের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং উক্ত চিত্র যে গোড়ের চিত্র তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

“পূর্বের পশ্চিমপটী বোলায় হাসনহাটী।” ( কবিকঙ্কণ )

এই “হাসনহাটী” হোসনাবাদ বা হোসেনহাট গোড়ের অন্তর্গত মোসলমানপল্লী ব্যতীত আর কিছুই নহে। “আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ নোগল কাজি

খয়বাতের বীর দেয় বাড়ী।

হিন্দু-পল্লীমধ্যে মোসলমান-  
প্রাধান্য পূর্বের পশ্চিমপটী, বোলায় হাসনহাটী,  
এক সমুদায় গৃহবাড়ী ॥

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিতপাটী,  
পাঁচবেবি করয়ে নমাজ।

ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীরপগম্বরে,  
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥

বাক্সালী কবির কাব্য  
বাদশাহী ভাষার চটা দশবিশ বেবাদরে, বসিয়া বিচার করে,  
অনুদিন কিতাব কোবাণ।

সাঁজে ডালা দেই তাটে, পীরের শীরনি বাটে,  
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান।

বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না কবে ছন্দ,  
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

ধরয়ে কাষোজ বেশ, মাথে নাছি রাখে কেশ,  
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥

না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে,  
ইজাব পরয়ে দড় কবি।

যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,  
সারিয়া ডেলার মায়ে বাড়ি ॥

আপন টোপর লইয়া, বসিয়া গায়ের মিয়া,  
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত।

সুবলী যেহালি পানী, কুড়ানি বটুনি হনি  
পাঠান বসিল নানাজাত ॥

বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া,  
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।

মোলা পড়িয়া নিকা, দান পায় সিকা সিকা,  
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥” ( কবিকঙ্কণ )

কবিকঙ্কণেও এদেশী গ্রাম্য ভাষার যথেষ্ট সন্নিবেশ দেখিতে পাই, অবশ্য “পল্লীভাষা” পরিচয়ে যে কেবল হিন্দুগণের কথিত ভাষাই বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। বহুকাল এদেশে আমরা মোসলমানের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি। তাঁহাদের জন্মভূমি ও আপন দেশ যখন এই বাঙ্গালা, তখন তাঁহাদের ও আমাদের “পল্লীভাষা” আমাদের ভাষার সঙ্গে একত্র সন্নিবেশ না করিলে ভেদজ্ঞান থাকিয়া যায়; সুতরাং বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানিভাষাই প্রকৃত প্রস্তাবে ‘পল্লীভাষা’ বলিয়া সাধুসমাজে গৃহীত বিবেচনা করিতে পারি।

কতিপয় মোসলমানী শব্দ ‘কাজি, খয়রাত, বোলায়, ফজর, বিছায়া, পাঁচবেরি, পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হয় মোকাম, সাঁজ, বেরাদরে, কিতাব, দানিসবন্দ, ইজার, তরফ, নিকা, পড়ায়্যা, দোয়া’ প্রভৃতি শব্দ মালদহের “পল্লীভাষা” মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে।

“দিল-কিতাব” সম্বন্ধে এইস্থানে ছচারিটা কথা ও উদাহরণ প্রদত্ত হইল। আমরা তিন চারিখানি “দিল-কিতাব” নামক বাউল-দরবেশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। যত্নের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, প্রায়ই একরূপ এবং বাউল-সম্প্রদায়-মূলত প্রেহেলিকা-পূর্ণ। রূপ ও সনাতনের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

“ইহার কারণ কথা কহ সোনাতন।  
 দিলকিতাবী ভাষা ‘সোনাতন বলে সাঞী কিছুই না জান ॥’ ( দিল কিতাব )  
 “শ্রীকৃপের কথা সুনি হেন কর খবরদার।  
 আরজগির হৈঞা গুছে আরবার ॥” ( ঐ )

মুরসিদের নিকট শিষ্য না হইলে তাহাদের ভজনমার্গের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিত না তাই—

“মুরসিদ বোলেন বাবা সিস্য হও তুমি।  
 এসব দিনের খবর বলি দিব আমি ॥” ( দিল কিতাব )  
 সাধক হইতে হইলে—

“মমিন মেয়া ভাই, মুরসিদের কদম চাই।” ( ঐ )  
 রূপ সনাতনকে যে সমুদায় প্রেহেলিকাব্যং প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ছচারিটা উদ্ধৃত করিলাম।

“প্রথম গোড় বাপের মন্তক ওঁপরে।  
 দ্বিতীয় গোড় হয় মায়ের উদরে ॥  
 ত্রিতীয় গোড় হয় সংসার পরিপাটি।  
 চতুর্থ গোড় হয় থাকে পিতামাটি ॥” ( ঐ )

দিলকিতাবী প্রেহেলিকা ভাষা

“মুখ মাঁকা কলবি হাত হজরত ।  
 প্রাণাদি সঙ্গে মালিক কহে বাত ॥  
 খোদার খোদাই এক আছে তার সাত ॥  
 অজনিম্ভব সহজ বোসিবেক সাত ॥” (ঐ)  
 “সত্যতে হালাল বৈসে ক্রোধেতে হারাম ।  
 খেজমতে পির বৈসে মুরসিদের মোকাম ॥” (ঐ)  
 “জমুনার তিরে আছে এক পুরুষ বর ।  
 রাজহংস কুড়া করে চরে কুলে তার ॥” (ঐ)  
 “মোহিজিদের বাহিরে চোকীদার ফিরে ॥” (ঐ)  
 “খোদার হুকুমে সেই ফুকারে ঘনে ঘন ।  
 অহংকারে তার বোল না শ্রুনে কোনজন ॥” (ঐ)

এই প্রকাব বহু কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নোত্তরে “দিল-কিতাব” পূর্ণ বহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়  
 দিলকিতাব, হিন্দু ও  
 মোসলমানীধর্মের এবং  
 হিন্দু ও মোসলমানী  
 শব্দের মিশ্রণ আদর্শ  
 এই গ্রন্থের আরম্ভ-বাক্যে “৬শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগতি” লিখিত আছে  
 এবং এদেশীয় বহুলোকের গৃহে এই গ্ৰন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।  
 এক সময় ইহার বড়ই সম্মান ছিল বলিয়া প্রকাশ। সম্ভবতঃ  
 সেই সময় বাউলদরবেশী প্রাধান্তের সময় বলিয়া বোধ হয়।

“সাক্ষী, খবরদার, আরজগির, মমিন, মেরা, কদম, কলবি, হজরত, মালিক, বাত,  
 খোদার, খোদাই, হালাল, হারাম, খেজমতে, মুরসিদ, মোকাম, মোহিজিদের, হুকুমে,  
 ফুকারে, বোল” ইত্যাদি শব্দগুলি মোসলমানী হইলেও হিন্দু সমাজে হিন্দু-কবির পুঁথিতে  
 “পল্লীভাষায়” স্থান পাইয়াছে।

মোসলমানগণের ধর্মবিষয়ক কেতাব বঙ্গভাষায় পুঁথির আকারে লিখিত। আমরা প্রাচীন  
 পুঁথির সংগ্রহব্যাপদেশে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে একখানি পুঁথি পাইয়াছি। নিয়ে উহার ছচারটি  
 বাক্য নমুনা-স্বরূপ প্রদান করিলাম।

### “মধুমন্দ কলমা”

হস্তলিখিত অপ্রকাশিত বধু-  
 বঙ্গ কলমার ভাষা ও শব্দ

“গরিব আতম এখানা করহ ঘিনা ।  
 অনেক পাইব তথা করস বিছানা ॥  
 ইহা বুঝিয়া সাবধান হও সর্কজন ।  
 আরশে এক রোজ হইব সহি সব দিন ॥  
 কিরামতের দিন জেন নাহ এত কঠীন ।  
 আখের হইবে কামত একদিন ॥”

“দাহামদ ভোমার নাম ॥ ভোমি সর্কণধার ॥



মোসলমানীকেতাবে বাঙ্গলা

ছন্দের অনুকরণ

তোমি নবি অগতির গতি ।

হর পরীদেবগণ :: পক্ষ্য পক্ষি জত জন ::

কে তোমাকে চীহিবারে পারে ॥

ভক্ষণ আনে ক্ষুধে :: ধবে সাধি আপন মুখে ::

সাধি হেন কুদবত নাহি আর ।

সাধি নাই করিহ বোশ :: থেম মোব গুল্লা দোষ ::

তবু\* রাখিহ আমাএ ॥”

“ছতিএ কুলি করি মুখ পাখালিবে ::

তিইআ নাশিকাতে পানি দিএগা ধুলাইবেন ::

গালালা কবি ধলাইবেন জেন কর নিজ কন্ম ::

ছুই করয়ে পানি দিবো তদপবে ছুই পাও ধলাইবে ::

ফরজ এট মসপ সাফ কবিবেন ::”

“প্রথমে লইএগা আব দস্ত পাখালিবে ::

ছুতএ গালালা করি নাশিকা ধুলাইবে :

মুখপাখালিএগা ছুই কনে পানি দিবে :

ত্রিথিএ মসফ সাফ কবি গছল কবিবে :

কবিতে গোছল জেন ভিজ়ে সর্ব ক্রম ::

গোছলেতে ফরজ তিন তয়নে কএ :

কহিলাম এহিমতে জেবা জলগোছল কবিএ ::”

জে জে কন্ম কবিএগাছেন সংসাবে ।

অব্যশে হিসাব দিতে হবে দরবারে ॥

■ \* \*

ধন জন মন গর্ব একতাল নএ ।

জেই গর্ব ভাল জাহাতে আলা রাজি রএ ॥

বড় বড় জুফা এলা বাদশাহার ওজির ।

গরাগড়ী জাইবে তারা ভূমৈ দিএগা শির ॥”

ঘিনা, ফরসবিছানা, আরশ, কিয়ামতের, আখের, নবি, সাধি গুল্লা, পাখালিএগা, ধুলাইবে, পাও, ফরজ, গছল, করিএগা, হিসাব, দরবারে, ওজির, কতিপয় মুসলমানী শব্দ  
আছল ইত্যাদি শব্দ হিন্দু ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে ।

“আছল”

“অনেক ‘আছল’ কিতাব খ্রীষ্টীয় মাঝারে ।” ( মধুমন্দ কলমা )

মোসলমানগণ গোড়দেশে বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া বাঙ্গালীর ভাষা

বাঙ্গালীমোসলমানের  
বাঙ্গালী ভাষা

শিখিয়া যেমন বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাদের ভাষাও  
বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মোসলমানগণের প্রাণের ভাষা  
একণে বঙ্গভাষা। বাঙ্গালাভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তাঁহাদেরও  
যত্নবান হওয়া কর্তব্য। মালদহের পল্লীভাষায় মোসলমানী ভাষা চিনিবাব সহজ উপায় কেবল  
ধর্ম্যভাব্যতীত আর কিছুই নাই।

বাঙ্গালী হিন্দু কবির হাতে—

“উজির ঠাকুর কান্দে নিত্য পরন্তেক ॥” (চন্দ্রঃ কলি)

বাঙ্গালী কবির হাতে

“তোমার ভাই শ্রীরূপ ছিল পূর্য পাঠ।

হামেসা বৈঠক ছিল শয়ন একত্র ॥”

“দরবেশ হঞা আমি মক্কা চলি যাব।” (ঐ)

এইপ্রকার রচনার পাবিপাটা দেগিতে পাই।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিব মধ্যে একখানি জীর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাতে বাহা  
লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(প্রাচীন গদ্যের নমুনা)

“৭০ অাঁক জাঁক : সড়বন্ধ জজগ : নাগাবা নিসানা : পাঠকি খড়ম : ফকিরি আদল :  
চলায়া ফকিরি : ফকিবমানে : বামরোহিমানকো ॥ দ্বারিকা কি  
প্রাচীন মালদহের গদ্যের  
নমুনা  
টুঙ্কবা : জহনন্দন কি জহবা : জগুনন্দন কি মোহঁরা : যুগকি  
মুগোছালা :। বাঘকি বাঘখালা : প্রহ্লাদকে ধাগাঘরা : ॥

সুরং সাহেব জি : বামজিক্যাদজা : কানাঞিয়া জিকা মরারি : শ্যামজিক্য বেণু :। তিন  
নাম চালায়া : আড়বন্ধমজ্যা : † চুলকোপীন ভেক : মেগং কি মোরজাতা : ফুলমালা :  
পাওকি জিজিরী : হাতকি কড়া : কামকা বিবরোলি : শিরকা বাবুরি : মুক্ষকা দাড়ি :  
লোহানিক্কা কিস্তি :। কোতোর্ক : ও স্বাতা \* শানকি : কড়য়া ॥ তসরি :। ত্রিকণ্ঠমাল :  
ব্রেকং কি কথ্যা : ধগ্গীগুরু : সচিনন্দনকে বালা :। উদরকি কারন : মাজতভিছা ॥ ছোরদেশর  
ধাক্কা : উড়লে কার্থা : চড়লে ব্রন্দাবন মোকাম : জাহাপ্যাবীজিকাধাম : ১ ॥ (ফকীরি)

অমুসন্ধানে অবগত হইলাম বাউল বা দরবেশী-সম্প্রদায় মধ্যে চেলা বা শিষ্য হইবার  
সময় মুরসিদের নিকট এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইত। প্রথম “অাঁক” “জাঁক” এই দুইটা  
উহাদের সম্প্রদায়গত বীজমন্ত্র বলিয়া সর্বদা গুপ্ত রাখিবার নিয়ম আছে। উপরি উক্ত  
মন্ত্রমধ্যে প্রাচীন ফকীরিবেশ ধারণের নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে।

এই মন্ত্রলিখিত ভাষা তৎকালে উক্ত সম্প্রদায়-মধ্যে এতদ্দেশে বন্ধুল ছিল।

■ ধাপা = মত্রে ( বেটা, কস্তা ) পুতাদিয়া সেলাই করা বস্ত্র ( কাঁথা )

† দল্যার্য = ইচ্ছা।

এইপ্রকারে এদেশে যেমন একপ্রকার ধর্মমতাবলম্বীর পুষ্টি ও পরীভাষার বিকাশ সাধিত হইল তদ্রূপ “মাদারসাহেবের” ভজনমার্গাবলম্বী অন্তর এক মাদার সাহেব সম্প্রদায় গোড়ে দেখা দিলেন। তাঁহাদের ‘মাদারসাহেব’ বৃহৎ মাদারীশ্বরজা ও “ডব্‌ফ” বাজাইয়া এদেশে ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মাদারসাহেবের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা মালদহী প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

( পদ্মছন্দমুখী গদ্য )

কদক (১) চামপার ফুল : বলমোলকবি : গেল ঠাকুরের পাস ॥  
 ঠাকুর বোলেন বেটা : নরকনারায়ণ : আইলা কি কারণ :  
 চিণ্টিফরিঙ্গ : পোকামকর : তোমার সেবা নষ্ট করে :  
 তার কি আশা হয়ে : জারে জারে বেটা নরক নারায়ণ : ! ;  
 তোমার দুই কপের জপিআ : দিলাম ধর্মনাম : ।  
 এই ব্রহ্মগান জায়া : করহ ওঁত্থান ॥ আজিকার চারিপ্রহর রাই :  
 কালিকার দুইপ্রহর দিন : থাকিল বন্ধ পড়িয়া ॥  
 ঘরবন্ধ চাতরবন্ধ : চৈতন্তের স্থলবন্ধ : মোরবন্ধ নড়েচরে :  
 দোহাই পির সাহা মাদার ১॥ ১ : ॥  
 ‘বজ্যর বন্ধ ২ সাহামাদার কি : জোড় বজ্যর বন্ধ :  
 আকাশের কামিনি বন্ধ : পালের বারসিকি বন্ধ : ঘরবন্ধ :  
 চাতরবন্ধ ॥ চৈতন্তের স্থলবন্ধ : ।  
 চিণ্টি ফরিঙ্গবন্ধ : থাকিল বন্ধ পরিয়া : মোরবন্ধ নরে চরে :  
 সাহামাদারের বন্ধ দুই চরণ : ১ ॥” ( সাহামাদার )

এইটী এদেশীয় প্রাচীন ভাষার ও ছন্দে লিখিত মন্ত্রবিশেষ। শেষে “পীরসাহামাদারের” দোহাই আছে, কিন্তু মন্ত্রটির প্রথমংশ বৌদ্ধভাব-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রটির রহস্য তেদ করিতে হইলে আমরাগিকে একটি গুপ্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর সাহায্য আলোচনা করিতে হইবে। এদেশী বৌদ্ধপীর মাদারের = কাহিনী অতি সুন্দর। রাধাইপুর+ নামে বৌদ্ধ-পদ্ধতিপ্রধান সমৃদ্ধিশালী উপনগর ছিল, তথায় লোকনাথ বুদ্ধমূর্তি আজিও বর্তমান আছেন। এই বুদ্ধপূজক এক ঘর ধর্মভাট ( ব্রহ্মভাট বর্তমানকালে )

ধর্মভট ও পীর

বা ধর্মভট উক্ত বুদ্ধদেবের পূজক আছেন। উক্ত ধর্মরাজ ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে। এই ধর্মরাজ-মন্দিরের অনতিদক্ষিণে এক পীরের আস্তানা

(১) কদক।

= মালদহ পরীকথার বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

+ সংক্ষিপ্ত বিবরণ “বাণী”তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আজিও বর্ধমান। তাঁহার সমাধি-বেদিকার উপর হিন্দু-মুসলমান নবনারী আজিও দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে।

এই পীর সাহেবের বিবরণ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কুনি পূর্বে ধর্মভট্ট-বংশীয় বৌদ্ধযোগী ছিলেন। যোগশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ~~স্বাক্ষর~~ হই জাতা ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত হইতে হয়। এই ধর্মদীক্ষায় পাণ্ডয়ার বাদশাহ অগ্রণী ছিলেন। শেষে বাদশাহের আদেশে ধর্মরাজের সম্পত্তি দুই অংশে বিভাগ করিয়া এক অংশ ধর্মরাজকে এবং অপরাংশ এই নবদীক্ষিত পীরকে প্রদত্ত হয়। অতাপি ধর্মরাজ ও পীরের সম্পত্তি বর্ধমান আছে। একটা মাধাইপুরের পীর, বৌদ্ধভাব পুষ্করিণীর অর্ধেক পীরের ও অর্ধেক ধর্মের—এই নিয়মে বিভাগ দৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্মাক্রান্ত ভাষা হয়। পীর সাহেব জীবহিংসায় বিরত থাকিয়া আত্মানায় স্নবহং ধ্বজা বাধিয়া উদার ধর্মমত, হিন্দু-মুসলমানে অভেদ জ্ঞান ও ব্রাহ্মভাব শিক্ষা দিতেন। অনেকে আবার তাঁহাকে মাদারপীরের চেলা বলিয়া থাকে, কেহ কেহ স্বয়ং মাদারপীর বলে। এই পীর অতিশয় বাকসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং বৃজরূক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামের দোহাই দিলে বনের বাঘ, মহিষ ও সর্প হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে। একারণে অনেক এদেশী মন্ত্রতন্ত্রে তাঁহার দোহাই দেখিতে পাই। এই কারণে পীর সাহেবের চেলা বলিয়াছেন যে—

“চিটি করিঙ্গ পোকামাকর তোমার সেবা নষ্ট করে তার কি আজ্ঞা হয়।”

যাহাই হউক, এই প্রকারে এদেশে ধর্মমতের বিশিষ্ট্রমে নব নব ধর্মমত বিকাশ পাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে “পল্লীভাষা”ও নব নব রূপ ধারণ করিতেছিল। এই মন্ত্রটী মালদহের প্রাচীন পল্লীভাষার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এদেশীয় একটি মন্ত্র-বিশেষের অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

“উকারে উকীরে পোকা রে পুঁকিরে মাকইরে দূরে পলায়।”

ইহাও অতি পুরাতন পল্লীভাষার আদর্শ। আমরা “মাদারের” মন্ত্রটী একটু মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে কথিত পল্লীভাষার হিন্দু-মুসলমানী মিশ্রণের আদর্শ স্থলরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

হিন্দুভাষা মুসলমানী কথিত ভাষার সহিত ক্রমশঃই যত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিল, ততই পল্লীভাষার মধ্যে আত্মবিস্তার করিয়া প্রাণের ভাষা হইয়া পড়িল। প্রাণের আদরের ভাষা গীতে আপনি উৎসের জ্বায়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। মালদহের একটা প্রাচীন গীত নিয়ে লিখিত হইল—

“রূপনগরে রসের মামুস আইসাছে

আরগ তোরা দেখিবিকে।

মালদহী প্রাচীন

গীত

রূপে শুনে ডগমগী দেখিলে নয়ান জুড়াবে।

ওহার ভিকাতাবে তলুখিন রাণা বৈল্যা ডাকতেছে।

আনন্দ মদন আর নয়ানে ওদয় দিরাছে।

সে দেখিতে প্যারী মোনের মাগুস হৃদয়ে জার বিরাজে ।  
 জে দেখাছ, দেখা জাগ কুলে কি তার ভয় আছে ।  
 কত কুটমতি পাইয়া রতি স্বরূপে রূপ মিশাই আছে ।  
 গোসাই কিঙ্কর চান্দে বোলে দেখিলে নয়ান ভুলিবে  
 লাল জরদ, সিঁহা, সফেদ চাইব রঙ্গিতে মাত্যাছে ।”

লাল, জরদ, সিঁহা, সফেদ প্রভৃতি পদের ব্যবহার বৈদেশিক ভাষায় প্রাধান্যবশতঃ  
 হইয়াছে ।

“ঙ” অন্ত শব্দ

“ঙ” অন্ত পদের আছিলাঙ, দেখিলাঙ, কহিলাঙ, সাখিলাঙ, মাখিলাঙ প্রভৃতি  
 ব্যবহার শব্দের অন্তস্থ “ঙ” ক্রমশ “ম” হইয়াছে । যথা ।—আছিলাম,  
 দেখিলাম ইত্যাদি । “ঙ” অন্ত শব্দ এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু মাঁঙ, পাঁঙ, গাঁঙ,  
 শব্দগুলির অন্তস্থ “ঙ” লোপ হইয়া তৎস্থানে “ম” হয় না । বিশেষ্য পদ, ক্রিয়াপদের স্থায় নহে ।  
 কিন্তু “ঙ” স্থানে “ও” হইয়া থাকে যথা, মাঁও পাঁও ইত্যাদি । শব্দ মধ্যস্থ “ঙ” অক্ষরটি  
 প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না । যথা ।—‘কোঙর’ ( কুমার ) “নঙব” ( নঙ্গর )

“এই মত ছিল জত সভার কোঙর ।” ( নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত )

“কোঙর” “নঙর” শব্দের “ঙ” যদিও “মা” “ঙ্গ” তে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা গ্রাম্য  
 ভাষায় ব্যবহার্য্য নহে ।

“নাগবা নিসান পাওঁকি খড়ম ফকিবি আদল” এস্থলে “পাওঁকি” র “ওঁ” টা “ঙ” রূপান্তর  
 মাত্র ।

“সত্যবন্ধি ‘হইলাঙ’ তবে গুনহ বচন ।”

( চম্পলিখিত মহাঃ, বনপর্ক, ত্রীকরনন্দী )

“ভাঙুর” উপরে কণ্ঠা দিলেন নিন্দুর ।” ( ঐ )

‘হইলাঙ’ ‘ভাঙুর’ প্রভৃতি পদের বিষয় বিবেচ্য ।

কোন কোন শব্দের বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে অর্থভেদ ।

একই শব্দ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হইলে পল্লীভাষায় অর্থের সম্পূর্ণ পার্থক্য হইয়া  
 যায় । যথা—

কতিপয় পদের বিশেষ্য ও  
 ক্রিয়াভেদে অর্থভেদ

‘গাই’ ‘পাই’ ‘নাই’ ‘ছাই’  
 বিশেষ্যপদে ‘গাই’ অর্থে গাভী ।  
 ক্রিয়াপদে ‘গাই’ অর্থে গান করি ।

বিশেষ্য	অর্থ	ক্রিয়াপদ	অর্থ
পাই	পয়সা	পাই	পাইয়া থাকি, প্রাপ্ত হই ।

বিশেষ্য	অর্থ	ক্রিয়াপদ	অর্থ
নাই	নাভী	নাই	মান করি, বা নেই।
ছাই	ভস্ম	ছাই	ছাওয়া (ঘর ছাই—আচ্ছাদন করা)

হাঠা, হারুণ, হারায় হাঠাথ্ প্রভৃতি শব্দের প্রচলন আছে।

হার্ণাকথা = বেফাঁশকথা, বেতলাকথা। হাঠালোক।

হারুণ = ছুট, যথা “ছাইলাটা বড়ই হারুণ”।

হারায় = এখানে এস। হাদ্যাথ্ = এদিকে দেখ।

মালদহে যে সমুদায় ‘ব্রত’ বর্তমান কালে প্রচলিত আছে, তাহার কথা বা ব্রতকথাগুলি রমণীগণই বলিয়া থাকে। উহার ভাষায় প্রাচীন ভাষার আদর্শ দৃষ্ট হয়। আমরা ঐ প্রকারের ব্রতকথা ও গীতাদির উল্লেখ করিয়া প্রাচীন ভাষার পরিচয় প্রদান করিলাম।

বালিকাগণের সাজাব্রত কথা

“সাজা পূজ সাজতী, বুঢ়ার ঘরে ঘিয়ের বাতি।

ক্যান্ বুঢ়া এত রাতি, কাজির পিছে খোঁচার বন,

পল্লীবালিকাগণের  
ব্রতগীত

নল ভাঙ্গা জলখা, খাগ্‌গর ভাঙ্গা শাঁসখা,

অগ্‌গর রে, চন্দনরে, ভূরকুট যা।

কিরে সা দোলো দোলো, কিরে চাম্পারি ফুল।

সাতকুল নিঞা সাজা আনন্দকর।”

অত্র এই ব্রতের নাম “সাঁজপূজানী” এদেশে ‘সাজাপূজা’ সাঁজ বা সন্ধ্যাকালে পূজা করিতে হয় বলিয়া এই বালিকা-ব্রতের নাম “সাজাপূজা”।

রমণীকুলকথিত ভাষার  
কয়েকটা শব্দ

সাজা, সাজতী, কাজির, অগ্‌গর, ভূরকুট প্রভৃতি শব্দ সুপ্রাচীন।

এদেশে আজিও “সাঁজ” শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার হইল থাকে।

যথা—সাঁজের ব্যালা, সাঁজের বাতী।

সাজতী = সাজাপূজা-পরায়ণা বালিকা।

অগ্‌গর = অগুরু

ভূরকুট শব্দ এখানে বিশেষণের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাইতেছি যথা “ভূরকুট আঁধার” ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ভূরকুট আঁধার বলিয়া থাকে।

‘ভূরকুট আঁধার’ বৎ কতিপয় শব্দ এদেশে প্রচলিত আছে। যথা—‘অঘল ট্যাঙ্গা’,

‘অঘল খাট্যাম্’, ‘অঘল চুক্’, ‘ধলো ফ্যাকাশ্’, ‘কালো চিঁঙাট’,

বিশেষণের বিশেষণ শব্দ

‘মিষ্টি পান্স্যা’, ইত্যাদি শব্দ সমুদায় নিম্নত ব্যবহার্য—পল্লীভাষা।

“খালি খালি কুহড়া জালি সম্মুখে থুরা।

পল্লী—বাকীলা সগীত

আমার সাজা ভাত খাবে কি কি বেস্‌তি দিয়া।

সাজীয়া লকুচ্‌ পাড়ব যায়্যা।” ইত্যাদি। (সাজাব্রত)

বেসতি—তরকারি ।

বেসতি ও বেসাতিনী অর্থ-স্বতন্ত্র, যাহারা ডোর ( ঘুনসী )

মিসি, কোঁটা ইত্যাদি বিক্রয়েজীর নাম “বেসাতিনী” উহাদের বিক্রয়  
জব্যের নাম “বেসাতি” ।

এই প্রকার শব্দের

এদেশে এই প্রকার সামান্য উচ্চারণ ভেদে অর্থের বহু প্রভেদ

বিভিন্ন অর্থ

দৃষ্ট হয় । যথা—বিরমি, বিহনী, বাইনী, বিরী ।

বিরমি—এক প্রকার চাউল ভাজিলে থৈ মত হয়, সেই থৈ ।

বিহীন—বোলতা ( wasp )

বাইন—কাঁটা

বিরী—বেনা-বাস, থস্‌থস্‌ ।

“চাঁদ সুরুজ পূজ, সোনার থালে ভুজ ।

সোনার থালে খিরসার লাড়ু ।

শংখের ওপর সোবতের খাড়ু ।”

কোঁতুকাবহ শব্দার্থ

ভুজ শব্দ ভুজ হইতে উৎপন্ন । এখানে ভুজ অর্থে ষাও ।

ভুজ অর্থে ভাজ । ভুজা অর্থে চাউল ভাজা বুঝায় ।

ভুজ অর্থে হস্ত । কিন্তু দশভুজা বলিলে জুর্গাও বুঝাইবে এবং দশ  
রকমের চাউল ইত্যাদি ভাজাও বুঝাইতে পারে । কিন্তু তখন “দশভুজা” উচ্চারিত হইবে ।

কতিপয় পরীভাষা

কথিত শব্দ

“আধেক ঘাঁটা যাতে সাজা সিঁস দেখালা ।

তাই দেখএ রাজার বেটা সিঁছর বসালা ।

আধেক ঘাঁটা যেতে সাজা লাক দেখালা ।

তাই দেখএ রাজার বেটা বাসর বসালা ।

\* + ■

সেই সিঁদুরের মধ্যে আছে, বিনদ ভ্রমর ই ভ্রমরা,

মাও লালে কে—।” ( সাজা )

( বালিকাগণের ব্রতকালে, গাত প্রবণ করিয়া লিখিত । )

“এ” ব্যবহার ।

ক্রিয়াপদান্তে ‘দেখিয়া’ বা ‘দেখিয়ে’ পদগুলি ‘দেখএ,’ ‘দেখিএ’ এই প্রকার পদগুলির

‘এ’ অন্ত পদের ব্যবহার

ক্রমশঃ ‘দেখিআ’ মত কথিত হইত ।

“ভারতের গুণ্যকথা অমৃতলহরী ।

ইহোলোক “সুখএ” পরলোক তরি ॥”

( কবীন্দ্র, আদিপর্ক, নিত্যানন্দ ঘোষ )

এস্থলে “সুখ হয়” প্রয়োগের পূর্বে “সুখহএ” প্রচলিত ছিল।

“মাএ’ পোএ’ বনবাস দেহ ছই জনে ॥”

( হস্তলিখিত স্মৃতি-কথা )

“ক্ষিদাএ, তৃষ্ণাএ সান্ত হৈল ছই জন ॥” ( ঐ )

মাএ, পোএ, ক্ষিদাএ, তৃষ্ণাএ প্রভৃতি পদগুলির যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

“জপিআ”

“তোমার ছই কন্তে’ জপিআ ॥ দিলাম ধর্ম’ নাম : ।” ( মাদার )

“আ” অন্তপদের প্রয়োগ

এই “আ” “এ” হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

করণ-কারকের সাক্ষেতিক চিহ্নের ব্যবহার এই প্রকার পল্লীভাষায় স্থচিত হইয়া থাকে।

‘মাকে’, ‘পোকে’র স্থলে ‘পোএ’ হইয়াছে।

“সাক্রি নাই করিহ রোশ : : খেম মোর গুহা দোষ : :

হকু\* ( মে ) রাখিহ “আমাএ ॥”

( হস্তলিখিত মধুমন্দ কলমা )

“ছতিএ’ কুলি করি মুখ পাখালিবে : :”

“তিইআ’ নাশিকাতে পানি দিঞা ধুলাইবেন : :”

“তিথিএ মসক শাফ করি গছল করিবে : :

“গোছলেতে ফরজ তিন ভয়নে কএ :”

“কহিলাম এহি মতে জেবা জল গোছল করিএ :”

“ধন জন মন গর্ব একতা লনএ।

জেই গর্ব ভাল জাহাতে আল্লারাজি রএ ॥” ( ঐ )

‘ছতিএ’, ‘তিইআ’, তিথিএ, কএ, করিএ, লনএ, রএ” প্রভৃতি পদ পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হইত।

“আলতায় ডুবু ডুবু ছখানি পাও,  
লাগাল পদের বিবিধ অর্থ যে ঠে ম্যালানীর লাগাল্ পাই  
লাক পহা ব্যাসর দেই।

ম্যালানিটে—মালঞ্চালা দে।” ( সাজা )

“লাগাল্” = লাগ ( লাগাল্ ) আজিও এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। উপরি উক্ত কবিতাটী বর্তমান কথিত পল্লীভাষায় আদর্শরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

■ লা—বাল, লা শব্দের পর একটু অবকাশ দিয়া ‘বাল্’ শব্দটি উচ্চারিত হইলে, অর্থের বিস্তার পার্থক্য হইয়া পড়ে। তাহাইহলে লা=নোকা, বাল= (বাইল) বটে, কতিগ্রহ। অর্থাৎ নোকাখাদি ডুবুরি দিয়াছে বুঝাইবে,— লা বাল হইয়া গিয়াছে।



মালদহে পল্লীগ্ৰামে হিন্দুসমাজে বিবাহ উৎসবে স্ত্রীগণ যে গীত গাইয়া থাকেন তাহা মালদহের পল্লীভাষায় পরিমার্জিত আদর্শ বলিতে হইবে। নিম্নে বিবাহের গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

যুবতীগণের পল্লী-সংগীত

“শিতল দ্যাও রে। (ঋ)”

উত্তর দিক্ কার ম্যাম, ম্যামরে—

পশ্চিম দিক্ কার হর, শিতল দ্যাও রে।

ভিজুক্ ভিজুক্, ভিজ্যা গোলরে রাইহোর দণ্ডের সিঁহর,  
ভিজ্যা গোলরে।

কালি বিহান হতেরে, হামরা হাতির পিঠে

গুকাব কাচলী রে।

কালি বিহান হতেরে, হামরা হাতির পিঠে

গুকাম সিঁহব বে।

(জল সাজা গান)

“রাইহোর” “দণ্ডের” “বিহান” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কতিপয় রমণীকুল  
ব্যবহাৰী শব্দ

রাইহোর—এয়ো, আয়ত। দণ্ডের—সীমস্তের। বিহান—প্রাতঃকাল।

রাইহো, রাহেলী একই অর্থবোধক। “রাহেলীগণ জজ্কা দিচ্ছে।”

এস্থলে জজ্কা অর্থে উলু বাঁ হুলুধনি বুঝায়।

“দণ্ড” অর্থে সীমন্ত, সীংখি বুঝাইলেও নাসাগ্র হইতে আবস্ত করিয়া সমুদায় ললাট দেশ হইতে সীমন্তোদ্ধ পর্য্যন্ত রাহেলীগণ সিঁহর লিপ্ত করিয়া থাকেন বলিয়া উক্ত সমুদয় দেহাংশের নাম “দণ্ড”।

বিহান—প্রাতঃকাল বুঝাইলেও অধিকাংশ স্থলে “বিহান ভোর” পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

অপর গীত যথা—

“বর সাজিল রে (ঋ)”

আঙলাক (আঙ্গিনা) শোভা করে তুলসী বিন্দাবন

ছাইলা বর বিভাতে সাজ্যাছে চন্দ্রবরণ।

উজানী নগর হ’তে বর চাম্পাই নগর যারে।

যত যে কায়েতের মাইয়া চন্দন ছিটায়ে।

উজানী নগর হ’তে বর ভাটানী নগর যারে।

যতক বাতুমের মাইয়া আশীর্বাদ ছিটায়ে।

ককীর কাঙাল লয়রে লখ্খের সদাগর।

কড়ির বদলে দিব লংগ আই-ফল। (বরসাজা গীত)

আঙনাতে, ছাইলা, বিভাতে, সাজ্যাছে, গাইয়া, ভাটানী, বাভুনের, কাঙাল ইত্যাদি পদের প্রয়োগ নিত্যনৈমিত্তিক ।

আঙনাতে—আঙ্গিনাতে, অগ্নে, উঠানে ।

অতি প্রাচীন সর্লদা ব্যবহার্য্য ছাইলা—ছেলে ।

পল্লীভাষার শব্দ বিভাতে—বিবাহে ।

সাজ্যাছে—সাজিয়াছে, সজ্জিত হইয়াছে ।

ভাটানী—ভাটী ।

বাভুনের—বায়ুনের, ব্রাহ্মণের ।

কাঙাল—কাকাল, দরিদ্র ।

কোন কোন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বিবাহ-গীতগুলি বড়ই অপরিমার্জিত ভাবে গীত হইয়া থাকে ।

বরের রূপবর্ণনা সম্বন্ধের গীত অতীব আদিমভাবাপন্ন । যথা—

“বরেরি মাইখাটা, ধানসিদ্ধা তৈলাটা ।

অতিশয় গ্রাম্যদোষ-ছুট

বরেরি পিঠটা, খাব-কাচা পিচাখান ।

ভাষার আদর্শ

ববেবি হাত ছুথান্ ডাইল বোঁটা খড়ি ছুথান ।

এ বর ভাল লয় টে—, ববকে দেইখা ধুন্দ লাগিছে ॥”

পদীম জ্যাইলা জাখ্ টে কস্তার মা ( এ বর ভাল লয় টে,—ঞ )

( বর-রূপ-বর্ণন )

তৈলাটা—বড় হাঁড়ী ।

খাব-কাচা পিচা—খারসিক্ত বস্ত্রধৌত পিঠ ।

খড়ি—কাটি । ধন্দ—ধাঁধা ।

“লয়ারে লাউয়ারে, ভাল করে কামাইও হামার বাছারে ॥” ইত্যাদি ।

( বর-কামান গীত )

এস্থলে “লয়ারে লাউয়ারে” পদটির ‘লয়ারে’ পদ ‘লাউয়ার’ বিশেষণ নহে, ইহা অনুরূপ

অব্যয় শব্দ । যথা—কাউয়া কাঁকই, চি(হ)ল চিহ্লাই,

গ্রাম্য অনুরূপ অব্যয়

উকারে উকিরে, পোকারে পোকিরে, চাউয়া ঢাকনা, ইত্যাদি ।

লয়া—নূতনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—লয়া চাউল, লয়া কোতা, লয়া মান্নু ইত্যাদি ।

সাত পাকের গীত

কস্তা ধিরে বইসরে । (ঞ)

পল্লীভাষার আদিম সঙ্গীতাদর্শ

বরের মটুক হ’ল সোবর্ণের পঞ্চকুল ।

মথুয়া আশে ভব্রা হ’ছে বিরাকুল ॥ (কস্তা—)

ধরিয়া তু(ই)ল্য, ধরিয়া তু(ই)ল্য গৌরীর সিংহাসন ।

হুই মুখে চার চোখে হ'বে দর্শন ॥ (কথা—)

খুতার পঞ্চ প্রদীপ সমুখে জালাইয়া ।

মুষ্টি মুষ্টি ফ্যালে ফল বরের বদন চায়া ॥ (কথা—)

একো পাকো হোলো, আরে—হুইরো পাকো হোলো,

তিনো পাকের ব্যালায় গৌরী সমুখে দাঁড়াল । (কথা—)

তুমি কি জানহে ক(ই)ত্না বিভার বেতার,

সাতো পাকের ব্যালা ক(ই)ত্না কল্লৈ নমস্কার । (কথা—)

এই প্রকার রমণীয় রমণী মুখোচ্চারিত ভাষার গীত বিরল নহে । হয় ত কোন কোন ক্ষুদ্রচিসম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রকার ভাষার কথা তুলিয়া বলিবেন এ প্রকার নারীভাষা মৃতভাষা । বাস্তবিক মৃত, কিন্তু বিবাহবাসরে সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি ।

রমণীকুলপিয় পল্লীভাষার কথা যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল এক্ষণে পুরুষপুরুষের পল্লী-ভাষার রচিত হুইটী গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম ।

“শালার শিং কি চোখা”, ঠিক করে দেখরে ওটা, হাঁকরে কিরে হোঁকাঃ । (ঞ)

পুরুষগণের  
পল্লীভাষার  
প্রাচীন আদর্শ

তার পিঠে কেটারে, জগৎ শেঠ কি ? ছুয়ার মাটিকি কতো প্যাটিকি ফোঁকাঃ !  
হুদিক্ আচ্কাঃ হুটা, বোচ্কা কাঁধে, ফুলিয়ে গাল্টা,  
ফুলিয়ে কোমর মারচে থাক্কাঃ ।

এদিকে বস্তা কেটারে সেটি, আন্ত ঘ্যান গীয়াবৎ বেটা,

বুঢ়া ভালত মজা লুটে, আবার ববম্ করে উঠে ।

বুঢ়াটা দামরু পিঠে, ঠুংকু গাইছে, ডম্‌কর তালে মারছে ছকাঃ ॥

বুঢ়াকে চিনেছি বান্দা, বিসম ধান্দা, খুব নাখান্দা কামে পাকা ।

পরে রাজবংশী পিটি, টাটির আড়ে, চটির তলে আছিল লুকাঃ ॥

বুঢ়ার জ্যাভের দকা গিয়েছে খাঁটি, থেরেছিল কুদনী কুচনীর কটা ।

বুঢ়া হাঁহু নাইথো ফলে, ঝোরঘেরে কোরাণে আদম বলে ;

১ চোখা, হুঁচাল ।      ২ হোকারবকারী বুধ ।      ৩ কোতরা শুড় ( তামাকমাথা শুড় ) ।

৪ জালা, বুহৎ কলসবিশেষ ।      ৫ কঁপা, পুঁজপুঁজ ।      ৬ আন্দৰ্য বা নৃতন ধরণের ।

৭ “ফুলিয়ে কোমর মারচে থাক্কাঃ”—( হুদিক্ হইতে থাক্কা ) হুই দিকে নখীতুলী পুঠে পুইলী লইয়া, এতদ্বারা গাল ফুলাইয়া রহিয়াছে ( অর্থাৎ সিঁদা বাজাইতেছে ) একজন ( “ফুলিয়ে ইত্যাদি ” ) গাঙ্গা টিপিতেছে । এতদ্বারা জাপে কোমর বুঁকাইতেছে ।

৮ গিরিজাকন্তা ।      ৯ দামরু পিঠে—দামড়ার পুঠে ( অনুপ্রাসের জন্য দামরু লিখিত হইয়াছে, দামরু বুঝার্থে এখানে প্রয়োগ হইয়াছে । )      ১০ সোম, বাজের ভালবিশেষ ।      ১১ রাজবংশীপিটি—কোপীনবৎ বস ।

১২ বেড়া ।      ১৩ বদিবার কট ।      ১৪ লুকান, শুড় ।

আঁইড়ার<sup>১০</sup> হাওদার বস্তা, ওয়াদা বুঝে, কায়দা করে পালায় মাকা ॥  
 বুঢ়ার শুভাছি লহর, বিসম বিহর, থেয়াছে জহর, দু তিন ফাকা ॥  
 কি বাছ খাটালো, বিষের মিটল আলা, ফুটলো গলায় কাল-চাকা † ॥  
 বুঢ়া খাচ্ছে গাজা, ভাংগের ফাঁকি, আদতে কেবল মদতে<sup>৪</sup> বাকি ।  
 নিশায় বেদিশা, ঝাঙটা কাচা, বুঢ়া অচ্ছা গুণী চাচাহে ।  
 বুঢ়ার কপালের চাঁদটা, আস্ত আইস্কা<sup>১৫</sup>, চোকেটা ঈশ্বাকপনের টেকা ॥”

( §গভীরার গান )

চোখা, হুঁ করে, ধোঁকা, ছুরারমাটকি, ফোঁকা, আচ্কা, গীরার বেটী, দামরু, বান্দা,  
 কঠির পল্লীভাষার ধান্দা, নাপান্দা, পট্টি, টাট্টির, চট্টির, লুকা, লহর, বিহর, জহর,  
 নিত্যব্যবহৃত শব্দ চাকা, মদতে, নিশায়, বেদিশা, ঝাঙটা, আইস্কা ইত্যাদি এদেশে  
 প্রচলিত নিয়ত ব্যবহৃত শব্দ ।

নিম্নে অত্র একটা গভীরার গীত লিপিবদ্ধ করিলাম । এই গীতটীতে প্রভূত পরিমাণে  
 পল্লীভাষার ছটা ও ঘটা দেগিতে পাইবেন । এদেশে গুলিখোরের<sup>১১</sup> সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে ।  
 গুলিকে এদেশে “মদৎ” বলিয়া থাকে, নিম্নের গীতটীতে মদৎ প্রস্তুতের উপকরণ ও মদৎ সেবার  
 বিষয় ফলের উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা সমাজ-সংস্কার পক্ষে উত্তম হইয়াছে । ৬৮নক্সা  
 অধিকারী মহাশয় গভীরার গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহাব তুলিকায় রচিত “মদতের  
 গান”টাই নিম্নে লিখিত হইল ।

## ( ২য় গীত )

“আমি প্রণাম করি মদৎ প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু ।

নিত্যব্যবহৃত- তোমাকে ভজে মুকুটি বাদর পুঁকুটী<sup>১২</sup> হল সরু ॥  
 শব্দবিশিষ্ট গীত প্রভুর সিংহাসনটি আনপাহাঁড়ী-কান্ধা-ভাঙ্গা গলা<sup>১৩</sup> ।

১০ এঁড়ে, বুকা । ১৪ গুলি । ১৫ আসকে, পিষ্টকবিশেষ ।

† ফুটলো গলায় কাল চাকা—বিষপানহেতু শিব নীলকণ্ঠ হইলেন ।

§ গভীরার গানটার প্রথমেই “জালকের” স্বল সংস্কার বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া হয়ত পাঠকমহোদয়গণ  
 “কটিবিকার” মনে করিবেন কিন্তু ইহা মনে রাখিবেন “পল্লীভাষা” অতিমার্জিত নহে । বাহাই হউক গানটার মধ্যে  
 মালদহ পল্লীভাষার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন ।

১। পুঁকুটী—( দেপীভাষায় ‘লোঢ়া’ ) নিভষ, পাছা ।

“পুঁকুটী হল সরু”—(গুলিখোরদের) “নিত্যবেশ শুক হইয়া যায় ।”

২। আনধা-হাঁড়ী-কান্ধা-ভাঙ্গা-গলা ।

আনধা—আলুকা, আলু ।

কান্ধা-ভাঙ্গা-গলা—গলার কান্দা ।

অর্থাৎ আলুকা গোছের হাঁড়ীর গলার কান্দা ভাঙ্গা ।

তাতেই হরণাৎ হুকা কেমন শোভা যেমন ব্রজের বলারে ।  
 ভোগ দিতে আয়োজন ভাবি ভোগেব হাঁড়ী বোকা কাতারিঃ ।  
 তুলনা তাতে জানি যামন মুড়কি-মাবা ঘানিঃ ।  
 ঘানি নাড়তে পিয়ারা-পাতাব-ঝাঁহুঃ বাস্তা-ছিলা-কাড়ু ॥<sup>৭</sup>  
 প্রভুর রক্তভাবি অঙ্গসেবায়, শিক লাগে ঠিক লম্বা ॥<sup>৮</sup>  
 গলিয়ে মাল, চুলিয়ে<sup>৯</sup> নিতে, জিভা ১০ যাদন, এল না জগদম্বা ১১ ।  
 বার্ষিকী-পাচ-পরসা-চুকান<sup>১২</sup> প্রভুর শ্রীপাঠ সেগজীর দোকান ১৩

৩। হরণা হুকা—যে চাকর গোলাটা কাল না তট্টয়া শব্দা গোছেব। এই প্রকারের চাকর মূল্য কম বলিয়া গুলিখোরেরা পছন্দ করে এবং গুলিখোলেবা প্রায়ই রান করে না বলিয়া হাকায় কেল দেয় না। হতরায় বলরামের ছায় স্বেতবর্ণ বর্ণ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে।

৪। বোকা কাতারি—সে টাঙ্কি বাজাইলে বাদে না কাহাকে বোকা বলে। এতলে ফাটা ফুট হাড়ী যাহা অল্প কার্যে অব্যবহার্য্য।

৫। মুড়কী-মাবা-ঘানি—মুড়কী প্রস্তুত কববার সময় মোদকগণ খোলাব সাহায্যে মুড়কী প্রস্তুত করে। এম্মে এক এক গোলা মুড়কী প্রস্তুত কবাব নাম “একঘানি মুড়কীমাবা” চন্দন বা “একঘানি মুড়কী” বলিয়া থাকে।

৬। ঝাঁহু—গুলিপ্রস্তুতকালে পিখাবাপাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে উপরি উক্ত “আনঝাইড়ী-কান্ধা-ভাঙ্গা গলা” বিশিষ্টে গুড়িতে করিয়া ভাজিতে হয় এবং সেই ভাজিত পিখাবাপাতা দেখিতে “চা”র মত হইলে তাহাব নাম “ঝাঁহু” বলিয়া থাকে। পুর্বে পান হইতে ঝাঁহু কবিত এক্ষণে পিয়ারা পাতা হইতে ঝাঁহু করিয়া থাকে।

৭। বাস্তা ছিলা কাড়ু—মুড়কীপ্রস্তুতকালে “কাঠময় হাতার” প্রয়োজন হয়, কিন্তু গুলিপ্রস্তুতকালে বংশ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দণ্ড আবশ্যক হয়, উহাব নাম “কাড়ু”। বাস্তা ছিলা অর্থাৎ বাঁশের শাকরি চাঁচিয়া কাড়ু প্রস্তুত হয়।

৮। শিক লাগে ঠিক লম্বা—গুলিপ্রস্তুতকালে উত্তপ্ত গুলি নাড়িবার জন্ত লম্বা শিকের আবশ্যক হয়।

৯। চুলিয়ে—চোলাই করিতে (distillation)

১০। জিভা—আগ্নিঃ জলমিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে “বোকা কাতারি”তে ফুটাইতে হয় এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড জিহ্বার ছায় করিয়া কাতারির গাত্রে গলিত আফিংএর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাগিতে হয় এবং কোলীক আকর্ষণে বিশুদ্ধ অহিকেন চোলাই হইয়া সত্ত্ব পাত্রে রক্ষিত হয়। এই বস্ত্রখণ্ডের নাম “জিভা”।

১১। জগদম্বা—কালিকা: অর্থাৎ কাতারির উপর “জিভা” বর্ত্তমান থাকিলে, দেখিতে লোলজিহ্বা কালিকার ছায় দেখায়।

১২। বার্ষিকী পাচপরসা চুকান—অর্থাৎ সেই সময়ে পাচ পরসায় একসিকি ওজনের আফিং পাইত। গীতরচক একজন গুলিখোর (মদ্যক্তি) ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এক এক বারে একসিকি অহিকেনের ‘মদ্য’ সেবন করিতেন।

১৩। “প্রভুর শ্রীপাঠ সেগজীর দোকান”—গীতরচক বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন সেই কারণে “প্রভু” অহিকেনকে বলিয়াছেন এবং অহিকেনের স্থান “শ্রীপাঠ” নামে উক্ত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোসলমানগণই অহিকেনের দোকান করিয়া থাকে, সেই কারণে আফিংএর অবস্থান সেগজীর দোকান<sup>১৩</sup> হইয়াছে।

শিষ্য ছুটে ম্যালা, প্রভুর ভেট লাগে হুই ব্যালা<sup>১৪</sup>,

তাতে কলকী, আজব-কলকী-ভাঙ্গা মেরু<sup>১৫</sup>

প্রভুর রূপটি ভাল, দেখতে আলো, যেমন ব্রজের কালকানু<sup>১৬</sup>

ভজিলে জয়-ডঙ্কা বাজে<sup>১৭</sup>, শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু<sup>১৮</sup>

নলে মুখে যখন চুষি, কখন হাঁসি, কখন কাশি, যথ ধোয়া থাসি<sup>১৯</sup>

ভাবি কাজ কি গয়া কাশী, দীর্ঘ দয়াময় গুলিঠাকুর সাতপুরুষের<sup>২০</sup> গুরু ।”

যাহাই হউক গীতোক্ত শব্দগুলির ব্যবহার এতদেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। আমরা অত্র প্রকার মালদহের পল্লীভাষাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এদেশে নাগর, ধানুক ও চাই নামক জাতি যথেষ্ট বাস করিয়া থাকে। তাহাদেব ভাষার পার্থক্য আছে। নিয়ে উক্ত ভাষার আলোচনা করিলাম।

### নাগর, ধানুক ও চাইগণের ভাষা

নাগর, ধানুক বা বিহার ও মিথিলাদি জনপদবাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বর্তমান নাগর, ধানুক ও চাইগণের কালে তাহাদের ভাষার ইহা পরিষ্কৃত রহিয়াছে। আমরা বিস্তীর্ণ পল্লীভাষার আদর্শ ভাবে নাগবাদি ভাষাব আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল আদশ মাত্র প্রদত্ত হইল।

### বিশেষ্য পদ

টোকরি, থালিয়া, মুঙগা, হাড়ীয়া, বোরগী, সাহার, পোৎনা, মছি, লদিয়া ইত্যাদি।

### টোক্‌বি (ঝড়ি)

টোক্‌রি মা চাউল ছিলিয়ানু রে ?

১৪। “ভেট লাগে হুই ব্যালা” অর্থাৎ গুলিখোরেরা দলবলে একত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলি খাইয়া থাকে।

১৫। “কলকী-ভাঙ্গা মেরু”—অর্থাৎ ভাঙ্গা কলিকার গোড়াটি উণ্টা করিয়া বসাইলে যে প্রকার দেখায়, সেই প্রকারের ক্ষুদ্র গোলাকার কলিকাকে “মেরু” বলিয়া থাকে। উহাতেই ছোট ছোট মটরপ্রমাণ গুলি পাকাইয়া দিয়া অগ্নিসংযোগে ধূমপান করে।

১৬। “কাল কানু”—গুলির বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কানু নাম দিয়াছে। পূর্বে “হরণাহকা”কে “ব্রজের বলা” বলা হইয়াছে বলিয়া বলরাম জাতা ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছে।

১৭। “ভজিলে জয়ডঙ্কা বাজে”—সচরাচর গুলিখোরেরা কোন কাজ করে না বলিয়া গুলির খরচে শীঘ্র নিঃস্ব হইয়া যায়। জমিজমা মহাজন নিলাম করিয়া লইবার কালে “টোলসহরৎ” করে বলিয়া “জয়ডঙ্কা বাজে” বলা হইয়াছে।

১৮। “শঙ্কা যায়, হয় লঙ্কাপোড়া হনু”—মহাজনের ভয় যায়, কারণ তাহার কিছুই সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না। গুলিখোরের চেহারা বিকৃত ও কাল হইয়া যায় কোথাও আশ্রয় পায় না, স্বতরাং মুখপোড়া বীরদের স্তায় ভুলিয়া যেড়ায়।

১৯। “ধোয়া থাসি”—গুলিখোরেরা গুলির ধোঁয়া শীঘ্র ছাড়িয়া দেয় না। কোন করিয়া ব্যবহার করিয়া রাখে।

২০। সাত পুরুষের গুরু—গুলিখোরের বংশধরন গ্রামই গুলিখোর হইয়া উঠে।

থালিয়া ( থাল )

থালিয়া ভরিকে থা লে ?

মুঙগা ( কাপড় )

মুঙগা পিন্হিকে থো ।

হাড়ীয়া ( হাড়ী )

হাড়ীয়া ভরিকে রান্কাছ ।

বোরগী ( ঝাঁটা )

ঝাড়্‌নামে বোরগী দে দিহিন্ ।

সাহার ( স্থল ঝাঁটা )

গোহালিমে সাহার দে ।

পোৎনা ( ছাতা )

ভান্‌শা ঘারক পোৎনা পর্‌লাছিন ।

( ভান্‌শা—ভাতশালা । রান্‌গারে ছাতা দেওয়া হয় নাই । )

মছি ( মৎস্য )

গাট্‌স মছি আনহিন্ ।

লাদিয়া ( কাতারি )

লাদিয়া মে দহি ছ্যাই ।

বাবু, ( পিতা ), বেটা, বেটী, বহু বা কনিষ্ঠা, নন্‌ প্রভৃতি পল্লীভাষায় ব্যবহৃত হয় ।

পল্লীভাষায় কতিপয় শব্দের সম্বোধনে সাংগ্ৰাহ্য প্রভেদমাত্র দৃষ্ট হয় । যথা—

সম্বোধনপদের প্রকৃতি বাবুহো, বাহো, মাগে, বেটীগে ইত্যাদি ।

\*ক্রিয়াপদ

শব্দ	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
করই	করইছিন্	করইছলিহিন্	করবেই
যাই	যাইছি	গেল্‌ছেলিএ	যাবে
থাই	থাইছি	থাল্‌ছি	থাবে
কতিপয় ক্রিয়াপদের রূপ	দেই	দেইছি	দেদেতিহিন্ ।

করইছিন্ ( বর্তমানে )

তুঁ কোন্‌ কাম্‌ 'ক্যরই-ছিন্' ।

কতিপয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার

থালছি ( অতীতে )

কাল মছি দে করিরে ভাত 'থালছি' ( বা থালছিলিরে )

\* ক্রিয়াপদের অগ্রে সর্বনামপদ লিখিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অবশ্যতঃ ক্রিয়াপদের পরে সর্বনাম লিখিত হইল ।

খাটৈ ( ভবিষ্যতে )

হাম্মার অর হোল্ছি ( বর্তমানে ), কাল ভাত 'খাটৈ' ।

দেদেতিহিন্ ( ভবিষ্যতে )

ওকার টাকা কাল দেদেতেহিন্ ।

সর্বনাম

( আমি )

নাগরাদি জাতির পল্লীভাষার

সর্বনাম পদের আদর্শ

আমি হাম্মা ।

আম্মার হমরে ।

আম্মাদের হাম্মরেকেরা ।

( তুমি )

তুমি তুঁ, তুঁই ।

তোমার তোর ।

তোমাদের তোরাকেরা ।

( তিনি )

তিনি উ ।

তাহার ওক্রে ।

তাহাদের ওকরাকেরা

এই প্রকার রূপ ব্যতিক্রম হয়নি থাকে ।

সচরাচর নাগর, ধানুক ও চাঁইগণের বিবাহকালে জীগণ যে গান গাইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের পল্লীভাষা হুন্দর সজ্জিত দেখিতে পাই । জীগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে বসে, কাহার সাধ্য হঠাৎ তাহাদের গানের মধ্য জদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় । উহারা তাহাদের গীতগুলি অন্তকেও প্রদান করিতে চাহে না । অতিকষ্টে নিম্নলিখিত গীতকয়েকটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি ।

( ১ম )

বাস্তপুজার গান

নাগরাদি জাতীয় রমণীদিগের ১ । বেঁত বাঁধল উলুয়া ছারল হে ।

গ্রাম্যলগ্নীত

গোসাঞ পরমেধরী ষড় কোইলি রাবএ ॥

২ । লহি বাহি লেঁও তলুঁ শওরা, •

গোসাঞ লেঁও তলুঁ কুল পরিবাড়, পরমেধরী ইত্যাদি ।

৩ । নাহে নাহে ওয়ারা বেসান্তয়াল,

•গোসাঞ দেশ দেশ মেঙতা ছিটাওয়ারাল,

পরমেধরী ষর কোইলি রাবএ ॥ ক ।



৪। “লহিয়ারাস” \* নহি আওল ভাইয়া মোর.

শুভরাস নহি আওল ছোট দেওরা.

জিয়ে মোর গভরাইছে হে ॥

৫। “লহিয়ারাস” আপল ভাইয়া মোর,

শুভরাস আওল ছোট দেওরা মোর,

জিয়ে মোর “হলসইছ” হে ॥

৬। ঘিঅ ঘিঅ সাঁচ দাদি মেরোগে,

তোহড় ঘিঅ হৈত ঘিঅ চাড়.

পরমেস্বরী ইত্যাদি।

কতিপয় ব্যবহার্য শব্দ

বাধল, ছাবল, কোইলিবাবএ, বেসাওয়াল, ছিটাওয়াল, কোইলি,  
আওল, গভরাইছে, হলসইছ, সাঁচ, চাড়, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের  
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

নাছে = ক্ষুদ্র, নেওতা = নিম্নএল, গভরাইছে- ( ধারডেয়াইল ) ব্যাকুলিত হইতেছে,  
হলসইছ = সুস্থ হইলে। \*

( ২য় )

### সিন্দুর-দানের গান

১। কউনা গগরিয়াগে বেটি সোনারা সোনাগড়এ,

কউনা নগবিয়াগে বেটি বাভানা বৈদ পড়এ ॥

২। কিএ তোব খালিও কে বাবা কিএ তোব পিন্‌হলু,

সিন্‌বকে লোহা হে বাবা কবলে পব ঘবিয়া ॥

৩। ভাত মোর খাইলে গে বেটি, কাপড় মোব পিন্‌হলে,

কটুমক লোহবগে বেটি করলু পর ঘবিয়া ॥

৪। হাত তোব খসিওরে বাভানা, সুরামি খুনায়েলগিও,

বাবাস ছোড়াওয়ালে রে বাভানা সামীস মিলাওলে ॥

৫। পথি তোব জড়িওরে বাভানা ঘুয়ানীঘুনরে লগিও।

ভাইয়াস ছোড়াওয়াল রে বাভানা শুভরাস মিলাওলে ॥”

নব পরিণীতা কহা পিতৃভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্ম হুঃখ করিতেছে। কুটুম্ব ও সিন্দুরলোভে

“ল্যাইহোর” শব্দ সাধারণতঃ বধূর পিতৃগৃহে বৃদ্ধার, সাধারণতঃ এই দেশের ব্রাহ্মণই “ল্যাইহোর” শব্দের  
প্রয়োগ করিয়া অপরিণীত অধঃপতন করিয়া থাকে।

আগরায়ী ভাষার “লহিয়ারাস” বসিয়া থাকে “লহিয়ারাস” অর্থে “লহিয়ার” হইতে, ল্যাইহোর পিতৃগৃহ হইতে। “বধূ  
ল্যাইহোর করে গেছে” বদিলে বধূ পিতৃভ্রাতৃবিচ্ছেদ করে থাকে।)

তাহাকে পরগৃহে দিয়াছে বলিয়া হুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত করিয়া দিল তাহাকে “হাত ধসিয়া ঘাউক”, “তোব পখি (পুখি) জলিয়া ঘাউক”, তোর “ঘুমানী ঘুনরে লগিও” অর্থাৎ “তোর ঘোবন দেহে ঘুন লাগিয়া ঘাউক” বলিয়া গালি দিতেছে।

পল্লীভাষার লক্ষ

খালিও পিন্‌হলু, করলু, ছোড়াওয়ালে, সিলাওলে, জড়িওরে, থসিওরে, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অতি স্তম্ভক এবং নিয়ত ব্যবহৃত হয়।

অর্থ

কউনা = কনে, বাভানা — ব্রাহ্মণ, পরঘরিয়া = পরের ঘর, কটুমক = কুটুম্বের, পখি = পুখি, পুস্তক, ঘুমানী = ঘোবন।

বিবাহ উৎসবাদিতে-রঙ্গীগণ এক প্রকাব লক্ষ দিয়া তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যভঙ্গিটী সাঁওতালীধরণের। নৃত্যকালে গান গাইতে থাকে এবং তালে তালে পা ফেলে। এই নৃত্যকালে যে গান গাইয়া থাকে উহাকে কাতাকা “লাচারি” বলিয়া থাকে। বাল্যকালে এই প্রকার গীতের নাম “লাচারী” চইয়াছে।

৩৯১

লাচারি

- রত্নাসছযোগে গীত ও ভাষাকৌতুক
- ১। বাড়ী পিছুয়াব পিপব গাছরে, পিপব বহি যায়।  
তহি তল উতরে ববেছিয়া মিতা খেলহ সীকার ॥  
তাঁহি তল উতরে ববেছিয়া। ৬।
  - ২। কউনক হাত ধনুকিয়াবে, কউনক হার তরওয়ার ॥  
কউনক হাত গুলেলওয়া, কউনক হাত বরেছিয়া  
মিতা খেলহ সীকার ইত্যাদি।
  - ৩। কউনক টুটল ধনুকিয়াবে, কউনক টুটলে তরোওয়ার।  
কউনক টুটল গুলেলওয়া, কউনক টুটল বরেছিয়া ॥  
মিতা খেলহ ইত্যাদি।
  - ৪। দেওরক টুটল বরেছিয়া, তইহুসুয়া তরোওয়ার।  
মিতওয়ারো টুটল ধনুকিয়া, মিতা খেলহ সীকার ॥  
মিতা ইত্যাদি।
  - ৫। কঞ্চিও বাসকের বাঙালা মিতা ছাপকি ছাড়া।  
আটকি রহল শির পাগিয়া মিতা রহল লজাই।  
মিতা ইত্যাদি।
  - ৬। আবহো মিতাধর আঙিনা বড় আঙিনা তোহাড়।  
বইসক দেব দোন আঙিয়া, মিতা ঘোবন তোহাড়।  
মিতা ইত্যাদি।

( ৪র্থ )

লাচারি

- ১। হুগলি সহড় সতী, আলোচুড়ি হাড়ওয়া ।  
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি ॥
- নৃত্যসংযোগে গীত, ২। বড় পিছুয়াড় বৈসল চুড়ি হাড়ওয়া ।  
আহো, রাণিক থোগড় চুড়িয়া গড়ায় মুরলি ॥  
ভাবা এবং শব্দ
- ৩। অইছন চুড়িয়া গড়াবে চুড়ি হাড়ওয়া ।  
আহো, বঁহিয়া মোড়েড়ি ঘর যায় মুরলি ॥
- ৪। বাটরে বাটোহিয়ারে তুঁহি মোর ডইয়া ।  
আহো, হামারে সমবাদ লেল যায় মুরলি ॥
- ৫। তুঁহরে সমবাদ বহিনো চিনিওনা জানিও  
আহো, কইছন করি কহব সমবাদ মুরলি ॥
- ৬। হামার বল-মুয়াকে টেঁরে টেঁরে পাগিয়া ।  
আহো, যইছন মোগল, পইঠান মুরলি ॥
- আবশ্যকীয় নূতন শব্দ  
বাট ও বাটোহিয়া, বল-মুয়াকে, প্রভৃতি শব্দ প্রায়ই ব্যবহার হইয়া  
গাকে । বাট = পথ, বাটোহিয়া = পথিক, বলমুয়াকে = পতিকে,  
স্বামিকে ।

(৪) অর্থ—পথের পথিক তুমি আমার ভাই

আমার সমাচার লইয়া যাও.

‘মুরলি’ সম্ভাস্তবাচক এক্ষণে ধ্রুবা ।

(৬) অর্থ—আমার স্বামির মাথার পাগড়ীটা বাকা বাকা

যেমন মোগল, পাঠানের ।

এই গীতটি অতি মধুর রমণীকণ্ঠে গীত হয়, “আহো” পদটি গীত মধ্যে অতি দ্রুতভাবে গাইতে হয় । তাহে তালে নৃত্যসংকারে এই গীতটি গাইলে যমুনা, গোপী ও ত্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্মরণ করাইয়া দেয় । এই প্রকার পল্লীভাবার ক্রিয়াপদগুলির কালবিভাগসূচক বিভক্তির প্রয়োগ বড়ই জটিল । উচ্চারণের সামান্য প্রভেদে বর্তমানে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া যায় ।

বর্তমানে

	(১ম গীঃ)	গড়এ	( ২য় গী )
গভরাইছে	( ঐ )	পড়এ	( ঐ )
হলসইছ	( ঐ )	অলহ	( ৩য় গী )

ক্রিয়াপদের বর্তমানের রূপ

ইছে, ইছ, অএ, অহ প্রভৃতি বিভক্তিসংযোগে বর্তমান পদ লিখ হইয়াছে ।

অতীতে

ক্রিয়াপদের অতীতের রূপ	ছিটাওয়াল	( ১ম গী )	পিঙ্কলে	( ২ গী )
	বাখল	( ঐ )		
	খালিও	( ২য় গী )	বরলু	( ঐ )
	থাইলে	( ঐ )	পিনহলু	( ঐ )
	করলে	( ২য় গী )		
	ছোড়াওয়ালে	( ঐ )		
	সিলাওলো	( ঐ )		
	টুটল	( ৩য় গী )		
	রহল	( ঐ )		
	আলো	( ৪র্থ গী )		
	সেঙ্গ	( ঐ )		
	বৈসল	( ঐ )		

আল, ইও, ইলে, অলে, অউ ( নু ) আলে, অল, এল প্রভৃতি দ্বারা অতীতকাল বুঝাইতেছে ।

ক্রিয়াপদের ভবিষ্যতের রূপ		( ১ম গী )	দেব	( ৩য় গী )
	থাস	( ২য় গী )	গড়াবে	( ৪র্থ গী )
	লগিও	( )	কহব	( ঐ )
	জড়িও	( ঐ )		

“চাড়” পদটি বর্তমানকালেও প্রয়োগ হইয়া থাকে । এরূপ প্রয়োগে অসুজা বা আদেশ বুঝাইবে । ‘চাড়ল’ পদটি অতীতকালে ব্যবহৃত হয় ।

অর্থ পার্থক্য  
 “তৌহড় ঘির হৈতে ঘির চাড় ।”  
 এস্থলে “তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিয়া দাও ।” ( সমাপিকা )  
 অথবা “তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে ।” বুঝাইবে ।  
 অথবা “তোমার ঘৃত হইতে ঘৃত ঢালিতে থাক” । ( অসমাপিকা )  
 অ, ইও, আবে, অব প্রভৃতি বিভক্তিযোগে ভবিষ্যৎ বুঝাইবে ।

আবহো ( ৩য় গীত )

আবহো শব্দের মূল  
 “আবহো” মিতামর আঙিনা ষড়্ অঙিনা তোহাড় ।”  
 এই আবহো, আইস ( অসুজা ) আইস্ন  
 ( সংক্ষেপে—আনি, আবহ, আবহ ( উত্তমপুরুষ ) ) ।

সংস্কৃত উত্তমপুরুষে “আবহ” হইয়া থাকে, এখানে মধ্যমপুরুষে আবহো হইয়াছে, কিন্তু অমুজ্জা বুঝাইতেছে। আমরা ‘লোট’ বিভক্তির ত্রায় পদ সিদ্ধ হইতে দেখিতেছি।

সময়ে সময়ে “আব্” অর্থাৎ আইস অর্থেও ব্যবহৃত হইতে শুনিতে পাই। “হো” বা “০।” বিভক্তি দ্বারা অমুজ্জা বুঝাইয়া থাকে যথা—

( যাব্ শব্দ ) যাবহো = যাও ।

( কর ) করহো = কর ।

( যা বা যাহ ) যাহো = যাও । ইত্যাদি ।

### কৌচ ও পলে জাতির পল্লীভাষা

মালদহ জেলার পল্লীভাষা সম্বন্ধে যতই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন ততই অভিনব ভাবাবেশে মোহিত হইয়া যাইবেন। এ জেলার ভাষা বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত।

মিশ্রভাষা

যদি ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান প্রগাঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া ইহার

অন্তঃস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে গোড়ের ইতিহাসের এক অভিনব উদ্ভানে উপস্থিত হইয়া অতীত পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন।

নাগর, ধাহুক, চাঁই, কৌচ, পলে প্রভৃতি অনার্য-জাতি এবং পুণ্ড্রাদি আর্যজাতিও দ্রাবিড়। গণেশ প্রভৃতি অনার্যজাতির সমাবেশে অত্র জেলার ভাষা বড়ই মিশ্র ভাষাপন্ন

হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈষ্ণবগণের ভাষা বিস্তৃত কতিপয় জনতা

বাক্সালা। এ ছাড়া মালদহে বিস্তারিত বিভিন্ন জাতি বর্তমান

রহিয়াছে। মালদহের ‘জাতি ও জাতির বিবরণ’ পুস্তকে সবিশেষ আলোচনা করা হইবে। পূর্ণিমা, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল ( সাঁওতালপরিগণা ) প্রভৃতির ভাষা অর্থাৎ বিহারী, মৈথিলী, রাঢ় ও পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানের ভাষা মালদহে বর্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত কোচবিহারাদির ভাষাও বর্তমান রহিয়াছে। ‘পলে’ জাতি অতি আদিম পার্শ্ববর্তী জাতি। ইহার প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম আস্থাবান ছিল। মালদহের এই প্রকার ভাষাপার্থক্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রবাদ আছে যোজনাস্তর ভাষা এদেশে গ্রামান্তর বলা চলিতে পারে।

মালদহের নদী পরিবর্তন যেমন অস্বাভাবিকভাবে হইয়াছে ভাষাপরিবর্তন বা সংক্রামনও আশ্চর্য্যভাবে হইয়াছে।

বর্তমানকালে কোচ ও পলে জাতিকে সাধারণতঃ “বাক্সাল” বলিয়া থাকে; তাহাদের পল্লীভাষারও নিন্দা অত্র জাতিকে করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক

বাঙাল ভাষা

তাহারা মালদহের অতি সুপ্রাচীন জাতি। বারেন্দ্র অঞ্চলে তাহাদের অধিকাংশের বাসস্থান। কোচ ও পলের প্রাচীন উন্নত অরণ্য ভূভাগে বাস করে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। এদেশের সেরশাবাদীরা নামক মুসলমানদের ভাষার স্বত্বতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কৌচ, পলের পল্লীভাষার আদর্শ

বিশেষ্য পদ

(কৌচ ও পলেরা যে প্রকার সুর ও টানযোগে উচ্চারণ করে তাহা লিখিবার উপায় নাই)  
মৈথ্যা ( থলে ), মেথলি ( মেথলা ), গামোছ ( লকা ), ধৌকড়া ( কাঁথা ), কারুহা ( ছাতা ),  
ভাতলব্বী ( ভাতকাঠি ), ভাতোরা ( ভাতপাকের হাঁড়ী )।

মৈথ্যা ( থলে )

প্রঃ। রে আঁধাঁর! হাটোৎ যামু “মৈথ্যা” দিম্’না ?

উঃ। দিম্ দিম্ বা দিম্ দিম্।

মেথলী ( মেথলা-কটিদেশে বাধিবার জীগণের বস্ত্রবিশেষ )

মোরঘেরে সাহ ( স্বামী ) আসছে মেথলী কিস্তে।

গামোছ ( লকা )

বাগুরে জালাটা ( দড়ির জালবৎ থলে ) মোর দিম্ হাটোৎ গামোছ ব্যাচতে যামু।

ধৌকড়া ( কাঁথা )

ধৌকড়া মোর হারিষ্যা গেলঃ মোহো জাডৎ মরছ।

কারুহা ( ছাতা )

মুই একনা কারুহা কোরমু, পাট মোকে দিম্।

মোর ঘেরে মবৎ সাহ ( মহাজন ) আলছুঃ কি খাইন্তে দিম্।

রে ছয়াল বরেগী ঠাকুর টাকে চাল দিলুঃ।

যাকাল— বাইনার ব্যাটা শুপারি কি ভাও দিবুঃ।

বানিয়া— শুপারি তিন সের ভাও পাবু।

বাকাল— হৈল্ হৈল্ দিম্ দিম্।

যখন বাইছা গাঢ়াক্ হন্।

তখন বাইছা টিপ্ টিপ্ করন।

বাইছার ব্যাটা বার মসল্যা তান্। বাইছার ব্যাটা মোর ঘেরে

যাকাল

সওদাটা দিম্ না আর কোন বাইছার কাছোৎ যামু।

কতিপর নাম

বরাতু ( শালিপতিভাই ), ঝাকাই ( ঝালক ), কাহিন ( নিকা ),

হিয়ার, ঝাঁপ ( চট, কাঁথা, গাজবস্ত্রাদি, খাল, ধোকড় )।

ব্যক্তির নাম—আক্কার, জোনাকু, নিরাসা, আজ ( রাজ ), মোহন, ধমুঁ।

ক্যাঙ্কাক্ করোছি = ঠাট্টা করিতেছি।

“মালদহের জাতি ও ভাষা” নামক পুস্তকে প্রত্যেক জাতির ও তাঁহাদের ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির বিতীর্ণ বর্ণনায়ুক্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহরিদাস পালিত

মালদহ শিক্ষা-সমিতি।

# আসাম-ভ্রমণ

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

## ডিমাপুর ও মাইবং

১৩১৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে ডিমাপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, আর ১৩১৫ সালের দোল-যাত্রার দিনে মাইবং দেখিয়াছি।

মণিপুর রোড ষ্টেশনের অতীত সন্নিবর্তেই ডিমাপুরের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ। ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে প্রায় ১ মাইল গেলেই রাজবাড়ীর উত্তর দিকের গড়-প্রাচীরের চিহ্ন দেখা যায়। তৎপরে আরও কিছু গিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া কিছুদূর গমন করিলে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে পৌছা যায়।

তোয়গুহারটি প্রায় ১৫ হাত উচ্চ এবং বেশ প্রশস্ত। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। ইহার দুইদিক হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে, ঐ প্রাচীর ৫ হাত উচ্চ ও ২ হাত প্রশস্ত।

ভিতরে ঢুকিলেই দাবার গুটির স্থায় পরিলক্ষিত হইসারি প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ডিমাপুরের প্রধান দর্শনীয় পদার্থ এই গুলি—

স্তম্ভ অনেক; সর্বাপেক্ষা বড় যেটি উহার উচ্চতা প্রায় ৯ হাত এবং বেড় প্রায় ১৫ হাত। এই স্তম্ভগুলি “বেলে পাথর” দ্বারা নির্মিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিতান্ত সন্নিবর্তে কোনও প্রস্তরময় পর্বত দেখা যায় না। স্তম্ভগুলিতে সুন্দর কারুকার্য দৃষ্ট হয়। জীবজন্তু লতাপাতা ফুল প্রভৃতি ইহাতে খোদিত হইয়াছে। সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রস্তরস্তম্ভগুলিতে কোনও বোড়া দেখা যায় না। যেন এক একটি প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া এক একটি স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে।

কালের সর্বসংহারক প্রভাবে বিশেষতঃ ১১০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে স্তম্ভগুলি মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া গিয়াছে, দুই একটি ভূমিসাংও হইয়াছে। সদাশয় ব্রটীশ গবর্ণমেন্ট ঐ গুলির অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে প্রভূত যত্ন করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে জায়গাটিও এখন বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, নচেৎ ইহা বনজঙ্গলে এবং তদাশ্রিত হিংস্রজন্তুতে দুর্গমকল্প হইয়া উঠিয়াছিল।

এই প্রস্তরস্তম্ভগুলি কি এবং কেনই বা একত্র এতগুলি স্তম্ভ সারি সারি দাঁড় করা হইয়াছে; ইহার কারণ এখনও কেহ সূচাকল্পে নির্ণীত করিতে পারেন নাই। খাসিয়া পাহাড়ে কোমণ্ড কোনও স্থলে বহু শিলাখণ্ড একত্র দণ্ডায়মান দেখা যায়, ঐ গুলি শ্রমশানের পরিচায়ক; ইংরাজিতে “মোনোলিথ” (একশিল) বলা হয়। এই স্তম্ভগুলিও কি তাই?

কিন্তু স্তম্ভে খোদিত সূচক কারুকার্য দেখিলে ইহা বোধ হয় না। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে খুশানচিহ্ন-সূচক প্রস্তররাজি থাকিবে ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়? অথচ এই-গুলি যে কোনও এক অট্টালিকার অঙ্গীভূত স্তম্ভরাজি নহে ইহা আপাতদৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। মিঃ গেইট্ তদীয় আসাম-ইতিহাসে অহুমানওঃ বলিয়াছেন যে, এইস্থানে একটা পণ্ড-বীথিকা ছিল। আমার কিন্তু সেইরূপ বোধ হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই-জায়গাটি কাছাড় রাজগণের দরবারস্থান ছিল; পাত্রমিত্রগণের পদমর্যাদা অনুসারে স্তম্ভের উচ্চনীচতা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় স্তম্ভের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া রাজদর্শন ■ সম্ভাবণ করিতেন।

এই স্তম্ভাবলীতে কোনও লিপি নাই, এবং যতদূর স্মরণ হয় কোনও দেবমূর্তি বা নরমূর্তি অঙ্কিত দেখি নাই। তেজপুরের প্রাসাদস্তম্ভে ■ যেমন নারায়ণের অবতারদের মূর্তি অঙ্কিত, সেইরূপ কিছু এখানে দেখা গেল না, অথচ তেজপুরের স্তম্ভের কারুকার্য অপেক্ষা ডিমাপুরের স্তম্ভগুলির কারুকার্য যে কোনও অংশে নিকট তাহা বলা যাইতে পারে না।

সেই প্রকাণ্ড প্রাচীর-বেষ্টিত রাজবাড়ীর সর্বত্র বেড়াইয়া দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা এক প্রকার অসাধ্য মনে করিলাম। বনজঙ্গলে উহার অবশিষ্ট স্থান এখনও হ্রগম। আজ প্রায় ৪০০ বৎসর হইল ( ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে ) কাছাড়ী রাজগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া আহোম-আক্রমণের হাত হইতে কিয়দ্দিনের জন্ত পরিজ্ঞাণ পাইয়াছিলেন। এই চারিশত বৎসরের পর যাহা দেখিতে পাওয়া গেল ইহাই প্রচুর মনে করিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলাম।

ডিমাপুরের অপর দর্শনীয় বস্তু ইহার পুকুরগুলি। একটিতে গিয়া স্নান করিলাম। উহার তীরভূমি কি সুন্দর স্থান! জল অতি পরিষ্কার, বেশ টলটল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, অন্যান্য ৪০০ বৎসর পরেও + কাছাড়ী-রাজ-খনিতে এই পুকুরিণীতে জৈদৃশ নির্মল জল বর্তমান রহিয়াছে! এই পুকুরিণী শিবসাগর কিংবা আসামের অন্ত্যান্ত প্রকাণ্ড দীঘিকার স্রাব বৃহৎ না হইলেও জলের উৎকর্ষে কোনটি হইতেই হীন হইবে না, অথচ জয়সাগর, শিবসাগর প্রভৃতি অপেক্ষা ইহা ২।৩ শতাব্দীর প্রাচীনতর।

আর যে সব পুকুর দেখিলাম, সেই সকল প্রায়ই দলঘাসে পরিপূর্ণ অথবা শুষ্কপ্রায়। গ্রহর কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকগুলি পুকুর দেখিলাম, কিন্তু সকলটি যে পুকুরিণী (বা দীঘিকা) ছিল একথা বলিতে পারি না। এই বহুদূর ভ্রমিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে গিয়া কোমও কোমও স্থান পুকুরের আকারে খাত হইয়াছে, এইরূপ অসম্মিত হইল।

ডিমাপুর মণিপুর হইতে ১৩২ মাইল ব্যবহিত। এখান হইতে কোহিমা দিয়া শকটগমনোপ-যোগী শড়ক নির্মিত হওয়ায় মণিপুর গমনের সুবিধা হইয়াছে।

■ আসামভ্রমণ প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

+ পুকুরটি যে কখন খনিতে হইয়াছিল কে জানে? স্তম্ভের চারিশত বৎসরের প্রাচীনত্বও "অনুমান" করিয়া রাজ।



একণে নামটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই ডিমাপুরের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব উপসংহৃত করিব।

সাধারণের ধারণা “হিড়িম্বাপুর” হইতেই ডিমাপুরের উৎপত্তি। কাছাড়ী-রাজগণ নিজেদের হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের সম্ভান বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কাছাড়ী-রাজ্য নাগা পর্বত, মণিপুর ও ত্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সকল রাজ্যের সঙ্গে মহাভারতোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সম্পর্ক ছিল। ত্রৈপুর-রাজগণ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র দ্রুহ্যার বংশজাত। নাগরাজ-কম্ভা উলুপী অর্জুন কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। মণিপুর-নৃপতিগণ অর্জুন-পুত্র বক্রবাহনের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত। কাছাড়-রাজগণও সেইরূপ ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভ-সম্ভূত ঘটোৎকচের বংশধররূপে আপনাদিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন।

মাইবন্ধের যে পাষাণনির্মিত প্রাসাদের বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে, তাহাতে রাজ্যের হিড়িম্বার উপাধি দৃষ্ট হয়। কাছাড়রাজ্য বরাবর হিড়িম্বা বা হেডিম্বা রাজ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এমন কি, (১৮৩০ খৃঃ অব্দে) ব্রিটিশ অধিকারের পরেও কয়েক বৎসর সরকারি কাগজপত্রে কাছাড় জেলার নাম হেডিম্বা ছিল। এতদবস্থায় ডিমাপুর নামটি হিড়িম্বাপুরের অপভ্রংশ মনে করা স্বাভাবিক।

কিন্তু আসাম-ইতিহাস-কর্তা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব বলেন—

“Dimapur or the town on the Dima is a modern name. We have no record of the Kachari name for the place. It was called by the Ahoms Chedimchipen (city of earth-burn-make) or the brick-built city. It was also sometimes alluded to as Chedima or the city on the Dima river. Dima or Duima was the Cachari word for any large collection of water (di water, ma great); but the Ahoms took it as the name of the river on which the Kachari capital was situated.”—

Mr. Gait's History of Assam; footnote page, 89.

কাছাড়ী দুই ত্রিপুর দুই সংস্কৃত ভাষায়; মা সংস্কৃত মহা। (এস্থলেও সংস্কৃতের চিহ্ন বর্তমান।) হিড়িম্বাপুরই যেন ডিমাপুরের আদি নাম বোধ হয়। আহোমগণ যে চিডিমা বলিত ইহাও “হিড়িম্বা”এর উচ্চারণ ব্যত্যয় বোধ হয়। তৎপর “চি”টুকু নগরার্থক ভাবিয়া উহা লোপ করিয়া কেলিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ডিমাপুরে কোনও প্রস্তরলিপি নাই। “পুর” শব্দটি যে সংস্কৃত ইহার ত অন্তর্ভুক্ত হইবার যো নাই; তৎসহ পার্শ্বতা শব্দের সংযোগ প্রায়শঃ দেখা যায় না, যদিও অধুনা (ইংরাজী শব্দের সঙ্গে) লায়লপুর কেথেলপুর ইত্যাদি এবং মোসলমান যুগে আলিপুর, মামুদপুর প্রভৃতি নাম হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক, ডিমাপুরের নিকটস্থ নদীর বর্তমান নাম ডিমা নহে, ধনশ্রী।

মহাভারতের আদিপর্বে হিড়িম্বা (ওরফে হিড়িম্বা ইতি শব্দকরক্রমঃ) ও উত্তরগিনী হিড়িম্বার কাহিনী আছে। সমাত্তক পাণ্ডবেরা কতৃগৃহ-দাহকালে বারণাস নগর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণমুখে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বহু পর্যটন করিবার পর হিড়িম্বার

সাক্ষাৎ লাভ করেন। হিড়িম্বা রাক্ষস ছিল; তাহার সঙ্গে ভীম বাহুবল করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমের মূর্তি দেখিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়বতী হইয়াছিল। ভ্রাতার বিনাশের পর কুন্তী ও পাণ্ডবগণের নিকট নিজের কামনা বিবৃত করিলে পুত্রজন্য পর্যাঙ্ক তাহার সহিত ভীমকে অবস্থান করিতে তাঁহারা অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তার পর বাহা আছে, আদি-পর্ক ১৫৫ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

“তথৈতি তৎ প্রতিক্কার হিড়িম্বা রাক্ষসী তদা।

ভীমসেনমুপাদায় সৌদর্ঘ্যমাক্রমে ততঃ ॥

\*                      ■                      \*

কুত্বা চ পরমং রূপং	সক্যভরণভূষিতম্।
সংজ্ঞিতং স্তম্ভুরং	বরয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥
তথৈব বনভূগেযু	পুষ্পিতফ্রমসানুযু।
সরঃসু রমণীয়েষু	গম্মোংপলযুতেষু চ ॥
নদীদীপপ্রদেশেষু	বৈদূর্যাসিকতাসু চ।
সুতীর্ণবনভোয়াসু	তথা গিরিনদীষু চ ॥
হিমবদিগ্নিকুঞ্জেষু	গুহাসু বিবিধাসু চ।
সাগরসু প্রদেশেষু	মণিহেমচিতেষু চ ॥
পল্লবেষু চ রম্যেষু	মহাশালবনেষু চ।
দেবারণ্যেষু পুণ্যেষু	তথা পর্বতসানুযু ॥

\*                      \*                      \*                      ■

রময়ন্তী তথা ভীমং	তত্র তত্র মনোজবা।
প্রজ্ঞে রাক্ষসী পুত্রং	ভীমসেনান্নহাবলম্।”

ঘটোৎকচের জন্ম হইল; ইহার এই নাম সম্বন্ধে আছে—

“ঘটো হাত্তোৎকচ ইতি মাতা তৎ প্রত্যভাষত।

অব্রবীতেন নামাত্তা ঘটোৎকচ ইতি স্মৃতঃ ॥”

ঘট অর্থে সন্তক, উৎকচ কেশরহিত; নীলকণ্ঠ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহা হউক, ঘটোৎকচ সহ ভীম পাণ্ডবগণের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন। ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের সর্বপ্রথম ছেলে, কেন না তখনও দ্রৌপদীর স্বয়ংবরই হয় নাই। কুন্তী এই নিমিত্ত তাহাকে সর্বদা পাণ্ডবগণের সহায়তা করিতে অহরোধ করিলেন। তৎপর তাঁহাদিগকে

“আমন্ত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যহ উত্তরাং দিশম্।”

ভারতের যুদ্ধে ঘটোৎকচের বীরত্বের কীর্তিকাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি কোথায় অবস্থিত করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া মহাবনের একাংশে অবস্থিত ছিলেন। ঘটোৎকচ তাঁহা-

দিগকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন। ইহা দ্বারা এই আসাম অঞ্চলের কোনও স্থানে যে তাঁহার আবাস ছিল, ইহা খুব কষ্টতঃ কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু হিড়িঙ্গা ভীমকে লইয়া যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাতে প্রকৃত্তর লীলাভূমি এই আসাম প্রদেশেরই যেন স্থান সকলের উল্লেখ দেখা যায়। তবে যে “সাগরস্রু প্রদেশেষু” আছে ইহাতে “গনোজবা” ব্রাহ্মসীমার সাগরতট পর্য্যন্ত বিহার ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে; তা এস্থান হইতে সমুদ্রতীরবর্তী স্থলে মধ্যে মধ্যে বিহারার্থ গমন অসম্ভাবিত কিছুই নহে। বিশেষতঃ সাগরও তখন স্রুদ্রবর্তী ছিল না।

যাহা হউক, পৌরাণিক বিষয়ের সমধিক আলোচনা নিম্নায়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাছাড়ীরাঙ্গণ আহোমদের নিকট পরাভূত হইয়া ডিমাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ডিমাপুর ছাড়িয়া দক্ষিণে পর্বতরাজির মধ্যে মাহর নদীর তীরে কাছাড়ীরাঙ্গণানী স্থাপিত হয়। ইহার নাম হইল মাইবং অর্থাৎ ‘ধাতুক্ষেত্র’। ডিমাপুরের “ডিমা” যাহাই হউক “পুর” ত সংস্কৃতমূলক। এতদবস্থায় পরবর্তী রাজধানীটি কেনন করিয়া কাছাড়ী ভাষায় “মাইবং” বলিয়া অভিহিত হইল, সংস্কৃতমূলক একটা সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিল না, ইহা একটু আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ কি? বোধ হয় এই নামটা তখনই কাছাড়ী জগতে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, ইহা আর পরিবর্তনসহ ছিল না। তাই “মাইবং”ই থাকিয়া গেল।\*

মাইবং জায়গাটিতে এই পর্বতসঙ্কুলপ্রদেশেও অনেকটা স্থান জুড়িয়া, সমতল; ধাতুক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার কথাই। এখন ইহা আসামবেঙ্গল রেলওয়ের অন্ততম স্টেশন রূপে কথঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মণিপুর রোড স্টেশন হইতে মাইবং স্টেশন ৮৪ মাইল।

লামডিং হইতে মাইবং স্টেশনে যাইতে এষ্ট স্টেশনের ডিপো স্টেশনে দেখিয়া যখন এঞ্জিনে বংশিধ্বনি বা শব্দধ্বনি হয়, তখন আরোহী যদি বামদিকে পর্বতের গাত্রে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে বিষ্ণুমণ্ডপের আকারে কাল একটা ঘর খুব উচ্চ একটা ভিটার উপর অবস্থিত দেখিতে পাইবেন। মাইবংয়ের উহাই একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। ঈদৃশ পর্বতগাত্রে কাটিয়া প্রস্তুত কোন ঘরের কথা পূর্ববঙ্গ ও আসামে আর শুনা যায় না। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা এইরূপ একটা ঘর তৈয়ার করা কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচায়ক মনে করিতে না পারি; কিন্তু একটা পাষাণময় পাহাড়ের অঙ্গচ্ছেদনপূর্বক গৃহাকারে পরিণত করাতে যে একটা বেশ বাহ্যিক্রি আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

স্টেশনে পৌছিয়া একটি সজী লইয়া প্রায় ২০ মিনিট কাল উত্তর দিকে চলিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই প্রস্তরগৃহের সম্যক পর্য্যবেক্ষণার্থ উপস্থিত হইলাম। প্রায় ৮ হাত উচ্চ দোলমঞ্চের অধোভাগের স্তায় ভিত্তির উপর গৃহটি নির্মিত। উঠিবার কোনও সিঁড়ি নাই—কোনও মৈণ্ড ছিল না। ভিত্তির এক কোণে অন্ন অন্ন গর্ত থাকায় একটি বংশদণ্ড ভর

\* কাছাড়ীরাঙ্গ শব্দময়ন আক্রমণকারী আহোমদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাইবংয়ের নাম “কোতিপুর” রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই নাম তেমন উজ্জ্বল হয় নাই।

করিয়া কোনও রূপে উপরে উঠিলাম। গৃহের পূর্বদিকে এক জন গৃহত্যাগী নিম্নজাতীয় “সাধু” আশ্রয়লাভ করিয়া বাশ, লতা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা একটি পোট্টিকো বাধিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলাম। ইহাতে ঘরটির সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে এবং চারিদিকে থোলা বারান্দায় চলিবার ব্যাধাতও হইয়াছে ; বিশেষতঃ সাধু অন্নপাকের এবং দেহতাপের জন্ত আগুন জ্বালাইয়া গৃহের পূর্ব দিকের বিলক্ষণ ক্ষতি জন্মাইয়াছে। কিন্তু তথাপি সে “সাধু” এবং এক জন সাধুর আশ্রয় স্থান হইলে তত্ত্ব কলি প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসীরা গৃহটিকে অধিকতর সম্মের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহা মনে করিয়া সাধুকে কিছু বলিতে সাহসী হই নাই ; বরং তদীয় সাধুত্বের মর্যাদাকল্পে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার আশীর্ষচন রাশি রাশি লাভ করিলাম।

ঘরের চারিদিকে বারান্দা ২ হাত আন্দাজ প্রশস্ত ; অতএব চারিদিক বেশ বেড়াইয়া দেখা যায়। গৃহটি সম্পূর্ণ নিরেট হওয়ায় ইহার দ্বার নাই, তবে চারিদিকেরই দেওয়ালের মধ্যস্থলে এক একটি খোপ আছে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের খোপে কিছু নাই। কিন্তু পশ্চিম দিকের খোপটিতে কিছু অঙ্কিত আছে, তাহা কি বুঝা গেল না। এই চিত্রটি তরবারির চিহ্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কেন না কাছাড়ের রণচণ্ডী, আহোমদের ‘হেং দাং’ তথা শিবাজীর ‘ভবানী’র ত্রায়, একখানি তরবারির নাম। সম্ভ্রুতি এই তরবারি খানিরও অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। এই পশ্চিম দিকই টেইন হইতে দেখা যায়।

এতৎসহ গৃহের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। [ ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য। ] গৃহটী দৈর্ঘ্যে ১২ হাত, প্রস্থে ৮ হাত, চালের প্রস্থ প্রায় ৮ হাত ; অর্থাৎ দো-চালা ৭×১২ মণ্ডপ তৈয়ার করিতে এতদঞ্চলে ঘরামিরা যে “বাট” দিয়া থাকে, সেই রূপই। উচ্চতা বড় কম, দেওয়ালের মধ্য ভাগের উচ্চতা বড় জোর ৩ হাত মাত্র। গৃহের গাড়ে কোনও রূপ লতাপাতাদি অঙ্কিত হয় নাই ; ইহা আশ্চর্যেরই বিষয়, কেন না এতাদৃশস্থলে এইরূপ সাদাসিধা কাজ বড় দেখা যায় না।

এই পশ্চিমের দেওয়ালের খোপের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরগৃহের গাড়ে বলাকরে সংস্কৃত ভাষায় খোদিত লিপি আছে। গৃহের পাথর “বেলে” গোচের হওয়ায় লিপি অনেক স্থলে অম্পষ্ট এবং কোনও স্থলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অক্ষরের নমুনা প্রদর্শনার্থ ইহার যতটা নকল করিতে পারা গিয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল—[ ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য। ]

শুদ্ধপাঠ এই :—“শ্রীশ্রীরূপচণ্ডীপদারবিন্দে মধুকরস্ত বগা গোহাই শ্রীশ্রীরা ■ ■ ■ হিড়িম্বেশ্বরশ্রীশ্রীষুতহরিশ্চন্দ্রনারায়ণনৃপস্ত শকে ১৬৪৩\* মার্গশীর্ষে দ্বাদশদিবস গতে ভূমিপুত্র-বাসরে পাষাণনির্মিতঃ প্রাসাদঃ সম্পূর্ণ ইতি”।

মূলে প্রাসাদ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে ; ইহাতে সূচিত হয় যে, ইহা কোনও পণ্ডিতের রচনা নহে। বর্ণাশুদ্ধির দায়িত্বভার খোদকের দ্বারা চাপান বাইতে পারে, কিন্তু “পাষাণনির্মিতঃ

সন ১৩১৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৮শ ভাগ, ৫য় সংখ্যা



১মং ভিঃ

মাইবোডের পুকুর-বাঁক

১৪৬ ৬৭১

কালক বঁট হৈ নানাবান্ধব কলহ  
 বনাগোমার বান্ধিবান  
 কলহ লব বীথী হুত হান হৈ ০০০ নাগ  
 কলহ লব কল হুত হান হৈ ০০০ নাগ  
 কলহ লব কল হুত হান হৈ ০০০ নাগ  
 কলহ লব কল হুত হান হৈ ০০০ নাগ  
 কলহ লব কল হুত হান হৈ ০০০ নাগ  
 কলহ লব কল হুত হান হৈ ০০০ নাগ

প্রাসাদং সম্পূর্ণমিতি” এইরূপ একটা অন্তর্দৃষ্টি কেবল লিপিকল্পপ্রমাদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তবে “শ্রীশ্রীরামচণ্ডীপদারবিন্দমধুকরশ্চ” ইত্যাদি সংস্কৃত ভাষার স্তায় সর্বজনবিদিত বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। “ভূমিপুত্রবাসরে” কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু ইহাও লেখকের জ্ঞাতপত্রাদি হইতে প্রত শব্দবিশেষ হইতে পারে।

তবে কাছাড়রাজ্য পণ্ডিতশ্রুত ছিল, একথা বলিতে পারা যায় না। কাছাড়ের দণ্ডবিধি একখানি পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ইহা গোহাটিস্থ বঙ্গানুবাদসমীক্ষিত বিত্তক সংস্কৃতে লিখিত।

“বগা গোহাই” এই শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া এই স্থানে যে আহোমরাজগণের অধিকারের ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের পাবাণ-নির্মিত “প্রাসাদ” দর্শনপূর্বক ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে কি কি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য চলিলাম। ভাল সঙ্গী জুটাইতে না পারায় অনুবিধা হইতে লাগিল। ভগ্ন ও বিধ্বস্ত প্রাচীরের ইষ্টক অনেকগুলি রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বেই দেখা যায়। রেলওয়ে তৈয়ার হইবার সময়ে বোধ হয় এই সকল ইষ্টক কন্ট্রাক্টরদের অনেক কাজে লাগিয়াছিল। প্রস্তরমূর্তি অনেকটা পাওয়া গিয়াছিল, ঐগুলি কিছু স্থানান্তরিত হইয়াছে, আবার কিছু বোধ হয় বেশ সদ্যবহারেই লাগিয়াছে; রাস্তার আন্তরণের নিমিত্ত চূর্ণিত হইয়া ধূলি-সামুদ্রা লাভ করিয়াছে।

মাইবং ষ্টেশনের সম্মুখে একটা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের গঠনে ইহা হাতী বা গণ্ডারকল্প। তবে আকর্ণবিশ্রান্ত করালবদন দৃষ্টে এই মাত্র স্মৃতিত হয়, বুকি বা ইহা শার্দূলের প্রতিমূর্তি। ষ্টেশন হইতে মাইল খানিক দক্ষিণে একটা গাঁজার দোকান আছে, রেলওয়ে রাস্তারই নিত্যস্ত সন্নিহিতে উহা অবস্থিত; ইহার নিকটে ২৩টি প্রস্তরমূর্তি এখনও বর্তমান আছে।\* রেলের যাত্রীরা তাহা অনায়াসে দেখিতে পাবেন। মূর্তিগুলি মাহুয়ের তাহা বেশ বোকা যায়। তবে কিরূপ মাহুয়ের তাহা বোধগম্য হয় না। সন্ন্যাসীর মূর্তি হইতে পারে; আবার কোনও রূপ দেবমূর্তিও যে না হইতে পারে তাহাও বলা যায় না। যাহাই হউক, এই দণ্ডায়মান মূর্তি-গুলির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হই ব যে, নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যতটা লম্বা নাভি হইতে পা পর্য্যন্ত ততটা নয়; অর্থাৎ নীচের দিকে খর্বতা দেখা যায়।† ইহা স্বভাববিরুদ্ধ। তবে এইরূপ অসৌষ্ঠব এতদপেক্ষা সভ্যতর স্থানেও দেখা যায়। মূর্তিগুলিতে ভাস্কর্য্য চাতুর্য্য মেহাৎ মন্দ নহে।

\* সম্প্রতি এই সকল মূর্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে।

† বড় মূর্তিটির মাপ নিয়াছিলাম। মাথার চূড়া হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৯ ইঞ্চি এবং নাভিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৫ ইঞ্চি। [ এই মূর্তিটির চিত্র সম্প্রতি “ঢাকা রিভিউ ও সন্নিহন” পত্রের ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্যঃ ইহাকে “বুদ্ধমূর্তি” বলা হইয়াছে।—সাপ-পঃ। ]

সেই স্থান হইতে পূর্ব ও পশ্চিম অনেকটা জায়গা বেড়াইয়া দেখা গেল। সঙ্গে একটা কাছাড়ী-লোক ছিল, সে বড় ভাল করিয়া কিছু দেখাইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে উচ্চ ভিটা এবং শুষ্ক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া গেল। পশ্চিম দিকে এক স্থলে একটা দেবমন্দিরের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। তৎপার্শ্বে কাছাকাছি দুইটি গাছ দেখা গেল, যাহা এই পর্বতের অগ্রত দেখা যায় না। এই গাছের ইংরেজী নাম cycad বৈজ্ঞানিক নাম “cycas revoluta”। গোহাটি সহরের টেনিগ্রাফ আফিসের উত্তর ভাগে সড়কের পার্শ্বে এইরূপ দুইটি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গী কাছাড়ী উহার নাম “দীপগাছ” বলিল। উহার এই নাম হইবার কারণ কি, বুঝিলাম না; কাছাড়ীটিও উহা বলিতে পারিল না। তবে উহার ফুল ঠিক দীপাশথার স্থায় দেখা যায়, ইহাতেই যদি এই পার্বত্যপ্রদেশে ইহাও এই স্বদেশী নাম হইয়া থাকে। কাছাড়ীর কথা হইতে জানা গেল যে, এই দেবস্থলীতে দীপগাছের কাছে নরবলি অর্ঘ্যাস্ত হইত। স্মরণ বলিতে হইবে গাছের সঙ্গে দেবপূজার সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্যের বিষয় এই যে রণচতীর “প্রাসাদ” এই স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরত্ব অথচ এই নর-বলির স্থান কাছাড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাসবাটিকা হইতে ক্রোশ পরিমিত ব্যবধানে নিদৃষ্ট হইয়াছিল।

উপসংহারে কাছাড়-রাজগণের বাস্তব-বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাভারতে উল্লিখিত হিড়িম্ব হিড়িম্বার এবং ঘটোৎকচের আবাসভূমি বিষয়ে আমার যাহা অনুমান তাহা ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে ত্রিগুপ্ত রণচরণ বন্দ্য নামে জনৈক শিক্ষিত কাছাড়ী আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“যে দেশে ভীমসেনের সহিত হিড়িম্বার দেখা হইয়াছিল সেই দেশ প্রয়াগের নিকটবর্তী কোনও এক স্থানে ছিল। ঐ হেড়িম্ব রাজ্যে ঘটোৎকচ রাজত্ব করেন নাই। ভগবতী ৬ হেড়িম্বধরীর শাপে সেই রাজপুত্রী পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন। মহাবীর ঘটোৎকচ আসামের অন্তর্গত দরং রাজ্য নিজ বাহুবলে অধিকার করিয়া লইয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। দরং হইতে গিয়াই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। গোহাটি অঞ্চলের হাতীর চেয়ে দরং অঞ্চলের হাতী বৃহৎ ও বলবান, তাই ভগবতীর হাতীকে ঘটোৎকচের হাতীর নিকট পরাজয় পাইতে হইয়াছিল। ঘটোৎকচ হইতে উদয় ভীমনারায়ণ পর্য্যন্ত ১৮ জন রাজা দরঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক দিন ভগবতী স্বপ্নাদেশ করাতে ঘটোৎকচ-বংশের অষ্টাদশ রাজা উদয় ভীমনারায়ণ বিশ্বনাথ-ঘাটে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিয়া প্রথমতঃ শিলাঘাটে রাজধানী স্থাপন করেন, তথা হইতে তদীয় বংশধরগণ আগামের নানা স্থানে বিতৃত হইয়া পড়েন। কাছাড়রাজবংশধরগণ এক সময়ে সদিয়া অঞ্চলেও রাজত্ব করিয়া ছিলেন, বোধ হইতেছে; কারণ আজ পর্য্যন্ত সেই বিখ্যাতা দেবী কেচাইথাস্তির পূজা আমাদের দিতে হইতেছে।”

এই গেল ঐতিহাসিকযুগের পূর্বের কথা। আহোমদের বুরঞ্জি \* হইতে কাছাড়ীদের বিবরণ

\* ‘বুরঞ্জি’ অর্থ ইতিবৃত্ত। আহোম ‘বু’ অর্থ ‘অজ্ঞ’, ‘রন’, শিক্ষা দেওয়া ‘জি’, ভাণ্ডার। অর্থাৎ যে ভাণ্ডার হইতে অজ্ঞেরা শিক্ষা লাভ করে।



যখন আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন ডিমাপুরে তাহাদের রাজধানী অবস্থিত। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উহারা ডিমাপুর হইতে আহোমগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেও আহোমেরা ইহাদিগকে শাস্তিতে থাকিতে দেয় নাই।

• ১৭০৬/১৭০৮ খৃষ্টাব্দে আহোম-আকবর রুদ্রসিংহের সময় মাইবং আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়; তখন কাছাড়রাজ পলাইয়া খাসপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই খাসপুর বর্তমান বৃটীশ রাজধানী শিলচর সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর দিকে মধুরা নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু তখনও ইহা স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হয় নাই, কেন না ১৬৪৩ শকে অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মাইবঙ্গে রণচণ্ডীর পাবাগনির্মিত প্রাসাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খাসপুরকে কাছাড়ীরা টালিগ্রামও বলে। এই খাসপুর শিবের বন্দ মোক্তার অন্তর্ভুক্ত; টালিগ্রাম শিবের বন্দের সংলগ্ন স্থান।

এই খাসপুরেও কাছাড়ের শেষ ভূপতি আমরণ তিষ্ঠিতে পারেন নাই। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম দেশীয়েরা কাছাড়রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিলে কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র বৃটীশ গবর্ণ-মেন্টের শরণাগত হইয়া নিরাপদ হন এবং খাসপুর চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃটীশ সীমান্তের অতিশয় সন্নিকট হরিটিকর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানেই ১৮৩০ অব্দে মণিপুরীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র নিহত হন, এবং তদীয় শেষ বাসস্থান ভস্মীভূত হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অভাবে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কাছাড়রাজ্য অধিকৃত হয়। কাছাড়ের শেষ রাজধানী হরিটিকর আসামবেঙ্গল রেলওয়ের বদরপুর স্টেশনের ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। সেই স্থানের টিলাটিকে এখনও লোকে ‘রাজার টিলা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।†

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা

\* খাসপুরে কাছাড়ের শেষ তিন রাজার ‘পাট’ অর্থাৎ স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে অনেকগুলি মন্দির এখনও পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গুলির অধিকাংশই অসামান্য ভয়াবহতার অবস্থিত।

† এখানেও ঐষ্টব্য কিছুই নাই, সামান্য ছই একটা পুষ্কর আছে। টিলার উপরি ভাগে বাসের ঘরের নিচে এখনও খঁড়িলে রাজার ঘাঘের খোঁজার ভয়াবহ পোড়া চাউল পাওয়া যায়।

## আসাম-ভ্রমণ দ্বিতীয় প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

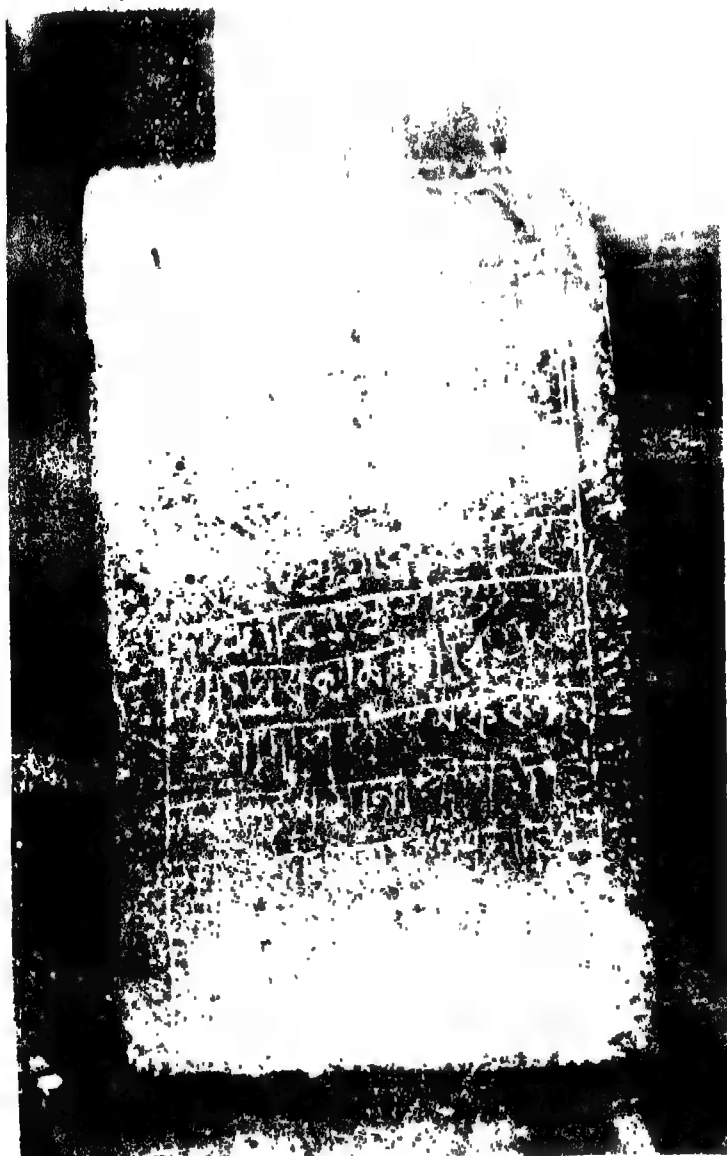
এই প্রবন্ধ প্রায় এক বৎসর হইল লিখিত হইয়া গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যগুণীণী সভার নবম অধিবেশনে (মাঘ ১৩১৬) পঠিত হইয়াছিল। ইহার পর সম্প্রতি মাইবং সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মাইবংয়ের পাষাণ-নির্মিত গৃহের নির্মাণ তারিখ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।



আমি নিজের মাইবং গিয়া প্রান্তরগৃহের পার্শ্ব-লিপি পাঠ করিয়াছিলাম, একথা প্রবন্ধে বলিয়াছি। তখন শকটিকে '১৬৮৩'ই পড়িয়াছিলাম। ইহাতে '৪' এই অক্ষরটি এমন ভাবে লিখিত যে ইহাকে ৮ পড়াই উচিত ছিল। ■ তথাপি কেন ৪৩ পড়িয়াছিলাম, ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।

‘আসামের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত ই-এ-গেইট্‌ মহোদয় তদীয় Report on the Progress of Historical researches in Assam নামক পুস্তিকায় (৫ পৃষ্ঠে) এই লিপির শক ‘১৬৮৩’ বলিয়া লিখিয়া ছিলেন। ঐ রিপোর্ট তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। তৎপর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আসাম-ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে তিনি প্রান্তর-গৃহ-নির্মাণ তারিখ ১৭২১ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ ১৬৮৩ শক) লিখিয়াছেন [যদিও তদীয় গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠে শকের অঙ্কটি অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে] এবং কাছাড়রাজবংশের তালিকায় (৩৬০ পৃ) জুই ■■■ হরিণচন্দ্র দেখাইয়াছেন। অতএব গেইট্‌ সাহেবের এই শেষবারের সিদ্ধান্ত অপ্রাস্ত মনে করিয়াই শকের অঙ্কটিকে ১৬৪৩ পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি এতদ্বিষয়ক পুনরালোচনা উপলক্ষে “পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণ” নামক গ্রন্থপ্রণেতা শিলচরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ধর মহাশয় আমাকে খাসপুরের শিলালিপি সম্বন্ধে বিবরণী প্রদান করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১৬৯৩ শকে

\* মাইবংয়ের টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শকের অঙ্কের একটি ছাপ তুলিয়া দিয়াছেন, উপরে তাহা প্রদত্ত হইল।



৩য় চিত্র

খাঁসপুরের শিলালিপি

১৯১ পৃষ্ঠা

খোদিত এই শিলালিপিঃ উল্লিখিত হরিশ্চন্দ্র এবং মাইবজের লিপিতে উল্লিখিত হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি, এবং মাইবজের লিপির শক ১৬৪৩ না হইয়া ১৬৮৩ হইবে। তিনি বলেন যে, শিলচরের অনেকেই ঐ মাইবজের লিপি পড়িয়াছেন, সকলেই ৪ না পড়িয়া ৮ পড়িয়াছেন।

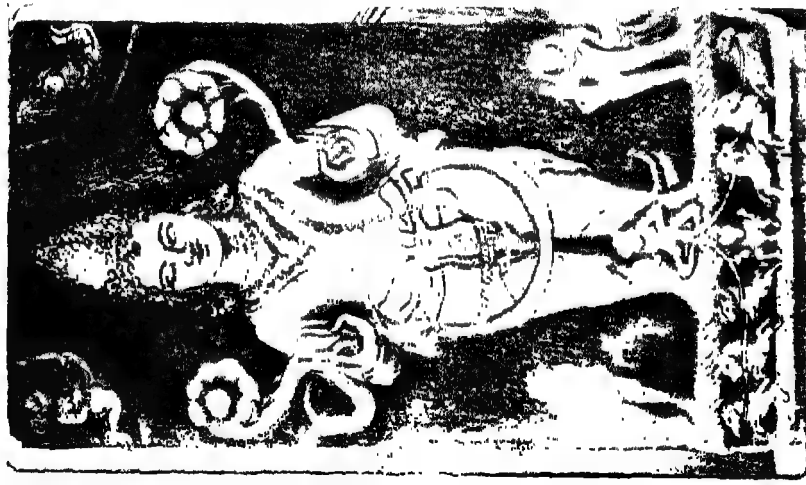
এতদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত সংকলনार्থ কাছাড়রাজবংশের যে তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ একজন মাত্র পাওয়া যায়। অপিচ হাণ্টার সাহেব তৎসঙ্কলিত Statistical Accounts of Assam Vol. II (পৃঃ ৪০৩-৪০৪) কাছাড়রাজগণের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শেষ আটজন রাজার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই যে, পূর্ববর্তী অজ্ঞাত রাজগণের নাম অবিস্মৃত হইলেও ইহারা যে যথার্থই রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না; অথচ তাঁহার তালিকায়ও একজন হরিশ্চন্দ্র মাত্র দেখা যায়। ১৬৮৩ শকে মাইবজে পৃথগণগৃহ নির্মাণ করিয়া দশবৎসর অন্তে এই হরিশ্চন্দ্রই চিরকালের জন্ত মাইবং পরিত্যাগ করিয়া খাসপুরে নিজ নামে এক রাজপাট স্থাপন করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভাব্য ঘটনা। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই হরিশ্চন্দ্র ১৬৪৩ হইতে ১৬৯৩ পর্যন্ত রাজা ছিলেন, এই কথা স্বীকার করি না কেন? এই সমাধানের একটা বিষয় অন্তরায় এই যে, ১৬৫৮ শকে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণের সনন্দ দুই খানি পাওয়া গিয়াছে, এবং এই জন্তই গেইট সাহেব বাধ্য হইয়া দুই হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তন করিয়াছিলেন। কাছাড় রাজবংশাবলীতে হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রের পরবর্তী রাজা ছিলেন, ইহাই দেখা যায়। অতএব মাইবজের খোদিত লিপি ১৬৮৩ শকালের, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

### শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা

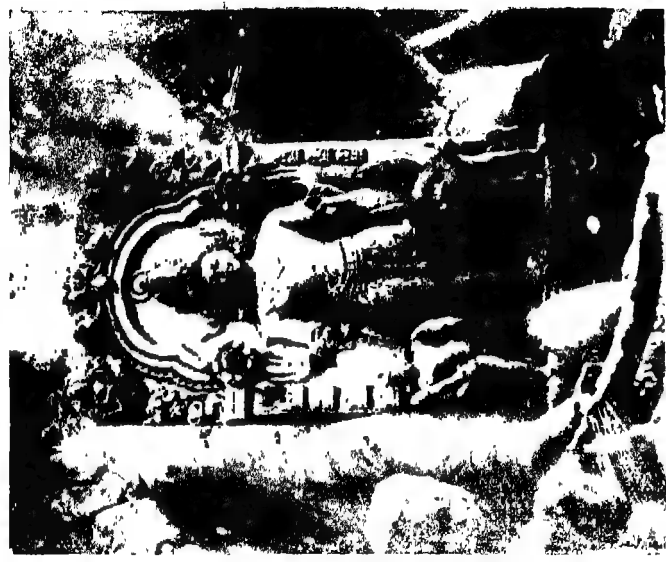
\* খাসপুরের ভগ্নাবশেষ হইতে এক হাত দীর্ঘ তিনপোয়া প্রশ্ন এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া নিয়া শিলচরে কলেক্টরিতে রাখা হইয়াছে। তাহাতে যে লিপি খোদিত আছে তাহার বিস্তৃত পাঠ এই :—“শ্রীনন্দনন্দনাঙ্কুরা নেত্রোদ্ধরচন্দ্রমিতে শাকে কার্ত্তিকস্বিতে ভাস্করে হেডুয়াধিপতিশ্রীশ্রীমহাশিবচন্দ্রনারায়ণভাদ্রমিনি রাষ্ট্রে তদন্তর্গতখাসপুরনামনগরে ৮তৎপাদপঞ্চমকরনলোলুপমানাশ্রীশ্রীমতীরাজমাতুলশ্রীপ্রভাদেবীসাম্বিতেষ্টকাদিনিচয়নির্মিতবিচিত্র প্রাসাদভিরাঃ।” এই লিপিস্থ শিলাখণ্ডের চিত্র প্রদত্ত হইল। [ ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য। ]

† “The last eight of these names are certainly correct and represent real personages.” p. 304.

‡ এই সনন্দ দুইখানি হেডুয়াজ্যের মন্ত্রিবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ঐ গুলি তাঁহারই পূর্বপুরুষ চাঁদলস্করের পুত্র মণিরামকে উজ্জীরীপদ প্রদান উপলক্ষে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এবং খাসপুরের কাছাড়রাজগণের কীর্ত্তিপরিচায়ক বিবরণী ও চিত্রাদি অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত “শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত” এবং সোঁহাটি বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভা হইতে প্রকাশিত “হেডুয়াজ্যের দণ্ডবিধি” নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। [ সম্ভ্রতি “চাকারিভিডি ও সম্মিলন” পত্রে ইংরেজীতে সম্মিখিত খাসপুর-ভ্রমণকাহিনী সচিত্র প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও দ্রষ্টব্য। ]



১৯৩৫ খ্রিঃ  
গণেশের মূর্তি



১৯৩৫ খ্রিঃ  
ভগবৎ মূর্তি

## চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি

আজ আমি আপনাদের নিকট যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহাব আলোচ্যবিষয় চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি। আমি সেদিন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চুঁচুড়ায় ৮শাড়েপ্ৰবের মন্দির দেখাইতে আনিয়াছিলাম। যখন ৮শাড়েপ্ৰবতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, সমস্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ। বাঁহাকে সঙ্গে কবির লইয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরের কিছুই দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলাম—তিনি আমাকে মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্দির সম্বন্ধে কতকগুলি জিনিষও দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে যখন কিছুই দেখাইতে পারিলাম না, তখন তিনি বলিলেন, “চুঁচুড়ায় আর কোথায়ও কি কোন দেবতাব মূর্ত্তি বা মন্দির নাই?” এই বলিয়া তিনি এদিক্ ওদিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটা বালক বলিল—“মহাশয়! ষষ্টিদেবীর মূর্ত্তি দেখবেন?” আমরা ষষ্টিদেবীর মূর্ত্তি দেখিবাব জন্ত অগ্রসর হইলাম। একটা সঙ্কীর্ণ স্থানের এক কোণে একটা অগ্ন্যবৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষের গাত্র ভেদ করিয়া একটা প্রস্তরমূর্ত্তি তথায় বিরাজিত ছিল। বালক সেই মূর্ত্তিকে ষষ্টিদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া ইঙ্গিত করিল। “আমরা তাহাতে কিছদ্দ ষষ্টিদেবীর ‘ষষ্টিদেব’ কিছুই দেখিলাম না। বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলাম যে, মূর্ত্তিটা স্ত্রীমূর্ত্তিই নহে—পুরুষমূর্ত্তিকে স্থানীয় লোকেরা কি জানি কেন ষষ্টিদেবীর খাড়া করিয়াছেন, কিছদ্দ যখন ভাবিলাম যে মেদিনীপুর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বহু বুদ্ধমূর্ত্তি যখন শিব হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তখন যে আমাদের এই পুরুষমূর্ত্তিরও এ দশা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সঙ্গে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হরীকেশ মিত্রকে আনিয়াছিলাম। তিনি আগ্রহ-সহকায়ে মূর্ত্তিটার দুইখানি ফটো তুলিয়া লইলেন। ফটো লইয়া আমরা চুঁচুড়া হইতে বিদ্যার গ্রহণ করিলাম। তারপর নানা উপায়ে মূর্ত্তিটার পরিচয় স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি মূর্ত্তিটিকে যেরূপ বর্ণনাছি, অথ আপনাদিগের নিকট তাহাই নিবেদন করিব।

### মূর্ত্তির পরিচয়

মূর্ত্তিটার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মূর্ত্তির হস্তে অভয়-মুদ্রা পরিশোভিত। শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বামহস্তের অভয়মূর্ত্তি সকল প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধীকৃত করিলেই অভয়মুদ্রা হয়। “উর্দ্ধীকৃত-বামহস্তে প্রসৃতোহভয়মুদ্রিকা।” শ্রাব্যহস্তে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তিকে অভয়দান করিবার সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, সেইরূপ করিলেই অভয়মুদ্রা হইবে। যেমন, ‘বরদাভয়মুদ্রা’ বরদাভয়বৎ কুর। এই মূর্ত্তির মুদ্রাও অভয়মুদ্রা। তারপর মূর্ত্তিটার মস্তক শাণিকাবিশিষ্ট। কণ্ঠ কেয়ূরহারা দি কুণ্ডলযুক্ত। বিগ্রহটা ত্রিভুজ—তবে উপরের চকুটা কিছু অস্পষ্ট। দুই হাতের উপর দুইটা

পদ্ম। পদযুগল উপানং পরিমণ্ডিত। এই মূর্তির সহিত সূর্য্যমূর্তির সম্যক্ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। সূর্য্যমূর্তির ধ্যানে দেখিতে পাই—

“রক্তাজ্যযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ুরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।

মাণিক্যমৌলিং দিননাগমীড়ে বন্ধুককান্তিং বিলসন্ত্রিনেত্রম্।”

অন্যত্র—“রক্তাস্নুজাসনসগুণৈকসিকুং ভাসুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিরকুণ্ডলকুণ্ডলিং ত্রিনেত্রম্ ॥

এতদ্বিন্ন মংসাপূৰ্ণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যদেবের মূর্তিব কথা আছে। আমাদের দেশে দ্বিজ, চতুর্ভুজ স-সহচর বা সহচরহীন অনেক সূর্য্যমূর্তি আছে। এই সূর্য্যমূর্তিটার পাদনিম্নে সপ্তাশ্ব বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়পার্শ্বে পার্শ্বচর। তন্মধ্যে একজন অসিচর্ম্মধারী। মূর্তিটা নিরীক্ষণ করিলে সূর্য্যমূর্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এই মূর্তিটা দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত পরিমিত ও প্রস্থে এক হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক। এতদ্বিন্ন মূর্তিব তিনদিকে দ্বাদশা-দিত্য। দুইজন পার্শ্বচরের দুইদ্বারে দুইটা সহচর। ইহাই আমাদের আলোচ্য মূর্তির পরিচয়।

সম্প্রতি সেরপুরের অন্তর্গত কোশল্যাতলায় কয়েকটা মূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে। সেট মূর্তিগুলির মধ্যে একটা মূর্তিব স্তূতি আমাদের এই বর্তমান মূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রঙ্গপুরের অগ্রতম ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার “সেরপুরের ঐতিহাস” নামক প্রবন্ধের ৬৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মূর্তিটা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“পুরুষমূর্তি, দ্বিভুজ, দুই হাতে দুইটা পদ্ম; পদযুগলের মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্র একটা শায়িত মূর্তির উপর একটা পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান; উভয়পার্শ্বে দুইটা স্ত্রীমূর্তি আড়ভাবে অবস্থিত এবং দুইটা পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান। সর্ব্বনিম্নে কতকগুলি বাধিত অশ্ব। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এন্ মহাশয় মূর্তিটিকে সূর্য্যমূর্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। উচ্চতা প্রায় ২।০ হস্ত।”

জানি না কি কণে কাহারকর্তৃক এই সূর্য্যদেব বটীদেবী নামে প্রথমে প্রচারিত হইয়া বালক-বালিকার রক্ষয়িত্রী ও লালয়িত্রীরূপে এবং পুত্রমুখদর্শনবিধুরা বন্ধ্যারমণীর আশাস্থল হইয়া চুঁচুড়ায় বোড়শোপচারে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। জানি না বটীদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না? ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দুরমণীর হস্তের সিন্দূর ললাটে ধারণ করিয়া তপনদেবের পুরুষলোপ হইয়াছে কি না? তবে আমাদের বিশ্বাস যদি আপনারা এই মূর্তিটিকে সূর্য্যদেব বলিয়া মনে করেন, তবে শাস্ত্রনির্দ্ধারিত উপায়ে ইহার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।

### মূর্তি-প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ

মূর্তিটা দেখিয়া ইহা কোন্ সময়ের তাহা স্থির করা ছরুহ ব্যাপার। তবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনাদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, কখন কোন্ সময়ে কেমন করিয়া এই

বিগ্রহ আপনার মন্দির ছাড়িয়া, পূজোপচার পরিচালনা করিয়া, চুঁচুড়ার এই গাছতলায় আসিয়া লইয়াছেন। চুঁচুড়ার সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত বংশ তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন—তখন গোড়ে হিন্দুশাসন চলিতেছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গোড়েব্বরের প্রধান মন্ত্রী বা “উজীর মমালকু” ছিলেন। গোড়েব্বরের অন্ততম প্রধান কর্মচারী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এক পরম-রূপবতী কন্যা নিত্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পূজানিরতা রহিয়াছেন, এমন সময় বলভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিনি পুরন্দরের নিকট কন্যাপ্রার্থনা করেন এবং পুরন্দরও তাঁহাকে জামাতরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র ক্রমশঃ সূর্য্যোপাসক হইয়া পড়িলেন। এই বলভদ্রের বংশপরম্পরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমূর্ত্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্রামরাম মন্ত্রান্তরে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহাদিগের গৃহস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি অপূজিত থাকে। এই শ্রামরাম বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে “বাবু” উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময় তাঁহার নাম প্রতিপত্তি যথেষ্টই হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্ত দুইটা মন্দির ঘাট নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। শ্রামরাম বাবুর বাটীতে কোন এক বৃহৎ কাষ্যোপলক্ষে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্তৃক নিৰ্ম্মিত ঘাটে স্থানলাভ করে। আমার বিশ্বাস, এই “ঘাটেপড়া” ঠাকুরটিকে কেহ কি ভাবিয়া পূজোপচার প্রদানের জন্ত ‘ষষ্ঠী’ নাম দিয়া অশ্বখবৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তদবধি বোধ হয় বলভদ্রের সাধের তপনদেবের গাছতলায়ই সার হইয়াছে। আমি যে অনুমান করিয়াছি, সে অনুমান ঠিক কি না বলিতে পারি না। এই মূর্ত্তিই যে বলভদ্র-প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঘটনা-সমাবেশে যাহা সম্ভব তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমি এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাল-নিরূপণ করিয়াছি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

### সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রবন্ধ-লেখক চুঁচুড়ার রক্ষিত প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক আশাদেশ ধর্ম্মবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য মূর্ত্তিটির শিল্প-নৈপুণ্য ও গঠনাদির পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রাচীন মূর্ত্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার সময়নিরূপণকালে যে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে, বাস্তবিক সেনরাজগণের সময়েও রাজপরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাকে পদ্ম সৌর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, এ অবস্থার



গোড়েশ্বরের অমাত্য বলভদ্রসোমের পূর্বপুরুষ যে একজন পরম সৌর ছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

শ্রীললাম, চুঁচুড়ার আলোচ্য স্থ্যামূর্তিটিকে অনেকে স্থ্য বলিতে কুন্তিত। মূর্তিটা যে মিত্রদেবের, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবন্ধ-লেখক যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মূর্তির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বথেষ্ট নহে। ভাবম্যাপুরাণায় ব্রাহ্মপঞ্চ ও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রে মিত্রমূর্তির পূর্ণপরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্হাদিন হইল, ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্বপ্রসঙ্গে তাহার সবিত্তার আলোচনা করিয়াছি।\* এ স্থলে সাবাবণের কোতুহল পরিতৃপ্তির জন্ত “বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প” হইতে মিত্রপরিচায়ক শ্লোকভাগ উদ্ধৃত হইল—

“একচক্রং সস্প্রাশ্বং সসারাতং মহারথম্ । হস্তদ্বয়ং পদ্মবরং কক্ষুৎচন্দ্রবক্ষসম্ ॥  
অকুঙ্কিতম্বকেশস্ত প্রভামণ্ডলমাণ্ডতম্ । কেশবেশমায়ুক্তং স্বর্ণরত্নাবভূষতম্ ॥  
নিম্ফুভা দাক্ষণ্যে পাশ্বে বামে রাজা প্রকাতিত। সক্ষাতরঙ্গসংযুক্তা কেশহারসমুজ্জ্বলা ॥  
এবমুক্তরথস্তম্ মকরধ্বজ হযাতে । মুকুটধাপ দাতব্যমণ্ডং সৰ্বং সমণ্ডলম্ ॥  
একবক্ত্রাঙ্কিতো দণ্ডো স্পন্দন্তেজোকরাশ্চজম্ । ব্রহ্মাতু হাপয়েৎ পূবং পুরুষাকৃতক্ৰাপিণো ॥  
হর্যাকৃত্ত কুৰ্ব্বাত পৃথং বাচনামকম্ । দিব্যমানবপুং সঞ্চলোকেকদাপকম্ ॥  
জাতিহিঙ্গুল্যসংহাপ্য কারণেং স্থ্যামণ্ডলম্ । চতুর্ভুজদ্বিত্তো বা রেখামণিবভাজনা ॥  
দ্বিত্তহস্তরোজম্ সলগাশ্বরথাত্তঃ । দণ্ডচ পিঙ্গলশেব ধারপালো চ খড়্গগমো ॥”

( বিশ্বকর্ম্মীয়-শিল্প )

“( মিত্রদেব ) সপ্রাশ্ব ও সারথযুক্ত একচক্র মহারথে আধিষ্ঠিত। হস্তদ্বয়ে পদ্ম এবং বক্ষে কক্ষুৎ ও চন্দ্র ধারণ করিয়া আছেন, তাহার কেশভাগ অকুঙ্কিত ও প্রভামণ্ডলমাণ্ডত। কেশ স্তবেশযুক্ত ও স্বর্ণ-রত্ন-াবভূষত। তাহার দাক্ষণ্যপাশ্বে নিম্ফুভা ও বামপাশ্বে রাজা। উভয়ে সক্ষাতরঙ্গসংযুক্তা ও কেশহারসমুজ্জ্বলা। উক্ত রথ মকরধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেরই মণ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। মিত্রদেবের সম্মুখভাগে পুরুষরূপী দুইটা মূর্তি করিতে হইবে, তন্মধ্যে দণ্ড বা যমের একবক্ত্র এবং স্পন্দ তেজোকরাশ্চজ হইবেন। দিব্য দেহধারী ও সৰ্বলোকের আলোকদানকারী বাচকে হর্যাকৃত্ত পদ্মের উপর স্থাপন করিবে। স্থ্যের মণ্ডল জাতি ও হিঙ্গুলবর্ণবৎ হইবে। চতুর্ভুজই হউক বা দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বারা সুশোভিত, দ্বিত্তোপরি পদ্ম ও সলগাশ্বরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পিঙ্গলনামক খড়্গধারী দুইটা দ্বারপালকেও রাখিতে হইবে।”

উপরের মূর্তি-পরিচয় হইতে মিত্রদেব ও তাহার অনুযজিগণের পরিচয়ও পাওয়া বাইতেছে। সাধারণের কোতুহল-পরিতৃপ্তির জন্ত চুঁচুড়ার মূর্তির পাশ্বে ময়ূরভঞ্জের হর্গম জঙ্গল হইতে আবিষ্কৃত মিত্রদেবের চিত্রও প্রদর্শিত হইল।

পত্রিকা-সম্পাদক।

## রাজা দত্তখাস কে ?

বঙ্গ হইতে সেনরাজবংশের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হইলে এবং সর্বত্র মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, গোড়াধিপ সেনরাজগণের প্রবর্তিত কুলবিধিরক্ষায় অনেক কুলীনসন্তানই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজের আচার ব্যবহার ও সামাজিক সম্বন্ধ বল্লালী কুল-প্রথা অনুসারে অক্ষুণ্ণভাবে বক্ষা করা কষ্টসাধ্য মনে করিয়া পরবর্তী কুলাচাৰ্যগণ পূৰ্ব নিয়মগুলি অনেকটা শিথিল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে যাহারা বিশেষভাবে দোষী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কুলীনসন্তান হইলেও কেহ বংশজ, কেহ শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়, কেহ বা নিতান্ত হেয় কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে পারিগণিত হইয়াছিলেন।

গোড়াধিপ বল্লালসেনের সময় বন্দ্যবংশে জাহ্নন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, জৈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন, চট্টবংশে বহরূপ, স্মৃচ, অববিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন, পুতিতুণ্ডবংশে গোবন্ধন, ঘোষালবংশে শির, গাঙ্গুলীবংশে শিশু, কুন্দবংশে রোষাকর, কাজিগংশে কাহ্ন ও কুতুহল এবং মুখুটিবংশে উৎসাহ ও গরুড় অর্থাৎ বন্দ্যাদ অষ্ট গ্রামীর মধ্যে উক্ত উনিশজন মাত্র 'মুখ্যকুলীন' এবং মাধবাচার্য্য মহিস্তা, শরণি শুড়, অতিরূপ পিপ্পলী, রুদ্র চোৎখণ্ডী, চক্রপাণি বা চাকু পারিহাল, চক্রপাণি গড়গড়ী, চৌট রায়া, জনাদন ডিংসাহ, ধর্ম কেশরকুনী, জগৎ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ডী, গুয়া, কুলভী ও মুণ্ডাকর দোষাক্ষী এই চৌদ্দগ্রামীর চৌদ্দজন ব্যক্তি 'গোণকুলীন' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে গোণ-কুলীন এবং মুখ্যকুলীন উভয়ের মধ্যেই আদান-প্রদান চলিত। আমরা এবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বল্লালী কুলীন উৎসাহ মুখুটার পুত্র আহিত মাধবাচার্য্য মহিস্তা ■ শরণি শুড়ের সহিত, (১) বহরূপ চট্ট গুয়া কুলভীর সহিত, (২) মকরন্দ বন্দ্য গর্ভেশ্বর রায়াঁর সহিত, (৩) বাঙ্গাল চট্ট শূলপাণি পিপ্পলীর সহিত, (৪) মহেশ্বর বন্দ্য অতিরূপ পিপ্পলী ও রুদ্র-

(১) "আহিতশু পারিবত্ত আভ্যা দেবলকে পুরা। চট্টেন বহরূপেণ মকরন্দেন চোচিতঃ ॥

জাহ্ননেন সমানোহসৌ পুতিগোবন্ধনেন চ। উচিতেন খাটুকেন দেবলেন সমং পুনঃ ॥

মহিস্তা মাধব ক্ষেমাঃ শুড়িশরণিকপ্তথা। উষোকলৌলিকশ্চৈব পুত্রৌ যৌ খ্যাতপৌরুষৌ ॥" (মহাবংশ)

(২) "বহরূপোহচিতিএতে নববিখ্যাতপৌরুষাঃ। ক্ষেম্যোহস্ত কুলভিগুয়া কাজিকুতুহলোচিতঃ ॥"

( মহাবংশ )

(৩) "তুল্যোজ্জ্বলমকরন্দস্ত আহিত মুখজোত্তমঃ।

■ \* ■

রায়াঁগর্ভেশ্বরঃ পশ্চাৎযেতে ক্ষেমা একীভিতাঃ। মকরন্দস্ততাবেভৌ দাসৌ বিনায়কাবুভৌ ॥" ( মহাবংশ )

(৪) "ক্ষেম্যো বাঙ্গালচট্টশূলপুণ্ডিশ্চ পিপ্পলী।

■ \* ■

মহিস্তা মাধবাচার্য্যো মুখকাসঃ সমন্ততঃ। কিতোনাম স্ততস্তস্ত হনামা লোকসমন্ততঃ ॥" ( মহাবংশ )

চোৎখণ্ডীর সহিত, (৫) বন্দ্যবংশীয় অপর প্রধান কুলীন ঈশান জন বা জগৎ ডিংসাই ও নিশাপতি ঘণ্টেশ্বরীর সহিত (৬), বাদলি মুখ জয়কুলভী ও নন্দনগুড়ের সহিত (৭), এবং কাম্বু কাজিলাল গভেষ্বর রায়ী ও রামগড়গড়ীর সহিত (৮) পরিবর্ত্ত বা কুলকার্য্য করিয়াছিলেন। ঐবানন্দের মহাবংশ পাঠ কবিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, গোড়াধিপ বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন এই উভয়ের সময়েই ৮ খৃঃ শৃংখ্যা ও ২৪ ঘর গোণ কুলীনমধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। 'মাশ্চয্যেব' এবং সধক্কানগরকার লালমোহন বিত্তানিধি মহাশয় এই বল্লালপুত্রিত ১৪ জন গোণকুলীনকে 'বটশোএয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (৯) তাঁহার মতে "এই চোৎখণ্ডী সদাচার-পরিবর্ত্ত হলেন এজ্ঞাত গোণকুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন।" (১০) দ্বাত্তবিক এই গোণকুলীন-গণ সদাচারপরিবর্ত্ত ছিলেন না। সুপ্রাচীন রাষ্ট্রীয় কুলচাঙ্গা বাচস্পাতিমিশ্র লিখিয়াছেন, 'নবলক্ষণাক্রান্ত কুলীনগণ ছইভাগে বিভক্ত হন, মুখ্য ও গোণ। নবগুণে ঘাড়াবা একটু খাট ছিলেন, তাহারাই গোণকুলীন হইয়া ছিলেন।' (১১) রাষ্ট্রীয়-কুলমঞ্জরী নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, উক্ত দ্বাবংশতি গ্রামীসমৃদ্ধ ২০ জন বিগ্রহ বল্লাল কটক কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। (১২) হরিমশ্রেণে কারিকাতেও মুখ্য ৮ ও গোণ ১৪ এই দ্বাবংশতিকুলোদ্ভবই মহারাজ দনোজমাধবেব সভাতেও সম্মানিত হইতে দেখা যায়। (১৩) কিন্তু গোণকুলীনের পূরুষসম্মান বেশী দিন স্থায়ী হইল না। গোড়বঙ্গে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কুলীন-সমাজেও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় নানা স্থানে কুলীনগণ ছড়াইয়া পড়ায় আদান-প্রদানেরও অনেকটা অস্বাবধা ঘটিয়াছিল। অনেকেই সদাচার-পরিবর্ত্ত হইয়াছিলেন ও কুলবিধি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময়ে আচারবৈলক্ষ্য্যাহেতু গোণকুলীনগণ মুখ্য-কুলীনের ঘেষ করিতেছিলেন। দোষী মুখ্যকুলীন ও নির্দোষ গোণকুলীনের মধ্যে সামাজিক

( ৫ ) "মহেশ্বরো মহাবিজয়ঃ শুচোচ্চৈত্ব্যপতিঃ । রাজ লক্ষণসেনস্ত সভায়াঃ তিলকঃ কৃতিঃ ॥

শিখলীয়াতিরুগেন বিজেন গুণশালিনা । চোৎখণ্ডিরদোকেন ॥ পরিবর্ত্তঃ সহাকরোৎ ।

মহাদেবঃ স্বতন্ত্ৰস্ত লক্ষণেন ঐপূজিতঃ ॥" ( মহাবংশ )

( ৬ ) "পুতিগোবর্দ্ধনোদিগিঃ ক্রমোদ্যকী মিশাপতিঃ । মুখজোভাগতশ্চৈব ঈশানস্ত বিনিময়াঃ ॥" ( মহাবংশ )

( ৭ ) "জয়োদলনকৌতুল্যো কুলভিচ গুরী তথা । বাদলে মুখজস্যোতে তুল্যাস্ত পরিকীর্তিতাঃ ॥" ( মহাবংশ )

( ৮ ) "কাঙ্ককস্যোচিতোবদ্যো দেবলঃ পরিকীর্তিতঃ । ক্ষেমোখভেষরো রায়ী রামোপি গড়সম্ভবঃ ॥"

( ঐবানন্দের মহাবংশ )

( ৯ ) সধক্কানির্ণয়ের পরিশিষ্ট ১০ পৃষ্ঠা

( ১০ ) সধক্কানির্ণয় ২য় সংস্করণ ৬০০ পৃষ্ঠা।

( ১১ ) "তে দ্বিধা গোণমুখ্যাস্ত নবধা কুললক্ষণম্ । নবধা স্বলজ্জাবেন গোণমুখ্যজায়তে ॥" ( কুলরায় )

( ১২ ) "ভদ্রতগ্রাহিণোস্তে যে বিপ্রা দ্বাবংশতিমতা । গ্রামিণস্তাম্ সমভ্যর্চ কুলীনানকরোমৃ পঃ ॥"

( রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী )

( ১৩ ) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম অধ্যায় ( ২য় সংস্করণ ) ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

কুলমর্যাদা লইয়া গোলযোগ ঘটিতেছিল। রাজা বল্লালসেন নিয়ম কবিয়া যান যে, কুলীন ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে কত্তাদান করিবেন এবং সেই কুলীনের ঘর হইতে কত্তা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পরিবর্তই কুলীনগণের সর্বপ্রধান স্বধর্ম।(১৪) ইহার ব্যতিক্রমে কুলমর্যাদার দ্বাশ বা কুলক্ষয় হইবে। এই নিয়ম রক্ষা করিয়া গোণকুলীনেরা মুখ্যকুলীন ছাড়িয়া পরম্পর আদান-প্রদান চালাইতে লাগিলেন। মুখ্যকুলীনদিগের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব দেখিয়া কুলাচার্যগণ গোণকুলীনদিগের কুলপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা শ্রীদত্ত খাসের সভায় কুলাচার্যগণ উপস্থিত হইলেন। ঞ্চবানন্দ মিশ্রের “মহাবংশ” হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দত্তখাস মহাশয়ের সভায় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল।(১৫) প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘গোণকুলীন-গণ’ পরম্পর গোণকুলীন মধ্যে আদান-প্রদান বা পরিবর্ত করিতেছিলেন, কদাচিৎ মুখ্যকুলীনে কত্তাদান মাত্র করিতেন, (মুখ্য কুলীনের কত্তাগ্রহণ বা মুখ্যকুলীনের সহিত পরিবর্ত করিতে কাহারও আগ্রহ ছিল না।) রাজা শ্রীদত্তখাস গোণকুলীনদিগের এইরূপ শ্রোত্রিয়গণের সমান আচার লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গোণকুলীনকে শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।’(১৬)

রাজা দত্তখাস উক্ত চৌদ্দ ঘর গোণকুলীনকে কেবল “শ্রোত্রিয়” করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। চৌদ্দ ঘরের মধ্যে কেশরকোনী, রায়ী, পীতমুণ্ডী, গড়গড়ী, ঘর্টেখবী, কুলভী ও চৌৎখতী এই সাতঘরকে “অরি” বা কুলনাশক বলিয়া স্থির করিলেন। দেবীবর তাঁহার “মেলবন্ধ” নামক গ্রন্থে ইহার কারণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, যে উক্ত সপ্ত গাঁইর গোণকুলীনেরা চুরী করিয়া কুলীনকত্তা লইতেন, এই জন্যই এই সাতঘর অগ্রাহ হইলেন।(১৭) অবশিষ্ট সাতঘরের মধ্যে পিঙ্গলী, দীর্ঘাকী ও ডিংসাই এই তিনঘর সিদ্ধ এবং মর্হস্তা, হড়, শুড় ও পারিহাল এই চারি ঘর সাধ্যশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার “কুলরামে” লিখিয়াছেন, ‘ইষ্টদেব থাকায় উক্ত কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তঘর “অরি” বা কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন।’(১৮) দেবীবর ও বাচস্পতিমিশ্র এই উভয়ের উক্তি

(১৪) “কত্তাদানপ্রদানাত্ম্য স্বধর্ম পরিবর্ততঃ। অস্তোন্তসমধর্মী চ ভবিতা রাজসম্ভতঃ ॥

অয়মেব বৃহদ্রথঃ কুলীনন্তেন সংযুতঃ। কর্তব্যমিতি নিশ্চিত্যঃ নৃপবল্লালসেনকঃ” (কুলরাম)

(১৫) “স্ববংশভূপালকুমারকৃত্য্য যোগ্যো বিবাদঃ প্রতিপত্তিকারি।

শ্রীদত্তখাসস্য সভায় পূর্বং কিনালকুণ্ডং ঘটকাঃ সমূচুঃ”

(ঞবানন্দমিশ্রের মহাবংশ)

(১৬) “গৌণৈঃ সহ গোণানাং পরিবর্তবিধানং কদাচিন্মুখ্যে তনয়াপ্রদানং অতো শ্রীদত্তখাসেন রাজা শ্রোত্রিয়াণাং সধর্ম্মেণ গোণা অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতাঃ” (দেবীবর)

(১৭) “কেশরো রায়ী গাকী চ পীতমুণ্ডী চ গড়গড়ী। ঘটকা কুলভী চৌৎখতী সপ্তৈতে চারয়ঃ স্তুতাঃ ॥

কুলীনজাপহারিহাং সপ্তানাক কুলাখিতা। যস্মৈ দেয়া ততোহগ্রাহ্য দোষজৈরিতি কল্পিতম্ ॥”

(দেবীবর)

(১৮) “ইষ্টদেবতয়া সপ্ত চারয় পরিকীর্জিতা ॥” (মেলপার্থায়ত কুলরাম)

হইতে বেশ বরাং বাইতেছে যে, রাজা দত্তখাসের সময়ে গোণকুলীন ও মুখ্যকুলীনে পরস্পর ঘেষাদেবী চলিয়াছিল, মুখ্যকুলীনগণ পূর্ববৎ গোণকুলীনকে কতাদান কবিত্তে বিমুখ ছিলেন, এ কারণ প্রধানতঃ গোণকুলীনেরা পরস্পর আদান-প্রদান চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেশরকোনী প্রভৃতি সপ্তম্বর কুলগৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া ছলে, কৌশলে ও গোপনে মুখ্য-কুলীনকত্যা গ্রহণ করিতেছিলেন। অবশ্য বঙ্গালী কুলবিধি আলোচনা করিলে তাঁহাদের এ কার্য ( কুলীনের পক্ষে ) নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। কাবণ কুলীনগণ স্ব স্ব কুলরক্ষা করিবার জন্য সকল সমাজেই এক্রপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গৌড়াধিপ বঙ্গালের সময়ে যাঁহারা গোণকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন, রাজা দত্তখাসের সময় তাঁহাদের ৭ম ও ৮ম পুরুষ রিগ্ধমান ছিলেন। এক্রপ স্থলে ৭।৮ পুরুষ পরে উক্ত সপ্তম্বরের লোকসংখ্যা ধরিলে ন্যূনকল্পে ৩৪ শতব্যক্তি জন্মিবাব সম্ভাবনা। এষ্ট তিন চাবিশব্যক্তির সকলেই কিছু কুলীনকত্যা-হরণদোষে দুষিত হন নাই বা লিপ্ত ছিলেন না। অথচ তাঁহারা সকলেই কুলহীন হইলেন। কেবল কুলহীন নহে, কুলনাশক বলিয়া গণ্য হইলেন। মুখ্যকুলীনগণ শ্রোত্রিয়কত্যা অবাদে বিবাহ করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন দোষ হইত না; অথচ বঙ্গালসেনের সময় হইতে যে সপ্তম্বরের সহিত আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল, তাঁহাদিগকে কতাদান দূরের কথা, তাঁহাদের কত্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনের কুলপাত হইলে, রাজা দত্তখাস এইক্রপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন † এবং সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজ উক্ত ব্যবস্থা অবনতশিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এক্রপ স্থলে সঁকলেই স্বীকার করিবেন যে, রাজা দত্তখাস কখনই একজন সামান্ত ব্যক্তি ছিলেন না। বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজে তিনিই কুলীন ও শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা করিয়া বান। আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছেন।\* কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্য্যেব বিষয় এক্রপ একজন সমাজব্যবস্থাপক অসামান্ত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোথায় তাঁহাব বাস ছিল, কুলগ্রন্থ হইতে তাহার কোন আভাস পাওয়া বাইতেছে না! রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সর্বপ্রধান কুলগ্রন্থ “মহাবংশ” হইতে এই মাত্র জানিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় কুলীন পুতি শোভাকর ১৩৭৭ শকে ( ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ) মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পূর্বে রাজা দত্তখাসের সভায় রাষ্ট্রীয় কুলীনগণের ৫৭ম সমীকরণ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে এ সময় বঙ্গালী কুলীনগণের অধস্তন ৭।৮ পুরুষ হইয়াছিল।

এখন বঙ্গে সর্বত্রই যথেষ্ট ঐতিহাসিক আলোচনা চলিতেছে। এ সময়ে রাজা দত্তখাসের প্রকৃত পরিচয় ও সময় নিরূপিত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াই “রাজা দত্তখাস কে” এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

# শিবের গাজন

“বলদ বাহনে হর করিআ সাজন।

সহিত গমনে জাইলা ধর্মের গাজন ॥” (শুং পঃ)

বঙ্গদেশে “গাজন” একটা প্রাচীন ধর্মমহোৎসব। গাজনের মূল অঙ্গসন্ধান করিলে, আমরা বঙ্গের ধর্মোতিহাসের এক অভিনব অংশে উপস্থিত হই। বৌদ্ধ-উৎসবদির সহিত ‘গাজন’ ধর্মপুস্তকদের সময়ে গাজনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না।

‘গর্জন’ শব্দ হইতে

উদ্ভব হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, “গর্জন” শব্দ হইতে “গাজন” শব্দের বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ-উৎসবে নৃত্য-গীত ও বাত্যাঙ্কনের

কথা ছিল না, প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্মোৎসব বর্তমান কালের অধিকাংশ ইসলামধর্মের আবৃত্তিও ছিল। কালে গ্রীষ্মাদির রাজহসময়েব কিছু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ-নীরব-সাধনা সাধারণ অঙ্গ ক্রমগণের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তাবে সমর্থ হইতে পারে নাই বলিয়া একটা তামসিক ভাবের সমাবেশপূর্বক বৌদ্ধ-সাধনা, বৌদ্ধ তামসিক উৎসবে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে বাত্যাঙ্কমসহকারে নৃত্যগীতাদির অঙ্গুষ্ঠানপূর্বক অভিনব তাবে, বুদ্ধ-পুজার প্রচলন আরম্ভ হয়, দেশের নিরক্ষর জনগণ সকলেই সাত্ত্বিক নীরব সাধনা বুঝিবে কেন? তাহার তামসিক আমোদ উপভোগ কবিতো না পাইলে সুখী হইতে পারিবে না, ইহা যখন পণ্ডিতে বুঝিলেন, তখন তাহাদের জ্ঞাত স্বতন্ত্রভাবে উৎসবদির বন্দোবস্তও হইয়াছিল।

বৌদ্ধগণের গীত, বাজ, নৃত্য, আনাচরঙ্গীর হইলেও, তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণের নিকট আদৃত হইয়াছিল।

রাজা তাহার উত্তোগী ছিলেন। একদিকে নৃত্য, গীত, বাজাদির সহিত বুদ্ধ-উৎসবের সম্বন্ধ, আবার অত্মদিকে প্রচুর আহ্বানের বন্দোবস্ত থাকায়, উৎসবের সর্বজনসুন্দর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বহু জনগণের চীৎকার বিপুল বাত্যাঙ্কমব্যাপারে “গর্জন”

উঠিত, তাই বোধ হয়, এই উৎসব কালক্রমে “গাজন” নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণই গাজন প্রতিষ্ঠা করেন।

বৌদ্ধধর্ম যখন তাত্ত্বিকতামূলক বহু দেবদেবী কল্পনার পুষ্টি প্রাপ্ত হইল, সেই সময় হইতে এই “গাজনে কাণ্ড”, বঙ্গের ধর্মব্যাপারে এক অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

বৌদ্ধগণ ধর্মপুজার সমস্ত নিয়ম-কথিত ভাবের রচনা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ পরী-কথিত ভাবার উপদেশ ও ধর্ম-গ্রন্থাদি-প্রণয়নে তৎপর হইয়াছিলেন। গাজন মহোৎসবের মন্ত্রাংশগুলিও সংস্কৃতে রচিত না হইয়া, প্রাচীন বঙ্গীয় পরীভাষায় রচিত দেখিতে পাই।

বৌদ্ধগণের গাজনব্যাপার পরী-কথিত ভাবার রচিত হইবার কারণ অঙ্গসন্ধান ও সেই

পল্লী-কথিত ভাষায় মন্ত্ররচনা  
বৌদ্ধগণই সর্বাশ্রম  
আবৃত্ত করেন।

মহাংশ আলোচনা কবিলে, দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-উৎসবের পূর্ণভাব  
উহাতে বিরাজিত রহিয়াছে। ধর্মপণ্ডিত রামাইএর ধর্মপূজা-  
পদ্ধতির অনুকরণ সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা আর বুঝিতে

বা কি থাকে না।

বীরভূম, বঙ্গমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, উৎকল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানের গাজনব্যাপার  
উৎকল হইতে মালদহ,  
দিনাজপুর পর্যন্ত, গাজনের  
একই প্রকার ভাষা  
দৃষ্ট হয়।  
ও মন্ত্রগুলি একই উদ্দেশ্যমূলক, একই ভাবজ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে  
পারি, গিনি বঙ্গের গাজনের মন্ত্রগুলির সম্মান লইয়া উহার  
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সর্বত্র সমান ভাব, সমান  
ভাষার অনুকরণ বা বিস্তার দেখিয়া গাজনে ব্যাপারের মূলদেশ  
দেখিতে পাইবেন, এ প্রকার বিবেচনা করা যায়।

সন ১৭১৬ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার “জাগের গম্ভীরা” নামক মালদহের  
শিবের গাজনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তৎপরে আমি এতাবৎকাল বঙ্গদেশের বিবিধ  
স্থানের গাজনের বিবরণ-সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলাম। এতাবৎ বহু পল্লীর শিব ও ধর্মগাজনের  
বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বুলিয়াছি, শিবের গাজন ধর্মের গাজনের পরবর্তী এবং শিবের  
গাজন, ধর্মের গাজনের পূর্ণ অনুকরণ মাত্র।

বৌদ্ধ-ধর্মোৎসবের ক্ষণ তাত্ত্বিকভাবস্থচক ধর্মের গাজনের বিলোপসাধন উদ্দেশ্যেই হউক  
গাজন বৌদ্ধ-উৎসব।  
অথবা শৈবধর্মাবলম্বী নিবন্ধব পল্লীবাসীর উৎসাহার্থেই হউক,  
প্রাচীন ধর্মের গাজনের অরূপ শিবের গাজনের উদ্ভব হইয়াছে,  
ইহা নিশ্চিতভাবে বলা দোষাবহ হইবে না। আমি গাজনের ইতিহাস সংগ্রহে যতই অগ্রসর  
হইতেছি, ততই যেন বৌদ্ধ-উৎসবের ভিত্তর প্রবেশ করিতেছি বলিয়া বোধ করিতেছি।

শিবের গাজনের উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে হয়, যেন সেনরাজগণের সময় ইহা পূর্ণভাবে  
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে সদাশিব  
সেনরাজগণের সময়ে শিবের  
গাজনের অভ্যাস হয়।  
মুদ্রা অঙ্কিত আছে। সেই সময়ে গাজন ব্যাপার—সদাশিব-উৎসব—  
বৌদ্ধধর্মের গাজনের ছাঁকে নিরক্ষর শৈবগণের উৎসাহার্থে  
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিতে হয়।

আজিও বহুস্থানের শিবের গাজনের পল্লীকথিত ভাষায় মন্ত্রগুলিতে, সদাশিব নামের  
ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। রাঢ়ে, বারেঙ্গে, একদিন রামাই  
গাজনের প্রথমে সদাশিবের  
পূজার আরম্ভ হয়।  
পণ্ডিতের শ্রুতপুণ্যধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হইত, সে ব্যাপার  
পালনরপতিগণের সময়ের বলিয়া একরকম স্থির হইয়া গিয়াছে।  
মহারাজ লক্ষণসেনের সময় হইতে শিবের গাজন, ধর্মের গাজনের অনুকরণে অনুষ্ঠিত  
হইতে আরম্ভ হইবার কারণ বিলক্ষণ বর্তমান আছে।

জাগের গম্ভীরা নূতন কলেবরে নীচ পৃষ্ঠাকারে প্রকাশিত হইবে, উহাতে শিব ও

দেবালয়, দেবগৃহ ইত্যাদি  
গম্ভীরা নামে খ্যাত ছিল।

বন্যের গাজনের সমুদায় কিরণ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে,  
সুতরাং এ প্রবন্ধেব কলেবর বৃদ্ধি করিয়া উহার সমুদায়  
ঐতিহাসিক অঙ্গসজ্জানের পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিয়া, বর্জমান-

জেলার শিবের গাজনের একটি আদর্শ প্রদান করিলাম।

সাধারণতঃ গম্ভীরা শব্দ এক্ষণে অপ্ৰচলিত শব্দে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ‘গম্ভীরা’  
শব্দ প্রাচীন বঙ্গে পরিচিত ছিল। গম্ভীরা দেবগৃহ বলিয়া সে কালে  
গম্ভীরা আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপ। সকলে অদগত ছিলেন, উৎকল হইতে বঙ্গপূর্ব দিনাজপুর পর্য্যন্ত  
স্থানে গম্ভীরা বর্তমান চণ্ডীমণ্ডপ বলিয়া জ্ঞান ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের গীতে একাদিকবার গম্ভীরা শব্দ চণ্ডীমণ্ডপক্ষে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

“গম্ভীবে এসিয়া যোগী ধ্যানে দিল মন।”  
পূর্বে ‘গম্ভীরা’ শব্দের বহু  
ব্যবহার হইত। “আপনাব কায়া ছাড়ি গম্ভীবে রাখিরা।  
মায়া কবি যাত্রা বৈলা দৈবজ্ঞ মাজিয়া।”

(গোবিন্দচন্দ্রের গীত)

“যোর গম্ভীরিতে যন ধন বস্তু বাজে।”

ঘটঙ্গ কপোল প্রভু অক্লান্ত মাজে ॥”

(মহাদেবক বন্দনা—উৎকল কবিকর্ণ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ‘গম্ভীরা’ গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা :—

“গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।

ভিতে মুখ শির ঘবে ক্ষত হয় সব ॥” ৬

গম্ভীরা আজকাল অপ্ৰচলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ, গম্ভীরা অধিকার করিয়া  
লইয়াছে।

আশানে পিণ্ডদানমন্ত্রেও দেখিতে পাই, লিখিত আছে, “এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ  
পথিভিঃ ॥ \*” ইত্যাদি।

বাহাই হউক, ‘গম্ভীরা’ আমাদের পল্লী-কথিত ভাষা হইতে লুপ্ত হইবার অন্ততম কারণ-

মধ্যে যোগ হয়, সে কালে গম্ভীরা-গৃহ ধর্মোৎসব বা বুদ্ধদেবালয়  
গম্ভীরা বৌদ্ধ-উৎসবের স্থান বুলিয়া বিবেচিত হওয়ায়  
উক্ত শব্দের লোপ। হইয়াও, বৌদ্ধ-বিশেষতঃ, উক্ত নাম লোপ পাইয়াছে। পাষাণী

নাস্তিক বৌদ্ধগণের মন্তকে পদাবত করিতেও চৈতন্যভাগবতকার ছাড়েন নাই। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ  
প্রভু কর্তৃক বৌদ্ধ-মন্তকে পদাবত দ্বারা চৈতন্যভাগবতকার বৌদ্ধবিশেষ ব্যক্ত করিয়াছেন।  
সেকালেও বৌদ্ধগণের প্রতাপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাহাই হউক, সর্বপ্রথমে ‘গম্ভীরা’ বৌদ্ধদের ভজন-গৃহ ছিল। সেই  
সময়ে “আত্মাদেবী” নামক এক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর অভ্যাস হয়।



শূন্যপুরাণে আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। মানদহের মাণিকদত্তের চণ্ডীতে শূন্যপুরাণীয় আত্মাকে ধর্মনিরঞ্জনের কন্যারূপে বর্ণনা কতিপয় প্রাচীন পুথিতে করা হইয়াছে। ব্রহ্মহরিদাসেব\* খণ্ডিত পুস্তকেও মাণিকদত্তের আত্মার উৎপত্তি-প্রসঙ্গ। ন্যায় আত্মার বর্ণনা দেখিতে পাই। এ বর্ণনা আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের বর্ণনা নহে। মনসাদেবী যজ্ঞপূজার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আত্মাকেও সেই প্রকার ব্যস্ত দেখি। হুসমান আদ্যাব 'দেহারা' নির্মাণ করিয়া দিলেন, কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা সর্কাদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদ্যা তপায় পূজা প্রাপ্ত হন। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে ইহা লিখিত আছে। এই আদ্যা (অতীশের—আধ্যাতার, বজ্রতার, চণ্ডী,—বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী) চণ্ডিকা হইয়া শিবকে বিবাহ করেন। আদ্যাদেবী বৌদ্ধচণ্ডীরূপে বৌদ্ধতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক পূজিতা হইতেন, কালে যখন শৈবধর্ম প্রবল হইয়া পড়ে, তখন বৌদ্ধ আদ্যাদেবীর 'দেহারা' ও শৈবধর্মের অবাধ প্রচার দৃষ্টে 'দেউলে' আত্মাদেবী গৌরীরূপে অধিষ্ঠিতা হন। এদেশে শৈবধর্ম বৌদ্ধগণের আতঙ্ক। প্রবল বেগে আত্মবিস্তার করিলে, বৌদ্ধগণের স্ব-সম্প্রদায়ের বিলোপ-সাধনের ভয় মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাহার একটা নমুনা নিম্নে দিলাম—

যথা :—“যদা ভবিষ্যকালে চ অত্র নেপালমণ্ডলে।

শৈবধর্মাঃ প্রবর্তন্তে তুর্ভিক্ষকো ভবিষ্যতি ॥

যথা যথা শৈবধর্মঃ প্রবর্ততেহত্র মণ্ডলে।

তথা তথা ॥ অত্যর্থং তুঃখপীড়া ভবিষ্যতি ॥

বৌদ্ধলোকগণা যেহপি শৈবধর্মঃ করিষ্যন্তি।

তে সর্বের কৃতপাপাশ্চ মরকঞ্চ গমিষ্যন্তি ॥” (স্বয়ম্ভূপুরাণ, ৮ম অঃ)

যে গম্ভীর ধর্ম-অধিকারীর জন্ত নির্দিষ্ট ছিল, কালে শৈবপ্রভাবের প্রাবল্যে তাত্ত্বিক শাস্ত্র-আত্মাদেবী বৌদ্ধচণ্ডী হইয়া গণের দ্বারা তাহা “আত্মার গম্ভীরা” হইয়া পড়িল। যে গম্ভীরার ক্রমশঃ পৌরাণিক দুর্গা ॥ তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ-পূজিত আত্মাদেবী বিসর্জ করিতেন; পার্কীতে পরিণত হইয়াছেন। তাহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করিয়াই, তাত্ত্বিক শাস্ত্রগণ দ্বারা ‘আত্মার গম্ভীরা’ বলিয়া তাহা কথিত হইতে থাকিল। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ ফাঁপরে পড়িলেন। আত্মাদেবী যে চণ্ডিকা তাহা তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণই স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং শৈব বা শাস্ত্রগণ বেশ সহজে “আত্মার গম্ভীরা”কে নিজস্ব বলিয়া অধিকার করিলেন।

“ভরমিতে ভরমিতে পরতুর পড়ে গেল ঘাম।

তাহাত জনমিল আত্মা দুর্গা জার নাম ॥ ১৩০ (শূন্যপুরাণ হৃটিপতন ১৩ পৃঃ)

“ডাক দিআ বোলে আত্মা মধুর বচন ॥” ১৭৩ ঐ হৃটিপতন ১৭ পৃঃ

“কি দিএ রাখিআ গেলে যোলেস্ত পার্কীতী ॥” ১৭৪ ঐ ঐ

তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ হিন্দু-দেবদেবীর সম্মান করিতেন, এটা কেবল একত্র বাস-জনিত অভ্যাস-

বশতঃ এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম হইতে যে বিভিন্ন নহে, ইহাও দেখান অন্যতম বন্ধের ক্ষীণ বৌদ্ধধর্মের, শৈব- উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতেই তাঁহাদের সন্ধান হইয়া

■ ধর্মের আয়ত্তাগ। গিয়াছে। বৌদ্ধ-ছাঁচে নূতন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম গঠন করিয়া, কোশলে নির্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্মদীপ-শিখা হিন্দুধর্মালোকে বিলীন করাই উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তাহাই হইল।

সেনবংশীয় রাজত্বকালের পূর্বে “ধর্মের গাজন” হইত ; কিন্তু রামাই পণ্ডিত ধর্মের গাজনে ধর্মের গাজনে পৌরাণিক দেব- হিন্দু দেবদেবীকে বসাইয়া ধর্ম (বুদ্ধ)কে উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। দেবীর আগমন-স্থচনা। বাস্তবিক এই হিন্দু দেবদেবীগণকে গাজনে ডাকিয়া আনিয়া রামাই ভাল কাজ করেন নাই।

প্রথমে হিন্দু দেবদেবীগণ ধর্মের গাজনে দর্শকরূপে আগমন করিয়াছিলেন। লোভবশতঃ হিন্দুদেবদেবীগণ ধর্মগাজনের শেষে ধর্মের স্থান অধিকার এবং ধর্মকে গাজনের নায়কত্ব হইতে দর্শকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বিতাড়িত কবিয়া স্বয়ং শিব গম্ভীরে বসিয়া পড়িলেন এবং গাজনের সমুদায় স্বত্ব নিজের বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িলেন না।

রামাই পণ্ডিত বলিয়াছেন— “বলদ বাহনে হর করিয়া সাজন।

সহিত গমনে জাইলা ধর্মের গাজন ॥” ৪

অর্থ যব দেখা। ( শৃঙ্গপুরাণ ৩৫ পৃষ্ঠা )

পূর্বেই আত্মাদেবী চণ্ডী বা তুর্গা রূপে ধর্মের সংসারে প্রবেশ করিয়া, পরে হর-অন্ধাঙ্গিনী গোঁরী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর “বলদ বাহনে হর” যখন ধর্মের গাজনে আসিলেন, তখন—

“যম, জামাই তাগনা”

“এ তিম মছে আপনা ॥”

দর্শক শিব গোঁরী বা আত্মাকে জামাই হর ( বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা লোকেশ্বররূপে ) গোঁরী ( চণ্ডী, তায়ী বা আর্ষাতা )-কে বামে লইয়া গাজনে বসিয়া ( চণ্ডী, তায়ী বা আর্ষাতা )-কে বামে লইয়া গাজনে বসিয়া কাজ করিলেন। পড়িলেন। ধর্মের আসন অনেক পল্লীতে শূন্য হইল। গম্ভীর হরগোঁরীর স্থান হইল।

শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়— “যুগাদিকৃৎপূর্ণাবর্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ ॥”

গম্ভীর,—শিবের একটি নাম ; সূত্রাং গম্ভীর বা গম্ভীরালয় বা শিবালয় তাহার প্রমাণ গম্ভীর অর্থে শিবালয় জন্ত শিবকে ব্যক্ত হইতে হইল না। ধর্মের গম্ভীর—আত্মের বখাইল। গম্ভীরায়, পরে হরগোঁরীর গম্ভীরায় পরিণত হইল।

মালদহে আজিও শিবের গাজনকে ‘গম্ভীরাপূজা’ বলিয়া থাকে।

বর্ষাকালের অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামে বাবা ঈশানেশ্বর অতিশয় জাগ্রত দেবতা, তাঁহার গাজন-উৎসবে যথেষ্ট সন্মানীয় সমাগম ও ব্যয় হইয়া থাকে। বাবা ঈশানেশ্বর দেবের পল্লী-কথিত বস্ত্র-মধ্যে দেখিতে পাই, কথা :-

মালদহের গভীরা উৎসব এদেশে  
পূবে গভীরাপূজা বলিয়া  
প্রচলিত থাকিলেও, বর্তমানে  
গাজন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

“গাজনে আছেন ধর্ম অধিকারি  
তাব চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥”

এবং

“গভীবে আছেন ভোলা মহেশ্বর  
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥”

সুতরাং মনে হয়, ধর্ম-অধিকারীর গাজনে “গভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।” আজিও সেই ধর্মের গাজন দেশের লোকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারেন নাই। ধর্মের গাজন পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের গাজন হইয়াছে এবং শিবালয় আজিও অপ্রত্যক্ষ ভাবে ‘গভীরা’ নামে কথিত হইয়া থাকে।

পূর্বকালে রামাই পণ্ডিতের সময়ে ধর্মের গাজনে—

“বলদ বাহনে হর করিআ সাজন”

উপস্থিত হইতেন, তাহাব কিছু পবে গভীরার শিবের গাজনে ধর্ম-অধিকারীর আগমন হুচিত হইতেছে। কাল মাত্ৰায়া বলিতে হইবে। ধর্ম আপন অধিকার হারাইয়া এক্ষণে শিবের গাজনের এক জন দর্শকরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

বর্তমান কালে রাঢ়দেশের অধিকাংশ পল্লীতে শিব ও ধর্মের গাজন স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন স্থানে ধর্ম-প্রাধান্ত্য এবং কোন স্থানে হব-প্রাধান্ত্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মপূজকদিগকে ডোমবং করা হিন্দুগণের কোশল। একদিন প্রিয়দর্শী অশোকের অনু-  
বোধগণ, গুরুদ্বন্দ্বাবলম্বিগণকে শাসনে বোধদ্বন্দ্বাবলম্বিগণ বাতীত সকলকে “পাষণ্ডী” বলা হইয়াছিল, পাষণ্ডী বলিত, পরে হিন্দুগণ কালে হিন্দুশাস্ত্রে আবার বোধগণকেই পাষণ্ডী বলা হইয়াছে। বোধদ্বন্দ্বকেই পাষণ্ডী বলিল। বেদনার্গ-নিবোধী পাষণ্ডী-ধর্মাবলম্বী বলিয়া ধর্মপূজকদিগকে ডোম এবং হীন জাতিতে পরিণত হইতে হইয়াছে।

গাজনের পূজককে ‘গাজনে শিবের গাজনের পূজককে “গাজনে বামুন” বলে, ব্রাহ্মণ হইলেও বামুন’ বলে, ব্রাহ্মণ-সমাজে সমাজে তাহাদিগকে বড়ই হীনতা স্বীকার করিয়া থাকিতে হয়। তাহার নীচ হীন অধিকার রাঢ়ের ‘ধর্মরাজপূজা’ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছে।

ইচ্ছা রহিল।

### গাজনের বিবরণ

বর্তমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন গ্রামের ঈশানৈশ্বর্য দেবের গাজন সম্বন্ধে আলোচনা  
বর্তমান জেলার কুড়মুন-পলাশী গ্রামস্থ হইলাম। এদেশের শিবের গাজন প্রায়ই একপ্রকার  
গ্রামের শিবের গাজনের নিম্নের অধীন, তাহা হীনভেদে কিঞ্চিৎ ভেদও পরিলক্ষিত  
বিবরণ। হইয়া থাকে। সুতরাং কোন এক স্থানের গাজনের পরিচয় প্রদান  
স্বাভাবিক গাজনের পরিচয় হইবে মনে করি।

## কুড়মুন গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া কুড়মুন গ্রাম ৩০০০ বর্ষ পড়িয়াছে। খড়ী নদীৰ অনতি সন্নিকটে এই গ্রাম অবস্থিত। এই মোহন রাযের ষষ্ঠমালয়। পল্লীতে রাজা রামমোহন রাযের ষষ্ঠরবাড়ী ছিল বলিয়া, প্রাচীনেরা গল্প করিয়া থাকেন।

বল্লালী আমলে গোড়বাসী স্বৰ্ণবণিক্গণ রাজাকর্তৃক অপমানিত হইলে পর, তাঁহাদের মধ্যে বল্লালী সময়ে গোড়ের স্বৰ্ণ-অনেকেই এই গ্রামে আগমন করেন এবং সৰ্ব্বপ্রথমে তাঁহারা ই স্বৰ্ণিক্গণ কুড়মুনে আগমন করেন। বৰ্ত্তমানে তাঁহারা এই গ্রামের একমাত্র অদিবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই গ্রামে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। সম্ভ্রতি একট পুস্তকবিশীৰ পঞ্চোদ্ধারকালে বাহুবীকায় নামক যে হরগোবীমূৰ্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। চুঁচুড়া, বরাণডাঙ্গার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ স্বৰ্ণবণিক্গণের পূৰ্বনিবাস কুড়মুন ছিল। এমনও শুনা যায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পূৰ্বপুরুষের নিবাসস্থান কুড়মুন। বর্গীর হাঙ্গামাব সময় স্বৰ্ণবণিক্গণ কুড়মুন ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ স্থানান্তরে গমন করেন।

এই গ্রামে সেই সময়ে “উগ্রকজ্রিয়”-উপাধিক এক সম্প্রদায় বাস আবৃত্ত করেন। খড়ী নদীর তীরে “কল্মীশায়রদহ” সমীপে হলপ্রবাহকালে এক “ত্রিশীর লিঙ্গ” বাহিব হয়, লিঙ্গটী বাবা ঈশানেশ্বর দেব। প্রস্তরের। সেই ত্রিশীর (ত্রিশূলাকৃতি) লিঙ্গটী বহুকাল হইতে প্রাপ্তির কারণ। বাবা ঈশানেশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত উগ্র-কজ্রিয় বংশীয়গণ ঈশানেশ্বর দেবের মূল সেবাইত ও গ্রামের মণ্ডল। মালদহের জায় এখানে মাণ্ডলিক পদ্ধতির প্রচলন ছিল, অবগত হওয়া গিয়াছে।

মালদহের “পুণ্ড্রকজ্রিয়”গণের সহিত “উগ্রকজ্রিয়”গণের নৈকট্য আছে বলিয়া বোধ হয়। মণ্ডলবংশীয়গণ সম্ভবতঃ শৈব স্বৰ্ণবণিক্গণের আশ্রয়ে এদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। প্রাচীন ঈশানেশ্বর দেবের মন্দিরটী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বৰ্ত্তমান সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দিরটী শতাব্দিক বংশরের পুৰাতন, তাহা মন্দির-সংলগ্ন ইষ্টকলিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

## বাবা ঈশানেশ্বরের গাজন

গ্রামে ধর্ম্মের দেহারা আছে এবং তাঁহারাও গাজন হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশানেশ্বরের গাজনের উৎসব অত্যধিক হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের ১৩ই তারিখ হইতে ঈশানেশ্বর দেবের বার দেওয়া বাবা ঈশানেশ্বর দেবের হয়। কুড়মুন গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের শিবের গাজন গাজনের বিষয়ণ। স্বয়ং দেখিয়াছি, তন্মধ্যে পলাশী (সোনা পলাশী)গ্রামের বুড়া-শিবের গাজনও উল্লেখযোগ্য। এই পলাশী গ্রামে স্বর্গীর মেভারেও লালবিহারী দেব প্রাচীন বাসস্তান অগাণি দৃষ্ট হয়। দে মহাশয়ের দুই খানি স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুস্তক এই পলাশীর গ্রাম

চিত্রাবলম্বনে লিখিত। বুড়াশিবের স্মৃহং মন্দির ও নাটমন্দির শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। কুড়মুন ও পলাশীর গাজনের নিকট সম্বন্ধ আছে।

কুড়মুন গ্রামের উগ্রকন্ত্রিয়বংশীয় ৮মস্তোষ মণ্ডলের পুত্র ৮শকর এবং তৎপুত্র ৮দুর্গাচরণ গ্রামের মণ্ডল উগ্রকন্ত্রিয় জাতীয় এবং তৎপুত্র ৮রামচরণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজুদাস মণ্ডল শ্রীবিজুদাসমণ্ডল। মহাশয় গ্রামের মণ্ডল এবং ঈশানেশ্বর দেবের দেবোত্তরভোগী কৰ্ম্ম-কর্ত্তা। তাঁহার নিকট আমি বাবা ঈশানেশ্বরের পল্লীকথিত ভাষায় শিবপূজাবিধির যে বন্দনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমার মূল আলোচ্য বিষয় হইলেও গাজনের প্রাণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চৈত্রমাস ত্রিশ দিনে হইলে ২৬শে চৈত্র তারিখে শিবব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসিগণকে নিরামিষ-

ভোজী হইয়া থাকিতে হয়। তৎপর দিবস ২৭শে চৈত্র মহা-  
টংসবারত। হবিষ্যার দিবস। এই দুই দিবসেই

### সন্ন্যাসী-ধরা

পৰ্কে সম্পাদিত হইয়া থাকে। উত্তরীয়স্বরূপ স্ত্রুগুচ্ছ কুশ সংবদ্ধভাবে গলাদেশে সন্ন্যাসী-ধরা বা কোটা-বেওয়া ধারণ কবিত্তে হয়। পূর্বেকার ‘সন্ন্যাসী-ধরা’ পর্কের অন্তর্ধান ‘টাকা-পান’।

আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ধর্মপূজায় যেমন বার ধরিয়া কার্য্যারম্ভ হয়, ইহাতে দিন তারিখ ধরিয়া কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে।

“শুক্লাবার দিনে গো বিশ্বর করিব হবিস্য।

ভাজা গোড়া পরপাক না খাব আমিষ্য ॥”১ ( ৪২ পৃষ্ঠা শূন্য-পূরণ )

শিবের গাজনে ২৬শে ও ২৭শে তারিখে “উত্তরীয়ধারণ” ব্যবস্থা আছে। ধর্মের গাজনের “টাকাপানের” ( কোটা-দেওয়া বা সন্ন্যাসী-ধরা ) ইহার অনুরূপ।

“সোল সাস্তি লব লাভ বাহত্তরি কোটা।

সনিবারে নিঅ এছি নিঅমর কোটা ॥” ১১ ( ২৭ পৃষ্ঠা শূন্য-পূরণ )

শিবের গাজনে কোটার প্রচলন এক্ষণে সর্বত্র দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু ধর্মপূজক সন্ন্যাসীদের ম্যায় স্ত্রুগুচ্ছের উত্তরীয় গ্রহণ করিতে হয়।

সকল জাতিই শিবের সন্ন্যাসী-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে।  
শিব-সন্ন্যাসীর ত্রৈবিভাগ।

তাহাদের মধ্যে মানসিক ■ কৌলিক দুই প্রকার প্রণা আছে।

ইহাদের মধ্যে

( ১ ) অশান সন্ন্যাসী,

( ২ ) ধূল সাপট,

( ৩ ) জল সাপট,

( ৪ ) মূল সন্ন্যাসী,

( ৫ ) মানসিক,

সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকের গাজনে পৃথক পৃথক কার্য নির্দিষ্ট আছে। হবিষ্যের দিবস কুড়মুনের সন্ন্যাসিগণ বাঙভাঙ ও নৃত্যসহকারে পলাশী গ্রামে গমন করিয়া তথাকার সন্ন্যাসিগণের সহিত আলিঙ্গনাদি সমাপন করিয়া থাকে। কুড় পাকীতে স্বতন্ত্র “গাজনে শিব” বহন করিয়া লইয়া যায়। তৎপৰ দিবস

### ফল

ফলের দিবস অপরাহ্নে সমুদায় সন্ন্যাসী বিচিত্র বর্ণরাগে দেহ চিত্রিত করিয়া থাকে। চিত্রকর গটিকা, হরিতাল, সিন্দূরাদির বর্ণে তাহাদের মুখমণ্ডল চিত্রবিচিত্র করিয়া দেয়। ভূত, প্রেত, ত্রিনেত্রবিশিষ্ট বহুবিধ মূর্তিমান হইয়া বিবিধ বর্ণের কাগজের ফলের কথা। মালা গলায় দিয়া এবং প্রত্যেকে এক একখানি তরবারী (বর্তমান কালে ভোতা তরবারী ও চেচাবী) লইয়া শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করিয়া ঢকাবাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। কালীঘাটে নীলপূজার দিবস প্রাতে যে প্রকার উৎসব হয়। কলিকাতার জেলপাড়াব সংএর মত, শাস্তিপুরে শিবের বিবাহের মত একটা শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া থাকে। মালদহের আত্মের গম্ভীরার নৃত্যব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধ; কিন্তু ইহা উহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

ফলের দিবস পলাশী গ্রামের সন্ন্যাসিগণ কুড়মুনে আগমনপূর্বক আলিঙ্গনাদি করিয়া যায়। ২৪পরগণায় টালিগঞ্জের বড়াশিবের তলায় নীলের পূর্ববীত্রে বহুস্থানের সন্ন্যাসী একত্র হইয়া এই প্রকার নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে।

### শ্মশান-জাগান

নৃত্যগীতাদি অন্তে সন্ধ্যার সময় খড়ীনদীতীরে যে স্থানে ঈশানেশ্বর পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া অনেকে প্রণাম খাটে এবং পর দিবসের জন্য সন্ন্যাসিগণের শ্মশান-জাগান। শবমুণ্ড সিন্দূরলিপ্ত মস্তপূত করিয়া রাখে। ইহাকেই “শ্মশান-জাগান বলিয়া থাকে।

### উপোস

২৯শে তারিখে উপবাস কবে। এই দিবস রাত্রে পূজাদি ব্যাপারের পর শবমুণ্ড লইয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়। ঢকাবাদ্যসহকারে উন্মুক্ত রূপাণ-হস্তে সন্ন্যাসিগণ শবমুণ্ড লইয়া “ধর্ ধর্ ধর্ মড়ার মাথা” বলিয়া পৈশাচিক নৃত্য করিয়া থাকে।

অনেকে ধূনা পুড়াইয়া থাকে। শেষ রাত্রে অগ্নি-উৎসব হয়।

### ফুল-ভাঙ্গা বা ফুলখেলা

কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাহার উপর দিয়া ফুলখেলা বা অগ্নিকীড়া। লক্ষাদি প্রদান ও বিবিধ প্রকার অগ্নিকীড়া হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গাজনেও ইহার প্রচলন আছে।

“হাথত পাএর্থ বাঁধিএ ফেল আগুনির উপর ।

সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তৎপব ॥১২

হাথত গলএ বান্দি ফেল আগুনির উপর ।

পুড়া লইআ জাএ রামাই সত্তরে করতার ॥১৩

হেমসীতল আগুণ হইল তথি পর ।” ১৪ ( ৫০ পৃঃ শূন্য-পুরাণ )

শিবের গাজনে উর্কে পদবন্ধন করিয়া মন্তকের নিয়ে অগ্নি প্রজ্বলনপূর্বক ধনাচরণ  
নিষ্ক্ষেপ সহকারে দোল দেওয়া যায়, ইহা তাহার অনুরূপ ।

“উর্কে বান্দি পদয়ুগ ভূমে লুটে মুণ্ড ।

‘যেখানে উজ্জল হ’য়ে অলে যজ্ঞকুণ্ড ॥” ( শ্রীধর্মমঙ্গল—বনরাম )

শিবব্রত কৃচ্ছ সাধা হইলেও ধর্মব্রতের অনুরূপ বলিয়া মনে হয় ।

### চড়ক

চড়করত ।

বর্তমান কালে আঠন দ্বারা নিষিদ্ধ বলিয়া আর এ উৎসবেব  
অনুষ্ঠান হয় না ।

### মাণ্ডলিক পদ্ধতি

ফল, উপবাসাদির দিবসে সন্ধ্যার পর যখন সমুদায় সন্ন্যাসিগণ স্নানান্তে “কালো পুষ্প”  
লইয়া জাতিনির্কির্শেষে ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া এক পংক্তিতে উপবেশন  
মাণ্ডলিক পদ্ধতি ।

পূর্বক “গাজুনে ব্রাহ্মণ” দ্বারা “গাজুনে শিব” মন্তকে স্পৃষ্ট করান হয়  
এবং তৎপরে মণ্ডল, বর্তমান কালে শ্রীবিষ্ণুদাস মণ্ডল, তাঁহাদের বংশাবলীক্রমে পঠিত  
বন্দনা ও কতিপয় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । এক্ষণে সেই বন্দনা বা প্রণামনামক পল্লীকথিত  
প্রাচীন গদ্য-পদ্যে গ্রথিত বন্দনার পরিচয় প্রদান করিব ।

মণ্ডল মহাশয় সন্ন্যাসীপরিবৃত বৃত্তমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, তালে  
তালে ঢকাবাঁজ সহকারে সন্ন্যাসিগণ তাহা আবৃত্তি করিয়া শিবপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান করিয়া  
থাকেন । প্রথমে—

### দ্বারগুক্ত

( ১ )

প্রাচীন মাণ্ডলিক শিবপূজা-  
পদ্ধতির পল্লী-কথিত ভাষার  
বন্দনা ।

তাতে ত্রিশূল রাঙ্গা লাটী, পরিধানে বাঘের ছাল ।

বৃষভ বাহনে শিব, ত্রিদশের নাথ ।

জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল ।

মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্বদ্বার ।

এই প্রকারে একাধিক ক্রমে ছয় দ্বারগুক্ত বন্দনা গাইতে হয় । ছয় দ্বার বলিলে কুবিভে  
হইবে চারি দিক্-দ্বার এবং স্বর্গ ও গাজনের দ্বার । প্রত্যেক দ্বার-বন্দনা সমাপ্তির সহিত ঢকা-

বাণ ও “নাম ডাকিতে” হয়। এই “দ্বারমুক্ত” অনুষ্ঠানটি শূন্যপূবাণোক্ত “দ্বারমোচনের”  
অমুরূপ

“দ্বার ছাড় দ্বারী সহিত কটাল।

তক্ষা দরসনে দেখা শ্রীধর্ম্যর দ্বার ॥” ৯ (শূন্য-পূরাণ ৩৯পৃঃ)

শূন্য-পূরাণে “পঞ্চম দ্বার” মুক্তের কথা আছে এবং

“গুরুডেক মুক্ত কৈল গাজন দ্বারে।” ১৭ (শূন্যপূরাণ ৩৯ পৃঃ)

বলিয়া “গাজনের দ্বার” মুক্তের প্রসঙ্গ আছে। বর্তমান আলোচ্য দ্বারমুক্তে

“মুক্ত হইল ঠাকুরের গাজনের দ্বার।”

বলিয়া প্রচলিত আছে।

## দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

নিজাভঙ্গ

( ১ )

প্রভু ধোঁগনিদ্রা কর ভঙ্গ,

সেবকের দেখ বঙ্গ, পরিহব তোমার চরণে।

( ২ )

কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিজাভোগে,

আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে।

( ৩ )

নিদ্রা ত্যজ দেববাজ, বহ মা খট্টার মাঝ,

নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে।

( ৪ )

প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্ম করে স্তুতি

অন্য দেব কোন খানে লাগে।

( ৫ )

প্রভু ত্যজহ নিদ্রের মায়া, সেবকের কর দয়া

পুরামর্ত দেব ত্রিপুরারি।

( ৬ )

শিক্ষা ডব্বর হাতে, বৃষভ রাখহ বামভাগে,

বান্ধকী রহক ফণা, শিরে ধরি সিদ্ধ গঙ্গা,

কপালে চন্দন চাঁদ বেরি,

ওধি মধ্যে শোভে কোঁটা, হাড় মালা যোগপাটা

বসন শোভে বিভূতি ভূষণ।



( ৭ )

প্রভু দেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,  
নরের শক্তি, আমরা তোমার আস্তা করি,  
শাল খুলে ভর করি ।  
আগম নিগমে কয়, প্রভুদেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর,  
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয় ।

( ৮ )

নৃষভ বাহনে শিব, তোজহে কৈলাসগিরি,  
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরাবি ।  
গম্ভীবে করহ অধিষ্ঠান । তোমাব চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ।

মালদহেও এই প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । যথা :—

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ ।  
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥  
খোল চন্দন কাঠের কপাট দেয় দুধ গঙ্গাজল ।  
তোমার চরণে ছাদশ প্রণাম ॥

( আশ্রের গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ )

### ধূল সাপট ভক্তা

নামক সন্ন্যাসী মন্তকে ছই হস্ত মুষ্টিবদ্ধভাবে উপযুগপরি রাখিয়া একপদে ঢঙ্কাবাত্ত সহ  
নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিলে, মণ্ডল তাহাকে নিম্নলিখিত বন্দনা পাঠ করান ।

( ১ )

গোসাঞ তুমি যেন অটিসিনী, যেন বাটিসিনী, বাটিসিনী যেন পঞ্চবাটিসিনী, পঞ্চবাটিসিনী যেন  
ধর্ম-অধিকারী । ধর্ম-অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ, একাদশ রুদ্র, সপ্তসমুদ্র পার, তার দিকে  
বলুকা-সমুদ্র । তার কীকরের কীকর ধূল সাপট ভক্তা ।

( ২ )

আপন চুল দিয়া ধূল মার্জনা করিবে । ঠাকুরদের আস্তা হইল স্বর্গের ধূল স্বর্গে যায় ।  
মর্ত্যের ধূল মর্ত্যে যায়, বাদবাকি ধূল বাবার ভাঙামে বাক ।

তৎপরে চতুর্দিক হইতে সন্ন্যাসিগণ সমন্বয়ে বলিয়া উঠে—

“জয় ধূল সাপট ভক্তার জয়”

সেই সময়ে ঢঙ্কাবাত্ত সহকারে ধূল সাপট ভক্তা ধূলার মুঠান আদর্শ করে ।

তৎপরে

## জল সাপটভক্তা

মন্তকে একটা ক্ষুদ্র জলপাত্র রক্ষাপূর্বক দুই হস্তে ধারণ করিয়া, একপদে নৃত্য করিতে কল্পিতে আগমন করে। জল সাপটভক্তাকেও “গোসাঞ তুমি যেন” ইত্যাদি বন্দনা গাইতে হয় এবং বলিতে হয়—

“স্বর্গের জল স্বর্গে যায়।

মর্ত্যের জল মর্ত্যে যায়।

বাদ বাকি জল বাবার ভাণ্ডারে থাক।”

ইহার পরেই সমবেত সন্ন্যাসিগণ বলিয়া উঠেন, “জয় জল সাপটভক্তার জয়।”

## বল্লুকা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা

বলার প্রয়োজন-বোধে বলিতে হইল। “বল্লুকাসমুদ্র” শৃংখ-পুরাণে দৃষ্ট হয়। বল্লুকার ভীমে ধর্মনিরঞ্জন যোগধ্যানে যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

“তিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিআ।

বল্লুকা স্বজন কৈল গণ্ডীবোখা দিআ ॥ ১৪৭

সিরজিল বল্লুকা নদী বল্লুকাব জল।

উল্লুক বলিআ দিলা সে তপস্তাব খল ॥” ১৪৮ ( ১৫ পৃঃ শৃংখ-পুরাণ )

“বল্লুকা নদী” সম্বন্ধে বর্ধমানের উত্তরাংশে শুষ্ক নদীগর্ভ দেখাইয়া অনেকেই উহাকে “বল্লুকা নদী” বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, বল্লুকাভীর্ষে ধর্মের প্রথম অভ্যাস হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কুডমুন শিববন্দনায় বল্লুকা-প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, শৃংখ-পুরাণীয় মতবাদের উপর এই শিবপূজা প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শৃংখ-পুরাণীয় “জলপাবন” অমুষ্ঠানের সহিত বর্তমান আলোচ্য “জলসাপটভক্তা”র সম্বন্ধ বর্তমান আছে।

“স্বনার কলসি নিল নেতর বসম।

জল আনিতে বসুআ আপনি করিলা গমন ॥১

তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।

বল্লুকার তটে গিআ দিলা দরসম ॥২” (শৃংখ-পুরাণ—জলপাবন ২২পৃঃ)

## ঘর দেখা ও চারিচারে প্রণাম

( ১ )

পূর্বে পূর্বাংগে তার ঘরে, ঘরবারে, কে পারে, সিংহবারে, র বারে, তাষাদিপাত্রে, বিপক নামে, মোর উর্দ্ধ ঘরন। স্বয়ং বৃত্তান্ত, পূর্ববারে নমঃ শিবায় নমঃ।

চক্ৰাবাসহ সন্ন্যাসিগণের প্রণামকরণ, ও “নাম ভাকা”।

( ২ )

উত্তরে বহুতি বহু পরে তার দ্বারে ■ ■ ইত্যাদি  
উত্তর দ্বারে নমঃ শিবায় নম ।

( ৩ )

পশ্চিমে হুমুখণ্ড নামে ; তার দ্বারে ■ \* ইত্যাদি  
পশ্চিম দ্বারে নমঃ শিবায় নম ।

( ৪ )

দক্ষিণে ভবরূপেশ্বর নামে, তার দ্বারে : : ইত্যাদি  
দক্ষিণ দ্বারে নমঃ শিবায় নম ।

### দিকুবন্দনা

( ১ )

দেউল বন্ধন, দেহারা বন্ধন, পাঠ পাঠ লাঠা বন্ধন,  
আত্মের তুলসী বন্ধন, আর বন্দ সরস্বতীর গান,  
ডাইনে বন্দ রামলক্ষণ, সীতা বামে বীর হুমুমান ।  
পূর্বে আছেন ভানু ভাস্কর, তাঁর চরণে কবি পঞ্চ প্রণাম ॥

দিকুবন্দনায় এই শ্লোকটির আভাষ শৃংখ-পুরাণেও দৃষ্ট হয় ।

যথা :—“ডাইনে ডুমুর সাই বামে হুমুমান ।

কর জোড় করিআ ছই পাত্র বুঝান ॥”৩

ইহার অনুরূপ—( আত্মের গন্তীরা হইতে )

“জল বন্দ স্থল বন্দ বুঢ়াশিবের গন্তীরা বন্দ  
আর বন্দ সরস্বতীর গান,  
বান্ধরা বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম ।

( ১ম সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ )

অন্য একটা—

“জল বন্দ স্থল বন্দ আত্মের গন্তীরা বন্দ ।

ডাইনে ডুমুর বন্দ বামে বীর হুমুমান ।

সিংহ বাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥”

( ঐ, আত্মের গন্তীরা )

সুতরাং সহজেই মনে হয়, স্বামভেদে বন্দনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র । মূলে সমুদায়  
এক ভাব বহন করিতেছে ।

( ২ )

দেউল বন্দন \* \* ইত্যাদি ।

উত্তরে আছেন ভীম কেশব

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

অনুরূপ যথা :—

পশ্চিম দোয়াবে আছে ভীম একাদশ

তার চরণে প্রণাম ॥ ( ঐ—আত্মের গভীরা )

( ৩ )

দেউল বন্দন \* \* ইত্যাদি ।

পশ্চিমে আছেন আকর বৈষ্ণনাথ ।

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ৪ )

দেউল বন্দন \* \* ইত্যাদি ।

দক্ষিণে আছে জয় জগন্নাথ

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

অনুরূপ যথা :—

মোকৈ মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়াব ।

দক্ষিণ দোয়াবে আছে জয় জগন্নাথ । ইত্যাদি

( ঐ—আত্মের গভীরা )

( ৫ )

দেউল \* \* ইত্যাদি

স্বর্গে আছেন ইন্দ্ররাজ,

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ৬ )

দেউল \* \* ইত্যাদি ।

পাতালে আছেন বামুকী নাগ ।

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ৭ )

দেউল \* \* ইত্যাদি ।

দ্রোমে আছেন বাস্ত দেবতা ।

তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ৮ )

দেউল \* \* ইত্যাদি ।

গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর ।

তঁার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ৯ )

দেউল \* \* ইত্যাদি ।

গাজনে আছেন ধর্ম অধিকারী ।

তঁার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

( ১০ )

দেউল \* \* ইত্যাদি ।

গাজনে আছেন ছন্ডের সাঁই

বাছান্ডর ভক্ত ।

তঁার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম ॥

প্রত্যেক বন্দনার শেষে সরাসরী বা ভক্তগণ প্রণাম পাটয়া থাকেন ।

## সদাশিব প্রণাম

শঙ্করাচার্য্যকৃত সদাশিবের স্তব পাঠ চাইয়া থাকে ।

## আদেশ

জোড় হস্তে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে হয় ।

গোসাঞ তুমি যেন অটমিনী ইত্যাদি ।

আবাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঁঞ, বাতর ভক্তা ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন । ঠাকুরদের কি আজ্ঞে হয় ?

ঠাকুরদের আজ্ঞা হইল—পঞ্চ প্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন । তোমরা নেচে কুদে ঘরে যাও ।

“শিবের মাথায় চাঁপার ফুল ।

ভক্ত নাচে ওড়ের ফুল ॥”

ভক্তগণ ঢকাবাগের সহিত সুমবেত নৃত্য করিয়া এবং নাম ডাকিয়া গৃহে গমন করে ।

## পরিশিষ্ট

( ১ ) ধূনা পুড়ান । ( ২ ) হোমযজ্ঞ । ( ৩ ) মুক্তিমান ( উত্তরী-মোচন ) । ( ৪ ) বৈতরণী ।  
( ৫ ) শিবযজ্ঞ ।

## (১) ধূনা জ্বালা

সাধারণতঃ মানসিক কবিরা যানাস্তে সন্ধ্যাকালে নূতন সবায়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ধূনা-চূর্ণ নিক্ষেপ করা হয় । মস্তকে ও দুই হস্তে সরা বাগিয়া স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ধূনা জ্বালান হয়, সচরাচর ধূনা জ্বালাব বিশেষ কোন মন্ত্র নাই ।

“গঙ্গা জল দিয়া স্নান কৈল ধূনাচুর ।

চন্দন কাট তাহে দিলাম প্রচুর ॥ ৮

চন্দন কাট দিলা যুত ধূনা দিয়া ।

বন্ধ অগ্নি দিয়া রামাই দিল জ্বালাইয়া ॥” ৯

( শৃং-পূরণ—ধূনা জ্বালা ৬৭৬৮ পৃঃ )

ধূনা জ্বালাইবার সময় স্ত্রীগণ সচরাচর পুলকোলে কবিয়া ধূনা পুড়াইয়া থাকেন ।

## (২) হোমযজ্ঞ

পূজাদি উৎসবাস্তে গথাবিধি হোমকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । হোমকার্যটি যজ্ঞের শেষ পূর্ণাহুতি মাত্র । তৎপরে “যজ্ঞফোঁটা” প্রদান করা হয় । এই ব্যাপার বৌদ্ধ-বিষয়ান্তর্গত নহে । হোমযজ্ঞব্যাপারটি আমাদের হিন্দুধর্মের অঙ্গ-বিশেষ ।

## (৩) মুক্তিমান ও উত্তরী-মোচন

যজ্ঞাদি সমাপনান্তে ভক্তগণ একত্র তৈল হরিদ্রাদি মাখিয়া শিবনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জ্ঞানে গমন করে এবং জ্ঞানকালে স্ত্রীপুরুষগণ গলগল উত্তরী মোচন করিয়া থাকে । সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, দুস্ত কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই মুক্তিমানে ভক্তগণের সহিত যোগ দিয়া জ্ঞান করিলে, ভগবানের রূপায় ব্যাধিশোক-মুক্ত হইয়া থাকে । এ ভাব সম্ভবতঃ ধর্মপূজার মুক্তিমান হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে । কারণ দেশে ধর্মপূজার মুক্তিমানেও এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় এবং উহাই শিবের গাজনের অঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে ।

“সেই ঘাটে সবলোক করএ চান দান ।

ধর্মরাজে সেবএ লোক হুতা মতিমান ॥” ১০

“জাঁধা বাঁঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে ।

অবিস তাহার কাজ সিদ্ধ হএ ফলে ॥” ২১

( শৃঃ পৃঃ—মুক্তিমান ১০৭ পৃঃ )

সহিত পালি ভাষার কিরূপ বনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা বিশদরূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ফলতঃ বোদ্ধব্যুৎ যে ভাষার অস্তিত্ব নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে প্রমাণিত হইতেছে, সেনরাজত্বকালে যাহা সমগ্র কামতা-প্রদেশে সার্বজনীন ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাকে কোচ বা রাজবংশী ভাষা এইরূপ সঙ্কীর্ণ আখ্যা প্রদান করা কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

সেনবংশীয় শেষ রাজা নীলাধর\* সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামরূপের অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ী ও দিনাজপুর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার রাজধানী কামতাপুরীর (অধুনা গোসানীমাবীব) ভূগবণেব হিন্দুরাজত্বের শেষ নিদর্শন-রূপে হিন্দুস্থাপত্য ঐ ভাস্করশিল্পের অতুলনীয় গৌরবকীর্ত্তি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক বর্ত্তমান কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমকোণে প্রশান্তসলিলা ধ্বলা নদীর বামতীরে দেনীপ্যামান রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান কোচ বা রাজবংশী ভাষা তাহারই পরিমার্জিত সংস্করণ। এরূপ অবস্থায় এই ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই জাতিগত সঙ্কীর্ণ আখ্যার পরিবর্ত্তে প্রাচীন সেন ও আধুনিক কোচরাজত্বের নামানুসারে কামতাবিহারী ভাষা নামে অভিহিত করাই যেন অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কামরূপ ও গোয়ালপাড়া প্রদেশেও এ দেশের কথিত ভাষা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার কথিত ভাষার সহিত এ দেশের কথিত ভাষার অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য তাহাব জাজ্জল্যমান নিদর্শন। এ দেশের বহুল দেশজ শব্দ অত্য়পি কামরূপের কথিত ভাষায় অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি শব্দের রূপ ও বিভক্তিচিহ্নগুলি পর্য্যন্ত প্রায় একরূপ। প্রাচীন কোচবিহারী এবং অসমীয়া ভাষা যে অভিন্ন ছিল, কামরূপবড়পেটানিবাসী বায় বাহাডুব শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বড়দলই মহাশয় কর্ত্তক প্রকাশিত শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব ও মাধবকন্দলির রচিত অসমীয়া সাতকাণ্ড রামায়ণের ভূমিকা হইতে নিম্নোক্ত অংশটি পাঠ করিলে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না।

“ইতিপূর্বে কোরবা হৈছে কোচবিহার অসম দেশর অন্তর্গত আর কোচবংশীয় রজা সকলে মহাভারত অসমীয়াত রচনা কবোবা সময়ত প্রায় সমুদয় অসম থণ্ডর অধিকারী আছিল। নর-নারায়ণ রজার ভায়েক কমলা গোহাইর আলি কোচবিহারর পরা ডিবরুগড় লৈকে আজিও “গোহাই কমলা” আলি নামে জেলি আছে। আর কোচ রজা বিলাকর আনো আনো অনেক কীর্ত্তি আজি লৈকে অসমত আছে, এনে স্থলত কোচবিহারত পূর্বে যি ভাষা চলিত আছি-ল, সেই ভাষাই অসম দেশর আজি চলিত অসমীয়া ভাষা।”

প্রধানতঃ ভাষাসাহিত্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকটিত হইয়া থাকিলেও আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক প্রমাণরূপে উহা পরিগ্রহণের কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না, কারণ

\* ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ইহাকে কেণ বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন কোচবিহারের লিখিত ও কথিত ভাষায় যে সামান্ত পার্থক্য ছিল, তাহা ধর্তব্য নহে।† পালরাজত্বের অবসান ও সেনবংশীয় ভূপালগণের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুকাল এ দেশ অরাজক ছিল। এই সময়ে কোচ, মেচ, গারো, কাছারী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত অসভ্য পার্শ্বজাতিগণের সংঘর্ষের ফলে তৎ তৎ জাতীয় ভাষার শকাবলী কামতাবিহারী ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত, সংস্কৃত ও পালিশব্দ ব্যতীত কামতাবিহারী ভাষায় যে সকল দেশজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমিত হয়। কোন কোন লেখক ঐ সকল শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বা স্বরূপত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কোচ ও রাজবংশী ভাষার পার্থক্য-প্রদর্শনে সমুৎসুক। রঙ্গপুর ও কোচবিহারের কোন কোন স্থানের কথিত ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কোচবিহারের উত্তরাংশের ভাষা একরূপ হ্রস্বোদ্য। ভূটানের নিকটবর্তী বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলের কথিত ভাষায় আর্গোতব শব্দেরই বহুল সমাবেশ অবশ্যসম্ভাবী। কোচবিহারের পশ্চিমাংশের ভাষা অনেকটা জলপাইগুড়ীর ভাষার অনুরূপ, ইহাও সকলের পক্ষে সহজ বোধগম্য নহে। আবার কোচবিহারের পূর্বাংশের ভাষার কামরূপী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও সদর সবডিভিসনের ভাষার সহিত অত্যাশ্চর্য্য স্থানের ভাষার মূলপ্রকৃতি এক হইলেও উচ্চারণগত সামান্ত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাইবান্ধা মহকুমার লোক হসন্তান্ত ক্রিয়াপদগুলি ওকারান্ত এবং টাকার স্থানে টাফা উচ্চারণ করে আবার সদর সবডিভিসনে ‘করিছে’র স্থলে করোচে, ‘খাইতেছে’র স্থলে খাওচে, এইরূপ উচ্চারিত হয়। এ দেশের অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে ডাঐ, বাদীয়া, তেলঙ্গা ও নমঃশূদ্র জাতির ভাষায় বিলক্ষণ উচ্চারণগত পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপ পরিচয় না পাইলেও কেবল উচ্চারণ শুনিয়া ঐ সকল জাতিকে বেশ চিনিতে পারা যায়।

ডাঐ ও নমঃশূদ্রজাতির উচ্চারণ অনেকটা একরূপ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

কামতাবিহারী শব্দ	ডাঐ বা নমঃশূদ্রজাতির উচ্চারণ	অর্থ
কাঞ্	কাইঞ্	কে
কোণ্টে	কোণ্টই	কোথায়
ধাইর	ধেইর	দাওয়া
চঙ্গই	চঙ্গই	মৎস্তবিক্রয়ের খাঁচা

বাদীয়ার ও তেলঙ্গাজাতির মধ্যে একরূপ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সেই সেই জাতির ভাষা নামে কথিত হয়। উহা এরূপ হ্রস্বোদ্য যে সাধারণের পক্ষে তাহাতে দস্তখুট করা

† “In the old Rajvansi dialect there was very little difference between the written and the spoken language.” The Cooch Behar State and its land revenue settlements, page 201.



হঃসাধ্য। স্ব স্ব সমাজের লোকের সহিত কথোপকথনের সময় তাহারা উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এ দেশের নশ্র আখ্যাধারী মুসলমানসমাজ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিশাল রাজবংশী সমাজেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। নষ্ট নমস বা নশ্র উপাধিটী তাহাদের ধর্মব্রততার পরিচায়ক বলিয়া তাহারা অহমান করেন। এ সম্বন্ধে মতবৈধ থাকিলেও এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথিত ভাষায় যে বিশেষ ব্যবধান নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমানদের ভাষায় নানা, নানী, চাচা, ফুফু ও শালা কাল্লা প্রভৃতি যে গুটিকয়েক যাবনিক শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একরূপ নগণ্য।

প্রাচীন মেয়েলী সাহিত্য-ছড়া ও গ্রাম্যগীত হইতে সেকালের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সর্বত্র না হউক এ দেশেব কোন কোন স্থানে বিবাহ, অন্নরন্ত প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ও কুলকল্যাণের গীত গাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই সকল গীতের রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিবার বিষয়। উক্ত গানগুলির মধ্যে কোন কোনটির রচনা এরূপ প্রাজ্ঞ ও শালিত্যপূর্ণ যে কলকণ্ঠপিকবরিনন্দী কামিনীব স্তমধুর বামাকণ্ঠে উহা তানলয়যোগে গীত হইতে শুনিলে, হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দবাসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। হৃৎথের বিষয় পাশ্চাত্যসভ্যতার কলুষপঙ্কিলশ্রোতে এক্ষণে প্রাচীন রীতিনীতি ভাসিয়া যাওয়ায়, এই সকল মেয়েলী গীতগুলিও ক্রমশঃ আমাদের জাতীয়সাহিত্য হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। সরল গ্রাম্যকবির আড়ম্বরহীন রচনা এ দেশের কথিত ভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া নিম্নে এই শ্রেণীর একটি গীত উদ্ধৃত হইল। উহা যে বিবাহের সময় সম্প্রদানকালে উদগীত হইয়া থাকে, গীতটা পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুদ্ধিতে পারা যায়।

“পাট আগিলা বিচিত্র আলিপনা চান্দোয়া করে বলমল।

বসিছে জনকরাজা যত জ্ঞাতিবন্ধু লয়া ॥

জনকে করে আক্সা শাঁঘ আন সীতা বিয়ার লথ যায় বয়া।

( বাজিছে উৎসবের বাজ )

হাত পাও ধুইয়া জলে—বসিল সীতা বাপের কোলে

বাপ লয়া করুণা করে।

সংসারের নারায়ণী বাপের প্রাণখানি হেন বিয়ক পরে যায় লয়া ॥

বসিয়া উঞ্চল পীড়ায় বা’র করে স্তম্ভর সীতায় নিয়া যায় সীতাক

ছায়ামণ্ডপের তলে।

তোলাতুলি সপ্তধার জয়ধ্বনি জোগাড় হ’ল সীতার মুখচন্দ্রিকা

তিনগোটা তুলসী পঞ্চগোটা হরিতকী দান করিলে গজাজলে ॥”

উল্লিখিত গীতটী ভাবসম্পদ বা রচনাচাতুর্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত যে সকল শব্দ-সমাবেশে উহা রচিত, তাহার অধিকাংশই সাধু বাঙ্গলাভাষা হইতে গৃহীত। এ দেশের রাখাল বালক বা কৃষকযুবকগণ মাঠে গোচারণকালে অথবা ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে যে সকল

আদিরসায়ক গান গাইয়া থাকে, তাহারও অধিকাংশ এইরূপ মার্জিতশব্দবহুল। ঐ সকল সময়ে আদিরসের প্রভাব অত্যধিক হইলেও উহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য, সামাজিক আচারব্যবহার, রীতিনীতির পরিচয় প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত আছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার্থ এই সকল গ্রাম্যসঙ্গীত, যেয়েলী ছড়া, প্রবাদ-বচন ও হেঁয়ালীগুলি সংগ্রহের আবশ্যিকতাও অল্প নহে। এ দেশী কথিত ভাষার গতিনির্ণয়ের সুবিধার্থ এই শ্রেণীর একটি ভাওয়াইয়া গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এ গীতটী নিবন্ধের গ্রাম্যকবির রচিত হইলেও বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে বহু সংস্কৃত ও বিপুল বাঙ্গলা শব্দের সমাবেশ উহাতে লক্ষিত হইবে।

“গেঠিলে কি আসিবেন সিপাইবে

ঢাল বান্ধেন তলয়ার বান্ধেন তুইনা বান্ধেন পাগুরী

বিহাও করি ছাইরে গাইছেন সিপাই অল্প বয়সের নারীরে।

ঐ নয়্য ভিটা নিয়াবে সিপাই উইয়া যায়ছেন গুয়া।

পর পুরুষে খাইবে গুয়াবে চোচার ভাগী তোমরা রে ॥

নয়া ভিটা নিয়াবে সিপাই উইয়া যায়ছেন কলা।

বউহল বাহুরে খাইবে কলা চোচার ভাগী তোমরা রে ॥”

গীতটীতে কোন নবপরিণীতা তরুণী সূদীর্ঘ বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুলা হইয়া বিদেশ-গমনোত্তর স্বামীকে ঈর্ষিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

• কামতাবিহারী ভাষায় মৈথিলী-শব্দের সংখ্যাও অল্প নহে, তবে কথিত ভাষাপেক্ষা লিখিত ভাষাতেই উহার সমধিক প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। রাজা নীলাধর কর্তৃক আনীত মৈথিল ব্রাহ্মণগণ এদেশে ভাষা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক কি না তাহা নিশ্চিত রূপে বলা সহজ-সাধ্য না হইলেও অধুনা প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ যে সকল পুরাতন গ্রন্থের অস্তিত্ব আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সমাগত মৈথিল-ব্রাহ্মণগণের সুযোগ্য বংশধরগণ কর্তৃক রচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পভাম্ববাদক কবিবর গোবিন্দমিশ্র, মহাত্মারতকার রাম সরস্বত্বাপাধিক অনিরুদ্ধ ও দ্বিজ শ্রীনাথ প্রভৃতি অমর কবিকুলতিলকগণ সকলেই মৈথিল-ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। ইহাদের পূর্বে কোন কবি এ দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যরসের পীযুষ-প্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের স্মৃতি অতীতের যবনিকাস্তরালে লুপ্তারিত।

অতঃপর কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী, ক্রিয়ার রূপ, বিভক্তি প্রভৃতি ব্যাকরণ-গত দুই একটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

সাধারণতঃ এ দেশের নিম্ন-জাতীয় লোক শব্দের আত্মস্থর স্থানে অ ও আ স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের স্থানে আমচন্দ্র, রাইতের স্থানে আইত, রবিবারের স্থানে অবিবার, বৌদ্ধের স্থানে ওদ্ধ, এবং রাখালের স্থানে আখোয়াল ও রোবার স্থানে ওব্যা, আমের স্থানে রাম, আঁখোর স্থানে বাঁখা, এবং আগালের স্থানে রাগাল, এইরূপ।

উচ্চারণ সৌকার্যার্থ অনেক শব্দের, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-বিয়োগে হ্রাসবৃদ্ধি সং-  
সাধিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি শব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

বাঙ্গালাশব্দ	কামতাবিহারী শব্দ
মানুষ	মানুষী
পা	পাও
বাবা	বা
বোনাই	বজু
না	নোয়ায়
নূতন	নউতন
গাছ	গছ
পাখী	পখী
মহিষ	মইষ
আসিল্	আইল্
থড়	থাড
কাঠাল	কাটোল
কত্কা	কইনা
পয়সা	পাউসা
করিয়া	করি
শাশাক	গাশা
পাট	পাটা
কেন	কেমে
একথানা	একনা
হইতে	হাতে
এ দিকে	এত্তি
এ দিক্দিয়া	এদিয়া

ক্ষেত্র ও বনের পরিবর্তে বাড়ী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা ধানবাড়ী, পাটাবাড়ী, বাঁশবাড়ী, খ্যাড়বাড়ী, জঙ্গলবাড়ী ইত্যাদি।

ব্যক্তি-বাচক সর্বনাম উত্তম ও মধ্যমপুরুষে সঙ্গমার্থে এক বচনের স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা :—

মুঁইঞ্	সঙ্গমার্থে	আমরা
তুঁইঞ্	ঐ	তোমরা
তঁাঞ্	ঐ	তাহারা

উল্লিখিত বহুবচনের সহিত কেবলমাত্র গুলা বা ঘর শব্দ সংযোগে প্রকৃত বহুবচনে পরিবর্তিত করা হয় যথা, আমরা-গুলা, তোমরা গুলা, তামরা গুলা। আমার ঘর, উমার ঘর ইত্যাদি।

নামবাচক বিশেষ্য পদগুলির সহিত এইরূপ যথাক্রমে কোণা ও গুলা শব্দ যোগ করিয়া একবচন ও বহুবচন করা হইয়া থাকে। যথা—

একবচন

বহুবচন

মানুষ কোণা

মানুষগুলা

পখী কোণা

পখী গুলা

হাতী কোণা

হাতীগুলা

ভয় ও রাগ এই বিশেষ্য পদ-দ্বয় সাধারণতঃ খাওয়া শব্দের যোগে ক্রিয়া-পদে পরিণত হইয়া থাকে। যথা, ভয় খাওয়া, রাগ খাওয়া, হাতাস খাওয়া। আবার নিশ্চয়ার্থেও অনেক সময় অসমাপিকা ক্রিয়ার পব খায় শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন, খাওয়া খায়, শুতা খায় ইত্যাদি। লাগিবে শব্দের পরিবর্তেও অনেক সময় খাইবে শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা, ঘর কোণা বাঁধিতে মাস খানেক খাইবে।

কর্ম ও সম্প্রদান কারকের পদান্তস্থ কে শব্দের স্থানে ক্ এবং তে স্থানে ত্ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—তোক্, আমাক্, উমাক্ ভাইক্ এবং ননীত্, ঘরত্, জঙ্গলত্।

না এই ক্রিয়াবিশেষণটি প্রায়ই অসমীয়া ভাষার ঞায় ক্রিয়ার পূর্বে এবং কর্তা পদের অন্তে বসে, যথা—না যাওঁ মুইঞ্ না খাওঁ মুইঞ্, না করোঁ মুইঞ্, না শুতোঁ মুইঞ্।

কোন বিষয় কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ আবশ্যক হইলে, হুড়্, হিড়্, হার্ প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, হুড়্ দেখ্, হিড়্ শুন্, হার্ আয়্ ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের অন্তস্থ অক্ষরে তুচ্ছার্থে হসন্ত এবং সঙ্গমার্থে ওকার যোগ করা হয়, যথা থাক্ থাকো, কব্ করো, শুত্ শুতো ইত্যাদি। আবার আকারান্ত ক্রিয়া-পদের তুচ্ছার্থে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল সঙ্গমার্থে একটি ও বা ওকার মাত্র সংযোগ করা হইয়া থাকে, যথা—খা খাও যা যাও।

কাল ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের গুটিকরেক রূপ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে।

ক্ ধাতু		
উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ
মুইঞ্ করোঁ	তুইঞ্ কর্	তায় করক্
	তোমরা করো (সঙ্গমার্থে)	তামরা করক্ (সঙ্গমার্থে)
মুইঞ্ করিম্	তুইঞ্ করেক্	তায় করবে
মুইঞ্ কইটেজা	তুইঞ্ কচিস্	তায় কছে
গম্ ধাতু		
মুইঞ্ যাও	তুইঞ্ যা	তায় যাউক

	তোমরা যাও (সম্মুখার্থে)	তামরা যাউক্ (সম্মুখার্থে)
মুইঞ্ যাইম্	তুইঞ্ যাবু	তায় যাইবে
	তোমরা যামেন্ (সম্মুখার্থে)	তামরা যাইবে (সম্মুখার্থে)
মুইঞ্ গেইচৌ	তুইঞ্ গেছিস	তায় গেছিল
	তোমরা গেইছেন্ (সম্মুখার্থে)	তামরা গেছিল (সম্মুখার্থে)

কতকগুলি ক্রিয়াপদের বর্তমানকালে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষভেদে যথাক্রমে ধরচৌ, ধরচে এবং ধরছিস্ শব্দ যোগ করা হয়, যথা মুইঞ্ যাবাব্ ধরচৌ, উম্ৰা যাবার ধরছে, তায় আসবাব্ ধরছে ।

সম্ভাব্য ভূতকালে ক্রিয়ার পর হয় শব্দ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় । যেমন, তোমরা যদি গেলেন্ হয়, তায় যদি আসিল্ হয় ইত্যাদি ।

সম্বোধনে বাৎসল্যার্থে পুংলিঙ্গে বাপই ও জীলিঙ্গে মাইঞ্ শব্দ ব্যবহৃত হয় । আবার স্থল-বিশেষে নায়কনায়িকার প্রেম-সম্বোধনেও বাপই ও মাইঞ্ শব্দ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে । নিম্নোক্ত গীতাংশ তাহার প্রমাণ ।

“বাপই রে মোক্ কাকই কিনিয়া দে  
নউতন বাহারের চুণ মোর বাতাসে হালে ।  
বাপই রে আজ্ বালাটারীব হাট্  
আর সদায় মোব্ যেমন্ তেমন চুণ তামাউকেব পাতা ।”

আবার অত্ৰা,—

“সুন্দরীক মাইঞ্ তুই যেমন তার চপের মাইয়া তোর সোয়ামী মিলে নাই ।

ঘাটায় পথে মাইঞ্ তোর নাগাল্ পাও ওরে পাকা কলার মত গিলিয়ারে খাঁও  
তোকে পাইলে মাইঞ্ ছাড়ো বাপো মাও ।”

বাপই ও মাইঞ্ বাতীত এ দেশে আব একটি সম্বোধনপদ প্রচলিত আছে, তাহা বাহে । পরিহাসরসিক বৈদেশিকগণ ভাষাতত্ত্বের গুঢ়রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া এ দেশের লোককে বাহে এবং এ দেশকে বাহের দেশ বলিয়া বিক্রপ করিয়া থাকেন । প্রকৃতপক্ষে বাহে শব্দটা বাবাহের অপভ্রংশমাত্র । শব্দসংক্ষেপানুরোধে দ্বিতীয় অক্ষরটি লুপ্ত হওয়ায়, বাহেরূপে পরিণত হইয়াছে ।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন মেহানবীশ ।

## কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য

পৰ্বতবাসী ও অরণ্যচারী অসভ্যজাতি ভিন্ন সমস্ত সভ্যজনপদবাসীর ভাষা দুই প্রকার—লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষা। লিখিত ভাষা মার্জিত ও বিপুল এবং কথিত ভাষা অসতর্কিত রূপে ব্যবহৃত বলিয়া অমার্জিত ও প্রায়ই অশুদ্ধ বা ব্যাকরণহীন। কোন কোন স্থানের এই উভয়বিধ ভাষার এত প্রভেদ যে, সহজে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। যথা—

“সে স্বসেরা নিন্দাছে

সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

ছাকা পারিবার গেইছে।

থারে কাপড় কাচিতে গিয়াছে।”

কোচবিহার বঙ্গদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত এবং পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন। উপরে যে গ্রাম্যভাষার আদর্শ দেওয়া হইল, তাহা কোচবিহারেরই গ্রাম্য-ভাষা। উহা বাঙ্গলাভাষার রূপান্তর বই আর কিছু নহে।

কোচবিহারবাসিগণ সাধারণতঃ কোচনামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহারা এই নামে পরিচর দিতে নারাজ, আপনাদিগকে রাজবংশী বলে। ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ার্সন তজ্জন্ত এতদ্ব্যঙ্গী ভাষাকে রংপুরী বা রাজবংশী ভাষা বলিয়াছেন। তাহা বাঙ্গলা হইতে পৃথক ভাষা নহে, সামান্য পার্থক্যপ্রযুক্ত সে রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক ভাষা বা dialect বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যদি রাজবংশী ভাষাকে একটা পৃথক dialect ভাষা বলিতে হয় তাহা হইলে ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীর চলিত ভাষাকেও একটা পৃথক ভাষা বলিতে হয়। নানা স্থানের কথিত ভাষায় সেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পৃথক ভাষা নহে, লিখিত ভাষা লইয়াই ভাষাতত্ত্ব বিচার করিতে হয়। কোচবিহারের লিখিত ভাষায় এমন কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না, যাহাতে তাহার একটা পৃথক নাম দেওয়া যাইতে পারে। কোচবিহারের ও এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিলে, ইহা-দিগকে এক জাতীয় ভাষা বই অল্প কিছু বলা যাইতে পারে না। আমরা পশ্চাৎ তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় “কোচ ও রাজবংশী শব্দসংগ্রহ” শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে যে রাজবংশী শব্দের তালিকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে “কাণ”, “গতর”, “ভানু”, “কুর”, “গান”, “জিভা”, “চামড়া”, “বুক”, “আকুল”, “পাও”, “হাটু”, “গর্দান”, “বোটা”, “চেঙ্গড়া”, “দশি”, “কাকই”, “শিরসিত্ত” “দেহের”, “আঙাঝা” প্রভৃতি প্রায় অর্ধেক শব্দ

এতদেশীয় গ্রাম্যশব্দ হইতে অভিন্ন। কোচবিহারের সাধারণ লোকের উচ্চারিত গ্রাম্য-ভাষার সৌসাদৃশ্য এই যে, তাহারা “অ” স্থানে “র” এবং “র” স্থানে “অ”, “উ” স্থানে “রু”, “রা” স্থানে “আ”, “রু” স্থানে “উ”, “রো” স্থানে “ও” এবং “রৌ” স্থানে “ঔ” উচ্চারণ করে। যথা—“রমণী” “অমনী”, “রাতির” “আতির”, “রূপনাথ” “উপনাথ”, “রোদ” “ঔদ” ইত্যাদি। আমাদের এতদেশের কোন কোন স্থানের প্রাকৃত লোকেও এরূপ উচ্চারণ করে শুনা গিয়া থাকে। কোচবিহারের লোকের উচ্চারিত শব্দের মধ্যবর্তী “র” লুপ্ত ও তাহাব পরবর্তী বর্ণের দ্বিগুণ হয়; যথা—“তোধা” স্থলে তোধ্ধা ইত্যাদি। একপও এতদঞ্চলের অনেক স্থানের গ্রাম্যভাষায় দৃষ্ট হয়।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে স্বরের এবং শব্দাংশের লোপ এই স্থানের কথিত ভাষার একটা প্রধান লক্ষণ; যথা :—

মানুষ	মান্‌সী।	বাবা	বা।
পাখী	পখী।	বনাট	বহু।
মাসী	মসী।	করিয়া	করি।
গাছ	গছ।	তোকে	তোক্।
বেটাকে	বেটাক।	পাতকুয়া	পাট্‌কী।
মাঠেতে	মাঠত।	আলাপ	আঞ্জা।
		একখানা	একনা।

থাওয়া শব্দটা অনেক স্থলে করিবার এবং আবশ্যকতা বুঝাইবাব জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

( আগ ) রাগ থাওয়া	রাগ করা।
হতাশ থাওয়া	ডুগ পাওয়া।
এ কামে এক মাস থাইবে	এ কাজে একমাস লাগিবে।
মোর যাওয়া থাইবে	আমাকে যাইতে হইবে।

সর্বনামের ব্যবহারেও পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় পুরুষের বহুবচনের রূপ একত্ব বুঝাইবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা,—

আমি	স্থলে	আমরা
তুমি		তোমরা

এইরূপ মান্‌সীঙলা, ছাওয়ালঙলা ইত্যাদি। সম্মানসূচক ‘আপনি’ ‘তিনি’ ‘উনি’ ইত্যাদি শব্দ কোচবিহারের ভাষায় নাই। তৎপরিবর্তে “তোমরা” “উমরা” “ইমরা” শব্দের ব্যবহার আছে।

সপ্তমী বা অধিকরণ বিভক্তির জন্ত “তে”র পরিবর্তে—“ত”ব্যবহৃত হয়, যথা—যন্ন, যন্নত ;

নদী—নদীত, বাসা—বাসাত, ইত্যাদি শুধু গ্রাম্য ভাষাতে বহে, লিখিত ভাষাতেও এ প্রকার অধিকরণের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

“বিহারে বিরাজে চন্দ্র দেবেন্দ্র ভূপাল ।

গগনে উদিত চন্দ্র বুঝে কালাকাল ॥

অসিত ‘পক্ষত’ সে যে না হয় উদয় ।

গগনে উদিতচন্দ্র সিতে অভূদয় ॥”

কোচবিহারের অনুদিত রামায়ণ—কিষ্কিন্দাকাণ্ড ।

এতদেশের প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না, যথা—

“গুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূচ্ছিত ।

আনন্দে বিহ্বল হই পড়িল ‘ভূমিত’ ॥”

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ২২৪ পৃঃ ।

সেইরূপ কৰ্ম্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তির “কে” স্থলে “ক” ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা,—

“প্রতাপী সে কপিবর নিবথয় তাত পর

লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননে ।

কোপাবিষ্ট দুৰাশয়, ভীষণ লোচনদয়,

ভয় হয় “তাক” দরশনে ।”

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ অনুবাদিত রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড ।

এতদেশীয় প্রাচীন কাব্যেও এরূপ প্রয়োগ অপসিদ্ধ নহে,—

“এথনি আসিব, নিশাইব্ বাপ,

ক্ষীর কদলক্ লৈয়া ।”

বঙ্গবাসী আপিণি হইতে প্রকাশিত “চৈতন্যমঙ্গল” ৩৮ পৃঃ ।

কোন কোন স্থলে কোচবিহারীয় এবং এতদেশীয় ভাষায় “র”এর পরিবর্তে ষষ্ঠী বিভক্তিতে ‘ক’ ব্যবহৃত হয়,—

“বিহারক” রাজপুরী নামে অম্রাবতী ।

বীর নারায়ণ দেব যার অধিপতি ॥”

মহারাজ বীরনারায়ণ রচিত কীরাতপর্ক ।

“অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ।

নিত্যানন্দ নাম বন্দো ‘রোহিণীক’ স্নত ॥”

বঙ্গবাসীর চৈতন্যমঙ্গল ২ পৃঃ ।

এতদেশে প্রচলিত প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়ায় যথাক্রমে “ই” ও “এ” বিভক্তি স্থলে এবং “এন”র ব্যবহার হয় যথা,—



বর্তমান কালে—আমি করি... .. মুই করো।

তুমি কর ... .. তোমরা করেন।

অতীত কালে—আমি গিয়াছি ... .. মুই গেইছো।

তুমি গিয়াছিলে... .. তোমরা গেইছেন।

এতদেশীয় ভাষায় উহাদেব ব্যবহার,—

বর্তমান কালে—“সেবকের দোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।

পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারো।” চৈতন্যভাগবত, ১৭৩ পৃঃ।

অতীতকালে— কি দেখিলুঁ গোবারূপ অপরূপ ঠান।

কি দেখিলুঁ সকলকণ অরুণ নয়ন ॥”

এতদেশীয় ভাষাতেও ভবিষ্যৎ কালের ঐ ঐ ক্রিয়ায় “মু” বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কোচবিহারের ভাষাতেও ইহা বিরল নহে,—

“প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাচ ঘরে।

মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে ॥” ঐ ১৩৬ পৃঃ।

ইংরাজী progressive formএর রূপ বাঙ্গলায় বর্তমান কালের ক্রিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, যথা—আমি যাইতেছি, সে হাসিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু কোচবিহারের ভাষায় “মুই যাবার ধরচো”, “তোমরা হাসিবার ধরচেন” এই প্রকার হইয়া থাকে।

কতকগুলি প্রকৃত ক্রিয়ার রূপও উভয়ই সমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—কোচবিহারের লিখিত ভাষায়—

“স্বর্গ মঞ্চত পাঁতালন্ত আশ্রয় যি জন।

জিনিলন্ত যিতো জনে রাক্ষস দুর্জন ॥”

কোচবিহারের অনুবাদিত গীতগোবিন্দ।

অন্যত্র—

“কন্দর্পের শরে হৃদয় জর্জরে,

বিহনে বিকল হয়।।

অন্ধকার বমে কাহক লাগনে,

‘ভ্রমন্ত’ বিষাদে চায়। ॥”

ঐ

ঐ

প্রাকৃত রূপ এতদেশীয় প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত—

“সজ্জন না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।

নির্ভয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥”

কবীন্দ্র-প্রণীত মহাভারত, ভীষ্মপর্ব।

অন্যত্র—

“প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হৈল পরম মহাত্মী।

বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥” চৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ববর্তী রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহকার কোচ ও রাজবংশী ভাষায় বহুল শব্দ সংগ্রহ

করিয়াছেন, অতএব পুনরুজ্জীবিতকরণের :জন্ত ৭৭ স্থলে তাহাদের উদ্ধার করা অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

কোচবিহারের ভাষার সহিত আসামী ও বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ সোসাদৃশ্য আছে। সে কারণে প্রথমোক্ত স্থানের ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, আসামী ভাষাতে সেইরূপ তিন চারিশত বৎসর পূর্বে কোচবিহারের লিখিত ভাষার সহিত এতদেশপ্রচলিত ভাষার সোসাদৃশ্য ছিল, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবতাদির ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, নিম্নে আসামী ভাষার সহিত বাঙ্গলা ও কোচবিহার-প্রচলিত ভাষার যে কি প্রভেদ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

“ঘুমুছা সঙ্গে সঙ্গে প্রভু দেব হরি।

থাকিলা অনঙ্গ কেলি কোভুল করি ॥

এহি মতে সঙ্গে সঙ্গে প্রভু দামোদর।

সাত দিন বঞ্চিলন্ত ঘুমুছার ঘর ॥

জুনিমোক সাবধান হইয়া সর্বজন।

মহা মহেশ্বর কৃষ্ণ যাত্রার কীর্তন ॥” • শ্রীধরকন্দলী।

ভাষা নিম্নত পরিবর্তনশীল এবং এতদেশেব কথিত ভাষার যে যোজনাস্তর একটু আধটুক রূপান্তর আছে তাহাও সত্য। হুগলীজেলার বন্দনগঞ্জ থানার, বাঁকুড়ার কোতালপুর ও অত্যাণ্ড থানার এবং মেদিনীপুরের রামজীবনপুর থানার অধিবাসিগণ তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার শেষে প্রায়শঃ “ক” সংযুক্ত করিয়া থাকেন, যথা—দিলেক, নিলেক, হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি। বিজ্ঞানগর মহাশয়ের সীতার বন-বাসাদির দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণে হইবেক, যাইবেক, খাইবেক ইত্যাদি ক্রিয়ার রূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। বহুবচনের “দিগ” বিভক্তিটা আমাদের চোখের উপর বাঙ্গলা ভাষা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এক্ষণে “আমাদিগের” “তাহাদিগের” স্থলে আমাদের তাহাদের ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে। কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা হইতে এতদেশীয় আধুনিক ভাষার এই প্রকারেই পার্থক্য ঘটিয়া থাকিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোচবিহারের পূর্বসীমান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারেই আসাম বা পুরাণ-প্রথিত প্রাগজ্যোতিষপ্রদেশ। কোচবিহারের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, উক্ত প্রদেশে এখনও কোচজাতীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে তাঁহারা যে মিথিলা ও আসাম অঞ্চল হইতে যে ব্রাহ্মণদিগকে কোচরাজ্যে উপনিবিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে আসামী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। তৎ-পূর্বে কোচবিহারে রাজবংশী ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণের দ্বারা এই দেশে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। কালসহকারে রাজবংশী ভাষার সংশ্রবে তাহাদের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তর দারণ করিয়াছে। এ জন্য কোচবিহারের লিখিত

ভাষা খাঁটি আসামী ভাষা নহে? বঙ্গভাষার সহিত আসামী ও রাজবংশী ভাষার যে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাজার উৎসাহ না মিলিলে কোন দেশের ভাষার পুষ্ট ও শ্রীসমৃদ্ধি সাধিত হয় না। কোচবিহারের অধিপতিগণ সে পক্ষে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা কোচবিহারের ভাষার উন্নতি-পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। দেশীয় কবির অন্নচিন্তানিবারণার্থ যথেষ্ট ভূমি ও অর্থ দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। দেশীয় ভূস্বামিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্যে আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবির কবিত্ব ক্ষুদ্রি পাইয়াছিল, যথা—ঘনরাম, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর প্রভৃতি কবি। তাহারা দেশীয় রাজন্যগণের রূপায় দেশীয় সাহিত্যে আপনাদিগকে অমর কবিতা গিয়াছেন। রাজাব উৎসাহ না পাইলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেন না, দেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম মুছিয়া যাইত, সাধারণ লোকের খায় তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হইত। কেননা সেকালে মুদ্রায়ন্ত্রের প্রচলন ছিল না, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ লিপিকারগণকে বেতন দিয়া নূতন কাব্য লেখাইয়া লইতেন, তাহাতে গ্রন্থকারের কোন লাভ ছিল না, এক্ষেপে নিজের সময় নষ্ট করিয়া কয়জন কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন? আজিকালি গ্রন্থকর্তৃত্ব দ্বারা যেমন অর্থাগমের উপায় হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। বিশেষ অর্থবান্ না হইলে কেবল মাত্র সুনাম স্বখ্যাতির জন্য অতি অল্প লোকই সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কোচ-বিহারের নরপতিগণের দ্বারা তদ্দেশীয় কাব্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার কবি। কাঞ্চানরোপে সাত ছাটবৎসর পূর্বে কোচবিহারের রাজধানীতে গিয়া আমাকে তিন চাবিনাস তথায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তৎকালে সেখানকার ৬ মহারাজ ভূপবাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পুস্তকালয়ে গতিবিধির সুযোগও ঘটিয়াছিল। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাধুতা ও সচ্চরিত্রতায় আমি সকল সুবিধাই পাইয়াছিলাম। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গলা পুস্তকগুলি বিশেষতঃ যে গুলি এ পর্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় আছে, সেই গুলিই আমার আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোচবিহারের কবিগণের কৃতিত্ব দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ক্রমে সে গুলির পরিচয় দিতেছি।

১। পুস্তকালয়মধ্যে কোচবিহারের কবিদিগের যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে “কিরাতপর্ব” পুস্তকখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহারাজ বীরনারায়ণের অধিকারকালে কবিশেখর উপাধিদারী রামকৃষ্ণ নামক কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ বীরনারায়ণ খৃষ্টীয় শকের ১৬২১ হইতে ১৬২৫ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিরাতপর্বের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল গ্রন্থের নানা স্থানে কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

“অস্তল্ পুরত রাজরমণী ।  
 বেশ করে শুনি মনোমোহিনী ।  
 মল্লিকামালায় কবরী সাজ ।  
 নীলগিরি যেন গঙ্গার মাঝ ॥  
 সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে পিঞ্চিল । †  
 পূর্ণচন্দ্রে যেন অগ্নি লাগিল ॥  
 খঞ্জন গঞ্জন চাক চঞ্চল ।  
 লোচনযুগলে লোপি কঙ্কল ॥  
 যেন কামবাণে গেড়ল দিয়া ।  
 ভুরু শরাসনে থুইল জুড়িয়া ॥  
 তথাপি তরুণ তরুর ডরে ।  
 উপরে হেমঘণ্টা ধ্বনি করে ॥  
 উরুর শোভা কহিতে না পারি ।  
 যেন রামরম্ভা মানিছে হারি ॥  
 চরণকমল মনক লোভা ।  
 মত্তগজ জিনি চরণশোভা ।  
 তাত রুহু রুহু নুপুর বাজে ।  
 জগৎ জিনিতে মদন সাজে ॥  
 বীরনারায়ণ নৃপতি মণি ।  
 কবিশেখরের মধুর বাণী ॥  
 বিহারক রাজপুরী নামে অম্রাবতী ।  
 বীরনারায়ণদেব বার অধিপতি ॥  
 মধুর মধুর মহাভারত ভারতী ।  
 বোলা রামকৃষ্ণ কবিশেখর বদতি ॥”

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকালে কোচবিহারের কবি বলিয়া নহে, এতদঞ্চলের কবির রচিত, হইলেও কাব্যখানি কোন অংশে অনাদৃত হইবার নহে ।

যে সময়ে কোচবিহারের কবি এই গ্রন্থখানির রচনা করেন, সে সময়ে এতদেশীয় বৈষ্ণবকবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য অসংখ্য কাব্য রচনা করিতেছিলেন ।

২। মহারাজ বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ খৃঃ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ অব্দ পর্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করেন । তাঁহার অধিকারকালে ত্রিনাথ-নামক জনৈক

ব্রাহ্মণ “দ্রোপদীর স্বয়ম্বর” নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্য্যাংশে ইহা কোন মতে হীন নহে। বরং স্থানে স্থানে কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে কাশীরামদাসের রচিত দ্রোপদীর স্বয়ম্বর মনেকই পাঠ করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বচনাব তুলনা কবিলে উভয়ের প্রতিভার পরীক্ষা হইবে। শ্রীনাথের কাব্যে কল্পনা আছে—সেই কল্পনা লাভণ্যময়ী হৃদয়গ্রাভিণী, কাব্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পক্ষে অসাধাবণ শক্তিশালিনী। আমরা ব্রাহ্মণ-কবির স্মৃতি না করিয়া থাকিতে পারি না। পাঠকগণ চক্ষুর্কণের বিবাদ ভঞ্জন করুন, আমরা তাঁহার কাব্য্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“অনন্তর দ্রোপদীর পুরস্কী সকলে ।  
 বিধিমতে স্নান করাইল কুতূহলে ॥  
 গোবচন! তীর্থজল কুসুম চন্দনে ।  
 দ্রোপদীক স্নান কবাইল এয়োগণে ।  
 তাব পব সখীগণে কবাইল বেশ ।  
 আগ্রের ধূপ দিয়া শোভাইল কেশ ॥  
 বাক্সিল কবরী যেন মদনের ছায়া ।  
 সিন্দূব তিলক দিল তার কামছায়া ॥  
 খোপার উপরে দিল মল্লিকার মালা ।  
 মনমৃগ বন্দী করিবার যেন ছলা ।  
 লোচনযুগলে চারু পিন্দাল † অঞ্জন ।  
 কমল দলত যেন বসিল থঞ্জন ॥  
 অঞ্জনের রেখা দিল ক্রয়গে লেপন ।  
 কামদেব ধনুত যেন চড়াইল গুণ ॥  
 রবি শশী জলে যেন কর্তি কুণ্ডল ।  
 লাভণ্যলতার যেন গোটা দুই ফল ।  
 নাসার উপরে শোভে মুকুতার ফল ।  
 তিলপুষ্পে পড়িয়াছে যেন হেমজল ॥  
 কুচের উপর শোভে মুকুতার হার ।  
 অমর শিখরে যেন গঙ্গাজল ধার ॥  
 করত কঙ্কণ শোভে বলয়া ভূজত ।  
 চন্দ্রকলা জলে যেন আকাশতলত ॥

চরণে পিন্দাল হুই বাজন সুপূর।  
 রাজহংস সকলের গর্বে গেল দূর ॥  
 কুম্ভে রঞ্জিত বস্ত্র দেবাস্ত্র ভূষণ।  
 পরিপাটী করিয়া পিন্দাইল সখীগণ ॥  
 বিবাহ মঙ্গলস্থত্র বান্ধিল মদনী।  
 কচিকর হৈল যেন রূপদনন্দিনী ॥  
 কি কহিব দ্রৌপদীর রূপের মহিমা।  
 বিধাতার নাবী হেতু নিশ্চয়নের সীমা ॥  
 স্বামীক বরিতে চলিছে বালা।  
 হাতে সুবর্ণের পঙ্কজমালা ॥  
 নিতম্ব ভারে গজগতি যায়।  
 টলমল সর্ব্বঅঙ্গ করয়।  
 রুহু রুহু বাজে সুপূব পায়।  
 সপ্ত মদনক যেন জাগায়।  
 গুপ্পু শব্দে মজ্জি গেল মন।  
 কোকিলের ধ্বনি মানি ভেমন ॥  
 ভূপতিগণের চিত্তচকোব।  
 কৃষ্ণা মুখচন্দ্রে হৈ গেলা ভোর ॥  
 রূপে সুধাকর পিয়েন আনে।  
 চন্দ্রের বশিষ্ঠ চকোরগণে ॥  
 দ্রৌপদীর মুখ চন্দ্রমণ্ডল।  
 সভাসমুদ্রক কৈল তরল ॥  
 যে ভিত্তি চাহিল আড়নয়নে।  
 দগ্ধ হইল সেহ মদনবাণে ॥  
 কে বর্ণিতে পারে রূপ তাহার।  
 জয়লক্ষ্মী যেন কামরাজার ॥  
 মদনে দহিল সবাব চিত।  
 ভারত কথা অতি মনোনীত ॥  
 প্রাণনাশায়ণ মন মন্দির।  
 বিদধি ফেন অঙ্গ টেহির ॥  
 ভূপতিকদের পুত্র সুজনে।  
 শ্রীনাথ ভনে আত্মা পরমাণে ॥”

বলদ্বন্দ্ব পার্থ লক্ষ্যভেদে জন্ম সত্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া ধনুঃশর গ্রহণ করিতে  
অগ্রসর হইতেছেন,—

“বৈশম্পায়ন কয়,                      তবে ধনঞ্জয়,

বিপ্রসভা পরিহারি ।

ধনু বড় দেখি,                      খালি কোনা পেথি,

উঠিল যেন কেশরী ॥

যেন দেখি সর্প,                      করি মহাদর্প,

গরুড় চলিল ঝাম্প ।

গজগতি সম,                      সিংহ পরাক্রম,

ধমকে ধরণী কম্পে ॥

দেখি চমৎকার,                      রাজা সমাজেব,

বিস্ময় হৈ গেল মনে,

ক্রমে কোন বীর,                      পরম গম্ভীর,

= পরিভ্রম† নাহি কেনে ॥

ব্রাহ্মণ সবার,                      হৈল হাহাকার,

+ অর্জুন উঠিল যবে ।

কৃষ্ণা সে লপট,                      করি ঝট পট,

বলিতে লাগিল সবে ॥

ব্রাহ্মণ বালক,                      উঠিল কিণক,

সবে বিপ্রে দেহ হাঁস ।

সবে রাজা মেলি,                      দেহ করতালি,

হাসাব দ্বিজ সভাক ॥

কস্তুরূপ দেখি,                      লাজক না পেথি

ব্রাহ্মণ চলিল সাজি ।

ইহর কারণে                      সকল ব্রাহ্মণে

বড় লাজ পাইব আজি ॥”

৩। দ্রৌপদী-সম্বন্ধে কাব্যের পরবর্তী গ্রন্থ “নারদীয়াপুরাণ”। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ  
খৃঃ ১৭১৪ অবঃ হইতে ১৭৬৬ অবঃ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন।  
এই সময়ে তাঁহার অন্তঃস্থ খড়্গনারায়ণ, নারায়ণ নামক ব্রাহ্মণকে অনুমতি দিয়া ইহার  
রচনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব উভয়ই প্রশংসার যোগ্য,  
নমুনা দেখিলেই পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—

“জয় নিত্যানন্দ নিরাকার নাবাযুগ ।  
 নিরুপাধি নির্লেপ নিষ্ঠুৰ নিরঞ্জন ॥  
 পরম অপরানন্দ পরম পুরুষ ।  
 পদ্মপানি পঙ্কজলোচন নিমল্লব ॥  
 স্বরূপ অরূপ নিরূপণ রূপধারী ।  
 গোপনারীনাযক ত্রীগোলোকবিহারী ॥  
 ধরাধরধারী ধরাধর শ্রামকায় ।  
 কোটী কন্দর্পের দর্পহারী শ্রামরায় ॥  
 স্বরূপতঃ অজ কিন্তু জনম অনন্ত ।  
 অকর্তা কর্মের আর নাহি সার অন্ত ॥  
 তুমি পূর্ণকাম আমি কামী সর্বদাই ।  
 কামনার দাস ভকতির অন্তরাই ॥”

৪। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ খৃঃ ১৭৮৩ হইতে খৃঃ ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ সর্বতোভাবে প্রাশংসনীয়, তাঁহার উৎসাহ ও উদ্বোধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তিনি নিজেও একজন স্নকবি ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, ধর্ম্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ এই কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের সকলগুলিতেই কবিগণের সুললিত শব্দবিজ্ঞাস এবং কাব্যের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি দেখিয়া স্নখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পদবিজ্ঞাসগুণে তাঁহাদের কবিতা বড়ই চিত্তস্পর্শিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, নানাস্থানে সুন্দর ভাবসমাবেশে তাঁহাদের কাব্য উচ্চশ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। চরিত্রচিত্রণেও তাঁহাদের কৃতিত্ব আছে। আমরা যথাসময়ে কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত যথাক্রমে কাব্যাত্মক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কোচবিহারের কবিগণ এতদেশীয় কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না।

ক। অরণ্যকাণ্ড—এই গ্রন্থের রচয়িতা রুদ্ররাম বাচস্পতি

ত্রিহরেন্দ্রনৃপচন্দ্র মহেন্দ্র সমান ।  
 অসিন্দম ভীমসম পরাক্রমবান ।  
 মহিমার সীমা তার বলিবারে নারি ।  
 মহাদানী মহারাজ বিহারবিহারী ॥  
 তার নিজ দেশী দ্বিজ রুদ্র স্কৃন্দ্রমতি ।  
 গুরুদত্ত নাম তার বিজ্ঞাবাচস্পতি ॥  
 ভূপের আদেশ পায়্য স্বদেশ বচনে ।  
 হৃষ্ট থয় নিশাচর-বধ পদ ভূপে ॥”



কবিতার নমুনা—

পঞ্চবটীবনে খরদূষণেব নিধনবার্হা লইয়া লঙ্কাপুরে গিয়া সূৰ্পণখা রাবণকে ভৎসনা করিতেছে,—

“গুনগো রাবণ যেমত বারণ  
অক্ষুশ না হৈলে ধায় ।  
অমাত্য মধ্যত তুমি সেহি মত  
নিরঙ্কুশ গজ প্রায় ।  
গুন বাক্য মোর ভয় হৈল যোব  
দণ্ডকারণের মাঝে ।  
না জান অখন জানিবা তখন,  
পারিবা যখন কাজে ॥  
আপন নগবে, সুখ ভোগ করে,  
বিচার না করে দেশে ।  
শ্মশূনাগ্নি প্রায়, মানসে রাজায়,  
সে দেশের প্রজা শেবে ॥  
তোর কার্য কালে, নুপতি সকলে,  
আপনে না দেন রতি ।  
রাজ্য হয় নাশ, কার্যের বিনাশ,  
নষ্ট যায় নরপতি ॥”

খ। কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কতক রচিত, দুইখানি কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পুঁথি দেখা গেল। একখানিতে দ্বিজ রঘুরাম ও শ্রীনাথশর্মার এবং অপরখানিতে শ্রীদেবকী-নন্দনের ভণিতা আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রথম খানির রচনা মহারাজের মনোনীত না হওয়ায় শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। কবিতাগুলি পাঠ করিলে সেইরূপই মনে হয়—

“কামতা রাজ্যের পতি রাজশিরোমণি ।  
গুণাধার বেহার যাহার রাজধানী ॥  
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ নাম নৃপবর ।  
তার অধিকারত ময়নাগুড়ি গ্রাম ।  
সেহি গ্রামবাসী দ্বিজ নাম রঘুরাম ॥  
রামায়ণ বাগ্মীর তাহার আদেশে  
কাতর হইয়া ডাকে দীন রঘুরাম ।  
পায় কর ভবসিদ্ধ দীনবন্ধু রাম ॥



কত শত হস্তী হয়, দ্বারে আর বিরাজয়,  
 সেবে যাক নানাদেশী জনে ॥  
 নট ভাটগণ যারে, অনুক্ষণ স্তুতি করে,  
 গুণক প্রকাশে দেশে দেশে ।  
 বিদিত শাস্ত্রের মর্ম্ম, যাহার অসাধ্য কর্ম্ম,  
 নাহি কিছু জ্ঞাতসার শেষে ॥  
 তাঁহার আদেশরত্ন, পায়্যা করি বহুত্ন,  
 সুধাময় কথা রামায়ণ ।  
 ব্রাহ্মণ সন্তান অতি অল্পমতি প্রবদতি,  
 ভাষা বন্দে শ্রীদেবীনন্দন ॥”

গ। সুন্দরাকাণ্ড—ইহাতে মহারাজ হরেক্ষনারায়ণ ভিন্ন অত্র কাহারও ভণিতা দৃষ্ট হইল না। ইহাতে বোধ হয়, মহারাজ স্বয়ং ইহার রচয়িতা। তিনি একজন উচ্চ-শ্রেণীর কবি ছিলেন। তৎপ্রণীত কাব্যে যেমন শব্দলালিত্য তেমনি ভাবের বৈচিত্র্য। একরূপ কাব্য অনেক আধুনিক কবির লেখনী নিঃসৃত হইলে আমরা তাঁহাকে কবির উচ্চ আসন না দিয়া থাকিতে পারি না। ভণিতা যথা—

“ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে গান মনোনীত ।

বদ রাম অবিশ্রাম ভূপের রচিত ॥

অনুব্র—

রামনাম মুক্তিধাম বদ সভাসদ ।

শ্রীহরেক্ষ ভূপে ভণে রামায়ণপদ ॥”

এরূপ স্থলে মহারাজ হরেক্ষনারায়ণ বই আর কাহাকে ইহার রচয়িতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার কবিত্বের পরিচয় গ্রহণ করুন,—

“প্রতাপী সে কপিবর, নিরোধয় তাত পর,

লঙ্কেখর রাজা দশাননে ।

কোপাবিষ্ট দুরাশয়, ভীষণ লোচনবয়,

ভয় হয় তাক দরশনে ॥

মুখচয় মনোহর, যেন পূর্ণ নিশাকর,

চারু ভুরু ভঙ্গিম সুন্দর ।

নানা বণি রত্নময়, শিরে কিরীট শোভয়,

মুক্তাদাম তাত মনোহর ॥

যেন নীল মহীধরে, মণিশূক শোভাকরে,

তাত আর অরুণ কিরণ

লাগিলে হয়েন যেন, সেই প্রায় শোভিছেন,  
রাবণের কিরীট শোভন ॥”

ঘ। বিষ্ণুপুরাণ—গোবরাহড়া-নিবাসী মাধবচন্দ্র শর্মা ইহার রচয়িতা। যথা—

“মমুজ নিকরে সদা কবে যাব সেবা।

উপমা তাহার আর দিতে পারে কে বা ॥

সেহি দেবতার ভক্ত দেহীর ঈশ্বর।

এহি হরবংশজ নৃপতি পুণ্যতর ॥

ত্রীলত্ৰীহরেন্দ্রনারায়ণ অভিধান।

তাহার কল্যাণ সদা করুন ঈশান ॥

যার নিজ পরিবার মহাকবিগণ।

পুরাণ ভারতপদ করিছে রচন ॥

তাহার করুণাদেশ মজে অভিলাষ।

বিপ্রজাতি গোবরাহড়াতে নিবাস ॥

ত্রীমাধবচন্দ্র বিরচিত পদগণ।

মনে তার জগৎবন্দন নিরঞ্জন ॥”

ঙ। অতঃপর ধর্মপুরাণের বঙ্গানুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহারই মধ্যে কবির নাম, যাহার আদেশে ও উৎসাহে কাব্যখানি রচিত এবং যে সময়ে তাহা রচিত ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

“হরেন্দ্র নরেন্দ্রচন্দ্র গুণপারাবার।

করুন শিবের স্তুতা কল্যাণ তাঁহার ॥

অখণ্ড প্রতাপে হৈছে মার্ত্তণ্ড উজ্জল।

চণ্ড ভূজদণ্ড ভ্রমণে আখণ্ডল ॥

ত্রীশুরচরণপদ্ম মকরন্দ পানে।

মন মধুকর করে আনন্দ সঘনে ॥

খণ্ডিত কন্দর্পদর্প শরীর সুন্দর।

নিজ কুল কুমুদকোরকে শশধর ॥

নীতিবিশারদ বীর পরম সুস্থির।

অতুল অসীমকুলতিমিরমিহির ॥

দরবান্ ধৈর্য্য শৌর্য্য আদিগুণগণ।

কবির শক্তি কি বা করিতে গণন ॥

তাহার তাতে মনোবর মহাশয়।

ত্রীশচীনন্দন নাম গুণের নিলয় ॥

উদার শবিত্র চিত্ত চরিত্র যাহার ।  
 ইষ্টে তার শিষ্ট নিষ্ঠ মন হৈছে যার ॥  
 তাঁহার আজ্ঞায় মন করিয়া স্থতির ।  
 স্বগোচর বিশেষ করিতে নৃপতির ॥  
 ধর্মপুরাণের পদ অতি সুশোভন ।  
 যথাশক্তি বিরচিল শ্রীরামনন্দন ॥  
 কর মন পরকাল তরণ উপায় ।  
 লহ শ্রীগুরুর নাম বৃথা দিন যার ॥  
 কমল দলত জল যেমন চঞ্চল ।  
 দেহমধ্যে প্রাণ মন তেমন তরল ॥  
 ক্ষণমপি সজ্জনের সঙ্গ কর সার ।  
 সেহি সে তরণী ভবাবধ তরিবার ॥  
 যে কালে টুটিল সব কোকিলের মান ।  
 চাম্রদিকে শুনিলাম মণ্ডকের গান ॥  
 সে কালত বর্ষাধাতু করিল প্রকাশ ।  
 কর্কট রাশিতে ছায়াপতি নিল বাস ॥  
 সপ্তদশ দিনে তার শুন সভাসদ ।  
 সমাপ্ত হইল ধর্মপুরাণের পদ ॥”

৫। মহারাজ শিবেন্দ্রনাথায়ণেব রাজত্বকালে রচিত শিবপুরাণ-বঙ্গানুবাদ কোচ-  
 বিহারের পুস্তকালয়ে আছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনাথায়ণ ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ  
 পর্যন্ত কোচবিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। বৈষ্ণবনাথ নামক ব্রাহ্মণ এই  
 পুরাণখানি তাঁহারই রাজত্বকালে রচনা করিয়াছিলেন। শিবপুরাণ হইতে কিয়দংশ  
 উদ্ধৃত হইল,—

“প্রসন্ন বদন সুন্দর শাস্ত ।  
 শারদইন্দুসম দীপ্তিমন্ত ॥  
 নানাবিধ রত্ন বিচিত্র অঙ্গ ।  
 অনঙ্গের অরি জিনি অনঙ্গ ॥  
 মুকুট চক্রে অর্ধে অলঙ্কৃত ।  
 কপূরকুঙ্কমরাগরঞ্জিত ॥  
 ললাটমধ্যস্থ অরুণ নেত্র ।  
 সেহি নেত্র সনে আছে অন্তর ॥

ভণিতি

পদ্যগুণ যেন লোচনদয় ।

করুণানিধান করুণাময় ॥

গুণসমূহের মধ্যে তার প্রভূতা ।

বাড়ুক নন্দনবনে যেন কল্ললতা ॥

তাহাতে অভয় লইতে কবি আশা ।

দ্বিজ বৈষ্ণবাথ সত্তা বিরচিল ভাষা ॥”

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পরে আর কাহার রাজত্বকালীন কোন গ্রন্থ কোচ-বিহারের পুস্তকালয়ে দেখিলাম না। তবে উপকথা নামে একখানি কাব্য পাইলাম, তাহাতে গ্রন্থকারের নাম বা গ্রন্থরচনার সময় জানা গেল না—না যাঁউক, কিন্তু উপকথার রচনা উল্লেখযোগ্য। তাহার স্থানে স্থানে কবিব কুতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন মাতামহীগণ যে “রাজপুত্র, পাত্রের পুত্র” অবলম্বনে উপকথা বলিতেন, ইহাও সেইরূপ একটা গল্প। ইহাতে রাজপুত্র ও পাত্র (মন্ত্রী) পুত্রের পরস্পর মোহাদ্যের পরিচয়, একত্র বিজ্ঞাশিক্ষা, দারপরিগ্রহ, ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপারের বিবরণ, রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রের স্ব স্ব কর্তব্যতাপ্ধলন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন রাজপুত্রকে সাংসারিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবির বিলক্ষণ বর্ণনাচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়।

“নমো পঞ্চবাণ-অরি,

পিণাক ত্রিশূলধারী,

অরারি শোধন কামাস্তক ।

বিভূতি বিভূতি যার,

নমো দেব নাগহার,

দিগম্বর দেবের নায়ক ॥

পার্কীতীমনোরঞ্জন,

স্বরূপত্ব নিরঞ্জন,

নিরাকার পুরুষপ্রধান ।

যার আদি মধ্যাহ্ন,

শক্তি ভক্তি সুপ্রবীণ,

যার গুণ বেদে করে গান ॥

বারাণসী মুক্তিধাম,

তব গুণে অল্পপান,

এ জগতে নাহি যার সম ।

সে দেশের অধিকারী,

তুমি নাথ শূলধারী,

নমো দেব পুরাণ উত্তর ॥

জটাতটে গঙ্গাবাস,

তাহার অরণে নাশ,

কোটীজন্মার্জিত পাপচর ।

তার দানে লোকগণে,

প্রীতি ভক্তি পূত মনে,

অনায়াসে সব মুক্ত হয় ॥



উত্তরী বসন, অঙ্গ আচ্ছাদন,  
করিল ভূপতনয় ॥  
সন্ধ্যা কতক্ষণে, হইল তখনে,  
হস্তোদকের সময় ।  
হস্তোদকক্রিয়া, পাছে সমাপিয়া,  
রহিল নৃপতনয় ॥  
পর কথা শুন, হইয়া নিপুণ,  
করহ সবে শ্রবণ ।  
পাত্ৰীক তখন, আসি আয়োগণ,  
করাইল স্নান মার্জন ॥  
উল্লস মঙ্গল, করি কুতূহল,  
কিবা শোভা মনোহর ।  
হার মুকুতার, তার পরে হার,  
দিছে করি হই ছড়া ॥  
শ্রবণে শোভিত, করি মনোনীত,  
কর্ণকুণ্ডল রত্নময় ।  
নাসারে আশায়ে, যেন মধু খায়ে,  
কেশব ভ্রমর প্রায় ॥  
পাইয়া তিল ফুল মজ্জা অলিকুল,  
রৈছে পানে মত্ত হৈয়া ॥ ইত্যাদি  
\* \* \* \* \*  
কুলপুরোহিত, আসি যথোচিত,  
আরম্ভিলা যজ্ঞবয়ে ।  
পরে কতক্ষণে, ক্রিয়া সাক্ষ হলে,  
চলিলেন অন্তঃপুরে ॥  
অন্দরে মঙ্গল, করি কুতূহল,  
ক্রিয়াচয় সমাপিল ।  
পিতায় মাগিয়া, কঙ্কার লইয়া,  
আপন দেশে চলিল ॥”

ইহার পর আর একখানি কাব্যের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।  
সেখানি মহাকবি লক্ষ্মণ গোস্বামীকৃত গীতগোবিন্দের বল্লভবাদ। অল্পবাদক জগৎসিংহ।  
এইখানি ঋগ্বেদ, শেখাংশ অতি অল্পই নাই। রচনা দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকারের নিবাস



কোচবিহার বা তম্রিকটবর্তী কোনস্থান, তিনি যে রাজা মহারাজ বা তদনুরূপ কাহার উৎসাহ-আহুকুল্যে গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। তাঁহার অনুবাদের ভাষাও কোচবিহার বা তৎসম্বন্ধিত রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সেকালের ভাষা। অনুবাদক স্বয়ং একটি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“জয় জয় নম জগজ্জীবন মুরারি ।  
 গোবর্দ্ধনধারী গোপীজনপ্রিয়কারী ॥  
 কংগকেশীমথন মোহন বেশ যার ।  
 করোক কল্যাণ সেতি দেবকৌকুমার ॥  
 ত্রিভুবননাথ দেব নমো ত্রিপুরারি ।  
 ভক্ত জনাব ভবভয়হুঁহারী ॥  
 অর্দ্ধ অঙ্গ পীত বস্ত্র অর্দ্ধ বাঘছাল ।  
 বনমালা অর্দ্ধ অঙ্গে অর্দ্ধ গুণ্ডমাল ॥  
 শঙ্খ চক্র ত্রিশূল ডমরু শোভা করে ।  
 অর্দ্ধচন্দ্র মুকুটমণ্ডিত নিরন্তবে ॥  
 অর্দ্ধ অঙ্গে কমলা ভবানী অর্দ্ধ অঙ্গে ।  
 করোক মঙ্গল হরিহর মহারঙ্গে ॥  
 নমো নারায়ণী গোবী শঙ্করের জায়া ।  
 অতীষ্টদায়িনী নমো দুর্গা মহামায়া ॥  
 লক্ষ্মীরূপে জগতের বিভূতিদায়িনী ।  
 সরস্বতীরূপে বাক্যপ্রকাশকারিণী ॥  
 প্রণবহ ব্যাস সত্যবতীর নন্দন ।  
 যার মুখকমলগলিত বেদগণ ॥  
 ভাগবত আদি অষ্টাদশ যে পুরাণ ।  
 নিস্তারে জগৎ অমৃতক করি পান ॥  
 নমো শুকদেব আদি কবিশ্রমিগণ ।  
 নিজগণং চরণক করহ বন্দন ॥  
 কিছু বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার ।  
 জগৎসিংহ ভণে গীতগোবিন্দ পরায় ॥”

জগৎসিংহের অনুবাদ এতই সুশ্রাব্য যে, ইচ্ছা হয় সমস্তই এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সকলকে উপহার দিই। অনুবাদে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য্যরক্ষার জগৎসিংহ সর্বতোভাবে কৃতকার্য হইয়াছেন বলা যায়। গ্রন্থদেবের কবিতাপাঠকালে শব্দের সঙ্গে যথার্থ ভাব

যায়, মন নাচিতে থাকে, জগৎসিংহের অন্নবাদেও সেইরূপ হয়। পাঠকগণ দশাবতার-  
স্তোত্রের অন্নবাদ পাঠ করুন, পচাৎ সুবিধা হয় অগ্র স্থান হইতে একটুকু নমুনা দিব।

“প্রলয়পয়োধিজলে তল বায় বেদ।

মৌনরূপে কেশব খঙালে তার খেদ ॥

নৌকার চরিত্রে ভাগবত কৈলা পার।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥

কচ্ছপ স্বরূপে দেব দেবলক্ষ্মীপতি।

পৃষ্ঠত ধরিল। নিপুলতর ক্ষিতি ॥

ধরণীধরণ কর চক্রের আকাব।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ২ ॥

পুনরপি গোবিন্দ শূকর রূপ ধবি।

ইঙ্গিতে ধরণী লৈল দশনত করি ॥

কলঙ্ক লইয়া যেন শোভা চন্দ্রমার।

জয় জগদীশ হবি নন্দের কুমার ॥ ৩ ॥

নরহরি রূপে কৈলা হিরণ্য বিদার।

কবপদ্মনখোদ্ভূত শৃঙ্গের আকার ॥

ভৃঙ্গে কমলক যেন করিয়া বিদাব।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৪ ॥

বামন স্বরূপে বলী করিলা ছলন।

পদনখনীরে গঙ্গা হৈলা উৎপাতন ॥

সেই গঙ্গা জগতক কবেন নিস্তার।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৫ ॥

ভৃগুপতি রূপে ক্ষত্রি করিলা সংহার।

ক্ষত্রিয় শোণিতে হৃদ বহাল্য অপার ॥

তাত আনি নরে পাবে সংসারে নিস্তার।

জয় জগদীশ তুরি নন্দের কুমার ॥ ৬ ॥

হলধর রূপে নীল চক্রনে শোভিত।

মিলিছে যমুনা যেন পায়। হল ভীত ॥

যেত অঙ্গে নীলবস্ত্র জলদ স্তম্বর।

জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৭ ॥

নিম্না করি যন্ত বিধি শ্রুতি আদি করি।

সদয় জয় হৈল বুদ্ধরূপ ধরি ॥

পশুবৎ দেখি রূপা জন্মিল অপার ।  
 জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৮ ॥  
 ককীরূপে অঙ্কিত করে ধরি বাণ ।  
 শ্লেচ্ছ রাজগণক করিয়া বিনাশন ॥  
 ধূমকেতু সদৃশ রূপ অতি ভয়ঙ্কর ।  
 জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥ ৯ ॥  
 মীনরূপ ধরি তুমি বেদ উদ্ধারিলা ।  
 কুশ্মীরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠেত ধরিলা ॥  
 বরাহরূপেত পৃথ্বী দন্তে লৈলা তুলি ।  
 নরহরি রূপে হিরণ্যক নখে পেলি ॥  
 বামন স্বরূপে বলী করিলা ছলন ।  
 ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রি কৈলা বিনাশন ॥  
 রামরূপে রাবণক বধিলা সমরে ।  
 হনুমান রূপে সে লাক্ষ্মণ লৈলা করে ॥  
 বোদ্ধরূপ ধরি হৈলা পরম উদার ।  
 ককীরূপে শ্লেচ্ছগণে করিলা সংহার ॥  
 দশবিধ রূপ কৃষ্ণ কবি নমস্কার ।  
 পূর্ণব্রহ্ম সনাতন জগৎ উদ্ধার ॥” ইত্যাদি

বঙ্গদেশের রাজগণ চিরদিনই কাব্যামোদী । তাঁহারা কবিদিগের আদর যত্ন করিতেন, তাঁহাদের অশন, বসন ও পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ করিয়া রাখিতেন, আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাই । কিন্তু কোচবিহার-রাজ-বংশের পূর্বপুরুষ মহারাজগণের পূর্বোক্ত সাহিত্যিক কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি সাধারণের অগোচর রহিয়াছে, ইহা বড়ই হৃৎথের বিষয় । কোচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ মহাশয়কে অনুরোধ করি তাঁহার রূপাঙ্কিত বাঙ্গালাসাহিত্যের এই মহৎ অস্তাব সহজেই দ্রুত হইতে পারিবে । আলোচিত কাব্যগুলি বাঙ্গালাসাহিত্যে কোচবিহার-রাজবংশের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্বরূপ ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত ।

## জীবগণের রোম ও কেশের একটি নতুন ব্যবহার

‘রোম ও কেশ থাকায় পশুগুলি মোটামুটি যে যে উপকার লাভ করে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেগুলি এই :—

(১) লোমগুলি তাপ-অপরিচালক বলিয়া উহা পশুররীরকে শীত ও আতপ হইতে রক্ষা করে।

(২) লোমগুলি পশুদেহে একরূপ ভাবে অবস্থিত যে বৃষ্টির জল সহজে পশুর দেহকে আর্দ্র করিতে পারে না। জল গা বহিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়। উপরে রোমগুলি ভিজিয়া গেলেও ভিতরের চর্ম আর্দ্র হইতে পারে না।

(৩) রোমগুলি পশুদেহকে বিবিধ আঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা করে।

উপরি উক্ত তিনটা উপকাৰ ব্যতীত রোম থাকায় পশুগণের আর একটি পরম উপকার হয় বলিয়া আমার মনে হইতেছে। সেটা এই :—

রোম থাকায় পশুদেহ হইতে আঘাতজনিত রক্তস্রাব হইলে সে রক্ত জমিয়া গিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক।

যুদ্ধ করিবার সময় পরস্পরের নখ শৃঙ্গ ও দন্ত প্রভৃতির আঘাতে বা প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় বিবিধ কঠিন পদার্থে প্রতিঘাতনিবন্ধন পশুদেহ সহজেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে। ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে রক্তক্ষয় জন্ত পশুটির ক্রমশঃ বলহীনতা ও পরিণামে মৃত্যুও ঘটতে পাবে। কিন্তু জীবদেহ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার প্রকৃতির এক অপূৰ্ণ উপায় আছে। রক্ত যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে ততক্ষণ উহা জলের ছায় তরল থাকে। কিন্তু শরীর হইতে বাহির হইবার অল্পক্ষণ মধ্যেই রক্ত জমিয়া যায়। আঘাত অল্প হইলে আহত স্থানের উপর একবিন্দু রক্ত আসিয়া জমে। অল্পক্ষণ মধ্যে রক্তবিন্দুটা জমাট বাঁধিয়া আহত স্থানের শিরা বা ধমনীগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে রক্তস্রাব মিবারিত হইয়া থাকে। শরীর এইরূপে নিজেই নিজেকে রক্ষা না করিলে কোনও কৃত্রিম উপায়েই রক্তস্রাব নিবারণ করা যাইত না। কারণ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি খুলিয়া দিবার পর হইতেই পুনরায় সে স্থান হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে। অথচ কোন স্থান খুব বেশী ক্ষণ জোরে বাঁধিয়া রাখা হিতকর নহে, কারণ রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া সে স্থানটাও ক্রমশঃ রুগ্ন হইয়া পড়িবে।

কিন্তু লোমের দ্বারা রক্ত জমাট বাঁধিবার পক্ষে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সুবিধা হয় বলিয়া আমি অনুমান করি :—

আঘাতটা যখন অন্ন হয় তখন প্রথম রক্ত-ফোঁটাটার পর দ্বিতীয় আর একটি ফোঁটা আসিতে অনেকটা বিলম্ব হয়। ঠাঁহার মধ্যেই প্রথম ফোঁটাটা জমিয়া রক্ত-স্রাব বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় ফোঁটাটিকে আর বাহির হইতে দেয় না। কিন্তু আঘাতটা যদি কিছু গুরুতর হয় তাহা হইলে প্রথম ফোঁটাটা জমিবার পূর্বেই দ্বিতীয় ফোঁটাটা উহাকে স্থানচ্যুত করিবে এবং এইরূপে দ্বিতীয়টিকে তৃতীয়টা ও তৃতীয়টিকে চতুর্থটা স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। এরূপস্থলে রক্তরোধ করা যে শক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশুদেহে লোমের অস্তিত্ব-নিবন্ধন রক্তবিন্দু সকলের গতি ব্যাহত হয়; উহার সহজে ভূপতিত হয় না; আঘাতস্থানকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকের কেশগুলিকে ভিজাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। রক্তার্দ কেশগুলির পরিধিদেশের রক্ত প্রথম জমিয়া যায়। জমাট-রক্তের সংস্পর্শে যে নূতন রক্ত আসে তাহাও সত্ত্বর জমিয়া যায়। এইরূপে রক্ত পরিধি হইতে কেন্দ্রাভিমুখে জমাট বাঁধিতে আবস্ত করে। রক্তের চাপ ও কেশগুলি প্রথমতঃ আহত স্থান হইতে আগত বক্ত্রস্রোতের বেগ কমাইয়া দেয়। এবং বেগ যখন কমিয়া আসে তখন আহত স্থানের রক্তবাহী নলগুলির মুখও বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কেশের অস্তিত্ব আহত স্থানে রক্তরোধের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনুষ্য-দেহে রোমের বিবলতাবশতঃ আহত স্থানে এক টুকরা শুষ্ক নেকড়া জড়াইয়া লইলে পূর্বোক্ত উপায়ে সত্ত্বর রক্তরোধ হইয়া থাকে।

তবে আঘাত যখন খুব গুরুতর হয় তখন মুছুরী আসিয়া জংপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃতি-মাতা পশুকে রক্তরোধ-কার্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## বঙ্গভাষায় বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ \*

অতি প্রাচীনকালে আমাদের স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণ যখন বেদগান করিতেন, তখন তাঁহার যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেইরূপই বর্ণযোজনা করিতেন। তাহার পর বৈদিক-ভাষা যখন সংস্কৃতে পরিণত হয়, তখনও বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। প্রাকৃতো এই সামঞ্জস্য পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রাকৃত বিবর্ত-বশে ক্রমশঃ যে সকল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষা তাহার মধ্যে একটি। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের পরিণাম হইলেও, এবং সংস্কৃত ইহার মূল হইলেও, ইহার বর্ণ-যোজনা ও উচ্চারণ অনেক স্থলেই পরস্পর-বিসংবাদী।

এই বিসংবাদেব কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, বৌদ্ধ-যুগে বুদ্ধ-দেবের ইচ্ছানুসারে, শাস্ত্রাদি-লিখন ও কথোপকথন—উভয় কার্যের জন্তই, পল্লীর প্রাকৃতেরই অত্যধিক ব্যবহার হইত, এবং সংস্কৃতের প্রতি অতি অল্প লোকেরই পূর্বের মত আস্থা দৃষ্ট হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুদ্বোধের সহিত প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। যুগপৎ, সর্বত্র, একদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধীত বিবরণের সংস্কৃতে আলোচনা, এবং অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা—এতদ্বয়ের ফলে পুরাতন পল্লী-প্রাকৃত সহসা জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং এক নূতন প্রাকৃত জন্ম-পরিগ্রহ কবে। অশিক্ষিত ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায় সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরক্ত; শিশুর অঙ্গ-পুষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন—তাঁহাদিগের এমন ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ও তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রথম যৌবনে যাহাতে সে বিপথগামী না হয়, সংস্কৃতের কুল-গোরবে যাহাতে সে গৌরবান্বিত হয়, সংস্কৃত-সেবিগুণ অভিভাবক হইয়া অনবরত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অভিভাবকের আদেশে ও যত্নে বালকের বেশ-ভূষা ও আকৃতির অনেকটা “সংস্কার” হইল বটে; কিন্তু তাহার “অন্তঃপ্রকৃতি” সেই “বহিঃ-সংস্কারের” অনুমোদন ও অনুসরণ না করায় উভয়ের মধ্যে বৈষম্য রহিয়া গেল।

ভাষা-বিজ্ঞানের পারিপাট্যে সংস্কৃত অভুলনীয়। ভাষায় যতগুলি উচ্চারণ, ঠিক ততগুলি বর্ণ সংস্কৃত-বর্ণমালায় স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের একটি মাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ। অতএব সংস্কৃতভাষায় অক্ষর-যোজনা ও উচ্চারণের মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যস্বাবী।

প্রাকৃত সংস্কৃতের মত শিক্ষিত লোকের ভাষা নহে,—সাধারণের ভাষা। ইহার বর্ণ-মালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু সংস্কৃত সকল বর্ণই ইহাতে স্থান পায় নাই। সকল স্থলে এক রূপ বর্ণ-মালা-ব্যবহারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শব্দবিশেষের



পরাকৃত ছন্দ।' তাঁহারা সাধারণেব জ্ঞাত সংস্কৃতশাস্ত্রাদির 'পুণ্যকথা' 'প্রাকৃত-কথনে' লিখিলেন বটে; কিন্তু সংস্কৃত মূল্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ-বিভাগ-প্রণালীর সংস্করণে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু লিখিত রচনায় সংস্কৃতপরায়ণ হইলেও, কথোপকথনের সময় তাঁহারা প্রাকৃত বাঙ্গালাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। সুদীর্ঘকাল সংস্কৃতের আলোচনা এবং প্রাকৃতের বহুবিস্তার হেতু, অল্পবিধ প্রাকৃতের মত বঙ্গদেশেব প্রাকৃতও কতকগুলি সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ না হওয়ায়, তাহাদের উচ্চারণ-প্রণালী সকলেবই অবিদিত ছিল। সংস্কৃতসেবিগণও সাধারণের মত প্রাকৃতভাবী ছিলেন—বাঙ্গালাতেই কথা কাহিতেন। সংস্কৃতের মত উচ্চারণ করিতে হইলে তাঁহাদিগেরও নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষায় এবং অভ্যাসে কেহই অধিক সময়োপার্জন করিতে চাহিলেন না। অতএব যে যে সংস্কৃত-বর্ণের উচ্চারণ অনায়াসসাধ্য, বাঙ্গালায় কেবল তাহাই প্রযুক্তি হইল; যথা, র-ফলা—বক্র, চক্র, প্রভৃতি; পদেব অস্থস্থিত বিসর্গ আঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি। কিন্তু যে যে স্থলে উচ্চারণ অনায়াসসাধ্য, তথায় বর্ণযোজনা-প্রণালীর সংস্কার হইলেও, উচ্চারণ পূর্ব্বের প্রাকৃতের মত রহিয়া গেল; যথা—‘ম’-যোগ—আত্মা, কাম্বাণা; ‘ব’-ফলা—বাক্য, সভা।

বাঙ্গালায় যে সকল বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে অভিন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে বর একটাও নাই; সব ব্যঞ্জন! যথা—

অসংযুক্ত—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ (শৌরসেনী) ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন (পৈশাচী), প, ফ, ব, ভ, ম, য (নাগধা), ব, ঞ, শ (মাগধী), হ, ঙ।

সংযুক্ত—ক, ক্খ, গ্গ, গ্ঘ, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, ঞ্জ, ট্ঠ, ট্ঠ, ড্ড, ড্ঢ, ত্ত, থ্খ, দ্ধ, দ্ধ, ন্ধ, ন্ধ, য্য়, (পৈ), ঞ্জ, প্ফ, ব্ভ, ভ্ভ, স্ব, ঞ্জ, ল্হ, শ্শ, (না), ঞ্জ, ঙ্গ।

[বাঙ্গালায় অনেকস্থলে অ-কাবের উচ্চারণ প্রাকৃত হইব ওকারের মত। যথা—অতুল, অদা, অরি, অসি, প্রভৃতি। কেবল অ-সংযুক্ত অণ্ডায় বা শব্দের আদিতেই যে এরূপ হয় তাহা নহে। যথা—ক্ষতি, পক্ষী, লক্ষণ, মত, সভা। ‘অদম্’ শব্দ হইতে নিম্ন বাঙ্গালা ‘অ-রা’ (ওরা), ‘ও’ (অ, অসমীয়া সম্বোধনসূচক ‘অ’), ‘অই’ (ওই, ঐ) প্রভৃতি পদগুলির আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। (১) পদের মধ্যে (কথোপকথনের সময়) এবং পদের অন্তে (লিখিত ভাষায়ও), অনেক স্থলে ‘অ’-কারের উচ্চারণ হয় না। যথা—(১) ভাবনা, কলসী, সয়তান; (২) আলাপ, উচিত, ভীষণ, মরণ, স্বথ প্রভৃতি। রাজনারায়ণ, রামমোহন, হেমচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি নামের মধ্যে এবং পাঠশালা, যুগলরূপ, ফলমূল প্রভৃতি ‘সমস্ত’ শব্দের মধ্যে যে অপ্রচলিত ‘অ’-কার দৃষ্ট হয় তাহা রূপান্তরিত পদান্তস্থিত ‘অ’-কার। এতদ্ভিন্ন বাথা, ব্যক্তি, ত্যক্ত, ব্যতীত প্রভৃতি শব্দে ‘অ’-কারের অপর দুইটা উচ্চারণ লক্ষিত হয়।

" 'আ'-কারের উচ্চারণ সকল স্থলে দীর্ঘ ( ইংরাজী fatherএর মত ) নহে। দৃঢ় সম্মতি-সূচক হাঁ ( যথা ■ আমি বাবুই ) এবং কনিষ্ঠের প্রতি অগুরুসূচক ‘যা’ ( যথা—



বা, বলছি ) বেক্রপভাবে উচ্চারিত হয়, সন্দেহহৃচক 'ই' ( যথা—ঠা, তুমি আমার কথা শুনবে? ) এবং অবজ্ঞাহৃচক 'বা, যা' সেক্রপ ভাবে উচ্চারিত হয় না ; ইংরাজীতে and, at প্রভৃতি শব্দে 'a'র বেক্রপ উচ্চারণ ইহাদিগেরও সেইরূপ উচ্চারণ হয়। খ্যাতি, কল্যাণ, উপাখ্যান, ব্যাস, বক্সা, হত্যা প্রভৃতি 'য'-ফলাসংক্রান্ত শব্দেই এই আকার অধিক লক্ষিত হয়। 'য'-ফলা-যোগেব জন্মই এক্রপ উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হয় না। কারণ 'সন্ধ্যা', 'মিথ্যা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বিক্সা', 'অগস্ত্য', 'মৎস্ত', প্রভৃতি শব্দের আমরা 'য'-ফলা-বর্জিতের মতও উচ্চারণ করি।

বাঙ্গালায় 'ই'-কার, 'উ'-কার ও 'ও'-কারের উচ্চারণ অনেকস্থলে অপর স্বরের উচ্চারণ-সাপেক্ষ—ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় যুক্তস্ববেব Diphthong পরবর্তী অঙ্গের মত। 'ই' যথা—অই, মই, সই ; তাই, ভাই ; উই, শুইল ; ভুই ; এই, নেই ; 'উ' যথা—নাউ ; কেউ, ফেউ ; 'ও' যথা—হও, নাও, শোও, প্রভৃতি।

ভীষণ, উদ্ধে, ততোহধিক প্রভৃতি শব্দে 'ঈ', 'উ', 'এ', 'ও'র উচ্চারণ দীর্ঘ হইলেও, ঈষৎ, উরু, একটু, ওসাব প্রভৃতি শব্দে বাঙ্গালায় আমরা বদচ্ছাক্রমে হ্রস্বোচ্চারণই অধিক করি। এক, খেলা, যেন, বেঁলা প্রভৃতি শব্দের 'এ'-কারের উচ্চারণ পূর্বনির্দিষ্ট আকারের ( and, at প্রভৃতির 'a' র ) উচ্চারণের মত।

বাঙ্গালায়, সংস্কৃতের প্রভাবে প্রাকৃতে অব্যবহৃত কতকগুলি বর্ণ তাহাদিগের প্রাকৃত-বিকৃতির স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণ ( ১ ) মূল সংস্কৃতের ও কতকগুলির ( ২ ) মূলের প্রাকৃত বিকৃতির মত।

( ১ ) 'ঐ' ও 'ঔ' এই দুই স্বরের উচ্চারণ, সংস্কৃতে বেক্রপ, বাঙ্গালায়ও সেইরূপ। কিন্তু কথোপকথনে, প্রাকৃতে তাহাদিগের যে বিকৃতি হইত, তাহার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। যথা—গেরি ( গৈরিক ), তেল ( তৈল ), ওরশ ( ওরস ), ওত্তদ ( ওষধ ), ওক ( ঐক্য ), বেহাই ( বৈবাহিক ) প্রভৃতি।

প্রাকৃতির মত, আধুনিক সাহিত্যের বাঙ্গালায়, 'ও' এবং 'ঐ' অক্ষরদ্বয় ও ইহাদের উচ্চারণ, অতি-বিরল হইলেও, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষতঃ চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতিতে ইহাদের অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়, পদান্তস্থ বিসর্গ এবং পদমধ্যস্থ ও পদান্তস্থ 'য়' ( অনেক স্থলে ) সংস্কৃতের মত উচ্চারিত হয়।

জু ( কখনও কখনও, 'সুস্র' ), ( অন্তঃস্থ ) 'ত্র' 'ক্র' 'ষ্ট্র' 'শ্র' ও 'ক্ল' ব্যতীত যাবতীয় 'য়'-ফলা সংযুক্ত বর্ণ ; 'ক্র' 'ম' 'প্ল' 'ল্ল' এই কয়েকটি 'ল'-কারসংযুক্ত বর্ণ ; 'ল্য' 'লব' 'ল্ম' ; যেক-সংযুক্ত বর্ণ (কথোপকথনে অনেক স্থলে প্রাকৃতবৎ), 'ক্ল' 'ল্ল' 'ল্ড' 'ল্ম' 'ল্ত' 'ল্হ' 'ল্ফ' 'ল্চ' 'ল্ছ' প্রভৃতি বর্ণ ও তাহাদিগের উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

( ২ ) এক্ষণে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত যে সকল বর্ণের উচ্চারণ তাহাদের প্রাকৃত-বিকৃতির মত, তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণের প্রয়োজন।

আমরা বাঙ্গালায় কেবল ‘ঋ’-বর্ণ নহে ‘ৱ’-কারেরও অস্তিত্ব স্বীকার করি। কেহ কেহ আবার তন্ন ও অনন্নদমঙ্গলের ‘ঋ’-কাররূপিনী পড়িয়া ‘ৱ’-কারেরও গ্রহণ করেন এবং বোধ হয় তাহার ‘লী’ ‘লী’ বা এইরূপ আর একটা উচ্চারণ করেন। ‘ৱ’-কার সাধারণতঃ ‘লি’ এইরূপ উচ্চারিত হয়। প্রাকৃতেরও ‘ৱ’-কারের ঐরূপ পরিণতি হয়। ‘কৱন্ত’ প্রাকৃতে ‘কিলিত’ আকার ধারণ করে। ‘ঋ’-কাব ও ‘ঋ’-কাবের প্রাকৃতে নানারূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয়। ঋণ, তুষা প্রভৃতি শব্দে ‘ঋ’-কারের যে উচ্চারণ তাহা প্রাকৃতেই। গব্য-‘ব্রত’ কথাটির পরিবর্তে যে গব্য-‘ব্রত’ শুনায় তাহা, এখন হাসির কথা হইলেও, এক সময়ে মাগধীতে প্রচলিত ছিল। ‘ঘিঅ’ ( ঘি ) কথাটিও শোরসেনী, শকাবি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত। ‘কুম্ভ’ ‘কুম্ভ’ ‘তৃপ্তি’ প্রভৃতি শব্দের সাধারণে ‘কেষ্ট’ ‘কিত্তিম’ ‘তিবিত্তি’ প্রভৃতি যে সকল উচ্চারণ করে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃত-সঙ্গত। ‘ঋ’-কারের উচ্চারণও ‘বী’ এইরূপ। যথা—পিতৃণ ( পিত্রীন্ )

‘ণ’ ও ‘য’ র পৃথক উচ্চারণ বাঙ্গালায় আদৌ নাই—যুক্তাক্ষরেও নহে। পৈশাচী ভাষার প্রভাবে ‘ণ’ ও মাগধী ভাষার প্রভাবে ‘য’, মক্কাভট্ট, বর্ণাক্রমে ‘ন’ ও ‘শ’র মত উচ্চারিত হয়। অসংযুক্ত অবস্থায়, এবং অনেক সময় যুক্তবর্ণেও, ‘স’, মাগধীর প্রভাবে ‘শ’র মত উচ্চারিত হয়। ‘শ’-কাবও শোরসেনীর প্রভাবে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরে ‘স’-কারের মত উচ্চারিত হয়। ‘মাণিক-চাঁদের গান’ প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় শোরসেনীর এই প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ‘শীতল’, ‘পুষ্কেষর’, ‘দর্শন’ প্রভৃতি ( ‘সিতল’ = ) ‘সীতল’, ‘পুষ্ক-সর’, ‘দরিসন’ প্রভৃতি রূপান্তর শোরসেনী-প্রভাবাক্রান্ত। ‘য’-কারের উপর বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যতীত মাগধী ও শোরসেনী ভাষা-দ্বয়েরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানে শোরসেনীর প্রভাব সেখানে, আমরা লিখি ‘য’ ও উচ্চারণ করি ‘জ’। যথা—যে, যদি। আর যেখানে মাগধীর প্রভাব সেখানে আমরা ‘য়’ লিখি ও উচ্চারণ করি। যথা—রায় ( রাজন্ )। ‘শয়ন’, ‘বায়ু’ প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হয়। কথোপকথনে অনেক সময় ( প্রাকৃতেই মত ) ‘য়’-কারের উচ্চারণ হয় না ; তৎসংশ্লিষ্ট স্বরেরই কেবল উচ্চারণ হয়। যথা, ময়ূর ( মউর ), নেয়ে ( নেএ = নাবিক ), যাইয়া ( যাইআ ) প্রভৃতি। বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ ‘ব’-কারের অনেক সময়েই ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু বর্ণা ‘ব’ হইতে তাহার আকৃতি বা উচ্চারণ গত কোন ও ভেদ বাঙ্গালায় লক্ষিত হয় না। আমরা ‘ইওয়ার’, ‘খাওয়ার’ প্রভৃতি উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু যখন ‘হবার’, ‘খাবার’ প্রভৃতি লিখি তখন নহে। এইরূপ, ‘কৈবর্ত’ ও ‘আবর্তন’ হইতে ‘কেওট’ ও ‘আওটান’ ( বা ‘আওড়ান’ ) বলি বটে ; কিন্তু ‘কেবট’, ‘আবটান’ প্রভৃতি লিখি না। ‘উ’র, উচ্চারণ ‘ঃ’-এর মত।

‘য’-ফলা-সংযুক্ত বর্ণে ‘য’-কারের উচ্চারণ হয় না। যথা—মৎস্ত, অগস্ত্য, বিদ্যা প্রভৃতি। কেবল একাধিক বর্ণের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, যাহার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার দ্বিকৃতির মত উচ্চারণ হয়। বাস্ত, অব্যয়, সভ্য প্রভৃতি শব্দে ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ‘ত’-র উচ্চারণ

কখনও কখনও ‘দজ্জ’, ও ‘জ্জ’ও হয় ; যথা—‘উদ্জোগ’ ( উজোগ ) বা ‘উজ্জোগ’, এবং ‘হ্জ’র উচ্চারণ ‘জ্জ’র মত হয় ; যথা—বাহ্জ, সহ্জ ।

শব্দের আদিতে, কেবল ‘য’-ফলা-সংক্রান্ত বর্ণের নহে, দিকান্তবৎ উচ্চাৰ্য্যমাণ যুক্ত-বর্ণ-মাত্রেরই, উচ্চারণ অসংযুক্ত-বর্ণের মত হয় । যথা—‘ব’ ফলা, —বাক্তি ; ‘ব’-ফলা-কাধ ; ‘ক্ষ’—ক্ষীর ।

যেদ-সংযুক্ত-বর্ণেও চলিত-ভাষায় প্রাকৃতের প্রভাব বর্তমান । তর্ক, মূর্গ, স্বর্গ, অর্ঘ্য প্রভৃতি শব্দের তর্ক, মুক্খু, শগ্গ, অগ্ঘি প্রভৃতি উচ্চারণ নিতাই আমাদের প্রতিগোচর হয় ।

‘ষ’ ও ‘ষ্ব’-ন্যাত্মক ‘ব’-কাব-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ‘য’-ফলা-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণের মত । যথা—পৃথী, অঘয়, বিব্জ, অশ্ব প্রভৃতি । আদিতে অসংযুক্ত-বর্ণবৎ ; যথা—ইক্, স্বর্গ ; একা-ধিক-বর্ণ-যোগে ‘ব’-কাব অনুকারিত ; যথা—সাম্বনা, হৃন্দ ।

অনুমানসিক-বর্ণে ‘ম’-কার-সংযোগ হইলে তাহার উচ্চারণেও ‘ব’-প ‘ব’-যুক্ত বর্ণের মত, প্রাকৃতপ্রভাব দৃষ্ট হয় । যে বর্ণের সহিত ‘ম’ যুক্ত থাকে, তাহার দিকান্তি বা অনুমানসিক উচ্চারণ হয় । যথা—কাক্মণী ( কাকি না ) ; বিষয় ( বিশ্শয় ) ।

‘শ্ৰ’ ( ও ‘শ্ৰ’=‘শিন’ ), ‘গ্ৰ’ ( কখনও কখনও ) ও ‘শ্ৰ’-ব ‘শ’-কারের ( ‘স্’ ) উচ্চারণে শৌরসেনীর প্রভাব লক্ষিত হয় । যথা—শ্রগাল ( শ্রিগাল ), শ্রত ( শ্রুত ), শ্রগ্ন ( শ্রম ), শ্রথ ( সুথ ) ।

‘ৎস’, ‘প্স’, ‘ক্ষ’, ‘ম্প’, ‘ম্ম’, ‘ম্ম’ ও ‘ম্ম’-র ‘স’-কাবের ( ‘শ’ ) উচ্চারণে নাগধীর প্রভাব লক্ষিত হয় । যথা—উৎসাহ ( উৎসাহ ), বাপ্সা ( বাপ্শা ), তিরস্কার ( তিবশ্কার ), পরম্পর ( পরশ্পর ), বিম্মিত ( বিশশিত ), হাম্ম ( হাম্শ ), স্বচ্ছ ( শচ্ছ ) ।

অন্ত বর্ণের যোগে ‘হ’-কার যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়, প্রাকৃতে তাহার বিকৃতি সেইরূপ । হ্জ (=জ্জ)—বাহ্জ ; হ্জ্—হৃদ ( হদ, রদ ) ; হ্জ্—আহ্লাদ ( আল্হাদ ) ; হ্জ্—বিব্জল ( বিব্জল ), জিহ্বা ( জিব্জা ; জিব্জা—অন্তঃস্থ ‘ব’ ) ; হ্জ্—চিহ্ন ( চিন্হ ), হ্জ্—আহ্নিক ( আন্থিক ) ; হ্জ্—ব্রাহ্মণ ( ব্রাম্হণ ) ।

‘থ’ ও শব্দ-মধ্যস্থ ‘ক্ষ’-র উচ্চারণ প্রাকৃতির মত ( ক্খ ) । শব্দের আদিতে ও অন্ত-বর্ণ-যোগে ‘ক্ষ’ ‘থ’-র মত উচ্চারিত হয় । যথা—দ্ব্খ ( দ্বক্খ ), অক্ষয় ( অক্খয় ) ; ক্ষীণ ( খীন ), তীক্ষ্ণ ( তীখ্ণ ) ।

নিম্নে প্রাকৃত-বিকৃতির মত উচ্চারণ এবং সংস্কৃত-প্রকৃতির মত বর্ণ-সংযোগ দেখাইবার জন্য একটা তালিকা প্রদত্ত হইল । লিখিত সাধু-ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হইল । বিভিন্ন গ্রাম্য বা প্রাদেশিক কথিত ভাষার উচ্চারণগুলির সম্বন্ধে বাস্তবতায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । তবে এ স্থলে ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, স্বভাবতঃ লিখিত ভাষার সহিত তুলনায়, কথিত ভাষার উপর ‘সাক্ষাৎসম্বন্ধে’ সংস্কৃতির প্রভাব অতি অল্প ; প্রাকৃতির ও বাহিরের অন্যান্য প্রভাবই অধিক ।

তালিকায় তারকা (\*)-চিহ্নিত বর্ণগুলির উচ্চারণ সামান্যাসিক হইবে।

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
■	ক*	রুশিণা	রুশিঁনী
	কা	বাকা	বাক
	ক	পক	পক
কথ	ক্	কতি	।তি
	ক্*	স্বক্	গৃক্‌থ
	ক্য	লক্য	লক্‌থ
	ক্	ইক্‌থাকু	ইক্‌থাকু
	খ্য	সখ্য	শক্‌থ
	ঃখ	দুঃখ	দুক্‌থ
গ্‌গ	গ্য*	বাগ্মী	বাগ্‌গী
	গ্য	ভাগ্য	ভাগ্‌গ
	জ*	বিজ্ঞ	বিগ্‌গ
গ্‌ঘ	ঘ্য	শ্রাঘ্য	স্রাগ্‌ঘ
চ	চ্য	বাচ্য	বাচ্চ
জ	জ্য	রাজ্য	রাজ্জ
	জ	অজিত	অজিত
	জ্জ	উজ্জল	উজ্জল্
	য্য	শয্যা	শজ্জা
	য্	বায়ুদি	বাজ্জাদি
ঝা	হ্য	বাহ্য	বাজ্জা
ট	ট্য*	কুটুমল	কুট্‌ল্
	টা	নাট্য	নাট্টি
	ট্	খট্	খট্টি
ট্ঠ	ঠ্য	শাঠ্য	শাট্ঠ
ড	ড্য	জাড্য	জাড্
	ড্	অনড্‌নি	অনড্‌ডান্
ড্‌ঢ	ঢ্য	আঢ্য	আড্‌ঢ
ত	ত্*	আত্মা	আত্‌
	ত্যা	নিত্য	নিত্
	ত্	স্বত্	শত্

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
	ত্ব	সত্ব	শত্ব
	শ্রা*	মাহাত্ম্য	মাহাত্ম
ত্	থা	অকথা	অকথ
	প্	পৃথী	প্রিথী
দ	দ্র*	পদ্ম	পদ্ম
	ত্	বাত্ত	বাদ
	দ্র	দ্রব	দব
ক	খ্র*	গ্রীত	ক্রীত
	ধ্র	সাধ্য	শাধ
ন	ঞ + ( চ, চ্, জ, জ্. ঝ. )	সঞ্চয়, বাঞ্ছা, সঞ্জাত, বঞ্ছা.	শন্চয়, বান্ছা, শন্জাত, বন্ঝা
	ণ + ( ট, ঠ, ড, ঢ )	কণ্টক, কণ্ঠ. ভাণ্ডার	কন্টক. কন্ঠ. ভান্ডার
স্ত	স্ত্র	অস্ত্র	অস্ত
	স্ব	সাঙ্ঘনা	শাঙ্ঘনা
ব্	ব্দ	বন্দ্য	বদ
	ব্দ	বদ্য	বদ
ক্	ক্	বিক্র	বিক
গ	গ্	বিষয়	বিষয়
	গ্য	হিরণ্য	হিরয়
	ঘ	কণ	কয়
	গ্	অন্ত	অয়
	ব্	অবয়	অবয়
ম্	ম্	বগ্নাত্ত	শন্মাত্ত
ন্	ন্	চিহ্ন	চিন্হ
	জ্	আহ্নিক	আন্থিক
প্	প্য	আপ্যায়িত	আপ্পায়িত
	প্	অন্তঃপুর	অন্তঃপুর
ব্	( অন্তঃ ) ব্ + ( . )		
ব	ব্য	অব্যয়	অবয়
ভ	ভ্য	সভ্য	শত্ব
	ব্	আব্হয়	আব্হয়

উচ্চারণ	অক্ষর	উদাহরণ	উচ্চারণ
ষ	ষ ( অন্তঃস্থ )	স্বয়ংসব	শব্দংগর
ল্ল	ল্যা	বালা	বাল্ল
	ল্ব	বিদ্ব	বিদ্বল্ল
ল্হ	হল	আহ্লাদ	আল্হাদ
ব্হ	হব	আহ্বান	আব্হান
শ্	ষ্ (+ ক, ট, ঠ, প, ... )	শুক্, পৃষ্ঠ্, বর্ষ্, পুষ্প্	শুক্, পৃষ্ঠ্, বর্ষ্, পুষ্প্
	শ্ (+ ক, প, ... )	তিরস্কাব, পবস্পব	তিবস্কার, পবস্পর্
	( ৎ, ৎ+...+য, প্ ) +স	বীভৎস, মৎস্ত, ঈপ্সিত	বীভৎশ, মৎশ, ঈপ্সিত
শ্	ষ	ক্রমঃ	ক্রিশ্
শ্	শ্*, শ্*, শ্*,	শ্শান, গ্রীষ্ম, বিষ্ময়	শ্শান, গ্রীষ্ম্, বিশ্শয়
	শ্, যা, শ্	বশ্, পোশা, হাশ্	বশ্শ, পোশ্শ, হাশ্শ
	শ্, শ্, শ্	বিশ্, নিষ্ক, শ্	বিশ্শ, বিশ্শক্, শ্শ
	শ্ (+ ক, ন, র, ল )	শ্গাল, শ্গল	শ্গাল্, শ্গল্
		শবণ, শাঘা	শবন, শাঘা
	ঙ্ (+ ক, খ, গ, ঘ, ... ন)	শঙ্কা, শঙ্খ, বঙ্গ, বাঙ্গয়	শংকা, শংখ, বংগ, বাংয়
	জ্, জা, জি প্রভৃতিতে শ্	বাঙ্গালী, রশ্মিন্	বাংগালী, বংইন্
ংক	ক্য	অঙ্ক	অংক
ংখ	জ্জ, জ্জা	আকাজ্জা, আকাজ্জা	আকাংখা, আকাংখা

শ্রী প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

## বজ্রের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ

বিগত শাবদীয়পূজার বন্ধে অধিকাংশ সময় গয়ায় ছিলাম। ঐ সময় আমি বিহারের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করি। বলা বাতিল্য সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, ঘটনাক্রমে আমি প্রথমেই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমি ঐ বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। সকলেই জানেন খ্রীদিশুর কতৃক কাশ্মীর হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনয়নের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তন্মধ্যে সপ্তশতীরাই সংখ্যায় অধিক ছিলেন। যদিও তৎকালে নিতান্ত সদাচাববজ্জিত অনায়াসস্থূল বঙ্গভূমিতে আসিয়া তাহারা অনেক পৰিমাণে বিখ্যাচছাবিবহিত ও আচাবহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ তাহাদেব দ্বারা সম্পন্ন হইত। এখন দেখা যাউক, এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের মূল কোথায়, এবং কোথা হইতে কি হুত্রে তাহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন, আর সপ্তশতীদের আগমনকালে বঙ্গদেশের অবস্থা বা কিরূপ ছিল?

বিহারের বিজ্ঞ এবং কলণাত্মক প্রাচীন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বলেন,—“প্রথম কীকট প্রদেশে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। গয়াস্থবের তপস্যায় ভীত হইয়া দেবতারা কৌশলে অস্তুরকে বাধ্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে যজ্ঞের অন্তর্ধান করেন। ঐ সময় তিনি চতুর্দশটি মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। একা ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদানপূর্বক যজ্ঞান্ত ব্রান করিলে দেখা গেল গয়াস্থর যেন কিছু বিচলিত হইতেছে। তাহাব পব ব্রহ্মার আদেশে ধর্মরাজ যম নিজ গৃহ হইতে একখানি বৃহৎ পাষাণখণ্ড আনিয়া অস্তুরের মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। শেষে অনেক প্রক্রিয়ার পর, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু গদাধর মূর্তিতে অস্তুরের মস্তকে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। এইবার অস্তুর স্থির হইল, আর নড়িতে পারিল না। তাহাব পর, ব্রহ্মা যজ্ঞান্তর্জাতা পুত্রোক্ত চতুর্দশটি ব্রাহ্মণকে ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে পঞ্চকোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র, পঞ্চায়তানি গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন “তোমরা কখনো কাহারও নিকট কিছু বাচ্ঞা করিও না”। ব্রাহ্মণেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে গয়ার সন্নিহিত ধর্ম্মারণো ধর্ম্মরাজ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কীকটদেশে তখন পূর্বোক্ত চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর ব্রাহ্মণ ছিল না, সুতরাং ধর্ম্মরাজ উঁহাদিগেরই শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন “আমরা যজ্ঞ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মার আদেশ আছে, দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারিব না”। ধর্ম্মরাজ কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাহুলের মধ্যে পাঁচটি বহুমূল্য রত্ন রাখিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাহুল গ্রহণ

করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে প্রতিগ্রহদোষে দূষিত হইলেন। ওদিকে ধর্ম্মারণ্যের যজ্ঞের ধূম ব্রহ্মলোকে পৌঁছিলেই ব্রহ্মার কিছু অবিদিত রহিল না। তিনি তখন গয়ায় আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলেন,—বলিলেন, “তোমাদের স্বর্কস্বাস্ত হউক।”

ব্রাহ্মণেরা অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে কাতব্যোক্তিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন “তোমরা আচন্দ্রাক তীর্থোপজীবী হইয়া বাস কব। পূণ্যবান লোকেরা পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় এখানে পিণ্ডদান করিবেন। সেই সময়ে তোমাদিগকে পূজা করিলেই আমার পূজা করা হইবে।”

যে চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং পরে অভিশপ্ত হন, তাঁহাদের নাম যথা :—(১) গোতম (২) কশ্যপ (৩) কোৎস (৪) কৌশিক (৫) কাশ (৬) ভরদ্বাজ (৭) বৃদ্ধ পরাশর (৮) হর্বিংকুমার (৯) নাগব্য (১০) লৌগাক্ষি (১১) গোকর্ণ (১২) শিখণ্ডী (১৩) স্বহোত্র (১৪) আত্রেয়। এই চতুর্দশ মুনিই গয়াপাল বা গায়াল ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। হইাদের সন্তানগণই মগধের আদিম ব্রাহ্মণ। গয়াপালগণের কুলোপাধি যথা :—(১) সিজুয়ার (২) নক্কোফা (৩) টেয়া (৪) সেন (৫) হর্ক (৬) মহাথা (৭) পাহারী (৮) শীতলপাণি (৯) রৈ (১০) চেটী (১১) ডাইয়া (১২) ননোয়াশী (১৩) নঙ্গর্ (১৪) গোলীবার ইত্যাদি।

গয়াপালগণ গয়াক্ষেত্রে তীর্থোপজীবী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের সন্তানসন্ততিতে গয়াক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। গয়াপালগণের জীবিকা অনায়াসলভ্য-চরণপূজা করিয়া তীর্থযাত্রীরা যে অর্থ প্রদান করে, তাহাতেই তাহাদের উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে বিভ্রাটের তিরোহিত হইল। কোন সময়ে কাশ্মীরপ্রদেশ হইতে (মতান্তরে কুরুক্ষেত্র হইতে) এক রাজা গয়াতীর্থে আগমন করেন, রাজা সসৈন্তে সপরিবারে অমাত্য, পুরোহিত, যান, বাহনসহ গয়ায় উপস্থিত হইয়া মহা আড়ম্বরে পিতৃকায় সম্পন্ন করিলেন। তখন গয়াপালগণই শ্রাদ্ধের উত্তোগ করিতেন এবং মন্ত্রও পড়াইতেন। বাজার সঙ্গে দুইটি পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতদ্বয় ক্রিয়াবান্, তাহার বৈদ এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র উভয়ই উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহাদের গুণবত্তা দেখিয়া গয়াপালেরা অল্প দক্ষিণার পরিবর্তে ঐ ব্রাহ্মণ দুইটিকে রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

রাজা রাজধানীতে গিয়া পুরোহিত দুই ব্রাহ্মণসহ আর দশটি ব্রাহ্মণকে সপরিবারে গয়ায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পাঞ্জিকাগণনা, জন্মপঞ্জিকানিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি করিতেন বলিয়া সাধারণতঃ জ্যোষী নামে আখ্যাত হন। জ্যোষী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ যজুর্বেদী, কিরদংশ সামবেদী। জ্যোষীরা বলেন,—তাঁহারা গোতমী শাখা ও মাধ্যমিন শাখাধারী। আশ্বলায়নগৃহ্যত্র, কাত্যায়নগৃহ্যত্র, বশিষ্ঠগৃহ্যত্র ও আপস্তম্বগৃহ্যত্র অনুসারে জ্যোষীদের



বেদোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের গৌত্র যথা :—গৌতম, পবাশর, শাণ্ডিলা, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদগলা, গর্গ, বংস প্রভৃতি। কুলোপাধি—পাণ্ডে, পাঠক, তেওয়ারী, চৌবে, উপাধ্যায়, বৈষ্ণ, পণ্ডিত, মিশ্র ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অধিকাংশই নিঃস্ব, অল্পসংখ্যাকেই স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত জ্যোষী ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের চক্ষা ব্যতীত অন্য কোন অর্থকরী বৃত্তি অবলম্বন কবিত্তে পারেন নাই। গয়াসহবে যে সকল জ্যোষী বাস কবেন, তাঁহাদের সকলেই প্রায় পিণ্ডা করাইয়া (গয়াশ্রাদ্ধের মত পড়াইয়া) জীবিকা নির্বাহ করেন। মফস্বলে যে সকল জ্যোষী বাস কবেন, তাঁহারা “গৌঞা-পাণ্ডে” অর্থাৎ গ্রাম্য পুরোহিত। এই গৌঞা-পাণ্ডেদিগের বাহারও একখানি কাহারও ঠাই খানি কাহারও তিন চারিখানি গ্রাম আছে। গৌঞা-পাণ্ডেবা পুরুষামুক্রমে বহুকাল হইতে ঐ সকল গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ, বাভন, ছত্রি, কায়স্থ, বেণে প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বর্ণেরা তাঁহাদের সজ্ঞান। ঐ সকল গ্রামের নিম্নশ্রেণীর জাতিদের পুরোহিত ধামী ব্রাহ্মণ। ধামীর বাঙ্গালাদেশের বর্ণগাজক ব্রাহ্মণদের তুল্যব্যবসায়ী। গৌঞা-পাণ্ডেদের বিজ্ঞাবুদ্ধির পবিমাণ অল্পসানে দক্ষিণার পরিমাণও অধিক নহে। গৌঞা-পাণ্ডেদের অধিকৃত গ্রামে যে সকল দনী জমিদার বাস কবেন, রুহং রুহং ক্রিয়াকর্মে তাঁহারা শাকদ্বীপী, সবয়পাবী, সাবস্বত, সনাঢ়া, গৌড়, মৈথিল প্রভৃতি শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া ক্রিয়া সমাধা কবেন। ঐ সকল স্থলে গৌঞা পাণ্ডেবা দক্ষিণাদির সিকি ভাগ পান। জ্যোষীব্রাহ্মণের ধনহীনতার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলে একজন জ্যোষী পণ্ডিত বলিলেন ;—পূর্বে ব্রাহ্মণেরা ‘কুন্তীধাত্ত’ ছিলেন। ছয় মাসের আহারযোগ্য ধাত্ত সঞ্চিত হইলেই আর তাঁহারা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন না।\* উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইলে পুনঃ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতেন। জ্যোষীব্রাহ্মণেবা পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ কবিত্তে পারেন নাই।

জ্যোষী ব্রাহ্মণের আগমনের পবর্ত্ত মগধপ্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেব বসতি হয়। গয়া-সহরের শাকদ্বীপীয় পণ্ডিত বাণীদত্ত পাঠক প্রভৃতি কয়েকজন প্রবীণ কুলশাস্ত্রবিদের নিকট আমি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। তাঁহারা বলেন, এখানে দুইবার শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ আগমন কবেন। প্রথম যখন বাবণবধের পর অযোধ্যাধিপ মহারাজ রামচন্দ্র সরযুতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন, কাণ্ডকুজ ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ আহৃত হন এবং যজ্ঞে দান গ্রহণ করিয়া মহারাজের ক্রিয়া সমাপ্তি করেন। দ্বিতীয়বার দারকাধিপ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাশ্বকর্জুক আহৃত হইয়া শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। সকলই জানেন নাবদের

\* মনুসংহিতা চতুর্থ অধ্যায় কুল, কন্ডট্টয়, টীকা পাঠ করুন।

চক্রান্তে শাশ্ব দারুণ রোগাক্রান্ত হন এবং শেষে সূর্যের রূপায় রোগমুক্ত হইয়া চক্র-ভাগাতীরস্থ পবিত্র তীর্থ মিত্রবনে সূর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ আরোগ্যদাতা সূর্য্যেব অর্চনার নিমিত্ত শাশ্ব বাজা প্রিয়ত্রভেব শাসিত পুণ্যভূমি শাকদ্বীপ হইতে চারিবেদে অভিজ্ঞ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগের অষ্টাদশকুলকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উক্ত সূর্য্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন (১), সেই অবদি পদ্মনন্দ প্রদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস হয়। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ অতি বিশাট। ভারতের সকল প্রদেশেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের বসতি আছে। গান্ধার, গোড়দেশ, (প্রয়াগ অঞ্চল) মগধ ও ভারতের অন্যান্য নানা প্রদেশ এক সময় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণভারতের অনেক উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেব আদিম ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহার মূল শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ হইতে পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ চিরকালই জ্ঞানী এবং বিদ্বান।

প্রসঙ্গক্রমে এতক্ষণ আমরা মগধেব আদিম ব্রাহ্মণগণেব সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অন্তসংগ্ৰহ করিব। আদি গয়ার বাগীন্দ্র পাঠক প্রভৃতি কতিপয় কুলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করি—“বাঙ্গালাদেশে কাশ্যকুল-ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্বে সপ্তশতী নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহারা সর্বপ্রথম বাঙ্গালায় গমন করেন। (২) বাজা শশাঙ্ক যে সময়ে গোড়দেশের অধিপতি সেই সময়ে তিনি গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্ত সরযুতীর হইতে কতকগুলি বেদবেদাদিপাণ্ডব ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। (৩) তাহার পর কতকগুলি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় গমন করেন। (৪) ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ কোন শ্রেণীভুক্ত? ঐ সকল প্রবীণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, “তাহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। কারণ সাত আটশত বৎসর পূর্বে এক ত্রিহৃত বাতীত সমস্ত বিহাবে গয়াপাল জ্যোষী এবং শাকদ্বীপী ব্যতীত অত্র কোন ব্রাহ্মণেব বাস ছিল না। অবশ্য ধর্ম্মী এবং মহাব্রাহ্মণ ছিল। কাশ্যকুল, সারস্বত, গোড় ও শ্রোত্রী প্রভৃতি ছয় শত বৎসরের মধ্যে সমাগত হইয়াছেন। আসি বলিলাম, “বাঙ্গালাদেশের কাশ্যকুলজাত ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে :—‘বঙ্গদেশের রাজা আদিশ্বর ৯৯৯ শকে (মতান্তরে ৯৯৯ সংবতে) কাশ্যকুল হইতে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন (৫)। তাহাদেরই বংশধরগণ

(১) শাশ্বপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের শাশ্বের অভিশাপ গুস্তান্ত ও সূর্যের রূপায় মুক্তিরস্তের বিবরণ পাঠ করুন। তন্ত্রি মহাভারত, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ নারদপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ বজ্রবল ও অভিব্যবধে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের বিবরণ আছে।

(২) রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাসমূহে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ করুন।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ পাঠ করুন।

(৫) “আদিশুরো নবনবত্যাধিকশতশতাব্দে ব্রাহ্মণানু আনয়ামাস।” ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

বর্তমান সময়ে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া বাস করিতেছেন। বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা অপেক্ষা কাশ্যকুজের অধিক সমীপবর্তী। অতএব কাশ্যকুজ ব্রাহ্মণগণের বিহার প্রদেশে, আগমনই অগ্রে সম্ভব।” তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন। —“বাঙ্গালাদেশেব বাঙ্গার প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং কাশ্যকুজ-ব্রাহ্মণগণ আহত হইয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিহারে তাঁহাদিগকে কেহ আশ্বাসন করে নাই। আপন গরজে আসিয়াছেন, কাজেই এখানে তাঁহাদের পরে বসতি হইয়াছে।” তাহার পর তাহারা বলিলেন; “কাশ্যকুজ-ব্রাহ্মণগণ যদি শুধু দক্ষিণালোলুপ হইতেন, তাহা হইলে অনেক অগ্রে তাঁহাদিগকে বিহার প্রদেশে দেখা যাইত, কিন্তু প্রকৃত কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য এবং দানগ্রহণ তত পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই পুরুষকাবের পক্ষপাতী।”

তাহার পর, উল্লিখিত পণ্ডিতগণ আমাকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্র-সংক্রান্ত ছথানি পুস্তক প্রদান করিলেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের ‘পুবের’ সহিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণের ‘গাঁই’ মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আরও তাহারা বলিলেন—“পুরাকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি জলময় এবং নদনদী বিলখালে পবিপূর্ণ ছিল। প্রথমে বিহার প্রদেশ হইতে দীঘরেরা ঐ প্রদেশে গিয়া বাস করে। তাহাদের সহিত সম্ভবতঃ ধর্মী ব্রাহ্মণেরাও গিয়াছিলেন। ক্রমে বাঙ্গালার উন্নয়নশক্তির কথা সর্বত্র প্রচারিত হইলে দুলে দুলে বিহারী লোক বাঙ্গালায় গিয়া বাস করে এবং তাহাদের পুর্বোহিতদিগকেও লহরা যায়। ঐ সকল পুরোহিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। তাহারাষ্ট কোন কারণে বাঙ্গালাদেশে সপ্তশতী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কারণ তখন মগধে জ্যোতী এবং শাকদ্বীপী ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সুতরাং বঙ্গের প্রধান উপানবেশী ব্রাহ্মণেরা যে শাকদ্বীপী কিংবা জ্যোতী তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুমান করেন জ্যোতী এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধগণের কবল হইতে জনসাধারণকে রক্ষার্থ এবং পুর্বাণব্যাপ্য দ্বারা গ্রামে গ্রামে বৈদিক ধর্ম প্রচারার্থ হিন্দুনরপতিগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওজ্জয়ী গ্রাম্য-পুর্বোহিতেরা গোঞা-পাণ্ডে আখ্যায় অভিহিত হন।” “গোঞা-পাণ্ডে” শব্দটি রাত্তির কুলগ্রন্থে লিপিত “চাকলাষাজী” শব্দের সমানার্থক। এই গোঞা-পাণ্ডে বা চাকলাষাজী পুরোহিতগণ প্রাণপাত করিয়া বিহারে ও বাঙ্গালায় হিন্দু-ধর্মের প্রচার ও রক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

এইবিপ্রগণও যাহা, সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণও তাহাই। অতএব প্রথম স্তরের সপ্তশতী দ্বিতীয় স্তরের সরযুপারী এইবিপ্র এবং তৃতীয়স্তরের শাকদ্বীপী সকলেই তাহার পর হইতে অর্দ্ধ পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা-নির্ভর্য্য করিতে লাগিলেন। বিহারে গোঞা-পাণ্ডেরা যতদিন যাজনকার্য্য করেন, ততদিন তাঁহাদিগকে “আচার্য্য” বলে; উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিলেই আর সে পদবী থাকে না। কিন্তু বাঙ্গালার তাঁহাদের আচার্য্যপদবী প্রায়ই বিলুপ্ত হয় নাই। কুলোপাধি—মিশ্র, পাঠক, উপাধ্যায় প্রভৃতি কেহ কেহ ব্যবহার করেন, কাহার কাহারও উহা কুলপঞ্জিকাগত হইয়া আছে।

প্রসঙ্গক্রমে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের এবং বঙ্গদেশের গ্রন্থবিপ্রগণের অবস্থা বর্ণিত হইল। এইবার তাঁহাদের পুর ও গাইর সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রথম কথা, মগধের শাকদ্বীপী সমাজে যে সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সাতশতী সমাজে ও গ্রন্থবিপ্রসমাজে অবিকল সেই সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাহ্যভায়ে ঐ সকল গোত্রীয় বংশের নাম লিখিত হইল না।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের “পূব”।

- ১। উল্লাক।
- ২। কুটুম্বারি।
- ৩। পিত্তিআরক।
- ৪। বাউআরি।
- ৫। বাউখাউ।
- ৬। খণ্ডবাৰ।
- ৭। জলনী আবি।
- ৮। সিকোরি আর।
- ৯। যাকু।
- ১০। কুণ্ডাক।
- ১১। মরৈআর।
- ১২। ছত্রবার।
- ১৩। মলোরিআর। মুলুক।
- ১৪। বালার্ক।
- ১৫। ডিহিক।

সাতশতী ব্রাহ্মণের “গাঠি”।

- ১। উল্লাক।
- ২। কোয়ারি।
- ৩। পিত্তিবি।
- ৪। বেড়ু।
- ৫। বেলাউ।
- ৬। কাংটানি ( কামটি )।
- ৭। ভাদারী।
- ৮। সাগাই।
- ৯। যাগাই।
- ১০। কুড়াল।
- ১১। জুরাই।
- ১২। চেন্চেব।
- ১৩। মুলুকজুড়ি।
- ১৪। বাগুড়ি।
- ১৫। দহড়ি।

অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্পয়োজন। যে কয়টি পুর ও গাই উদ্ধৃত হইল, উহা দেখিলেই পাঠকগণ ব্রহ্মিতে পারিবেন, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে বাঙ্গালার সাতশতী নামে অভিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞমানগণের সহিত আগমন করেন, সুতরাং এখানে কোন গ্রাম প্রাপ্ত হন নাই। দেশের পূর্বপর্বসম্প্রাপ্ত পুর ( গাই ) ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাই কুলপঞ্জিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাতিল্য, এই সকল পূর্ব শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ “দিব্যানন্দচন্দ্রোদয়” হইতে উদ্ধৃত। “শাকদ্বীপীয় কুলভাস্কর” নামক কুলগ্রন্থেও পুরগুলি অবিকল এইরূপই আছে।

উপসংহারে বলিয়া, সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্র ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্তরকুরু বা প্রলোকম্ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহাদের পুরুষপর্বসম্প্রাপ্ত বৈদিক আচার ও বেদোক্ত ধর্ম সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একই বৈদিকধর্ম দেশকালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এবং তজ্জন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সকলেরই মূল বেদ। পূর্বে সকলেরই বেদোক্ত ধর্মের প্রচার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং সকল ব্রাহ্মণই এক ছিলেন। পরে দেশকালপাত্র অনুসারে বহু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।\*

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

\* বঙ্গের সপ্তসভীগণ কখন আপনাদিগকে শাকদ্বীপী বলিয়া খ্যাক করেন নাই। তাঁহাদের বর্তমান পদে একাদান করা যাইবে।

সং-প-প-স।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণী

—/v—

১৮শ বর্ষ—প্রথম মাসিক অধিবেশন

সময়—১৭ই আষাঢ়, ১২৭১ জুলাই, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভা-নির্বাচন ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন,—(ক) কবিবর চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ “কৃষ্ণকীর্তন” (খ) বিজ্ঞাবাগীশ বঙ্গচাবীকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাচীন অনবাদ “সারস্বরসদা” (গ) গোড় পাণ্ডুর চিত্রিত ইষ্টক প্রস্তবাদি ও (ঘ) ‘টামনা’ বা তর্পণ দীপ্তিতে প্রাপ্ত মিনা করা ইষ্টক। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ বিশি মহাশয় প্রদত্ত ৬শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের “ভূত” এবং (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদত্ত মহাশয়ের লিখিত চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ “কৃষ্ণকীর্তন” ৭। শোক-প্রকাশ—বঙ্গের প্রসিদ্ধ বেদাচাৰ্য্য ৬সত্যবত সামাশ্রমী মহাশয়ের পরলোকগমনে ৮। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পিএইচ ডি ( সভাপতি )	
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন	“ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
“ বিহারিলাল সরকার	“ যতীন্দ্রমোহন রায়
“ ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	“ মন্থননাথ ঘোষ এম্ এ
“ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	“ তারকনাথ বিশ্বাস
“ পণ্ডিত দয়্যরাম সাহনৌ এম্ এ	“ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
“ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ	“ হেমন্তকুমার কর
“ অম্বাচরণ ঘোষ বিদ্যাবূষণ	“ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
“ যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এল	“ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
“ তারাশ্রম ঘোষ বিদ্যাবিনোদ	“ সুধীরচন্দ্র সরকার
“ চিত্তমুখ সাহা	“ কৃষ্ণদাস বসাক

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বেজ

■ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যকর্তৃ	■ বাণীনাথ নন্দী
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	„ শ্রীমাচরণ পাল
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বসু	„ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	„ ভূতনাথ শেঠ
■ ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
■ বামকমল সিংহ	„ দয়াকুমার পাল
„ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়	„ পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„ বজ্রবল্লভ কাব্যাকর্ষ বিশাবদ	„ অতুলচন্দ্র শেঠ
„ হরিদাস পালিত	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত চুঁচুড়া
„ বজ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বোম্বাইকেশ মুস্তফী

„ বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ,  
 „ তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি এ,

সহঃ সম্পাদক

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব সম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা নির্বাচিত হইলেন :-

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	১। শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র ১৫নং রাজাবাগান জংসন রোড।
„	শ্রীবোম্বাইকেশ মুস্তফী	২। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭নং জয়মিত্রের ঘাট লেন।
„	„	৩। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„	„	৪। শ্রীপুলিনবিহারী স্নায় চৌধুরী ১০নং জগন্নাথ সুরের লেন।
শ্রীবোগেন্দ্রনাথ সমাদার	„	■। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জমিদার, কাশীপুর, কাশীনগর, যশোহর।
„	„	■। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ লক্ষ্মীবাজার, যশোহর।

প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	সভা
শ্ৰীমলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীঅসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায়	৭। শ্ৰীৰাজমোহন মুখোপাধ্যায় জয়দিয়া, বশোহৰ।
শ্ৰীঅসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায়	শ্ৰীবোমকেশ মুস্তফী	৮। শ্ৰীপ্ৰকৃতিচান্দ বসু ১৩৩ ছিদাম মুদিৰ লেন।
শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ		৯। শ্ৰীস্বৰূপ চন্দ্ৰ মিত্ৰ ৬৬৬৭নং কলেজ ষ্ট্ৰীট।
শ্ৰীউপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়		১০। শ্ৰীশৰচ্চন্দ্ৰ বিশ্বাস বি এ Assistant, Army Dept. Simla Hill,
শ্ৰীথগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ	শ্ৰীঅসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায়	১১। শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ দে এম এ অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগৰ কলেজ।
শ্ৰীমলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীউপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। শ্ৰীহেমেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা এল এম এস ১২৩২ আমহার্ট ষ্ট্ৰীট।
শ্ৰীবিপিনবিহাৰী গুপ্ত	শ্ৰীবোমকেশ মুস্তফী	১৩। শ্ৰীভূপতিচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত বি এ হেডমাষ্টাৰ, কলমা, ঢাকা।
শ্ৰীমলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ	১৪। শ্ৰীপাৰমলকান্ত ঘোষ ২নং আনন্দ চাৰ্ভুৱাৰ লেন।
	শ্ৰীবোমকেশ মুস্তফী	১৫। বৰবিৰাজ শ্ৰীৰঞ্জনকান্ত কাব্যকণ্ঠ বিশাৰদ, চুচুড়া।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীৰামকমল সিংহ	১৬। শ্ৰীৰঞ্জননাথ বিশ্বাস জমিদাৰ, স্মৃতিয়া, সোমড়া হুগলী।
শ্ৰীমলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীবোমকেশ মুস্তফী	১৭। শ্ৰীহীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত সম্পাদক, সাহিত্য আলোচনা সমিতি কায়াপাড়া, চুচুড়া।
শ্ৰীৰাজকুমাৰ বেদতীৰ্থ	„	১৮। শ্ৰীসৈয়দ আল আখ্তাৰ ২৯নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীট।
শ্ৰীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ এবং	„	১৯। শ্ৰীস্বৰেন্দ্ৰমোহন ঘোষ চৌধুৰী জমিদাৰ সলিলী-আৱা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্ৰীসিকৰঞ্জন সিদ্ধাস্তভূষণ	„	২০। শ্ৰীবামচিৰণ বসু কৃষ্ণঘাটা, খাগড়া, বহুবনপুৰ।
	„	২১। শ্ৰীআশুতোষ বাগচী এম, এ ৩৩৩ মণ্ডিষ্টেট, বহুবনপুৰ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসিকরজন সিদ্ধান্তভূষণ	শ্রীবোমকেশ মল্লিক	২২। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী Local Auditor, বহরমপুর।
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি এ	"	২৩। শ্রীসত্যরঞ্জন খাস্তগির এল সি ই ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার, বহরমপুর।
"	"	২৪। প্রাক্ষরকালী মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বহরমপুর।
"	"	২৫। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় বি এল ম্যুন্সিফ, গোরাবাজার, বহরমপুর।
"	"	২৬। শ্রীফণীন্দ্রলাল সেন এম এ বি এল ঐ
"	"	২৭। শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, খাগড়া বহরমপুর।
"	"	২৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল ঐ
"	"	২৯। শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর।
"	"	৩০। শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল ঐ
"	"	৩১। শ্রীরজনীকান্ত সান্যাল বি এল ঐ
"	"	৩২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাকার ও জমিদার, বহরমপুর।
"	"	৩৩। শ্রীবিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।
"	"	৩৪। শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি এ, বি ই ওভারসিয়ার, খাগড়া বহরমপুর।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫। শ্রীচুণিলাল চট্টোপাধ্যায় Astt. Pay Clerk, Burmah Ry. Sagaing P. O.
শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণমহাপাত্র	৩৬। শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ডেপুটি স্পাঃ অব পুন্ডি, ই, বি এস, আর, শিয়ালদহ। ১৬৫ বহুবাজার স্ট্রীট।



প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	নতুন সভ্য
শ্ৰীমুৰেন্দ্ৰনাথ গগ্গোপাধ্যায়	শ্ৰীহীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত	৩৭। শ্ৰীমোহিতকান্ত সেন বি,এ, বি,ই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, ই বি এন্স আৰ, ১৫ ষ্টেশ্বন ৰোড, দমদমা।
"	"	৩৮। শ্ৰীঅমলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, স্থপাঃ ভবানীগঙ্গকাছাৰী, গোকল, বগুড়া।
"	"	৩৯। শ্ৰীনৱেশচন্দ্ৰ বসু বি, এল উকিল বগুড়া।
"	"	৪০। ডাঃ অক্ষয়কুমাৰ সরকার এল্ এম্ এস, ১২.৫ অব ওয়েলস্ হাঁসপাতাল, মেডিকালকলেজ।
শ্ৰীঅধিকাচৰণ বজাচাৰী	শ্ৰীব্যোমকেশ মুস্তফা	৪১। কবিরাজ অতিভূষণকাব্যাতীৰ্থ নবদ্বীপ।
শ্ৰীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	৪২। শ্ৰীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ ৩০।৬ মদনমিত্ৰেয় লেন।
শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	৪৩। শ্ৰীদেবেন্দ্ৰনাথ মল্লিক ইলেক্ট্ৰিকাল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰামপুৰ ষ্টেট, ইউ, পি।
	"	৪৪। শ্ৰীযতীশচন্দ্ৰ পাল আসিষ্টাণ্ট ইলেক্ট্ৰিকাল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰামপুৰ ষ্টেট, উঃ পঃ।

ছাত্ৰ-সভা

শ্ৰীমেন্দ্ৰকুমাৰ কৰ	শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ	১। শ্ৰীআশুতোষ দে তত্পৰে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহাৰদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত জন্ত পুস্তকাদিৰ যথাৰীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন কৰা হইল।
---------------------	-----------------------	---

\* উপহাৰ-দাতা

পুস্তক-নাম

শ্ৰীযুক্ত বসন্ত লাহী-১। পুষ্পাঞ্জলি। ২। আৰাম। ৩। ছাইভষ্ম। ৪। মধুৰ-  
মিলন। ৫। সখের জলপান। ৬। রমা।

শ্ৰীযুক্ত চাক্ৰচন্দ্ৰ বসু-৭। ধন্যপদ।

শ্ৰীযুক্ত মূৰেনচণ্ডী দত্ত-৮। জালউইল। ৯। বিলাতীৰহস্য। ১০। মুলেভুল।  
১১। বীরবলরহস্য। ১২। কুলেরসাজি। ১৩। মা না ৰাক্ষসী। ১৪। রমণী-রত্ন।  
১৫। প্ৰেত-তত্ত্ব। ১৬। বিষমবিষ। ১৭। আয়ুদে ম্লি। ১৮। দীক্ষা ও সাধনা।  
১৯। প্ৰেত-তৰ্পণ। ২০। অমরাবৃত্তী। ২১। প্ৰতিশোধ। ২২। উষা। ২৩। জাহা-  
নাৰা। ২৪। সোণাৱকন্তী। ২৫। বাসৱে খুন। ২৬। ৰক্তাৱক্তি। ২৭। কাঁচা-মাথা।  
২৮। ভৈৰৱী। ২৯। ৰাণী কৃষ্ণকামিনী। ৩০। ৰাণী চৌধুৱাণী। ৩১। প্যাৱিস-ৰহস্য।  
৩২। কালীৱদমন। ৩৩।\* পৌৰাণিক গল্প। ৩৪। ইজ্জতাল-ভৰ। ৩৫। যুৱলা। ৩৬।

কুমারী ইন্দিরা। ৩৭। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব। ৩৮। লুকোচুরি। ৩৯। যোগতত্ত্বাবিধি।  
৪০। সাধনা। ৪১। রমণীঐর্ঘ্য। ৪২। পুরোহিতদর্পণ।

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সাগ—৪৩। শ্রীকৃষ্ণচরিত। ৪৪। শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিত। ৪৫। সংসার।  
৪৬। ভবের খেলা। ৪৭। মাতঙ্গিনী। ৪৮। বিলাতি স্বর্ণপাই। ৪৯। লোহার বাধন।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার—৫০। পঞ্চপদীপ।

Superintendent Government Press, Madras— ৫১। Descriptive Catalogue  
of the Sanskrit Manuscripts

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৫২। কৃষ্ণকান্তের উইল। ৫৩। কমলাকান্ত। ৫৪।  
রাজসিংহ। ৫৫। জ্ঞানন্দমঠ। ৫৬। চন্দ্রশেখর। ৫৭। বিষয়ক। ৫৮। সীতারাম।  
৫৯। কৃষ্ণচরিত্র। ৬০। লোকরহস্য।

শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র— ১। অবকাশকাব্যকুসুমহার। ৬১। ধর্মপরীক্ষা। ৬২। দাতা-  
পরীক্ষা। ৬৪। নাট্যকবির-মণি। ৬৫। নিকুঞ্জবিহার বা গোপিনী লীলা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার—৬৬। মুকুল—৬ষ্ঠ খণ্ড। ৬৭। মুকুল—৮ম খণ্ড। ৬৮।  
মুকুল—৯ম খণ্ড। ৬৯। মুকুল—১০ম খণ্ড। ৭০। মুকুল—১১শ খণ্ড। ৭১। Life  
of A. M. Bose, Esq. ৭২।\* পৌরাণিক কাহিনী ( ১ম ভাগ )। ৭৩। নীতি কথা।  
৭৪। গৃহের কথা। ৭৫। দৈনিক ১ম অংশ। ৭৬। ঐ ২য় খণ্ড। ৭৭। উপকথা।  
৭৮। মাতা ও পুত্র।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—৭৯। ভ্রমণবৃত্তান্ত (১ম খণ্ড)। ৮০। দীপ্তি। ৮১।  
মুরলী। ৮২। অপরাধিতা। ৮৩। বিবেক বাণী ১ম লহরী। ৮৪। স্থিতি। ৮৫।  
পুণ্যপ্রভা। ৮৬। শরৎচন্দ্র ( ১ম ও ২য় ভাগ )। ৮৭। প্রসাদ।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—৮৮। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৮৯। বুদ্ধধর্ম।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু ( 'বঙ্গবাসী'র সভাপ্রবন্ধকারী )—৯০। মহাভারত ১ম খণ্ড। ৯১। ঐ  
২য় খণ্ড। ৯২। রামায়ণম্। ৯৩। স্বাধীনতার ইতিহাস (১ম ভাগ) ৯৪। ঐ ২য় ভাগ।  
৯৫। মেঘনাদবধ কাব্য। ৯৬। কাঁলাচাঁদ। ৯৭। মহারাণী-স্বর্ণময়ী। ৯৮। কলি-  
কাতার ইতিহাস। ৯৯। ক্ষুদ্ররাম। ১০০। রামায়ণ ( কুন্তিবাস ) ১০১। রাজলক্ষ্মী।  
১০২। বঙ্গের বর্গী। ১০৩। ভরতপুর যুদ্ধ। ১০৪। বাঙ্গালী-চরিত। ১০৫। পাঁচুঠাকুর।  
১০৬। রাণীভবানী। ১০৭। Memoirs of Humayun। ১০৮। Memoirs of Jahangir,  
১০৯। History of Hydar Ali and Tipu Sultan। ১১০। History of the Sikhs।  
১১১। My Diary in India (Russel Vol I) ১১২। Do Vol II.  
১১৩। Orme's Historical Fragments. ১১৪। History of Bengal (Stewart)  
১১৫। India Tracts ( 1722-1782 )

শ্ৰীযুক্ত শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ (সম্বাদিকারী, মজুমদাৰ লাইব্ৰেৰী)—১১৬। গুৰুদক্ষিণা ১১৭। গোচাৰণেৰ মঠ। ১১৮। ইন্দু। ১১৯। সিৰাজদ্দৌলা। ১২০। রবীৰাবুৰ কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ ১ম খণ্ড। ১২১। ঐ ১ম ভাগ ২য় খণ্ড। ১২২। ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ১২৩। ঐ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড। ১২৪। ঐ ৩য় ভাগ। ১২৫। ঐ ৫ম ভাগ। ১২৬। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ। ১২৭। ববীৰাবুৰ নাট্যগ্রন্থ (২ম ভাগ ১ম খণ্ড)। ১২৮। ফলজ্ঞানি। ১২৯। বিশ্বনাথ। ১৩০। শৈশবসঙ্গী।

শ্ৰীযুক্ত হেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ—১৩১। বিপন্নীক। ১৩২। প্ৰেমের জয়। ১৩৩। প্ৰেম-ময়ীচিকা।

শ্ৰীযুক্ত রাধানাথ মিত্ৰ—১৩৪। মূলকটাদ। ১৩৫। সত্যনাৰায়ণ ব্ৰতকথা। ১৩৬। ভাগ্যলক্ষী। ১৩৭। লালকৃষ্টি। ১৩৮। মোহিনী। ১৩৯। রাধামতি। ১৪০। ছায়া। ১৪১। ছায়াপথ। ১৪২। মুকুৰ ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা। ১৪৩। ঐ ১ম ভাগ, ২য় হুইতে ৫ম সংখ্যা। ১৪৪। ঐ ২ম ভাগ, ৬ষ্ঠ হুইতে ১০ সংখ্যা।

শ্ৰীযুক্ত গৌৰগোবিন্দ গোস্বামী বিজ্ঞানভূষণ—১৪৫। পুৰুষপক্ষনিরসন (বালিবাঁই উদ্ধবপুৰ গোড়ীয় বৈষ্ণবধন্যসমালোচনী সভা)।

শ্ৰীযুক্ত গৌৰীনাথ চক্ৰবৰ্তী কাব্যবত্ৰ—১৪৬। আৰ্য্যদ্বন্দ্বিতা। ১৪৭। উচ্ছাস।

শ্ৰীযুক্ত ভবানীচৰণ ঘোষ—১৪৮। উপকথা। ১৪৯। পৰিণয়কাহিনী।

শ্ৰীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বসু—১৫০। ভাৰতে স্বাধীন আনামিশন। ১৫১। ইন্দ্ৰিয়গ্রাম। ১৫২। ব্যবহারিক কৃষিদৰ্শণ। ১ম খণ্ড।

শ্ৰীযুক্ত রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ—১৫৩। গদ্যগ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ। ১৫৪। ঐ ২য় ভাগ। ১৫৫। ঐ ৩য় ভাগ। ১৫৬। ঐ ৪র্থ ভাগ। ১৫৭। ঐ ৫ম ভাগ। ১৫৮। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ। ১৫৯। ঐ ৭ম ভাগ। ১৬০। ঐ ৮ম ভাগ। ১৬১। ঐ ৯ম ভাগ। ১৬২। ঐ ১০ম ভাগ। ১৬৩। ঐ ১১শ ভাগ। ১৬৪। ঐ ১২শ ভাগ। ১৬৫। ঐ ১৩শ ভাগ। ১৬৬। ঐ ১৪শ ভাগ। ১৬৭। ঐ ১৫শ ভাগ। ১৬৮। ঐ ১৬শ ভাগ। ১৬৯। শান্তি-নিকেতন। ১ম ভাগ। ১৭০। ঐ ২য় ভাগ। ১৭১। ঐ ৩য় ভাগ। ১৭২। ঐ ৪র্থ ভাগ। ১৭৩। ঐ ৫ম ভাগ। ১৭৪। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ। ১৭৫। ঐ ৭ম ভাগ। ১৭৬। ঐ ৮ম ভাগ। ১৭৭। ঐ ৯ম ভাগ। ১৭৮। ঐ ১০ম ভাগ। ১৭৯। ১১শ ভাগ। ১৮০। ঐ ১২শ ভাগ। ১৮১। ঐ ১৩শ ভাগ। ১৮২। কাব্যগ্রন্থ ৪র্থ। ১৮৩। বিসৰ্জন। ১৮৪। রাজা ও রাণী। ১৮৫। রাজা। ১৮৬। শিশু। ১৮৭। খেয়া। ১৮৮। মুকুট। ১৮৯। গীতাঞ্জলি। ১৯০। শাৰদোৎসব। ১৯১। গল্পগুচ্ছ ১ম ভাগ। ১৯২। গল্পগুচ্ছ ২য় ভাগ। ১৯৩। গল্পগুচ্ছ ৩য় ভাগ। ১৯৪। গল্পগুচ্ছ ৪র্থ ভাগ। ১৯৫। গল্পগুচ্ছ ৫ম ভাগ।

শ্ৰীযুক্ত বসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ—১৯৬। গজীৱায় শ্ৰীগোৱিন্দ। ১৯৭। শ্ৰীৱায়মানন্দ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—২০৮। রাজষি। ২০৯। বৌঠাকুরাণীর হাঁট। ২০০।  
গোরা ১ম ভাগ। ২০১। গোরা ২শে খণ্ড। ২০২। নোকাডুবি। ২০৩। চোখের বলি।  
শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়—২০৪। Srimat Bhagabatam Vol. I. ২০৫। Vol. II  
শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ—২০৬ প্রবন্ধাষ্টক।  
শ্রীরামদয়াল দাস—২০৭। চন্দ্রধর।  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব—২০৮। স্বাস্থ্যবিধান। ২০৯। অমরনাথ।  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত—২১০। ভারতে ইংরাজ বা ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা।  
শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—২১১। তিথি-তত্ত্বম্। ২১২। উদ্বাহ-তত্ত্বম্। ২১৩। প্রায়-  
শ্চিত্ত-তত্ত্বম্। ২১৪। আফ্রিক-তত্ত্বম্।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি, এল্—২১৫। রসকণা, ২১৬। ধোকাবাব প্রসঙ্গে,  
২১৭। বৈষ্ণবধর্ম, ২১৮। গঙ্গাসাগর-মাহাত্ম্য, ২১৯। উজ্জুপাঠ, ২২০। নন্দীসবাদ,  
২২১। ধোকাখুঁকি, ২২২। জ্যোতিষরত্নসংগ্রহ, ২২৩। শ্রীবৎসচিন্তার বনবাস,  
২২৪। শ্লোক পুষ্পাঞ্জলী, ২২৫। শ্লোকমালা-সংগ্রহ, ২২৬। ভীমচরিত্র, ২২৭। কাণখোরা,  
২২৮। রুদ্রামল, ২২৯। কবিতাবলী, ২৩০। অশোচ-তত্ত্বসংগ্রহ, ২৩১। গল্পস্বল্প,  
২৩২। ওরালটেক্সের ভিজাগাপত্ন, ২৩৩। পাশাপক্ষ, ২৩৪। হায়রে সেদিন কোথায় গেল,  
২৩৫। পুষ্প। ২২৬। কৃষিপুঁথি, ২৩৭। পথারকুন, ( প্রথমভাগ ) ২৩৮। সংসারপরিহার,  
২৩৯। প্রতিভা, ২৪০। প্রার্থনা, ২৪১। শ্রীমদগোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবন-চরিত,  
২৪২। হিতচিন্তা, ২৪৩। অবধূত গীতা, ২৪৪। জাতিবিজ্ঞান, ২৪৫। হরবোলা,  
২৪৬। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, ২৪৭। বতকথা, ২৪৮। হরধনুর্ভঙ্গ নাটক,  
২৪৯। সত্যনারায়ণের পাঁচালি, ২৫০। অশ্ব, ২৫১। বাবহার বিপ্লব, ২৫২। অশ্বপ্রবাহ,  
২৫৩। কায়স্থ-সংহিতা, ২৫৪। উমেদারকাহিনী, ২৫৫। বাঙ্গালা মহিমা, ২৫৬। দাদা  
ও আমি, ২৫৭। নাভীপ্রকাশ ও পরিভাষা, ২৫৮। নমাজ তত্ত্ব, ২৫৯। ফুল,  
২৬০। আমাদের কথা, ২৬১। নারীমঙ্গল, ২৬২। নবজুগা, ২৬৩। প্রাকৃত বিজ্ঞান,  
২৬৪। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী, ২৬৫। প্রমীলা-বিলাপ, ২৬৬। পদরত্নমালা,  
২৬৭। গোস্বামীর সাগরযাত্রা, ২৬৮। জর্রিপদপর্ণ, ২৬৯। বাশরী, ২৭০। সর্বনাশী,  
২৭১। নব্য জাপান, ২৭২। ধর্মবীর ( শঙ্করাচার্য্যের জীবনী, ) ২৭৩। তীর্থ-কলকল্পজন,  
২৭৪। দলিলাবলী, ২৭৫। দুর্গোৎসব, ২৭৬। ধর্মবাদ ও ধিকার, ২৭৭। দাম্পত্য-সোহাগ  
২৭৮। জগৎরহস্য ও দার্শনিক-নীমাংসা, ২৭৯। চা-প্রস্তুত-শিক্ষাপ্রণালী, ২৮০। চিত্তবিকার,  
২৮১। সুরেন্দ্রবিনোদিনী, ২৮২। জীবনের দৃষ্টাবলী, ২৮৩। পাগলের কথা।

শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র—২৮৪। সন্ন্যাসপতন কাব্য, ২৮৫। ত্রিসন্ধ্যা, ২৮৬। বিলাপপাঠ  
১ম খণ্ড, ২৮৭। কামিনীকদম্বক, ২৮৮। হরিনারঙ্গীত, ২৮৯। কবিতাকল্যাণ,  
২৯০। অজোবাহ, ২৯১। বল বা ভায়া দাঁড়াই কোথা।

## কার্য্য-বিবরণী

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ—২৯২। কোমল কবিতা, ২৯৩। পদ্মপুষ্পাঞ্জলী ( ১ম ভাগ ), ২৯৪। কল্পনা-কুসুম, ২৯৫। কবিতা-কুসুম, ২৯৬। বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন, ২৯৭। আৰ্য্য-গাথা, ২৯৮। সার-কথা, ২৯৯ অধ্যায় জ্যোতিষ, ৩০০। বামা-রচনাবলী ১ম ভাগ ৩০১। স্বৰ্ণ-বণিক, ৩০২। বিবেকবাঞ্জী, ৩০৩। পৃথ্বীসন্ধান, ৩০৪। ভরতবংশ (কাব্য) ১ম খণ্ড, ৩০৫। পদ্মপ্রসূন, ৩০৬। কনক-কুসুম, ৩০৭। বিবাদ-মুকল, ৩০৮। ত্র্যয়োদশকাব্য, ৩০৯। তাপস-বনিতা, ৩১০। হিমালয়, ৩১১। রাজপুত-কুসুম, ৩১২। প্রভাত কুসুম, ৩১৩। নবযুগ, ৩১৪। পুষ্পমালা, ৩১৫। নিশীথের অশ্রুধারা, ৩১৬। সাময়িক চিত্র, ৩১৭। কাব্যপরিচয়, ৩১৮। বীণা, ৩১৯। তারিণীতত্ত্ব-সঙ্গীত, ৩২০। স্যার নবাব খাজে আবদুল গণি, ৩২১। হিন্দু-উত্থান, ৩২২। প্রেমগাথা, ৩২৩। জীবনময়, ৩২৪। বালিবধ কাব্য, ৩২৫। কুসুমকলিকা, ৩২৬। হরিমতি, ৩২৭। সুধাময়ী, ৩২৮। কায়স্থতত্ত্ব-তরঙ্গিণী, ৩২৯। আৰ্য্য-সঙ্গীত, ৩৩০। অরুণ, ৩৩১। নিকাসিতের বিলাপ, ৩৩২। শুভ অধিবাস, ৩৩৩। ভার্গব-বিজয় কাব্য, ৩৩৪। দীপালী, ৩৩৫। শৈশব-স্মৃতি, ৩৩৬। যজ্ঞকুল-ধ্বংস, ৩৩৭। প্রসাদী, ৩৩৮। পদ্মপ্রসূন, ৩৩৯। সাবিত্রী, ৩৪০। গান, ৩৪১। বঙ্গের বীরপুত্র, ৩৪২। সাহিত্য-সন্দর্ভ, ৩৪৩। কবিতাশতক, ৩৪৪। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, ৩৪৫। সন্ন্যাসী, ৩৪৬। নৈশ-বিহার ( ১ম ভাগ ), ৩৪৭। ত্রেতাযত্নর রামচন্দ্র, ৩৪৮। পদকল্পলতিকা, ৩৪৯। কবিতাবলী, ৩৫০। পার্টিসন-প্রচেলিকা, ৩৫১। " জীবনের সম্মুখভাষ্য, ৩৫২। বীরোত্তর কাব্য, ৩৫৩। আমাদের জাতীয় ভাব, ৩৫৪। রণকাণ্ড, ৩৫৫। বালিকার পঞ্চশিক্ষা, ৩৫৬। বঙ্গমঙ্গল, ৩৫৭। নিহারিকা, ৩৫৮। লহরী, ৩৫৯। মাধুরী, ৩৬০। প্রলাপ, ৩৬১। শৈশবকুসুম, ৩৬২। কবিতাকোরক, ৩৬৩। আমি ভালবাসি, ৩৬৪। নারীরচিত কাব্য, ৩৬৫। নিশীথের অশ্রুধারা ( প্রথমভাগ ) ৩৬৬। কবিতাবলী ( প্রথমভাগ ) ২৬৭। কবিতাহার, ৩৬৮। মেলা, ৩৬৯। বেদবাস, ৩৭০। বেদবাস, ৩৭১। বেদবাস, ৩৭২। বেদবাস, ৩৭৩। বেদবাস, ৩৭৪। কাগজ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৩৭৫। কানীপুর কুসুম বা কানীপুর গ্রামের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ—৩৬৬। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী—৩৭৭। ব্যাধি ও প্রতিকার, ৩৭৮। প্রভাতী, ২৭৯। অরুণ।

শ্রীযুক্ত নরিনাল বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৮০। অমৃতপুলিন, ৩৮১। কুহিনুর, ৩৮২। শৈলবালা, ৩৮৩। যুগলপ্রদীপ, ৩৮৪। পাঁচরকম, ৩৮৫। রুদ্রসেন।

শ্রীমতী মেহলতা-রচয়িত্রী—৩৮৬। শান্তিলতা, ৩৮৭। প্রেমলতা, ৩৮৮। প্রসূনাঞ্জলী।

ইন্দিরান গাভেনিং এসোসিয়েসন—৩৮৯। কার্পাস-প্রবাদ, ৩৯০। কবিসংহার।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার—৩৯১। বিদ্যাসাগর।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৩৯২। উপনিষৎ ব্রহ্মতত্ত্ব।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার অগ্রাভ্য কক্ষের পূর্বেই সর্বাগ্রে ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ জনগণমান্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—গতকল্য আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধব্যক্তির অভাব ঘটয়াছে। রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ আমাদের দেশের প্রায় সকল সংকর্ষে জড়িত ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকতায় তাঁহার দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহার পারদর্শিতার কথা আমাদের আলোচ্য নহে। তিনি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদক থাকিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ‘সাহিত্য-সম্মিলনে’র সভাপতিরূপে আমরা তাঁহাকে সেই অচরাগের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শৈশবে তিনি ইহার সদস্য ছিলেন, এবং ইহার প্রতি তাঁহার চিরদিনই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ছিল। তিনি ইহার হিতৈষী ছিলেন। সহরের নানা পাঠাগার ও সভাসমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। ধর্ম্মা-লোচনায় ও সমাজতত্ত্বানুচিনায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার ছায় কৰ্ম্মী পুরুষ অতি বিবল। অনেকগুলি ঘোঁষ কারবারেও তিনি অধ্যাক্ষতা করিয়া গিয়াছেন, এবং যৌবনে এটর্নীর কার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। চিরদিন তিনি ওকালতী ব্যবসায় ও বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অবশেষে তাঁহার সেই কার্য পরিচালন করিতেছিলেন। রাজদ্বারে তাঁহার বিশেষ সন্মান ছিল। তিনি বহুবৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশনের ছিলেন, এবং সহরের শ্রাকৃতি-প্রকৃতির উন্নতি-সাধনে সংপারামশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহুবিষয়িণী কার্য্য-প্রতিভা ছিল, সেইজন্য বহুবৎসর তিনি দেশের প্রকৃতি-অধিকার করিয়া দেশের বহু কার্য্যে অধিনায়কত্ব করিয়া গিয়াছেন। নিঃস্বার্থভাবে এবং প্রভূত পরিশ্রমে তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। সম্পাদকরূপে এবং বহুকাৰ্য্যের নেতৃরূপে তিনি ভারতের সর্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে দেশের একজন মুখ্যব্যক্তির অভাব হইল। এজন্য সকলেই অতিমাত্র দুঃখিত। অতএব প্রস্তাব এই যে,—

“বঙ্গের প্রকৃতিভাজন, বহুসংকর্ষে অগ্রণী, ইণ্ডিয়ান মিরারের আবাল্য সম্পাদক, অক্লান্তকর্ম্মী, মনস্বী, বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়চিকীর্ষু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বহু সভাসমিতি কারবারের অধিনায়ক, স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ আজ শোকগ্রস্ত। পরিষৎ তাঁহার ছায় সাহিত্যসেবক ও হিতৈষী বন্ধুকে হারাইয়া বিশেষ শোকাহু-ভব করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন। আরও প্রস্তাব এই যে, পরিষদের নিয়মমত এই সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ত্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমাদের আর একটি শোকসংবাদ আছে। এটিও আর একদিকের ইঙ্গিতপতনের সংবাদ। রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন যেমন বহুবিষয়ে বঙ্গালীর প্রকৃতিভাজন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, পণ্ডিত সত্যব্রত দাসগুপ্ত মহাশয়ও

তদনুরূপ বঙ্গদেশে বেদবিজ্ঞানের প্রচার করিয়া দেশের পূজার্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনও সমান দুঃখজনক। তিনি কেবল বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্যবিজ্ঞা-অনুশীলন-কারী পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-মধ্যে বহুকালাবধি বেদাধ্যয়ন-প্রথা লোপ পাইয়াছিল। কাশীবাস-কালে সামশ্রমী মহাশয়ের পিতা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সেই কলঙ্ক-লোপের জুহু দুইটি পুত্রকে কাশীস্থ বেদবিৎ পণ্ডিতের নিকট বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দেন। কাশীবাসী শুদ্ধাচার দ্বিজমণ্ডলী তখন আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া বাঙ্গালীকে বেদ পড়াইতেন না। ইহাদের জন্য পাতনায় এবং ইহারা সপরিবারে শুদ্ধা-চারে জীবনান্তিবাহিত করিতেন। ইহাদের বেদপাঠে আগতি ঘটিলেও বিয় হয় নাই। ইহাদের দুই ভ্রাতার শিক্ষাগুলোই বাঙ্গালায় পাণিনি ও বেদবিজ্ঞান প্রচার হয়। সকল সংস্কৃত শাস্ত্রেই সামশ্রমী মহাশয়ের ভূয়োদশন ও পাণ্ডিত্য ছিল। বেদবিজ্ঞা-প্রচারার্থ তিনি “উষা” ও “প্রত্নকম-নন্দিনী” নামে দুইখান মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালায় প্রচার করিতেন। ঐতিহাসিক সোসাইটির সাহায্যে তিনি সংস্কৃত বহু গ্রন্থের সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তিনিই সর্বপ্রথমে সামবেদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধগুলির আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদকে “জুবার গান” বলা পরি-ভাগ করেন। ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার এই বিজ্ঞান আদর সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিক সোসাইটি তাঁহাকে বিশিষ্ট সভাপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত বোডে তিনি বহুকাল সদস্য ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা একজন অসাধারণ মহতিময় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতকে হারাইলাম। বাঙ্গালীর একটি প্রধান গৌরবস্থল চিরদিনের মত লুপ্ত হইল। অতএব প্রস্তাব করি—“বঙ্গের অদ্বিতীয় বেদবিৎ, সর্বশাস্ত্রদর্শী, বাঙ্গালা ভাষায় বেদবিজ্ঞান প্রথম প্রচারকর্তা, বাঙ্গালার প্রথম বেদানুবাদক, বহু সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশক ও সম্পাদক, বাঙ্গালী সাহিত্যের হিতৈষী, স্নেহক এবং নাট্যমোদী পণ্ডিত ও সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ একজন ভারতবিদিত, পাশ্চাত্যদেশ-বিশ্রুত-কীর্তি পণ্ডিত-রত্নকে হারাইয়া বিশেষ দুঃখিত ও শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা ভাষারও বিশেষ ক্ষতি হইল। এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ অতিমাত্র শোকান্বিত করিয়া তাঁহার শোকর্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন। প্রথমত এই সংবাদ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হিতব্রত সামকণ্ঠ মহাশয়কে জানান হউক।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এই উভয় মহাত্মার প্রতি সভার সম্মান-জ্ঞাপনার্থ সকলকে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন, রায় মনোজনাথ সেন বাহাদুর স্বীয় কর্তৃ-জীবনের অর্দ্ধশতাব্দী-কাল দেশের কার্যে নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া যে মহাত্ম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের অমূল্যবস্তু। তাঁহার সহিত ১৮৭৭ বৎসর একত্র কাজ

করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, তেজস্বিতা, পরোপকারস্পৃহা প্রভৃতি সদৃশ্ণের যি চমৎকার কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। আমি প্রস্তাব করি যে এরূপ একজন মহান ব্যক্তির জন্ত পরিষৎ হইতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিস্তারিত এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বেঙ্গ মহাশয়দ্বয় সমর্থন করিয়া, এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় সামশ্রমী মহাশয়ের “কালিদাস” নামের পরিবর্তে সত্যব্রত নাম হইবার বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন,—এদিকে যেমন তাঁহার চারিত্র-নীতি এতটা সত্যপারায়ণ ছিল, বিস্তার পাণ্ডিত্যও তেমন অগাধ ছিল। বেদবিজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের সকল দেশের পণ্ডিতসমাজে পরিভ্রমণ করেন, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করেন। একবার কাশ্মীরে কোন পণ্ডিতসভায় বিচারার্থ বঙ্গদেশ হইতে বেদবিৎ সত্যব্রত স্বয়ং মহারাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। পরে সেখানে বিচারে নবীন পণ্ডিত সামশ্রমী মহাশয়ই জয়লাভ করিয়া বঙ্গের ও বাঙ্গালীর গৌরব বদ্ধিত করিয়াছিলেন। অতএব আমিও প্রস্তাব করি, বাঙ্গালা ভাষায় বেদিক সাহিত্য-প্রচারক বাঙ্গালার গৌরববদ্ধক এই বেদবিৎ পণ্ডিতের সম্মানার্থ পরিষদের একটি বিশেষ সভা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, কেবল বেদবিৎ বা বেদপ্রচারক বলিয়া নহে, কাশ্মীরে বাঙ্গালীর গৌরববদ্ধক বলিয়াও নহে, সামশ্রমী মহাশয় পূর্বাচার্যগণের মত বেদব্যাখ্যাভাও বটে, এবং সে ব্যাখ্যা তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার প্রতিও অশেষ ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কেহ বেদকথা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশ করেন নাই। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থে তাঁহার নাম দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। তিনিই যুরোপীয়গণের বেদবিষয়ে ভ্রান্তমত পরিশুদ্ধ করিবার জন্ত বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যের পদে নিয়োগ করিয়া নিজেদের সম্মানিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গে চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার কৃত বেদব্যাখ্যা ও বেদের বঙ্গভাব বাঙ্গালার লুপ্ত হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, সামশ্রমী মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা আপনারা শুনিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার যে, পরিচয় দিব তাহা আপনারা অনেকই জানেন না। ১৮৬৪ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে নাট্যচর্চা এবং নাট্যশালা-স্থাপনের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং ৬৬খন্ডদাস লুই মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি আদিভাসনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর বৎসরে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় ৬৭খন্ডদাস বোম ৬৮খন্ডদাস চন্দ্র দত্ত, ৬৯খন্ডদাস দত্ত (মাইকেল) ৭০বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। একজন ইহাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে কার্য করিতেন। তিনি এই পণ্ডিতপ্রবর সামশ্রমী মহাশয়।



শামশ্রমী মহাশয়ের নাট্যশালার অনুশীলনে ও উন্নতিকল্পে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনিই মাইকেলের মায়াবানন নাটক কবিত্ব ও কল্পনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং তাহাই প্রথমে অভিনীত হয়। এদেশে প্রকাণ্ড নাট্যশালায় অভিনয়ে রমণী দ্বারা ক্রী-চরিত্রের অভিনয় বৈজ্ঞানিক থিয়েটারেই প্রথম অবলম্বিত হয়। শামশ্রমী মহাশয় তখন ইহার পরিচালক ছিলেন। শেষে “উঃ মহান্তের এই কি কাজ” নামক একখুনা সাময়িক কুৎসিত গ্রন্থের অভিনয় লইয়া মতের অনৈক্য হওয়াতে শামশ্রমী মহাশয় থিয়েটারের কমিটি ছাড়িয়া দেন। এইরূপে যে পণ্ডিত-প্রবরের নিকট আমরা সর্বপ্রধান বেদবিদ্যার ব্যাখ্যা পাইয়াছি, সেই পণ্ডিতপ্রবরের নিকটে সর্বপ্রধান আনন্দ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও লাভ করিয়াছে। বীডনষ্ট্রীটে বৈজ্ঞানিক থিয়েটারের স্টেজই সর্বপ্রথমে স্থাপিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ “দুঃখ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন—আজ শোকসংবাদে সভায় আরম্ভ এবং দুঃখতত্ত্ব ব্যাখ্যায় সভার শেষ বড় উপযোগী হইয়াছে। খগেন্দ্র বাবুর দ্বারা দার্শনিক কবির লিখিত এই দুঃখতত্ত্বের প্রবন্ধটিও ভাষাগৌরবে কাব্যভাষ্যে আরম্ভ হইয়া দার্শনিক গবেষণায় শেষ হইয়াছে। সুখদুঃখময় জগতে দুঃখের তত্ত্ব-কথা শুনিতে কৌতূহল সকলেরই হয়। দুঃখের কথা এমন সুন্দর ভাবে এই প্রথম শুনিলাম। দুঃখের কথা শুনিয়াও সুখলাভ হইল। ইতিপূর্বে সাহিত্য-সভায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর “সুখদুঃখ” নামক প্রবন্ধ পড়েন, আর আজ খগেন্দ্রবাবু কেবল দুঃখের কথা শুনাইলেন। তাঁহার বলিবার গুণে “দুঃখ” শুনিয়াই সুখ হইল। দর্শনই বলুন, আর যাহাই বলুন, দুঃখ নিত্য আছে। দুঃখ কেহ চাহে না, সাংসারিক চেষ্টাও কেবল দুঃখ-বিনাশের জন্ত। দর্শনও সেই দুঃখ বিনাশেরই উপদেশ দেন। আমরা সাংসারিক ভাবে দুঃখের বিনাশ বা সুখ যাহাকে বলি, দর্শন তাহাকেই আসল দুঃখের ভিত্তি বলেন। সর্বদর্শনের প্রতিপাত্তই সর্বদুঃখ বিনাশ। পদার্থতত্ত্ব জানিবার জ্ঞান হইলেই দুঃখের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিনাশের পছা নির্দেশই আমাদের দর্শন আর প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা প্রকৃতি জয় করাই পাশ্চাত্যদর্শনের উদ্দেশ্য। আসল কথাটা কিন্তু আমরা মহাভারতে ভীষ্ম মুখে পাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে “সুখং তত্ত্ব প্রতিদাস্তাঃ” বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখিলেই দুঃখবিনাশের সাধ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিহারী মহাশয় বলিলেন, রাজা বিনয়কৃষ্ণের “সুখ দুঃখ” প্রবন্ধ যেমন সুখপ্রদ ছিল, খগেন্দ্র বাবুর কেবল “দুঃখ” প্রবন্ধও সেইরূপ সুখপ্রদ হইয়াছে। তাঁহার ভাষা প্রোঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। “মন এব মহুয়াগাং সুখদুঃখত্ব কারণ এব”-মনই মানবের সুখ দুঃখের কারণ। নিরবচ্ছিন্ন সুখদুঃখ কাহারও হয় না। অবৈতন্যদে দুখদুঃখের ভেদ নাই। তত্ত্ব বলেন পাশবিক হইলেই জীব, আর পাশবিক অবস্থাই শিব।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখকের দ্বারা পণ্ডিতের প্রবন্ধ যে গভীর জ্ঞানপূর্ণ তাহা

আর বুঝাইতে হইবে না। তিনি পাশ্চাত্যদর্শনে বিশেষজ্ঞ, প্রাচ্যদর্শনেও অভিজ্ঞ এবং নিজের ধীর হির বাক্তি। তাঁহার কাছে বহী আশা করি তাহা পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধে তিনি মত উদ্ধার করিয়া পূর্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যায় নিজ পাণ্ডিত্যের যেমন পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি নিজের সিদ্ধান্তগুলিতে আপনার চিন্তাশীলতারও বিশ্বেষ পরিচয় দিয়াছেন। হুংথ সর্বত্র পরিহার্য্য এবং সুখ সর্বত্র প্রার্থনীয়। হুংথ ও সুখ লক্ষণ করিয়া বুঝান যায় না, অনুভবে বুঝিতে হয়। সকলেই সুখ চায়, হুংথ চায় না। হুংথদ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস মহিমামণ্ডিত হইয়াছে। সুখ তদনুরূপ কিছু করে না। হুংথের চরম অনুভব করা যায়, সুখের চরম ভোগ করা যায় না। হুংথ যে পরিতাজনীয় তাহা সকলে স্বীকার করেন না। বৌদ্ধদার্শনিকেরা বলেন, সকল প্রকার হুংথ আমাতে আত্মক, খগেন্দ্র বাবু এহেন হুংথের সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধে নিজের অনুশীলনের ও চিন্তার ফলাফল আমাদেরিগকে জানাইয়া বিশেষ উপকার করিলেন। আমি সর্বাস্তঃকরণে তাঁহার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের ভক্ত প্রণামসা করিতেছি ও বস্তুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

খগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির সম্বন্ধে জানাইলেন যে, বর্তমান ১৩১৮ সাল ২৩তে পরিষৎ আর একটি চিরপোষিত সঙ্কল্পে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আইন-বলে আমাদের দেশের ছাপা ছোটবড় ও ভালমন্দ সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জাতীয়-পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়মে সঞ্চয় করিতেছেন। বিদেশে বিদেশীর নিকট আমাদের জাতীয়-সাহিত্য আদর লাভ করিতেছে, ইহা অল্প স্মৃথের বিষয় নহে, কিন্তু সে সঞ্চয়ের দ্বারা আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও উপকার পাইতে পারি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে বাহাতে এ দেশের সমস্ত পুস্তক সংগৃহীত হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করার প্রস্তাব আমি বহুকাল হইতে করিয়া আসিতেছি। বিশেষ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং পরিষদের প্রতি স্নেহবান্ শ্রীমান্ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রন্থরক্ষকরূপে পাইয়া এবং সেই সঙ্কল্পসারে কাধ্য করিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। গত মাসে আমাদের চেষ্টায় প্রায় চারিশত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা যাহার কাছে গিয়াছি, তিনিই পরিষদের এই সঙ্কল্প গুনিয়া আনন্দ সহকারে নিজরচিত, মুদ্রিত বা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দান করিয়াছেন। অল্প সভাস্থলে যে এক আলমারি পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ শ্রীমান্ অসিতকুমারের দান ও চেষ্টার ফল। আশা করি দেশের অন্যান্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকের দ্বারে এই সম্বন্ধে তিক্কার বুলি লইয়া আমরা যে দিন উপস্থিত হইব সে দিন তাহারাও আমাদের বিমুখ করিবেন না। এই সংবাদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে অসিত বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, অসিত বাবুকে পত্র লিখিয়া এই সংবাদ জানাইতে হইবে। বোমকেশ বাবু এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে বোমকেশ বাবু শ্রীযুক্ত রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রদত্ত গোড়পাখার চিত্রিত ইষ্টক-প্রস্তরাদি প্রদর্শিত ও তাহার কারুকার্য্য-ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থলে জানাইলেন যে, আমাদের

এই সাহিত্য-বন্ধুটি আমাদের হৃদয়গত্রে এখন একপ্রকার মৃত্যু-শয্যা শায়িত। চিকিৎসকগণ তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি অল্প রাত্রি প্রভাতে তাঁহার আর সূর্যোদয় দর্শনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাঙ্গালী গৌড়ের, পাণ্ডুর এবং মোগল বর্ধনের ইতিহাস আলোচনায় প্রলোভিত হইয়াছেন। আজ আমাদের দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিরোভাবে শোকপ্রকাশ করিতে হইল, আবার হয়ত কাল এই অনাড়ম্বর অক্লান্তকর্মা পরম সূহৃদের বিরোগ-দুঃখ জ্ঞাপন করিতে হইবে। ভগবানের কাছে একান্ত প্রার্থনা তিনি দয়া করিয়া রাধেশ বাবুকে অকাল-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করুন। তিনি বাচিয়া থাকিলে পরিষৎ তাঁহার কাছে এরূপ বহু উপকার এবং ঐতিহাসিক তথ্যের বহু প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইবেন।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু ছইখানি প্রাচীন পুথির প্রতিলিপি এবং একখানি পুথি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, পরিষদের অতি শৈশব হইতেই যিনি ইহার সমস্ত এবং ইহার কার্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, যিনি ইহা অকৃত্রিম বন্ধু এবং যিনি এখন নিজের ব্যয়ে নানা গ্রামাদি ঘুরিয়া অন্বেষণপূর্বক পরিষৎকে বহু প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, সেই পরম সূহৃৎ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্ল মহাশয় এবার বঙ্গসাহিত্যের ছইখানি অমূল্য লুপ্ত গ্রন্থের আবিষ্কার, উদ্ধার ও তাহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ইহার একখানি কবির চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণকীর্তন” ও অপরখানি বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ গীতার প্রাচীন পত্যানুবাদ “সারঙ্গ-রঙ্গদা”। এই গীতার অন্তবাদকই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাগীশ রঙ্গচারী। কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানি শ্রীনিবাসাচার্য্যের দৌড়িক-বংশধরের বাড়ীতেই প্রাপ্ত এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ত্রাণশাসনের অনুরূপ অঙ্করে লিখিত। এই পুথিখানির উল্লেখ আমরা আজ ৩০৪০ বৎসর কাল শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোথায়ও ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় নাই। বসন্ত বাবু আজ এই গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং বঙ্গসাহিত্যেও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। অতঃপর সভাস্থ সকলেই বসন্ত বাবুকে এজ্ঞ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা মহাশয় এই ছই পুথি সম্বন্ধে বসন্তবাবুর লিখিত প্রবন্ধ দুইটির সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং জানাইলেন যে, গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি এই ছই গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশের ভার বসন্তবাবুকে দিয়াছেন। যথাকালে ইহার অন্তান্ত বিবরণ জানান হইবে।

সভাপতি মহাশয়ও এই পুথি আবিষ্কারের জন্ত বসন্ত বাবুকে ধন্যবাদ করিলেন। . অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা

সহঃ-সম্পাদক

শ্রীবরদাকান্ত রায় বিহারদ্ব

সভাপতি

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সময়—১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও  
তাহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারক এম্ এ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিচারক

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" শ্রীশচন্দ্র মিত্র

" বিহারীলাল সরকার

" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বন্দ্ব

" গৌরহরি সেন

মৌলবি আবুলকাসেম

" কেশবনাথ কাব্যভীর্থ

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ষ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

" রামচরণ বিজ্ঞানবিনোদ

" তারকনাথ বিশ্বাস

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ

" রূপসনাতন হালদার

" শশিভূষণ পাল

" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

" রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

" কুমুদবন্ধু রায়গুপ্ত

" রামকমল সিংহ

" অমূল্যবিহারী দত্ত

" অন্নদাপ্রসাদ সঁতরা

" পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল

" বাগীনাথ নন্দী

" বিনোদবিহারী গুপ্ত

" অনিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

" স্বর্ষ্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

সহঃ-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে লালগোলায় রাজা  
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই দিন মোহনবাগান  
দলভুক্ত ফুটবলের খেলোয়াড়দিগের সহিত ইষ্ট ইয়র্কস্ দলের খেলার জন্য নির্দিষ্ট থাকতে,  
উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল এবং সেই হেতু উপস্থিত সভ্যগণের মতামতসারে  
এই তারিখের বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি

## দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

সময়—১৪ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

আলোচ্য বিষয় :—

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভা-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য-নির্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সভ্যগণের পত্র ও তদনুযায়ী কার্য, ৫। প্রদর্শন—(ক) মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ শর্মা কবীন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত পুর্নি বিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত বৃন্দাবনের কতকগুলি চিত্র ও ইষ্টক, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের “বেদ জগতের আদি গ্রন্থ” ও শ্রীযুক্ত হরিন্দাস পালিত মহাশয়ের “গোড়ে গাজন” নামক প্রবন্ধ, ৭। শোক-প্রকাশ (ক) রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাদুর, (খ) কবিরাজ হরলাল গুপ্ত (গ) রামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি :—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিজ্ঞারত্ন এম্ এ, বি এল্ ( সভাপতি )

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারীআনন্দ দেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সাহায্য বি ই  
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

” কৈলাসচন্দ্র সিংহ

” বিশন স্বরূপ

” বিহারীলাল সরকার

” গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

” উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞারত্ন

” রামকমল সিংহ

” দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

” সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

” অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

” জ্যোতির্শ্রম্য ঘোষ

” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

” তারকনাথ বিশ্বাস

” মাখমক্কক বসু

” নন্দকুমার পদ্যোপাধ্যায়

” শশিকান্ত সেনগুপ্ত

” রামেন্দ্রনাথ গুপ্ত

” নারায়ণচন্দ্র মজুমদার

” বাণীপদ সেনগুপ্ত

” খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

” অমৃতগোপাল বসু

” চারুচন্দ্র বসু

” গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত

” শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

” কৃষ্ণদাস আচার্য্যচৌধুরী

” নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

” শশিভূষণ পাল

” ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

” বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ

শ্ৰীযুক্ত গিৰিজীমোহন সান্তাল বি এ

- " গৌৰহৰি সেন
- " স্বৰেন্দ্ৰনাথ মৈত্ৰ
- " নৱেন্দ্ৰনাথ ৰক্ষিত
- " যোগীন্দ্ৰপ্ৰসাদ মৈত্ৰ
- " বসন্তৰঞ্জন ৰায় বিদ্বদ্ভৰত
- " বীৰেশচন্দ্ৰ সেন
- " বিনোদবিহাৰী গুপ্ত
- " পৰাণেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল
- " স্বৰ্ণাকুমাৰ পাল
- " ৰাখালৰাজ ৰায়
- " অনিলকৃষ্ণ ঘোষ
- " প্ৰমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- " হৰিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

শ্ৰীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

- " ডাঃ শ্ৰীশচন্দ্ৰ বসু
- " সত্যেন্দ্ৰসেবক নন্দী
- " বসন্তকুমাৰ চক্ৰবৰ্ত্তী
- " শ্ৰীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- " অসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায় বি এ
- " নৱেন্দ্ৰকুমাৰ দত্ত
- " পুলিনবিহাৰী দত্ত
- " গুৰুনাথ সেনগুপ্ত
- " ৰমেশচন্দ্ৰ বসু
- " নৱেন্দ্ৰনাথ দাশাল
- " নৃপেন্দ্ৰনাথ বসু
- " বাণীনাথ নন্দী
- " বীৰেন্দ্ৰকিশোৰ আচাৰ্য্যচৌধুৰী
- " চাকচন্দ্ৰ সিংহ এম্ এ

শ্ৰীযুক্ত ৰামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ত্ৰিবেদী এম্ এ ( সম্পাদক )

- " ব্যোমকেশ মুস্তফী
- " হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্ এ
- " ৰাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- " তাৰাপ্ৰসন্ন গুপ্ত বি এ

সহঃ-সম্পাদক

সভাপতি শ্ৰীযুক্ত সান্দাচৰণ মিত্ৰ এম্ এ, বি এল্ উপস্থিত না থাকাৰ সৰ্বসন্মতি-ক্ৰমে পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত বৰদাকান্ত ৰায় বিচাৰক এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিলে, গত অধিবেশনৰ কাৰ্য্যবিবৰণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপৰে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি প্ৰস্তাব ও সমৰ্থনৰ পৰ সভ্য নিৰ্বাচিত হইলেন :—

প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	নূতন সভ্য
মাননীয় মহাৰাজ	শ্ৰীযুক্ত সান্দাচৰণ মিত্ৰ	১। মহাৰাজ শ্ৰীযুক্ত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ
শ্ৰীযুক্ত শ্ৰীমন্তচন্দ্ৰ নন্দী বাহাদুৰ		২। ভক্ত-দেও বাহাদুৰ, ময়ূৰভঞ্জ।
শ্ৰীযুক্ত সত্যীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ	ব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। শ্ৰীযুক্ত দেবপ্ৰসাদ দত্ত
		মজিলপুৰ, জয়নগৰ।
অসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায়		৩। ডাঃ বীৰেন্দ্ৰনাথ বসু এল্ এম্ এল্,
		৪। দুৰ্গাচৰণ মিত্ৰেৰ ইট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভা
যতীন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় হেডমাষ্টার, কুড়িগ্রাম স্কুল, যশোহর।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৫। " প্রকাশচন্দ্র রায় Asst. Accountant General's Office, Shillong, Police Bazar.
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত	"	৬। শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায় Asst. E. B. & Assam Secretariat Joginaya Asram, Laban, Shillong.
"	"	৭। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঘোষ Clerk, I. G. Registration Office, Ramna, Dacca.
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	" বামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	৮। " সেবানন্দ ভারতী ৩৮ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালি, কলিকাতা।
"	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	"	১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কবিত্বগণ ১০ নং বিন্দু পালিতের লেন।
"	"	১১। " মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৪৩১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট।
" বিনয়কুমার সরকার	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। " সৌরীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বেহালা, ২৪ পরগণা।
" অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য-চৌধুরী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
" নিত্যানন্দ রায়	" রামকমল সিংহ	১৪। শ্রীযুক্ত নির্মালচন্দ্র পাল ১৩৪ আমহাট্ স্ট্রীট।
"	" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	১৫। " অটলকৃষ্ণ দাস ২ টাপাতলা সেকেন্ড লেন।
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১৬। " সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জমিদার, নেহালিয়া এন্টেট, জিন্নাগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
"	"	১৭। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্ এম্ এম্, ১২ কালিদাস পুতিভুগুনের লেন, কালিঘাট।

- প্রস্তাবক                      সমর্থক                      নতুন সভ্য
- শ্রীযুক্ত হুসেননাথ গঙ্গোপাধ্যায়    শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত    ১৮।    „    নীরদকৃষ্ণ রায় বি এ  
ডে: ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা।
- শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়    শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র সরকার    ১৯।    শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক  
Land Acquisition Office.  
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
- „    গিরীশচন্দ্র সেন                      „    হুসেননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২০।    „    রাজেন্দ্রপ্রসাদ  
এম্ এ, বি এল  
৩ ডাঃ নূরউল্লাহ লেন, বালীগঞ্জ।
- „    হুসেননাথ গঙ্গোপাধ্যায়    „    গোপেন্দ্র সরকার    ২১।    „    খগেন্দ্রচন্দ্র বসু  
৫৯ পদ্মপুকুর রোড।
- „    বাপীনাথ নন্দী                      „    অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ ২২।    „    মনমথনাথ চক্রবর্তী  
৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
- „    বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যরত্ন    „    বোমকেশ মুস্তফী    ২৩।    „    জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়  
৩ ঠাকুরদাস পার্লিতের লেন, বহুবাজার।
- „    „    ২৪।    „    শঙ্কুচন্দ্র দত্ত বি এ  
Quarter Master  
General's Office, Simla Hills.
- „    রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী                      „    ২৫।    „    দুর্গাদাস অধিকারী বি এল  
কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
- „    পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী                      „    ২৬।    „    পণ্ডিত গিরীজাশঙ্কর আচার্য  
কুষ্টিয়া হাই স্কুল, মদীয়া।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, খ্যাতনামা লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনार्থ পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য-নির্বাচনের প্রথা আছে এবং এই বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ১২ জনের অধিক হইবে না, বলিয়া নিয়ম আছে (পরিষৎ-নিয়মাবলী ১১ এবং ১১ ক)। সম্প্রতি পরিষদের সাতজন বিশিষ্ট সভ্য আছেন ও ১ জন বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচনের জন্ত তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন ;—

মাত্ৰবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপে

সবিসময় নিবেদন,

গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য-তালিকার কয়েকটা পদ শূন্য হইয়াছে। নিম্নোক্ত খ্যাতনামা মহাশয়গণের নির্বাচন



দ্বারা উক্ত তালিকা পূর্ণ করিলে তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে এবং সাহিত্য-পরিষদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এই বিবেচনায় পরিষদের নিয়মাবলীর অন্তর্গত ১১ ধারা অনুসারে আমরা তাঁহাদের নির্বাচন প্রস্তাব করিতেছি। আপনি সাহিত্য-পরিষদের আগামী মাসিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া নিয়মানুযায়ী কর্তব্য নির্বাহ করিলে সুখী হইব। ইতি

প্রস্তাবিত সভা	ভবদীয়
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এল্	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
„ „ সত্যব্রত সামশ্রমী	শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
	শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, পরিষদের অত্যন্ত দুর্দৃষ্টবশতঃ এই পত্র পরিষদের সভ্যদিগের নিকট উপস্থিত করার পূর্বে আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বিশিষ্ট সভা নির্বাচনের প্রণালী সভ্যদিগকে জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রস্তাবিত সভাগণের নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত পরিষদের নিয়মানুযায়ী প্রথমে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা অরূপে করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—	৩২০। The Journal of the Royal Asiatic Society, January 1906
	৩২৪। „ April 1906
	৩২৫। „ July 1906
	৩২৬। „ January 1907
	৩২৭। „ April 1907
	৩২৮। „ July 1907
	৩২৯। „ October 1907
	৪০০। „ January 1908
	৪০১। „ April 1908
	৪০২। „ July 1908
	৪০৩। „ October 1908

উপহারদাতা	পুস্তকের নাম
	৪০৪। The Journal of the R. A. Society October 1904
	৪০৫। „ 1905
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন	৪০৬। পদচিন্তামণিমালা
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪০৭। খুমুগিরি রামায়ণ
	৪০৮। হরিকথা
শ্রীযুক্ত অশোকপ্রকাশ সেন	৪০৯। নববিধান কি ?
	৪১০। অশোক-চরিত
	৪১১। কবিতামালা
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র	৪১২। শ্রীগোরাঙ্গলীলা
	৪১৩। সরল শোলাঙ্কি-পরিচয় বা প্রাচীন শোলাঙ্কিজাতির পরিণাম
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ	৪১৪। গীতিকুঞ্জ
	৪১৫। কাব্যমালা—দ্বিতীয় প্রচার
	৪১৬। গীতগোবিন্দ—দ্বিতীয় প্রচার
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে	৪১৭। নবভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ
	৪১৮। The Jagannath College Magazine, August 1910
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে	৪১৯। The Jagannath College Magazine, January 1910
	৪২০। „ February 1910
	৪২১। „ March 1910
	৪২২। „ October 1909
	৪২৩। „ November 1909
	৪২৪। „ December 1909
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	৪২৫। Adam's Report on Vernacular Education in Bengal & Behar
	৪২৬। উক্তর শ্রীরামায়ণ
	৪২৭। জল সমবরাহের কারখানা, ১ম খণ্ড
	৪২৮। „ ২য়
	৪২৯। আলমচতুষ্টয়

উপহারদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী •	৪৩০। জেরুসালেম বা রয়তুল মোকাদ্দেসের ইতিহাস
	৪৩১। The Report of the Inaugural meeting of the Froebel Societ- of Calcutta
	৪৩২। ঐতিহাসিক চিত্র
	৪৩৩। কোহিনুর (আষাঢ় ১৩১৮)
	৪৩৪। The Dacca Review, July 1911
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায় গুপ্ত	৪৩৫। সান্ন্যবাদ শাস্ত্রশতক
” যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ	৪৩৬। হোমারের ইলিয়ড
” ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারত	৪৩৭। ব্যাকরণ-বিত্তীষিকা
” যোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ	৪৩৮। শুভশুচুনির ব্রতকথা
	৪৩৯। সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা
” ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৪৪০। পাইকপাড়া ও কান্দীরাজবংশ
” পুলিনবিহারী দত্ত	৪৪১। Hitopadesha
	৪৪২। Elihu Jan's story
” সুরেন্দ্রনাথ দাস, গুপ্ত	৪৪৩। নিবেদন
” কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৪৪। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা
” শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ	৪৪৫। Medical Magnetism
” শ্রীমৎ লক্ষণ মজুমদার	৪৪৬। স্বধর্ম
” মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪৪৭। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ
• স্ববলচন্দ্র মিত্র	৪৪৮। শকুন্তলা
	৪৪৯। সীতার বনবাস
	৪৫০। ছাত্রবোধ অভিধান
	৪৫১। সরল বাঙ্গালা অভিধান
	৪৫২। সরল বঙ্গীয় শব্দকোষ
	৪৫৩। কুন্তিবাসী রামায়ণ
	৪৫৪। মুখ্যবোধ ব্যাকরণ
	৪৫৫। Constant Companion, Phrases & Idioms.
	৪৫৬। Student's Anglo-Bengali Dictionary

উপহারীতা

পুস্তকের নাম

শ্রীযুক্ত স্বৰ্ণচন্দ্র মিত্র

৪৫৭। Pandit Iswar Ch. Vidyasagar,

A story of his life & works

• সংস্কৃত পুঁথি

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ

১। হরিভক্তি করলতা

২। চৈতন্যচন্দ্রোদয়

৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বাঙ্গালা পুঁথি

অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী

১। চৈত ( প্রাচীন পুঁথি )

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ

২। পদাবলী—গোবিন্দ দাস

৩। ঐ—কবিশেখর

৪। চৈতন্য-চরিতামৃত—কবিরাজ গোস্বামী

৫। প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস

৬। আশ্রয়নির্ণয়—কৃষ্ণদাস

৭। সুদামার দারিদ্র্য-ভঞ্জন—দ্বিজ পরশুরাম

৮। দ্রোণপর্ব—নন্দরাম দাস

৯। প্রেমতরঙ্গিণী—( খণ্ডিত ) ভাগবতাচাৰ্য্য

১০। সুন্দরাকাণ্ড—কৃত্তিবাস

১১। আদিকাণ্ড—ঐ

১২। উত্তরাকাণ্ড—ঐ

১৩। গোলক-সংহিতা—বৃন্দাবন দাস

১৪। সাধন-দীপিকা

১৫। বৃন্দাবনধ্যান—কৃষ্ণদাস

১৬। বৈষ্ণববিধান—বলরাম দাস

১৭। চৈতন্যচৌতিশা—বৃন্দাবন দাস

১৮। পূজাপদ্ধতি

১৯। ব্রহ্মপটল রত্নকারিকা

২০। ভজনক্রমগ্রন্থ—কৃষ্ণদাস

২১। ভক্তি-ব্রাহ্মবীকণা—নরনানন্দ দাস

২২। ভক্তি-চিন্তামণি—বৃন্দাবন দাস

২৩। ঐ ( খণ্ডিত ) ঐ

উপহারদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিহঙ্গমর্ড	২৪। কর্ণপর্ক
	২৫। ভীষ্মপর্ক
	২৬। সভাপর্ক
	২৭। উজোগপর্ক
	২৮। বিরাটপর্ক
	২৯। গদ্যপর্ক
	৩০। আশ্রমিকপর্ক
	৩১। শল্যপর্ক
	৩২। বনপর্ক
	৩৩। সৌপ্তিকপর্ক
	৩৪। নৈষদপর্ক
	৩৫। ত্রিশিকপর্ক
	৩৬। নারীপর্ক
	৩৭। শান্তিপর্ক
	৩৮। দ্রোণপর্ক
	৩৯। স্বর্গারোহণপর্ক
	৪০। আদিপর্ক
	৪১। অশ্বমেধপর্ক
	৪২। পার্শ্বগ্রহ তিনখানি

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, শ্রীযুক্ত পঞ্চপতিনাথ শর্মা কবীন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করেন। রাখালবাবু বলেন যে, মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত মুদ্রাগুলির ভিতরে গ্রীসদেশীয় মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র মহাশয়ের মুদ্রা নানা দেশীয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর প্রদত্ত মুদ্রা দুইটির মধ্যে একটি সাহ আলাম দ্বিতীয়ের রোপা সিকি (১২০০ হিঃ), অপরটি বোনিওর সারাওয়ারকের রাজা চার্লস ক্রকের তাম্রমুদ্রা।

রাখাল বাবু এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজপ্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বৃন্দাবন ■ চতুর্পার্শ্ব লীলাবনের নিম্নলিখিত ২৫ খানি আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন—(১) গোবিন্দজী—(২) গোপীনাথজী—(৩) মদন-মোহনজী—(৪) চৌরাসীখাড়া—(৫) গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির—(৬) মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির—(৭) লালাবাবুর মন্দির—(৮) সাহজীদেব মন্দির—(৯) শেঠদেব দেবালয়

( ১১ ) ব্রহ্মচাৰীৰ ঠাকুৰবাটী—( ১১ ) বাঁকেবেহাৰীৰ মন্দিৰ ( ১২ ) শ্ৰামকুঞ্জ ও বাধাকুঞ্জ ( ১৩ ) ও ( ১৪ ) বৃন্দাবনেৰ দৃশ্য—( ১৫ ) কেশীবাট—( ১৬ ) মথুৰাৰ বিশান্তিৰ ঘাট—( ১৭ ) গোবৰ্দ্ধনেৰ মানসগঙ্গা ও ভৱতপুৰেৰ ৰাজবাটী—( ১৮ ) ও ( ১৯ ) কুসুম সন্ধ্যাবৰ ও তাহাৰ আঁৱে জাঠৰাজ হৰজমলেৰ সমাধি—( ২০ ) ভৱতপুৰেৰ দিগ্ভবন—( ২১ ) ত্ৰীকুণ্ডেৰ বালা-লীলাস্থান—নন্দগ্ৰাম বা নন্দীশ্বৰগ্ৰাম—( ২২ ) বৰ্ণা বা বৃষাভম্বৰ—( ২৩ ) জয়পুৰেৰ ৰাজবাটী ( ২৪ ) কামাবন—( ২৫ ) জয়পুৰেৰ মিউজিয়াম । এই সমস্ত চিত্ৰ-প্ৰদৰ্শনপ্ৰসঙ্গে ত্ৰীমুকুত পুলিনবিহাৰী দত্ত মহাশয় বলেন যে, নগেন্দ্ৰ বাবু তাহাৰ ব্ৰজপৰিক্ৰমা গ্ৰন্থে নন্দকুমাৰ ঘোষেৰ উল্লেখ কৰিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে । নগেন্দ্ৰ বাবুৰ উল্লিখিত ব্যক্তিৰ নাম নন্দকুমাৰ বসু এবং তিনি পৰিষদেৰ পৰিচিত ৰায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুৰেৰ পূৰ্বপুৰুষ । বৃন্দাবনে ৮ নন্দকুমাৰ বসু মহাশয় গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহনেৰ তিনিট নূতন মন্দিৰ তৈয়াৰি কৰিয়া দিয়া-ছেন । এই মন্দিৰগুলি বঙ্গদেশেৰ দালানেৰ ধৰণে গঠিত । পুলিন বাবু এই আলোকচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনেৰ পৰ যুগলকিশোৰেৰ মন্দিৰভগ্নাংশ হইতে সংগৃহীত দুইখণ্ড ইষ্টক প্ৰদৰ্শন কৰেন এবং বলেন, বোধ হয় এই ইষ্টক দুইখানিহি আকবৰেৰ সময়ে প্ৰস্তুত ।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, অধিকাংশ সভ্য বিশিষ্ট সভ্য নিৰ্বাচনেৰ প্ৰস্তাব অনু-মোদন কৰিয়াছেন । পৰিষদেৰ নিয়মামুসাৰে প্ৰস্তাবিত ও অনুমোদিত সভাগণেৰ নাম পত্ৰদ্বাৰা সমস্ত সভ্যেৰ নিকট প্ৰেৰিত হইবে ।

ত্ৰীমুকুত হৰিদাস পালিত মহাশয়েৰ প্ৰবন্ধ পঠিত হইল না । তৎপৰে পণ্ডিত ত্ৰীমুকুত উমেশচন্দ্ৰ ঙ্গপু বিহাৰত মহাশয় “বেদই জগতেৰ আদি গ্ৰন্থ” এই বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন । তিনি বলেন যে, বেদই জগতেৰ আদি গ্ৰন্থ কি না ইহা জানিতে হইলে কোন্ দেশ সমগ্ৰজগতেৰ মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা প্ৰাচীনতম স্থান ও আদি সভ্যতম জনপদ তাহা বিচাৰ কৰিয়া দেখা কৰ্ত্তব্য । সমগ্ৰ ইউৰোপেৰ মধ্যে গ্ৰীসদেশ আদি ও প্ৰাচীনতম সভ্যজনপদ ; কিন্তু ইহাৰ বয়ঃক্ৰম কেবলমাত্ৰ ২৭০০ বৎসৰ বাইবেলেৰ বয়ঃক্ৰম ৩৯০০ বৎসৰেৰ অধিক নহে । কলিয়ুগেৰ ব্যাসদেব ৩ মহাভাৰতেৰ বয়ঃক্ৰম ৫০০০ বৎসৰেৰ অধিক । মিশৰেৰ বয়ঃক্ৰম ৫৬ হাজাৰ বৎসৰ ও বাবিলনেৰ বয়ঃক্ৰম ২০২৫ হাজাৰ বৎসৰ কল্পনা কৰিলেও, আমাদিগেৰ বেদগুলিকে তাহাৰ বৃদ্ধ প্ৰাপ্ত্যামহ বলিলেও যেন ঠিক বলা হয় না । তুৰ্কত সন্তান হিন্দু যবনেৰা তুৰস্কে গমন কৰেন এবং সেই স্থানে ইহুদী জাতিতে পৰিণত হইয়া বাইবেল ৰচনা কৰেন । তাহাদেৰই একদল আৰবে আসিয়া মুসলমান হন । মিশৰে যাইয়া মিশৰ জাতিতে পৰিণত হন । মিশৰগণ ঐকদেশ হইতে প্ৰাচীন ; কিন্তু তুৰস্কে দেশীয় বা ভাৰতবৰ্ষীয় হইতে প্ৰাচীন নহেন । ইল্লৰাজদ্বাৰা ত্যাগিত হইয়া বৃত্তান্তেৰ ইয়াণ জনপদে এবং বলাভূৰ তুৰস্কে যাইয়া আশুৰীয় বা Assyria জনপদে প্ৰতিষ্ঠিত হন । ইয়াণ আশুৰীয়াবাসী অশুৰদিগেৰ জেলাবন্তা কতকগুলি বেদমন্ত্ৰেৰ সমসাময়িক হইলেও, ঐহেদেৰ প্ৰাচীন মন্ত্ৰও বেদিক সংস্কৃতে লিখিত ও জগতেৰ আদিগ্ৰন্থ সামবেদ হইতে বহু কণীমান । আমৰা তাহাৰ আদি জয়ভূমি আদি স্বৰ্গ মঙ্গোলিয়া হইতে জাৰতে আগমনকালে সামবেদ

গান' করিতে করিতে আসিয়াছিলাম এবং পরে ভারতে আসিয়া ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ প্রণয়ন করি। মাতা মম্বর সন্তানেরা যজুর্বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করেন; সূতরাং সামবেদই ঋক্, যজু, অথর্ব অপেক্ষা প্রাচীন। আয়্যকলহ প্রযুক্ত অম্বরেরা ভারত হইতে পারস্তাদি দেশে গমন করেন এবং জৈন্দাবস্তা তৎপরে প্রণীত হয়। সামবেদের জন্ম যে স্বর্গে হইয়াছে এবং আৰ্য্যগণ স্বর্গ হইতে ভারতে আগমনকালে যে সামবেদ গান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি ১১৮৯ সূত্র ৮ম ও ৮৮৮ সূত্র ১০ম উল্লেখ করেন। বক্তা বলেন যে, কৃষ্ণযজুতেও এই মতের পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং মম্বরও বলিয়াছেন যে, সামবেদ আমাদের পিতৃভূমি স্বর্গে প্রণীত। সামবেদে শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক একটি বর্ণও বিদ্যমান নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ যথাক্রমে Fire, Air ও Sun হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কারণ এই অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য মাম্বর ও মহর্ষি ছিলেন। স্বর্গ যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি এবং উহাই যে জগতের আদি পিতৃলোক তাহারও প্রমাণ আছে। এই প্রমাণের দৃষ্টান্তস্বরূপ শুক্লযজু ১১২৩ ও ১২২৩ এবং কৃষ্ণযজু ১১২২ সূত্র ১ম ও ১১৮৫ সূত্র ১ম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে বৈদিক ও লৌকিক উভয় ভাষাবহুল। সামবেদ লৌকিক সংস্কৃতভাষা-পরিশৃঙ্খ। ঋগ্বেদে জাতির কথা আছে, সামবেদে তাহা নাই। ঋগ্বেদ নানা জ্ঞানরাশিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু সামবেদ কেবল জড়পূজার আদার। এই সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, হিন্দুগণপ্রণীত ঋক্, যজু ও অথর্ববেদ সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন এবং স্বর্গের সামবেদ এই সমস্ত অপেক্ষাও প্রাচীন।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা দেশের প্রচলিত সংস্কার অপেক্ষা ভিন্ন। তিনি তাহার মত পোষণার্থ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলি প্রবন্ধাকারে বাহির হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলে এ বিষয়ে সম্যক বিচার হওয়া সম্ভবপর নহে। বৈদিকসাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে মনুষ্যবাচী বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। বেদে যে ভাবে ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহাদিগকে মনুষ্যবাচী না বলিলে অনেক সময় বেদোক্ত বিষয়ের কোন সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিলে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধারের অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। বেদগুলির পৌরুষাণ্ড্য-সম্বন্ধে বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়ের মত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের প্রতিবাদ করিলেন বটে; কিন্তু তাহার বক্তৃতায় যুরোপীয় মতের গম্য পাওয়া গেল এবং যুরোপীয় ধর্ম্মের প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল। তাহার বক্তৃতায় অনেক আপত্তিযোগ্য কথা আছে। গুপ্ত মহাশয়ের মতে সামবেদে জ্ঞানগর্ভ কথা নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস সামবেদে অনেক উন্নত জ্ঞানের কথা আছে। আমার বোধ হয় ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষে প্রণীত হইয়াছিল। ইংরাজি ভূগোল লিখিত এক একটি স্থানের প্রতিবে

এক একটি শব্দ প্রয়োগ করিলেন, ইহাও বিতর্কের বিষয়ীভূত। এই বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সমর্থন কবিতা করিলেন, বেদ আলোচনায় যাহার অধিকার নাই, তাহার নিকট হইতে বেদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করা নিতান্ত কষ্টকর। বিহারী বাবুর মন্তব্যে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সকলেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করার জন্য সম্পূর্ণ তুল্য অধিকারী। প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা পরিষদের অন্ততম উদ্দেশ্য এবং বেদ ছাড়িয়া প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিষয় বিশেষের আলোচনার অধিকার নাই, এক্ষণে সংকীর্ণ মন্তব্য সাহিত্য-পরিষদের সভ্যের মুখে শোভা পায় না।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মত-সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এতাবৎ তাঁহার কোনও প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, বাদবল্লভ চক্রবর্তী, কবিবাজ হরলাল গুপ্ত ও রামনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং সভাপতি মহাশয় একটি সংকৃত শ্লোকের আবৃত্তি দ্বারা সমবেত সভ্যদিগকে প্রীত করিলেন পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

সহঃ সম্পাদক

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি



## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন ।

সময়—২০শে শ্রাবণ, ৫ই আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা ।

আলোচ্য বিষয়—

পণ্ডিত সত্যব্রত সামগ্রামী, রায় নবেজনাথ সেন বাহাদুর ও বামেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়-  
গণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থা ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তবদ্ব এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

,, হরিদাস পালিত

,, ইন্দ্রভূষণ নাথ

,, নরনাথমোহন বসু এম্ এ

,, রাধিকা প্রসাদ নাথ

,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

,, তারিণীকান্ত চক্রবর্তী

,, চারুচন্দ্র বসু

,, বাসুকীচরণ সিংহ রায় চৌধুরী

,, অমলাচরণ বোষ বিজ্ঞানভূষণ

,, কৌশিকীচরণ সরকার

,, আনন্দনাথ রায়

,, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

,, কৃষ্ণচন্দ্র দেব

,, শশিভূষণ পাল

,, সতীশচন্দ্র মিত্র

,, হৃদয়কুমার পাল

,, সুরেশচন্দ্র সরকার

,, চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবাসী

,, বিনোদবিহারী গুপ্ত

,, বাণীনাথ নন্দী

,, পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত ন্যায়কেশ মুস্তাকী

,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

সহঃ সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । সভাপতি মহাশয় বলেন যে, যে তিনজন মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পরিষদের এই বিশেষ সভা আহৃত হইয়াছে, ইহারা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন । তাহাতেই তাহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিলেন । সামগ্রামী মহাশয়ের ন্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিত বঙ্গদেশে হয় নাই ও অপর কোন দেশে হইয়াছে কি না, তাহা অজ্ঞাত । তিনি বঙ্গদেশে বেদ-প্রচারের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । পাটনাতে সামগ্রামী মহাশয়ের

সামশ্রমী মহাশয়ের পিতাব উদ্দেশ্য ছিল, উত্তরকালে তাঁহার পুত্র বঙ্গদেশে বেদ আনিয়ন করিবেন এবং সেইজন্ত তিনি বালক সত্যব্রতকে শিক্ষার্থ কাশীতে পাঠাইয়া দেন। তিনি সামবেদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অল্পবাণ ছিল এবং তাঁহার বঙ্গভাষায় অনূদিত বেদগুলি আমাদের দেশের সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সভা ছিলেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু পবিত্রদের হ্রদৃষ্ট বশতঃ এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই সামশ্রমী মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম ভারত-বিখ্যাত। দেশের সমস্ত সংকার্যে তিনি যোগ দিতেন। তাঁহার প্রকৃতি বালকের স্থায় সবল ছিল। তিনি সর্ব সম্প্রদায়েব সর্বধর্মের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় সাধারণের হিতকর অনেক কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যেব উন্নতিকল্পেও তিনি অনেক কার্য করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় আরও জানাইলেন যে, বাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের প্রতি শোকপ্রকাশার্থ আহৃত সভার সহিত সভানুভূতিজ্ঞাপন করিয়া রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত শ্রবেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়দ্বয় পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পাণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত আচার্য্য মহাশয়কে আমাদের যে ভাবে দেখা উচিত ছিল সে ভাবে আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। বেদশাস্ত্রে দখল নাই বলিয়া বাঙ্গালীর বহুকালের যে অপবাদ ছিল, সামশ্রমী মহাশয়দ্বারা সেই অপবাদ অপনীত হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার সময় বাঙ্গালী জাতিকে বেদজ্ঞ আচার্য্যগণ ঘৃণা করিতেন। যুরোপীয়গণ ও আমেরিকাবাসিগণ আচার্য্যেব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জানিতেন ও তাঁহার সম্মান করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশাতে আমরা তাঁহার প্রতি কোনও সম্মানপ্রদর্শন করি নাই, কিন্তু এখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মান করা উচিত তাহা বিবেচনার বিষয়। রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনেব মৃত্যুতে সমস্ত ভাবত ব্যথিত। তিনি কর্তব্যপারায়ণ ও নির্ভীক ছিলেন। দেশের সাধারণ মতের আঁপত্তি সত্ত্বেও স্থলভসমাচারের সম্পাদকতা গ্রহণ নির্ভীকতার অস্বাভাবিক প্রমাণ। তাঁহার হৃদয় সমুদ্রতুল্য উদার ছিল। তিনি জাতিবর্ণনির্কিশেবে সমস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার চরিত্রের এই ভাব আমাদের অনুকরণীয়। সমস্ত বর্ণ ও জাতির লোক তাঁহাকে নিজের সুহৃদ বলিয়া মনে করিত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় মালদহবাসী ছিলেন। পাণ্ডুরা ও গোড়ের কীর্ত্তি সঙ্ঘে তাঁহার লিখিত অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পূর্বে সরকারী রিপোর্টে এই স্থানগুলি সঙ্ঘে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু বর্তমানে গোড় ও পাণ্ডুরার সঙ্ঘে যত আলোচনা হইতেছে, তাহার মূলে ছিলেন—পরলোকগত রাধেশ বাবু। প্রাচীন গোড় ও প্রাচীন পাণ্ডুবর্জন যে একই অংশে ছিল, তাহা রাধেশ বাবু প্রমাণ করেন। তিনি রঙ্গপুর-শাখা-

পরিষদের পত্রিকায় কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করেন ও সাহিত্য-পরিষদে প্রদর্শনার্থ কতকগুলি ঐতিহাসিক দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও একজন কর্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি মালদহে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি মালদহে জাতীয় শিক্ষার প্রচারক ছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র ছিল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার ১৫।১৬ বৎসরের আলাপ ছিল। তিনি সমস্ত সংকার্যে যোগ দিতেন, তিনি কোন নীচ প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া মূলভসমাচারের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং অত্যন্ত হৃৎখের বিষয় এই যে, তাঁহার এই কার্যের জন্ত আমরা তাঁহার অজ্ঞাত সমস্ত কার্য ভুলিয়া যাইতেছি। নরেন্দ্র বাবু স্বতির প্রতি আমাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে পরলোকগত সামান্সমী মহাশয় বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন, এই সমস্ত নাটক আমাদের রক্ষা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, আচার্য্য সামান্সমী মহাশয়ের পুত্রগণ সাহায্য করিলে তিনি এই সমস্ত নাটক রক্ষার জন্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের উপকারের জন্ত তিনি দৈনিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তিনি কখনও লোকের খারাপ দিক্ দেখিতে পারিতেন না। তিনি সর্বদা মানুষের দেবত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, তিনি ত্যাগী, নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। নিম্নজীবের প্রতিও তাঁহার প্রেম ছিল। তিনি ২০ বৎসরকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া হোম করিতেন। ‘মূলভসমাচারের’ সম্পাদকত্ব-গ্রহণ, বোধ হয় তাঁহার বার্কক্যের সংঘের ফল।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী মহাশয় বলেন যে, আচার্য্য সত্যব্রত সামান্সমী মহাশয়ের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবী-বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার জীবদ্দশাতে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করাতে পরিষদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে। বাঙ্গালা-ভাষায় বেদ প্রচারের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং এই জন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পরলোকগত রাধেশ বাবু সমস্ত বাঙ্গালাদেশে পরিচিত ছিলেন। দেশের ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ধারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার মত বন্ধুর অকালমৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত হৃৎখিত। তাঁহার স্বতিরক্ষার্থ পরিষদের শুভানুধ্যায়ী অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন এবং পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি বিনয় বাবুর প্রস্তাব ধন্যবাদে সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

## কার্য্য-বিবরণী

৩৫

মাস্তবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়

সমীক্ষ্য—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়,

পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্ মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার সর্ববিধ উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক মালদহ-সমাজের হিতসাধনে তিনিই সর্বপ্রথমে উদ্যোগী হইয়া আজীবন তাঁহার নানাবিষয়িনী প্রতিভার সদ্যবহার করিতেন।

শিক্ষা-বিজ্ঞানে তাঁহার অধ্যবসায় অনেক মালদহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যসেবা সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ঐতিহাসিক প্রবন্ধরাজিহারা তিনি মালদহের প্রাচীন কীর্তিসমুচ্চের প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া লক্ষ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইঁহার স্মৃতি সংযুক্ত করিয়া রাখিতে বাঙ্গালীমাত্রেয়ই ইচ্ছা স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাদের হাতে ৬০০ টাকা সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা নিয়মিত সন্তে এই সামান্য দান গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হই।

(১) কোম্পানীর কাগজে অথবা অন্য কোনও স্থায়ী লগ্নীকার্য্যে আপনারা এই টাকা লাগাইবেন।

(২) ইঁহার বার্ষিক স্মৃতি হইতে আপনারা একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবেন।

(৩) এই বৃত্তির নাম “রাধেশচন্দ্র-জাতীয়-শিক্ষাবৃত্তি” থাকিবে।

(৪) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

(৫) পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচন, প্রাপ্য প্রবন্ধের পরীক্ষণ, বৃত্তিপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আপনারা উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমিতি গঠন করিবেন।

(৬) বৃত্তি-প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) এই দানপত্র আপনারা প্রত্যেক পত্রিকা কার্য্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকার উপযুক্ত স্থানে প্রতিবৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তি-প্রাপ্ত-প্রবন্ধের নাম এবং প্রবন্ধ-লেখকের নাম ধাম প্রতি বৎসর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে।

বশংবদ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সমবেত সভ্যমণ্ডলী এই পত্রের ৷ বিনয়বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হঠতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও সমবেত সভাগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব তিনটি গ্রহণ করেন।

(ক) বেদশাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য সভাব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া অদ্য গভীর শোকপ্রকাশ ও তাঁহার শোকক্লিষ্ট পরিজনের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(খ) বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়চিকীর্ষ বহু সংকার্য্যের অগ্রণী ইণ্ডিয়ান মিররের আবাল্য সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।

(গ) প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক মালদহনিবাসী বাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকক্লিষ্ট পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ, গুপ্ত

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

## প্রথম স্থগিত বিশেষ অধিবেশন

সময়—২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ন ৩টা ।

আগোচ্য বিষয়—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ।

■ উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত রায় ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

„ গিরিজামোহন সান্তাল বি এ

„ জ্ঞানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল

„ সুশীলগোপাল বসু

„ কেশবনাথ কাব্যতীর্থ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেশচন্দ্র সরকার

„ রমেশচন্দ্র বসু

„ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

„ রাধিকালাল রায়

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

„ যতীন্দ্রমোহন রায়

„ সহায়রাম কোঁচ

„ বিধেশ্বরনারায়ণ দেব

„ চিত্তবুধ সান্যাল বি ই

„ রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

„ অধরচন্দ্র ঘোষ

„ অনিলকৃষ্ণ ঘোষ

„ কিরণচন্দ্র দত্ত

„ হীরালাল নাগ

„ রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

„ দুর্গাশঙ্কর রায়

„ কুমুদবসু রায় গুপ্ত

„ আনন্দসুন্দর তর্কবাগীশ

„ ক্ষেত্রমোহন ভট্ট

„ জিতেন্দ্রনাথ সেন

„ নরেন্দ্রকুমার দত্ত

„ অশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

„ তারকনাথ মুস্তফী

„ ইন্দুকুমার মজুমদার

„ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর

„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

„ বিজয়লাল দত্ত

„ পরাগেন্দ্রনাথ বোমাল

„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ রামকমল সিংহ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ সেন বি এ

„ স্বর্য়াকুমার পাল

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু

„ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী

„ হেমচন্দ্র দাশ ভট্ট এম্ এ

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধনে বলিলেন, আজ আমরা যেজন্ম এখানে সমবেত, তাহা আপনাদের অবদিত নাই। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত পুণ্য ধার্মিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতে আমরা সমবেত হইয়াছি। এ সভার অধিবেশন বহুপূর্বে হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহাতে বিলম্ব ঘটয়া গিয়াছে। আজ সভাপতি মহাশয়ের অহুপস্থিতিতে আপনারা আমাকে সভাপতি করিয়াছেন; অগ্রকার কার্য্য শোকের হইলেও আমি তজ্জন্ম করিয়াছি। পূজাহিকে পূজা করিবার সুযোগলাভ করাও ভাগ্যের কথা, আজ আপনারা আমাকে সে সুযোগ দিয়া করিয়াছেন। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবুর রচনার প্রধান গুণ—উহা যেমন তীব্র বিজ্ঞপাতক তেমনি সহৃদয়পূর্ণ। তিনি রহস্য-রচনায় এমন কল্পন শক্তি যোজনা করিতেন এবং তদ্বারা এমন চমৎকার রসোৎপাদন করিতে পারিতেন যে, তাহাতে বিম্বিত হইতে হইত। জুবিলী উৎসবের সময় যে বালকভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে এদেশীয় বালকগণের স্থান আলিপুরের পণ্ডশালায় হইয়াছিল এবং যুরোপীয় বালকগণের স্থান অত্র হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ বাবু পক্ষানন্দে এ বিষয়ে সে সময়ে লিখিয়াছিলেন—“আমাদের বালকগণের জু-বিলি হওয়ার প্রকৃত জুবিলি তাঁহাদেরই হইয়াছে।” সামান্য কথায় তিনি প্ররোচনাপূর্ণ এমন চমৎকার রসসঞ্চার করিতে পারিতেন যে, সেরূপ ক্ষমতা আর কাহারও লক্ষিত নাই। তিনি যে কেবল ব্যঙ্গ-রচনাতেই লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাতেই ক্রটিত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। বাঙ্গালা বর্ণমালা-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি পরিষদে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বর্ণমালা গবেষণার ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ইদানীং ‘বঙ্গবাসী’তেই পক্ষানন্দ নামে বহুরচনা প্রকাশ করিতেম। তিনি একসময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহারই স্মৃতির সন্মানের জন্ত সমবেত হইয়াছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—ইন্দ্রনাথের গুণ অনেক ছিল, তাহা বলিয়া বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। রহস্য-রচনায় তিনি নানা প্রকার রস ফুটাইতে পারিতেন। তিনি বেরূপ হান্ত-রসের অবতারণা করিতেন, তাহা এত হৃদয়গ্রাহী হইত যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া অজ্ঞানোচ্চন করিতেন। ‘বঙ্গবাসী’র সময় পক্ষানন্দই যে ইন্দ্রনাথ বাবুর লিখিত, তাহা নহে। যোগেন্দ্র বাবুও ইদানীন্তন পক্ষানন্দ নাম দিয়াই বহু রহস্যাত্মক রচনা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার লেখা এবং ইন্দ্রনাথ বাবুর লেখা পৃথক করিবার যোগেন্দ্র বাবুর লেখাগুলি “পক্ষানন্দ” এই রূপ নামে রাখা দিয়া মুদ্রিত হইত। ইন্দ্রনাথ বাবুর লেখার সহিত সকলের মিল হইতে না পারে। কিন্তু কেহই অল্প রসাহিত্য করিতেন না। কাহাকেও বাখা দিবার জন্য তিনি এই সকল ব্যঙ্গ-রচনা করিতেন না। তিনি সংসারী ছিলেন, কিন্তু বিলাসী ছিলেন না। প্রাচীন

ভারতের মুনির্ধর্মী তাঁহার আদর্শ ছিল। সেই আদর্শে ব্রাহ্মশ্রমীকে উন্নত করিবার জন্ত তাঁহার প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা ছিল। ব্রাহ্মণ-সভার কার্য-পরিচালন তাঁহার মে আগ্রহ দেখিয়াছি। তাঁহার উৎসাহের জ্বাল উৎসাহ যুবকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই না। আমাদের সমাজে বর্তমানে যে অধঃপতন হইয়াছে, তাঁহার মতে তাহা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের অধঃপতনই হইয়াছে। তিনি নিজ দেশে সংস্কৃত-বিজ্ঞা এবং সদাচার শিক্ষা দিবার জন্ত নিজ গ্রামে “অভয়া চতুষ্পাঠী” স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারের জন্তও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের উন্নতির জন্ত তিনি নবদ্বীপ-সমাজের অঙ্গসংগে স্বদেশে একটি সত্য সংগঠিত করিয়াছিলেন। রোগক্লিষ্ট ও জরাগ্রস্ত শরীর লইয়া ব্রাহ্মণের উন্নতির জন্ত নানা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সৎকলের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন ও শুভ উদ্দেশ্যেই সামাজিক কালিমাগুলি লইয়া তাঁটা বিক্রম করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-সন্তানকে যে ভাবে চাহিতেন, নিজেও ঠিক সেইভাবে আচারবান্ ছিলেন।

তৎপরে ‘বহুমতী’র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,— ইন্দ্রনাথের তিন মূর্তি,—হাস্ত-রসিক, সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কারক। হাস্ত-রসের অবতারণা বিবিধ। একরূপ বহুমতন্ত্রের ‘লোক-রহস্তে’ ও ‘কমলাকান্তে’ দেখা যায়। ইহা ইংরাজী হইতে গৃহীত। অত্র প্রকার হাস্ত-রসের অবতারণা আমরা ইন্দ্রনাথ বাবুতে দেখিতে পাই। তিনি এই রসকে দেশীয় ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার রচনা মর্মস্পর্শী ছিল। তিনি বিক্রমের কশাঘাতে সমাজকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। ইন্দ্র বাবুর ভাষা খাঁটা বাঙ্গালা ছিল। তিনি সমাজকে প্রাচীনের আদর্শে দেশী রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদের ধর্ম অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। তিনি এই ধর্মের ভাব বজায় রাখিবার জন্ত, এতদুসারে দেশে সদাচার শিক্ষার জন্ত বিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। আমি নিজে তাঁহার নিকট হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। তিনি বাঙ্গালী-গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতেন। নিজ গ্রামে তিনি একরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ গ্রামে কাহারও কোনও অভাব হইত না। সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি ইংরাজীভাবে ইংরাজী-রীতিতে বাঙ্গালা লিখিতেন না। তিনি ইংরাজীতে কৃত-বিদ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনায় ইংরাজীর গন্ধ পাওয়া যাইত না। একরূপ একজন প্রতিভাবান্ পুরুষের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করা—আমাদের বিশেষ কর্তব্য।

তৎপরে ‘বঙ্গবাসীর’ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, ‘বঙ্গবাসী’র সহিত ইন্দ্রনাথ বাবুর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আজ বিহারী বাবু পীড়িত হইয়া এ সভার উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া আমি “বঙ্গবাসী”র ভগ্নদূতরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখন ভগ্নদূত হইলেও আমি তাঁহারই-বাতে গড়া। তিনি অতি তীব্র গভীর এবং হৃদয়ঙ্গমিত হৃদয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞান বিবেচক ব্যক্তিও কমই দেখিয়াছি।



কোনও জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা তাঁহার কাছে যেমন পাওয়া যাইত, এমন আর কাহারও কাছে নহে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ইন্দ্রনাথ বাবুর পরলোকগমনে সাহিত্যে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তেমন খাঁটী স্বদেশী ভাব বর্তমানে আর কাহারও কাছে পাওয়া যাইবে না। আমাদের দেশে হান্তরস যে পূর্বে ছিল না, তাহা নহে। হান্তরসের প্রসঙ্গ বঙ্কিম বাবুই অনেকটা ইংরাজী ভাবে আমাদের দেশে অবতারণা করেন। দীনবন্ধু তাহা অনেকটা দেশীভাবে কুটাইয়া ছিলেন, আর তাহার পূর্ণতা সাধন করেন—ইন্দ্রনাথ। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার এই শক্তির বিকাশ হয়। প্রথম বয়সে তিনি একখানি কবিতা প্রস্তুত প্রকাশ করেন। তাঁহার নাম কি দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নাম দিলেন “উৎকৃষ্ট কাব্যম্”। ইহার মূল্য স্থির করিলেন ৫০ কড়া অর্থাৎ আড়াই পয়সা মাত্র। ক্যানিঙ্ক লাইব্রেরীর যোগেশ বাবু তাহার প্রকাশক হন। তাঁহার উপর উপদেশ ছিল, আড়াই পয়সায় বোঁচতে হইবে। তিন পয়সা কেহ দিলে লওয়া হইবে না। এই আধুলা ভাড়াইবার গুণগোল লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে একটু মধুর বিরক্তির ভাব হইত, তাহাই বেশ রসসঞ্চার করিত। ইন্দ্রনাথ প্রথম দিন ক্যানিঙ্ক লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকিয়া এই রসাস্বাদন করিয়াছিলেন এবং পরে কয়েকখানা পুস্তকের বিরক্তলব্ধ অর্থে যোগেশ বাবুর সহিত মিষ্টান্ন উপভোগ করিয়া রসের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এইরূপ উদ্ভট ■ সরস কল্পনা ইন্দ্রনাথ বাবুর অতি সহজ এবং স্বলভ ছিল। নিজ গ্রামের উন্নতিকল্পে সায়দা বাবু, বৈকুণ্ঠবাবু ও ইন্দ্রনাথের চেষ্টা যত্ন, আগ্রহ ও অর্থব্যয় অতুলনীয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের সবপ্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার ভাষাও খাঁটী বাঙ্গালা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ বাহা শুনা যায়, তাহা এই দেশেই এই দেশের ভক্ত বিখ্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, অন্য দেশে এমন দেখা যায় না। সকল বিষয়ে—সাহিত্য-সেবায়, রহস্য-রচনায়, বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে, ধর্ম্য কন্ডে এবং পারলৌকিক বিশ্বাসবলে মৃত্যুর গথে তাঁহার খাঁটী দেশী ভাব বিশেষভাবে অনুকরণীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন, তাঁহার স্মার খাঁটী সাধক ব্যক্তি এবং আদর্শ পুরুষ অতি অল্পই আছেন। দেশের জন্ত এ সমাজের জন্ত তাঁহার প্রাণ বেগুণ কাঁদিত, তাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। সনাতন ধর্ম ও সনাতার রক্ষার জন্ত তিনি বীরের স্মার যুক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদি স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি আমাদের অহুরাগ থাকে, তবে আমরা কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। ১১

তৎপরে বঙ্কিমবাবুর অধিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত মহাশয় জানাইলেন যে, ইন্দ্রনাথ বাবু যে কেবল নিজ গ্রামের হিতার্থে অর্থ ■ সামর্থ্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। বর্তমান সদরে অবস্থানকালে তিনি জেলার উন্নতিকর সকল বিষয়েই মিশিতেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সে সকল কার্য সফল করিয়া তুলিতেন। অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে

স্কুলের বেতন, পাঠ্য পুস্তকাদি এবং তাঁহার নিজ বাসায় আহারাদির সাহায্য পাইত। তিনি যেমন সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে গতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তেমনই তাঁহার ব্যবসায় ওকালতী ও কলকার খনির কার্য-পরিচালনে যথেষ্ট বুদ্ধি ও ক্ষমদৃষ্টির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখিনী ছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহে চক্ষে দেখিতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। স্কুলে যখন পড়িতাম, তখন ইন্দ্রনাথ বাবু সম্বন্ধে সংবাদাদি রাখিতাম। বাল্যকালে চুরি করিয়া পঞ্চানন্দ পড়িতাম। তাঁহার এই সমস্ত রচনাতে যেরূপ নানা বিষয়ের রসায়ক তীর সমালোচনা থাকিত, সেরূপ সমালোচনা বোধ হয় পঞ্চানন্দের পূর্বে আর ছিল না। তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ সাহিত্য-পরিষদেই হয়। পরিষৎ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু উপদেশ দিতেন। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ লেখার অপেক্ষা বক্তৃতায়, বক্তৃতা অপেক্ষা কথোপকথনে এবং তদপেক্ষা বন্ধুবান্ধব পরিবৃত্ত বৈঠকী মজলিসে ফুটিয়া উঠিত। বাঙ্গালা বর্ণমালা-সংস্কারে তাঁহার একটা আগ্রহ ছিল। তিনি যখন পরিষদের সহকারী সভাপতি, তখন তিনি এ বিষয়ে কয়েকটা বক্তৃতা করেন। প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা অতি গবেষণাপূর্ণ। দুই বৎসর পূর্বে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কুলজি সম্বন্ধীয় এক খানি স্মরণ উপহার দেন। তাহা যুদ্ধের ব্যবস্থা এখনও আমরা করিতে পারি নাই। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

তৎপরে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভা শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন,—ইন্দ্র বাবু স্বগ্রামের পার্শ্ববর্তী ২২ খানি গ্রামের লেখাপড়া জানা এবং গণ্যমাণ ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি সজ্জ্ব স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ফরমাইস করিয়া এই সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারা গ্রামের উন্নতিকর সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ-সংশোধক কার্য করাইয়া লইতেন। তাঁহার রসোদ্ভাবনের শক্তিও অসাধারণ ছিল।

তৎপরে উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় বলিলেন,—ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি নূতন পরিচয়েই আত্মীয়ের স্তায় ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণ-ধর্মের সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে আমি সমাজ-সংস্কারক বলিব, না—সমাজ-রক্ষক বলিব। তিনি যদি ভবিষ্যৎ ভারতে-তিহাসের এক পৃষ্ঠা—ঐ একখানা মাত্র পুস্তক লিখিয়া যাইতেন, তাঁহার আর কিছুই না থাকিত, তাহা হইলেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। মানুষ হইতে হইলে লোকের যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, তাহা তাঁহার সমস্তই ছিল। তাঁহার সকল গুণের কথা সকলেই বলিয়াছেন, কেবল একটা গুণের পরিচয় কেহই দেন নাই। ওজ্জ্বল্যবিশয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি হাসিমুখে গল্পাডা করেন এবং হাসি মুখে মা গঙ্গাকে আঁচল পাতিয়া তাঁহাকে লইবার আহ্বান করিয়া শাস্তভাবে মৃত্যুকে অঙ্গিলক্ষন করেন। ইহাতে জীবনের শেষমুহুর্তেও তাঁহার রসায়ক বচনবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীহর্গা

শরণম্

শ্রীচরণেশু—

আমি পীড়িত, এমন কি শয্যাশায়ী ও উথানশক্তিরহিত। সুতরাং অল্পকাল সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ সঙ্কল্পে আমার যথাসাধ্য কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু নিরুপায়। বড়ই হৃদ্যাগোর কথা। আমার অবস্থা সভায় উপস্থিত হইবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল, নহিলে শতকর্ম পরিত্যাগ করিয়াও আমি যাইতাম। আশা আছে যে, স্বর্গীয় পুরুষের যথাযোগ্য স্মৃতি-সম্মান হইবে।

শোক হইবার কথা বটে। কিন্তু শোক করিব না। সেই ধর্মপ্রাণ, ধার্মিক ইন্দ্রনাথ তীরস্ব হইবার সঙ্কল্পে যাত্রা করিবার পূর্বে জননী, পত্নী, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'শোক করিও না, চক্ষের জল ফেলিও না; চক্ষের জলে আমার এ মঙ্গলময় মৃত্যুতে অমঙ্গল ঘটিবে, যদি কিছু আমার পুণ্য থাকে, তাহার ক্ষয় হইবে।' ইনি শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়া-ছিলেন 'চণ্ডি, মা গঙ্গাকে আঁচল পাতিতে বল, আমি যাইতেছি' এইকথা বলিয়া চৈতন্যময়ীর চিন্তা করিতে করিতে সেই পুণ্যশ্লোক পুরুষ জাহ্নবীসলিলে সজ্ঞানে চৈতন্যে মিশিয়া যান। শোক অনিবার্য হইলেও, হইবার বিয়োগে শোক করিব কেন? অল্প শোক করিবার কথা নহে, তাঁহার গুণানুকীর্ণনে ও কীর্তি স্মরণে শোকোপনোদন করিবারই কথা; কিন্তু হৃদ্যাগক্রমে আজ তাঁহার গুণকীর্তনের সুযোগ উপস্থিত থাকিলেও আমি তাহা করিতে পারিলাম না।

বহুসময় লিখিতে পারিলাম না, ক্রটি দার্জনা করিবেন। ইতি তারিখ ২রা ভাদ্র ১৩১৮সাল।

প্রণত—

শ্রীবিহারীলাল সরকার

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারীসভাপতি এবং পরম হিতৈষী সদস্য, বঙ্গভাষার বিবিধ রচনায় লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখক, ব্যঙ্গকাব্য রচনায় অসাধারণ শক্তিশালী, স্বধর্মনিষ্ঠ, সমাজভক্ত স্বদেশের সর্ববিধ কল্যাণকামী, বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক শোক-প্রকাশ ও তাঁহার শোক-সম্বন্ধে পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব সভায় সকলে দৃষ্টিমান হইয়া গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

“পরলোকগত লোকপ্রিয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্তরূপে স্মৃতিরক্ষার জীবন্ত ভাৱ পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।”

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, রাজসাহী-জোয়াড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী নাথ বিশি মহাশয় স্বীয় পুত্র শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশি মহাশয়ের অঙ্কিত স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিবদে উপহার দিয়াছেন। বিশি মহাশয় কার্যগতিকে অগ্রকার সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া হৃৎপ্রকাশ করিয়া তাহা সংবাদ দিয়াছেন। আমরা এই সজ্জন বদান্তবর গুণগ্রাহী জমিদারের দান, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৬ইন্দ্রনাথ বাবুর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

## তৃতীয় মাগিক অধিবেশন ।

সময়—১০ই ভাদ্র, ১৭শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভা-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যয়ে ক্রীত কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা এবং (খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্তি ও ইষ্টকণ্ড ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(ক) স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও (খ) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র । ৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের ‘মৌর্য নরপতি অশোক’ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিন্দাস পালিত মহাশয়ের ‘গোড়ে গাজন’ ৭। বিবিধ ।

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্, ডি, এফ্, সি এন্স ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

„ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

■ অম্বাচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ

„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ

„ আনন্দনাথ রায়

„ নন্দলাল ঘোষ

„ পীযুষকান্তি ঘোষ

„ হেমসুন্দরকুমার কর

„ মন্থননাথ ঘোষ এম্ এ

„ ব্রজধন বিজ্ঞানিষি

■ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

■ ভোলানাথ ঘোষ

„ চরেন্দ্রভূষণ মিত্র

■ জ্ঞানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এন্স

„ অমরেন্দ্রনাথ সিংহ

■ নন্দলাল বসু

„ রঙ্গলাল বসাক

■ বসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভূষণ

„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

„ বাণীনাথ নন্দী

„ দামোদর মিত্র

„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ আশুতোষ দাসগুপ্ত

■ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ

„ মন্থনকুমার রায়

„ চারুচন্দ্র বসু

„ রামকৃষ্ণ দত্ত

„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী

„ বিনয়কৃষ্ণ মিত্র

■ চিত্তমুখ সাত্তাল বি ই

„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার

„ অধিকাচরণ মিত্র

■ কবিরাজ ভূবনকৃষ্ণ মিত্র

„ নারায়ণচন্দ্র নন্দী

শ্রীযুক্ত কুপাশরণ মহাশ্বির

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

„ আনন্দ স্বামী

„ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

„ অম্বিনীকুমার বড়ুয়া

„ সরলচন্দ্র ঘোষ

„ শ্রীনাথ বড়ুয়া

• „ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

„ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

„ পদ্মচরণ গুপ্তনাথক

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ সরলকুমার বসু

„ রামকমল সিংহ

„ সতীশচন্দ্র মিত্র

„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

„ সতীশচন্দ্র সরকার

„ সূর্য্যাকুমার পাল

„ গিরিজামোহন সাভাল

„ পরাগেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সম্পাদক )

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

„ তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি এ

„ বোমাকেশ মুস্তফী

} সহঃ-সম্পাদক

সভাপতি মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর এম্ ডি, এফ্ সি এন্স মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভা মিক্সাচিত হইলেন।

অন্তাবক	সমর্থক	মৃত্যু সভা
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীসখারাম গণেশ দেউড়র ৭১১১ জুনিয়া ট্রাট।
„	„	২। শ্রীসত্যব্রত যুগোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল, এলাহাবাদ।
„	„	৩। শ্রীহরিপদ মিত্র ১৫ জুন্স ওস্তাগরের লেন।
„	„	৪। অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ এড্ ওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ, পাবনা।
„	„	৫। শ্রীশীতলচন্দ্র রায় লাদটা, ষশোহর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মজুমদার তরফ নেওয়ারীর কাছারী পায়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়		৭। শ্রীহরিশ্রর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পাদক, উত্তরপাড়া, হুগলী।
"	"	৮। শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তী বি এ ৭৮ নিউগেট ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	শ্রীপান্নালাল সিংহ	৯। ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীপান্নালাল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১০। শ্রীউমেশচন্দ্র রায় কবিরাজ বালুচর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১। শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
"	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১২। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্ গভর্ণমেন্ট প্রোসিকিউটর, আলিপুর জজ কোর্ট।
"	"	১৩। শ্রীপ্রমথনাথ সেন বি এল্ ৩২ ল্যান্ডাউন রোড।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৪। শ্রীসুধীররঞ্জন ভাট্টা বিহার জ্যোতিষী, পি এন্ বাগ্ চীর পঞ্জিকা-কাৰ্যালয়, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	"	১৫। শ্রীসতীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান।
শ্রীঅন্নদাচরণ বিহালকার	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৬। শ্রীকৃষ্ণবিহারী বন্দ্য তাজহাট রাজবাটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
"	"	১৭। শ্রীকালীপ্রসন্ন মৌলিক পুলিস নব-ইন্স্পেক্টর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
"	"	১৮। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিহাবাড়ী, আসাম।
"	"	১৯। শ্রীবল্লভকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর পল্লী-পরিবৎ-সম্পাদক, শ্রামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
"	"	২০। শ্রীসারদানাথ থা উকীল, বগুড়া।

প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	নূতন সভ্য
শ্ৰীঅন্নদাচৰণ বিদ্যালয়কাৰ	শ্ৰীৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী ২১।	শ্ৰীগোপাললাল জহৰী দিপাকুড়িয়া, ৰাজসাহী।
"	"	২২। শ্ৰীকেশৱনাথ ঘোষ সুপাৰভাইজাৰ, সৈদপুৰ, ৰঙ্গপুৰ।
"	"	২৩। শ্ৰীমহেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ব্ৰহ্ম সিগ্‌নাল ইন্‌স্পেক্টাৰ, সৈদপুৰ, ৰঙ্গপুৰ।
"	"	২৪। শ্ৰীৰঞ্জনীকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য পেঞ্চাৰ, ডিম্‌লা ৰাজবাটী, মাহিগঞ্জ, ৰঙ্গপুৰ।
শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত	"	২৫। আৰ এন্‌ চৌধুৰী খোড়ুয়াবাজাৰ, চুঁচুড়া।
"	"	২৬। শ্ৰীশ্ৰীচন্দ্ৰ বহু বিনাগুড়ি চাবাগান, বিনাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
"	"	২৭। শ্ৰীপ্ৰসন্নচন্দ্ৰ ঘোষ সবইন্‌স্পেক্টাৰ অব স্কুলস্, শ্ৰীহট্ট।
শ্ৰীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত	২৮। শ্ৰীসতীচন্দ্ৰ দাস সহাধিকাৰী, ইষ্ট বেঙ্গল প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
শ্ৰীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্ৰীশৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ	২৯। শ্ৰীনিত্যান্ধৰূপ ব্ৰহ্মচাৰী ১৪ ৰামতল্ল বোসেৰ লেন, কলিকাতা।
শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ ঘোষ	শ্ৰীসুৰেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩০।	শ্ৰীমধুসূদন দাস বি এ আসিষ্টেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট অফিসাৰ, মাদাৰীপুৰ, ফরিদপুৰ।
শ্ৰীতাপ্ৰসন্ন ঘোষ	শ্ৰীৰামকমল সিংহ	৩১। শ্ৰীউপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বহু ৩২। শ্ৰীলোকনাথ দত্ত বি এ
চৌধুৰী কে বিশ্বৰাজ ধনন্তৰী	শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত	৩৩। ডাঃ শ্ৰীললিতমোহন সিংহ বি এ কলেক্টাৰগঞ্জ, কাণপুৰ।
শ্ৰীগিৰিজামোহন সান্যাল	"	৩৪। শ্ৰীজিতেন্দ্ৰকুমাৰ সেনগুপ্ত বি এ ৬১ মেছুয়াবাজাৰ ষ্ট্ৰীট।
শ্ৰীসুৰেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	৩৫। শ্ৰীঅতুলগোপাল ৰায় এম্‌ এ দাব্‌ ডেপুটী কলেক্টাৰ, আহলিয়া, ফরিদপুৰ। ৩৬। শ্ৰীফণীকান্ত মুখোপাধ্যায় বি এ সাব-ডিভিচনাল অফিসাৰ, মাধেপুৰা, ভাগলপুৰ। ৩৭। শ্ৰীপঞ্চানন ঘোষ। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, সপতগ্ৰাম, গোৱালপাড়া।



চাত্র-সভা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র      শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত      ১।      শ্রীঅম্বিনীকুমার রক্ষিত, ভাগলপুর।  
তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত  
যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা

পুস্তকের নাম

শ্রীমদেজমোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন প্রভুর চরিত্র।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

পাঠানরাজবৃত্ত।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বধাকর গ্রন্থাবলী।

শ্রীহর্গেশনাথ ভট্টাচার্য

প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ এক্ষচারী

বাগোবাহার।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামের রাজ্যাভিষেক, প্রবাসচিত্র, সৃষ্টিরহস্ত,  
আযাজীবনী, শক্তলতাভূষণ, সাহুবাদ শাস্ত্রিশতক,  
দাক্ষণ্যপথভ্রমণ, সংস্কৃতশিক্ষা ( ১ম সোপান )  
সংস্কৃতপ্রবেশ ( ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ ),  
কৃষ্ণপাস্তি, অহল্যাবাট, প্রবন্ধাষ্টক, পৃথিবীর  
পৃথক্‌পৃথক্‌, বিবিধবিধান ( ১ম সংস্করণ ) সন্দর্ভ-  
চঞ্জিকা, কবিতা, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা-  
শিক্ষা, সরল ব্যাকরণ, সঙ্গীতকুসুম, লক্ষ্মীচর্য্য-  
চরিত, জ্ঞানযোগ, সাহিত্যসাধনা, বালনিতি-  
বিধান, গীতামৃতরস বা গীতার সরল পঞ্চব্যাখ্যা,  
ফল ও ফল, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, জড়ভরত,  
ভাষাতত্ত্ব ( ১ম ও ২য় খণ্ড ), বিবিধ-প্রবন্ধ, কবিতা-  
কুসুমঞ্জলি ( ২য় ভাগ ), চন্দ্রনাথদর্পণ, First  
Annual Report of the Fribel Society  
of Calcutta 1910, কাঞ্চরী, বংশাবলিচরিত্র-  
তম, দেবালয় ( ভাদ্র ১৩১৮, ২৪৩ ), কোহিহুর  
( শ্রাবণ ১৩১৮ ) শিশুজীবন ( চৈত্র ১৩১৭,  
ফাল্গুন ১৩১৭, মাঘ ১৩১৭ ) The C. U. Maga-  
zine, July 1911., Sonderabdruck Aus-  
dem Archivfur Systematische Philoso-  
phie—২৭৩, The Address by P. N.  
Bose, Report of the Maju Public

উপহারদাতা

পুস্তকের নাম

Library, Report of the Opening Ceremony of the new premises of S. K. Lahiri—২ খণ্ড।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বৈষ্ণবসম্মিলনী-কার্যালয়

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম-পদ্ধতিঃ।

শ্রীকালিদাস রায়

কৃন্দ।

Office of the Registrar, Calcutta—Calcutta University Calender  
University

1911 part I, II, III.

Calcutta University Minutes

1911, Part I.

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

Bengali made Easy, ভক্তি উপাসনা, হিন্দী শিক্ষা-সোপান, কাকলী, শৈলসঙ্গীত, চন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ, আমলক, পদ্মাবতী, বাইশকবিমনসা ২ খণ্ড, জাগরণ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

শ্রীমহাবাদশীরতদিননির্ণয়ঃ, স্মরণমঞ্জল।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শন ১২৮০ শ্রাবণ ইহতে ১২৮১ ভাদ্র

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রকল্পনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক পরিষদে উপস্থিত ছয়টি মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইহাদের মধ্যে একটি কণিকের, একটি ছবিকের, একটি ঘট্টাংকচের ও একটি গুপ্ত বংশীয় শেষ সনাটের। চব্বিকের মুদ্রাতে ব্যাবিলন দেশীয় দেবতার মূর্তি অঙ্কিত আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একখণ্ড ইষ্টক প্রদর্শন করেন। এই বিষ্ণুমূর্তি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নগর নামক গ্রামে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের তৈলচিত্রের আবির্ভাব উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের চিত্র-প্রতিষ্ঠার যাহারা পরিষদকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, অতি অল্পদিন হইল প্রকল্পনাথ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং এই সময়ে মধ্যেই যে পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত পৌরুষের বিষয়।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় “দৌর্য্য নরপতি অশোক” নামক প্রবন্ধ পাঠ

করেন। প্রবন্ধ-পাঠক অশোকের ঘটনা-বৈচিত্র্যময়ী জীবনী কীর্তন করিবার পূর্বে মগধের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করেন। বৈদিক গ্রন্থে, রামায়ণে এবং মহাভারতে মগধের যে প্রাচীন বর্ণনা আছে, প্রথমে সেই সকলের উল্লেখ করেন ও তৎপরে জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজপুরই যে পরবর্তী কালে প্রাচীন রাজগৃহ বলিয়া অভিহিত হইত, পালিগ্রন্থের বর্ণনা হইতে তাহা প্রমাণ করেন। পাটলিপুত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিয়া মহাবংশ, দিব্যাবদান, বিষ্ণুপুরাণ এবং জৈন হৃবিরাবলী চরিত হইতে মগধের প্রাচীন রাজবংশের বিভিন্ন বংশ-তালিকা প্রদান করেন এবং পালিগ্রন্থ হইতে তৎকাল-প্রচলিত ভারতবর্ষের অজ্ঞাত রাজ্যের বর্ণনা পাঠ করেন। তৎপরে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ, ভারতের তৎকালীন অবস্থা, চন্দ্রগুপ্ত ও আলেকজান্ডারের সাক্ষাৎ ও চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্যরাজ্য সংস্থাপন বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন, সেই সঙ্গে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা ও চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে মগধের রাজনৈতিক ও বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজকাণ্ড ও শাসন-তন্ত্র কিরূপভাবে পরিচালিত হইত, তাহার একটি চিত্র প্রদান করেন। প্রবন্ধপাঠক সেই সঙ্গে মগধের একটি ভৌগোলিক বিবরণও প্রদান করেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বাতীত বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও তদনুযায়ী শিল্পের ও বাণিজ্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগের একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন। এই সকল বিভিন্ন শিল্পী ও শ্রমজীবীগণ এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ বা জাতিতে শ্রেণীবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণী এক একজন নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীর বিবাদ আপন আপন দলপতি কর্তৃক মীমাংসিত হইত। সমস্ত শ্রেণীর বা জাতির উপর এক মহাদেও বা Lord High Treasurer সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপ সমস্ত শ্রেণী সম্মিলিত হইয়া এক বিরাট সাধারণ-তন্ত্র সংগঠিত হইয়াছিল। রাজ্যের অন্তর্জাত পণ্যদ্রব্যাদির উপর শুল্ক ও চুক্তি মাণ্ডল নির্ধারিত ছিল। তৎপরে কিরূপ ক্রিয়াবহুল কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানমার্গের দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হয় ও তাহা হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়, প্রবন্ধ-পাঠক সেই বিষয়ের আলোচনা করেন এবং ভারত-ইতিহাসের জ্ঞাত জৈনস্ প্রিন্সিপ ও জর্জ টর্নার প্রভৃতি ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টার ও যত্নের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক অশোকের রাজ্য শাসন প্রণালীর একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্য-শাসন-প্রণালী অনেকটা একই প্রকার, প্রভেদের মধ্যে এই যে, চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালী রাজশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী ধর্মের উপর সংস্থাপিত। একজনের উদ্দেশ্য রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, অপরের লক্ষ্য ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অহরাগ থাকিলেও অশোক কখন অল্প ধর্মকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস অতি উদার ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। তাঁহার শাসন-তন্ত্র এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। তাঁহার প্রজাবাৎসল্য, করুণাপূর্ণ হৃদয়, তাঁহার নিরপেক্ষ উদার ভাব, তাঁহার অমূল্য অনুশাসন-প্রণালী সর্বকালে সর্ব নরপতির অনুকরণযোগ্য। একাধারে রাজা ও

ভিক্ষু, সম্রাট ও সাধু, ক্ষত্র ও রাষ্ট্রশক্তির সমাবেশ কেবল মাত্র ঐতিহাসিক যুগে অশোক-  
চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখককে  
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন-যে, প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় পুস্তকাকারে লিখিত  
প্রকাশিত হইবে।

১০। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের “গোড়ে গাজন” নামক প্রবন্ধ পাঠ  
স্বগিত রহিল।

১১। অন্তঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

সহঃ-সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ন ৫। টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভা-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তবময়মূর্তি, এবং (খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন প্রদত্ত কয়েকটি মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “পালয়াজগণ” (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “আদিশূরের রাজধানী”, এবং (গ) শ্রীযুক্ত চিত্তম্বজ সান্যাল বি ই মহাশয়ের “দেউলপোতার প্রাপ্ত মূর্তি” নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত,—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ ঘোষ
“ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব	“ কিরণচন্দ্র দত্ত
“ অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ	“ তারকনাথ বিশ্বাস
কবিরাজ “ শ্রীমা প্রসন্ন সেন শাস্ত্রী	“ রাসবিহারী দত্ত
“ কালীপদ বিহারদত্ত	“ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
“ বাণীনাথ নন্দী	“ নীরদচন্দ্র বাগ্‌চী
“ চারুচন্দ্র বসু	“ শুরেশচন্দ্র সরকার
“ পুণ্ডিনবিহারী দত্ত	“ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
“ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	“ ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
“ লক্ষ্মীকেশ্বর মৈত্র	“ বিরজাশঙ্কর মজুমদার
“ রামভারগ সরকার	“ মনুধনাথ পাল বি এল্
“ কালিদাস রায় বি এ	“ অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
“ বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ	“ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
“ বিবেকানন্দ সান্যাল	“ লক্ষ্মীকান্ত দত্ত
“ মনুধনাথ দে	“ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
“ বসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভূষণ	“ বলাইলাল গুপ্ত
“ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী	“ অমৃতলাল গুপ্ত
“ কৃষ্ণশর্মা গোস্বামী বি এ	“ রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

শ্রীযুক্ত গোবিন্দভূষণ সরকার

- মনোমোহন চক্রবর্তী
- „ অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী
- „ বনবিহারী দত্ত
- „ জিতেন্দ্রনাথ শর্মা
- „ অমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- „ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
- „ বিনোদবিহারী গুপ্ত
- „ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

- হৃদোদয়চন্দ্র রায় বি এ
- „ নারায়ণচন্দ্র দাস
- মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিই
- কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত
- „ সত্যীশচন্দ্র মিত্র
- রামকমল সিংহ
- „ সূর্যকুমার পাল
- „ পরাগেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী এম এ (সম্পাদক)

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

■ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মহাশয় জানানাইলেন যে বিশিষ্ট-সভ্য নির্বাচনপত্র প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মোট ৩০১ খানা নির্বাচনপত্র ফেরত আসিয়াছে। প্রস্তাবিত চারিজন সভ্য নিম্নলিখিতরূপে ভোট পাইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	১৬৯
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার	২৫৭
„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	২৫৩
রায় „ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর	২৫২

সম্পাদক মহাশয় জানানাইলেন যে পরিষদের নিয়মানুসারে ইহারা প্রত্যেকেই পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩। গত বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক

সমর্থক

সভ্য

শ্রীরামভারগ মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

১। শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী

উকীল, মুন্সেফ কোর্ট, ষোড়ামারা, রাজসাহী।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দেবস্বায়

২। শ্রীখগেন্দ্রনাথ সোম

Electrician, Govt. House, Port Blair, Andamans

প্রতাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	৩। শ্রীমহেশ্বর দাস Sub Asst. Surgeon, Port Blair.
"	"	৪। শ্রীশঙ্করকুমার বর্মা Forester, Andamans Forest Dept. Port Blair.
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীরামেন্দ্রনাথ জিবেদী	৫। শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, শ্রামগঞ্জ, রঙ্গপুর
"	"	৬। শ্রীকেশবনাথ ঘোষ Supervisor, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
"	"	৭। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ Block Signal Inspector, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
"	"	৮। পণ্ডিত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ কাব্যতীর্থ বিহাবাড়ী, আসাম।
"	"	৯। শ্রীদুর্গাচরণ সেনগুপ্ত Police Sub Inspector, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
"	"	১০। শ্রীসারদানাথ বঁা, বি এল, উকীল, বগুড়া।
"	"	১১। শ্রীপ্রমথনাথ বঁা শ্রামগঞ্জ, কুয়ামপুর, মেদিনীপুর।
"	"	১২। শ্রীগোপাললাল ভাট্টা Sub Asst. Surgeon, পাকড়িয়া, রঙ্গপুর।
"	"	১৩। শ্রীকল্পবিহারী বর্মা তাজহাট রাজবাড়ী, রঙ্গপুর।
"	"	১৪। শ্রীকালীপ্রসন্ন মৌলিক Police Sub Inspector, রঙ্গপুর।
"	"	১৫। শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য পেছার, ডিমলা রাজবাড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
"	"	১৬। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ক্লার্ক, রংপুর পোষ্টঅফিস, রংপুর।
"	"	১৭। শ্রীপ্রমথনাথ জ্যোতিষর সখাবর্গ, রংপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
শ্রীজীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	১৮। শ্রীবিপিনচন্দ্র গুহ উকীল, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	১৯। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এল্ এম্ এস মেদিনীপুর।
	"	২০। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র এল্ এম্ এস ঢালা, কলিকাতা।
শ্রীহেমেন্দ্ৰলাল মিত্র	"	২১। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় সি এস ঢালা, কলিকাতা।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	"	২২। শ্রীহেমেন্দ্ৰচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল্ উকীল, জজকোর্ট, ফরিদপুর।
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্ৰচন্দ্র জিবেদী	২৩। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় 'তত্ত্ব-মঞ্জরী' সম্পাদক ৮০।১ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
	"	২৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Manager, National Cycle Co., ৭১।৪ বেল্টিক ষ্ট্রীট।
শ্রীহুৰেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	২৫। শ্রীপৱেশনাথ চৌধুরী বি এল্ উকীল, ডায়মণ্ড হাৰবাৰ, ২৪ পৱৰ্ণণা।
"	"	২৬। শ্রীহুৰ্গোপদ মুখোপাধ্যায় Proprietor, Oriental Medical Hall, ২২ হাৰিসন ৰোড।
"	"	২৭। শ্রীহুৰেন্দ্ৰনাথ গুহ Manager, Paragon Press, ২০৩।১১ কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	২৮। শ্রীমতিলাল সেন Accountant, P. W. D., বাঁকীপুৰ।
"	"	২৯। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ, বি এল্, ৫ মাহতটুলি, ঢাকা।
শ্রীখনওয়ারিলাল চৌধুরী	"	৩০। মহামহোপাধ্যায় শ্রীশুকচন্দ্র তৰ্কদৰ্শনতীৰ্থ, সংস্কৃত কলেজের শাসনাধ্যাপক, কলিকাতা। ৩১। ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্ৰনাথ মল্লিক এম্ এ (Cantab) D. Sc. (Dub.) F. R. S. E., ১১ উইলিয়মস্ সেন।



প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রী বনওয়ারিলাল চৌধুরী	শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩২। শ্রী রাজেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ Prof. Tinctorial Chemistry, C. E. College, Sibpur, ৪১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
		৩৩। শ্রী গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, Head Assistant, Board of Examiners for the Encouragement of the Study of Oriental Languages.
শ্রী রামকান্ত ভট্টাচার্য্য	"	১১ পটুয়াটোলা লেন হারিসন রোড, ৩৪। শ্রী শ্রীনাথ চক্রবর্তী ম্যানেজার, রাজ নাটোর, রাজসাহী।
"	"	৩৫। শ্রী চন্দ্রনাথ চৌধুরী নাটোর, রাজসাহী।
"	"	৩৬। শ্রী বকিমচন্দ্র রায় Inspector, Nattore Raj, নাটোর।
"	"	৩৭। শ্রী পার্শ্বনাথ সান্যাল বি এ Auditor, Nattore Raj, নাটোর।
"	"	৩৮। শ্রী ইন্দ্রশেখর চক্রবর্তী এল্ এম্ এন্স দার্জিলিং।
"	"	৩৯। ডাক্তার শ্রী বরদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্ বি ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা।
শ্রী ললিতমোহন দে	শ্রী রামকমল সিংহ	৪০। শ্রী জগদীশ দে Accountant General's Office, রেঙ্গুন।
শ্রী কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত	শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪১। শ্রী নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি ই ৫০ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	৪২। শ্রী প্রভাসচন্দ্র বসু ২ অভয়াচরণ ঘোষের লেন, গ্রামপুকুর।
"	"	৪৩। শ্রী রামকৃষ্ণ বসু বি এ জমিদার কোঠার, ভায়া ভদ্রক (৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট)।
"	"	৪৪। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বি এ সম্পাদক "টেলিগ্রাফ," ২২ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	৪৫। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ৯২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। ৪৬। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ সম্পাদক, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
শ্রীবিনয়কমার সরকার	শ্রীরাধাকমুদ মুখোপাধ্যায়	৪৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ।
"	"	৪৮। শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী এম্ এ বি এল উকীল, কাশী।
"	"	৪৯। শ্রীদীননাথ সান্তাল বি এস্ সি এম্ বি গম্বা।
"	"	৫০। শ্রীহারিচন্দ্র মিত্র উকীল, বাকীপুর।
"	"	৫১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এল উকীল, ছাপরা।
"	"	৫২। শ্রীকালিদাস ঘোষ বি এল উকীল, বাঁচী।
"	"	৫৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন উকীল, পুরুলিয়া।
"	"	৫৪। শ্রীরজনীকান্ত রায় বি এল উকীল, হাজারীবাগ।
"	"	৫৫। শ্রীরাধাচরণ দাস সামন্ত বালেশ্বর।
"	"	৫৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় বি এল উকীল, হাজারীবাগ।
"	"	৫৭। ডাঃ হরিরাম চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিয়া।
"	"	৫৮। শ্রীআদিনাথ সেন এম্ এ বি এস্ সি, Gandaria House, ঢাকা।
"	"	৫৯। শ্রীনলিনীকান্ত কর বি এল আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ শুক্ল	৬০। শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ কটক কলেজের অধ্যাপক, কটক।
		৬১। শ্রীকানীনাথ দাস এম্ এ কটক কলেজের অধ্যাপক, কটক।
		৬২। শ্রীরজনীকান্ত বসু এম্ এ কটক কলেজের অধ্যাপক, কটক।
ডাঃ শ্রীহিন্দুনাথ বস্তু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	৬৩। ডাঃ এম্ এন্ বসু, এম্ ডি, সিএ এম্
"	"	৬৪। শ্রীশ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই District Engineer, Dist. No V, Belvedere, Alipur.
"	"	৬৫। শ্রীললিতমোহন ঘোষ C. E., Engineer, Martin & Co. ১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬৬। শ্রীডাঃ হেমচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ ৭৮ রসারোড, নর্থ, ভবানীপুর।
"	"	৬৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার ৭৬ পদ্মপুকুর রোড।
শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র (দৌলতপুর)	শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৮। শ্রীকিরণচন্দ্র বসু এম্ এ বি এল্ অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমী, দৌলতপুর, খুলনা।
"	"	৬৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ ঐ
		৭০। শ্রীজ্ঞানভোষ বসু বি এল উকীল, বাগেরহাট, খুলনা।
শ্রীহেমেন্দ্রমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭১। ডাঃ শ্রীপতিনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, বড়বাজার, বর্ধমান।
"	"	৭২। শ্রীতামিনীরঞ্জন সেন বি এল্ উকীল বর্ধমান।
"	"	৭৩। ডাঃ অমূল্যচন্দ্র মিত্র বর্ধমান।
"	"	৭৪। শ্রীনিরঞ্জন বসু 'নগিন-ভিলা', বর্ধমান।
"	"	৭৫। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল, বর্ধমান।

## দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির ।

সময়—১২ই চৈত্র (১৩১৭), ২৬শে মার্চ (১৯১১), রবিবার অপরাহ্ন ৬।০ ঘটিকা ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভা-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) লালগোলাব রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর কর্তৃক পৌত্রীগণের বিবাহ উপলক্ষে প্রদত্ত মহারাজ সমুদ গুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্তি, (গ) শ্রীযুক্ত শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধমন্দির-দ্বারের মূর্তিবিশিষ্ট চৌকাঠের মধ্যে কপালীর কিয়দংশ, (ঘ) শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের প্রেরিত নবাবিস্তৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের কটোপ্রাক ও (ঙ) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি পুথি। ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “গৌড়-মাগধ ধাতুমূর্তি”, (খ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্, এম্ আর এ এস্ মহাশয়ের “ব্যাকবণে সন্ধি” ও (গ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ”। ৬। বিবিধ।

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজাভূষণ এম্ এ, পিএচ ডি

শ্রীযুক্ত মমতামোহন বসু বি এ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

■ চিত্রস্থ সাহায্য	„ স্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ বাণীনাথ নন্দী
„ অসিতকুমার বুদ্ধোপাধ্যায় বি এ	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
■ স্বরেন্দ্রনাথ নন্দী	„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ হেমন্তকুমার কর	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
■ হুর্গাদাস ত্রিবেদী	„ সুর্য্যকুমার পাল
„ কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ	

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক

■ ব্যোমকেশ মুস্তফী	} সহ-সম্পাদক।
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ	
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ	

সভাপতি ত্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সৰ্ব-সম্মতিক্রমে ত্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ত্রীকৰ্ণ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর নবম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা-নিৰ্ব্বাৰ্টিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভা
ত্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	ত্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ত্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ মহেন্দ্র বসুর লেন।
ত্রীতারা প্রসন্ন গুপ্ত	ত্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ত্রীবিজয়কেশব শেঠ ঝোড়হাট, আন্দুল-মোড়ী, হাবড়া।
চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধনন্তরী	ত্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	ত্রীসভাপদ চৌধুরী সব-পোষ্টমাষ্টার, সারসোল।
"	"	ত্রীরামপ্রসাদ সিংহ, তালুকদার, পালিনগিপুৰ, কানপুর।
"	"	ত্রীশঙ্কর বোথাস সিং, জমিদার, পালিদিস, কাণপুর।
কবিরাজ ত্রীজ্ঞানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	"	ত্রীমন্তকুমার দাশ গুপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর।
ত্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	ত্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ত্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন Govt of India, Railway Dept, Calcutta.
ত্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ত্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ত্রীঅম্বিকাচরণ উকীল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ৮৫ হারিসন রোড।
ত্রীচন্দ্রকান্ত ভাট্টা	ত্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	ত্রীগোপীভূষণ সেন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
ত্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ত্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ত্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ Assistant Registrar, University of Calcutta
ত্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ত্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ ত্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ এম্ ডি, সি এচ্ ডি ডাঃ ত্রীহরেশপ্রসাদ সর্কাধিকারী এম্ ডি, ৭৯১ আমহার্ট ইন্সটিটিউট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নতন
চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধনন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ Settlement Dept, Muktagacha, Mymensing
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী Sub Inspector ; Punitive Police মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা।
"	শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহারদন বসু Personal Assistant, Director of Public Instruction Writers' Buildings.
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅর্ণবচরণ দত্ত বি এল উকীল জজ-কোর্ট, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীচন্দ্রকুমার দত্তদার একাউন্ট্যান্ট, পোর্ট আফিস, চট্টগ্রাম।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	শ্রীকিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী, চার্জার্স ব্রাদার্স কোং, বরিশাল।
"	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন দাস	জে, সি, নাগ স্কয়ার অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।
"	"	ডাঃ এন্স কে নাগ ১৮ বিডন ষ্ট্রীট।
"	"	রাধু সাহেব শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী ২৫ রয়েড ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅরুণভূষণ মিত্র ২৭১১ বামাপুকুর লেন।
"	"	শ্রীধনপতি গঙ্গোপাধ্যায় বি এল উকীল, খাগোয়া, সি, সি।
"	"	শ্রীঅজিতমোহন চৌধুরী লক্ষীপাশা, বশোহর।
"	"	শ্রীচণ্ডীচরণ বসু ২৩ বেষুন রো।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীঅশোকমোহন ঘোষ বি এ চৌধুরীর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীনিতাই চাঁদ রায় ১০ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় ষ্ট্রীট। শ্রীগোকুলচাঁদ দত্ত ২২ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীসুগলকৃষ্ণ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, পাঞ্জাবী, লাহোর। শ্রীমথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এন্ উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিতালভূষণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত শ্রীহিন্দুভূষণ রায় ব্যারিষ্টার, হাইকোর্ট।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক রাণাঘাট, নদীয়া।
শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীশুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
শ্রীথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র সান্তাল এম্ এ অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
"	"	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীশুরেন্দ্রমোহন ঘোষ অধ্যাপক, ঢাকাকলেজ, ঢাকা।
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	"	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি এন্ নায়েব, বাহারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা  
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ—২২১। যুরোপযাত্রা  
(গোষ্ঠী ভাবায় লিখিত)

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ; সি বি  
২২২। বনৌষধিদর্পণ ১ম ও ২য় খণ্ড,

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—২২৩। আধ্যাত্মিকজ্ঞান (১ম পাঠ), ২২৪। উচ্চ  
বাক্যলা শিকাবিধি, ২২৫। জাপান-প্রবাস, ২২৬। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি

ধ্বংসোন্মুখ ? ২৯৭। বিজ্ঞানপাঠ ( ১ম ও ২য় মান ), ২৯৮। আত্মদর্শন ও মৃত্যু কোথায় ? ২৯৯। কাবানিরায় (বাঙ্গালা অলঙ্কার), ৩০০। সাহিত্যবোধ ব্যাকরণ, ৩০১। শিক্ষাপদ্ধতি, ৩০২। বাঙ্গালা সাহিত্য-দর্পণ (২য় ভাগ), ৩০৩। স্বপ্নদর্শন, ৩০৪। শিষ্টাচার, ৩০৫। এলিজাবেথ গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসংগ্রহ, ৩০৬। জাতীয় মঙ্গল, ৩০৭। গার্গী, ৩০৮। শিশির, ৩০৯। শোকগীতি, ৩১০। দীনবন্ধু-জীবনী।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১১। ফোয়ারা।

শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য বিদ্যাবিনোদ—৩১২। মুহূর্ত্ত-চিত্তামণি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—৩১৩। তমালী।

পুথি

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ—আসামী ভাষার রামায়ণ ( প্রাচীন কালের পুথি ),

শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া তাঁহার গুণাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, অত্কার সভার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে, সেই জন্ত পত্রে ইহার উল্লেখ হয় না। তাঁহার স্মরণার্থ পরিষৎ অতি শীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। অত্ তাঁহার এই অকলিবিয়োগ স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইবার জন্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাঁহার শ্রায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবকের এবং সুরসিক লেখকের অভাবে আমরা অতিমাত্র শোক অনুভব করিতেছি। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। তদন্তসারে সমগ্র সভা দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনের দ্রব্যাদি একে একে দেখাইয়া বলিলেন, পরিষদের চিরতৈত্তব্য বদান্তবর রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর স্বীয় পৌত্রী-গণের বিবাহ উপলক্ষে পরিষদে যে উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা মিষ্টান্নাদির অপেক্ষাও মনোহর। গুপ্তবংশীয় ভারতসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশ্বমেধের দক্ষিণা লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। সম্রাট এই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা স্বতন্ত্র চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় যুগবদ্ধ অশ্বমূর্ত্তি মুদ্রিত, অপর পৃষ্ঠায় পরশু হস্তে রাজমূর্ত্তি। এরূপ মুদ্রা অতি তুল্য। রাজা বাহাদুর ২৫০ টাকায় এই ছদ্মপা মুদ্রাটি ক্রয় করিয়া তাঁহার চিরস্মৃতির পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এজন্ত তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে আর একটি গ্রন্থি বন্ধি হইল। রাজা বাহাদুরের আরও একটি মহানুভবতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। এই দানের জন্ত কোথায় পরিষদ এবং পরিষদের কর্মচারীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ধন্য হইবে, না রাজাবাহাদুর এই মহামূল্য কোতুলজনক মুদ্রাটির সংগ্রহসংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত তিনি আমার শ্রায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই মুদ্রা এ পর্যন্ত তিনটি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; ২টি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, তৃতীয়টি পরিষদে আসিল।



অতঃপর রাখাল বাবু নিজ সংগৃহীত মূর্তিগুলি সম্বন্ধে বলিলেন, আমি এবার এটি মূর্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে অষ্টকোণী স্তূপের যে খণ্ডটি পাইয়াছি, ইহাতে মুকুটধারী বুদ্ধ-মূর্তি আছে। বুদ্ধের মুকুটধারী অবস্থা কোন সময়ের তাহা বলা যায় না। এখানেও বুদ্ধ চিরপরিচিত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট। আশ্বিনও সেই বজ্রাসন। দ্বিতীয়টি ভূকুটী তারামূর্তি, তৃতীয়টি মহন্তরী তারামূর্তি। ইহা কোন গর্ভস্তূপের খণ্ডবিশেষ। চতুর্থটি কোন মূর্তির পাদপীঠের আসনাংশ। ইহাকে নবরত্ন আসন বলে। একরূপ নবরত্ন আসন আরও দেখা গিয়াছে। কিন্তু কোথাও নয়টি রত্নের সমাবেশ দেখা যায় নাই। প্রায়ই ৫টি ৭টি দেখা যায়। পঞ্চমটি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি। ইহার চিহ্ন মাথায় অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি থাকে।

শ্রীযুক্ত শরদিক্সনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বোধিসত্ত্ব মূর্তি খোদিত প্রস্তরখণ্ডটি উপহার দিয়াছেন,—উহা কোন প্রস্তরময় বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারের চৌকাঠের একাংশ। ইহা চৌকাঠের মাথার উপর যে খণ্ড থাকে অর্থাৎ কপালীর অর্দ্ধাংশ। দ্বারটি স্তূপের খুব বড় ছিল না, ইহা হইতে একরূপ চৌকাঠে তিনটি করিয়া মূর্তি থাকে, তন্মধ্যে এই ভগ্নখণ্ডে দুইটি আছে বুঝা যাইতেছে। লর্ড ক্লাইবের যে বাড়ীতে গ্রেহেম কোম্পানীর আফিস ছিল, সেই বাড়ীতে এই প্রস্তর-খণ্ডখানি লর্ড ক্লাইবের সময় হইতে পাখা টানিবার বেহারার আসনরূপে ব্যবহৃত হইত। পরে গ্রেহেম কোম্পানীর দ্বারবানেরা ইহার বোধিসত্ত্ব মূর্তিকে শিবমূর্তিজ্ঞানে বুদ্ধতলে রাখিয়া ফুলজল চড়াইত। এখন সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন অট্টালিকা নির্মিত হইতেছে। শরদিক্স বাবু এই সুযোগে ইহা দ্বারবানদিগের নিকট হইতে লইয়া পরিষৎকে দিয়াছেন।

গতবারে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কাটোয়া সীতাহাটিতে প্রাপ্ত বঙ্গালসেনের যে তাম্রশাসনের বিবরণ পঠিত হয়, কাটোয়ার সব ডিবিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার ফটোগ্রাফ লইবার সুবিধা করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অস্ত্র তাহার এই ফটোগ্রাফ লোকের সম্মুখে এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। ইহা পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

জমীদার বৈষ্ণনাথ বাবু আসল তাম্রপটুখানি পরিষদে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু গবর্ণ-মেণ্টের নিয়মে বাধ্য হইয়া তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দিয়াছেন। এই সমুদয় জমীদার মহাশয়কেও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গালসেনের তাম্রশাসন এতদিন পাওয়া যায় নাই। এইখানি প্রকাশিত হওয়াতে ইতিহাসে একটা বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। ৩৪ বৎসর পূর্বে আমিও একখানি বঙ্গালের তাম্রশাসন পাই। তাহাতে সেনবংশের পূর্বপুরুষের পরিচয় ও বঙ্গালের পুত্রনাম পর্য্যন্ত ছিল। গোহাটী অঞ্চলের এক বণিক উহা বেচিতে আনিয়াছিলেন। উহার কোন কিছু উপায় করিবার পূর্বেই উহা আমার হাতছাড়া হইয়া যায়। যাহা হউক, একদিন না একদিন উহা পুনরায় বিশ্বসমাজের হাতে আসিবে সন্দেহ নাই।

আসাম খুবড়ীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয় অল্প ৮খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসমীয়া ভাষায় লিখিত একখানি ভাগবত ও একখানি রামায়ণ আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা বাস্কীকির রামায়ণের সহিত ইহার কোথায় পার্থক্য, তাহা অনুসন্ধান হয় নাই। অল্প পুথিগুলি এখনও দেখা হয় নাই।

রামেন্দ্র বাবু এই প্রসঙ্গে বলেন,—দক্ষিণাবাবুর এই সংগ্রহ সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসমীয়া ভাষায় রামায়ণ ও ভাগবত পাওয়ায়, উহা দ্বারা সাহিত্যের বিষয়গত তুলনা করিবার সুবিধা হইল। পরিষদে এই দুর্লভ গ্রন্থগুলি উপহার দেওয়াতে তাঁহার স্নেহের ও শ্রদ্ধার পরিচয়ও বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে। একজন তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—দক্ষিণাবাবু এই পুথিগুলি লইয়া আসেন, মানসী কার্যালয়ে তিনি সংবাদ লইয়া নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি আমাকে ধরিয়া পরিষদে দিব্য জ্ঞান এইগুলি দেন। ইহা হইতেও তাঁহার পরিষদের প্রতি মমতা কত বেশী তাহা জানা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের “ব্যাকরণে সন্ধি” নামক প্রবন্ধ বোম্বাই বাবু পাঠ করিলেন। বিজয়চন্দ্র বাবু বৈদিক ভাষায় কতকগুলি শব্দের সন্ধির বিশ্লেষণ উপলক্ষে বৈদিক কালে কথিত ভাষার শব্দের এবং তৎপূর্ববর্তী অল্প ভাষার অস্তিত্বের আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের “বাক্সালার প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” প্রবন্ধের “গোবিন্দদাস” নামক অংশ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে স্থির হইল। রাখালবাবুর “গোড়-মাগধ মূর্ত্তি” প্রবন্ধ স্থগিত রহিল।

অতঃপর লাহোর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (পঞ্জাবী-সম্পাদক) মহাশয় বক্তৃতায় জানাইলেন যে, আমি লাহোরে থাকি। এই লাহোর আপনাদের কলিকাতা হইতে ১৩০০ মাইল দূরে। লগুন হইতে সমুদ্র পার হইয়া সেন্টপিটার্সবার্গ যাইতে যে দূরতা অতিক্রম করিতে হয়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী, আজ আমি আপনাদিগকে এই দূরত্বানের বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী শুনাইব। লাহোরে সভ্যতাবিস্তার, লাহোরে ইংরাজী-শিক্ষাপ্রচার, লাহোরে সাধারণ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা খুব প্রাচীন কালের কথা নহে। আমাদের পূর্বনিবাস ফরাসডাঙ্গা বায়দুয়ারীর ঘাটের কাছে। আমার পিতামহ প্রথম লাহোরে যান। তিনিই লাহোরের আদি বাঙ্গালী প্রবাসী। তখন রেল হয় নাই। তিনমাসে দিল্লী পৌঁছিতে হইত। সেখান হইতে আরও কিছুদিন গেলে লাহোরে পৌঁছিতে পারা যাইত। বরেন্ গোড়ীতে তখন বুধুদের চটিতে সমস্ত বাড়ী জমা চইত। মানকরের পাশে তখন ডাকাতের আড্ডা ছিল। কত বিপদ কত কষ্ট সহিয়া নৌকার ও গো-গাড়ীতে এই বিপদ সমুল দীর্ঘপথ অভিযান করিতে হইত। বাঙ্গালীর কুণো অপবাদ যে কেন, তাহা তখনকার পথকষ্টের কথা শ্রবণ

করিলে বেশ বুঝা যায় ; কিন্তু তবু বলিতে পারি, সেকালেও বাঙ্গালী বড় অল্প সাহসী ছিল না। সেই দুঃসহ পথকষ্ট সহ্য করিয়া বাঙ্গালীরা সেকালে যে সকল দূরদূরান্তব দেশে যাইতেন, তাহা স্মরণ করিলে “হুজুতে বাঙ্গালা হিকমতে চীন” প্রবাদটির যথার্থ্য প্রমাণিত হয়। “হুজুত” অর্থে “গওগুলে” নহে “অধ্যবসায়ী”। ইবন বতুতা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাঙ্গালীর এই গুণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার কবিতাংশই আজ প্রবাদস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর এই হুজুতের নমুনা অধ্যবসায়ের প্রমাণ লাহোরে আজিও দেদীপমান রহিয়াছে। বাঙ্গালীরা লাহোরের সর্ব্বষ ছিলেন। বাঙ্গালা পাঠশালা, বাঙ্গালী ঝি, বাঙ্গালী গুরুমহাশয়, বাঙ্গালী পুরোহিত প্রভৃতি লইয়া গিয়া আমার পিতামহই লাহোরে বাঙ্গালীবাসের সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দেন। রেভারেণ্ড গোলোকনাথ বসু পুত্র চার্লস গোলোকনাথ ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় স্মৃচরনিবাসী চাটুয্যে গোলোকনাথ আরবে মাধির সঙ্গে যোগ দিয়া আরবী কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন। হরি ঘোষের ষ্ট্রিটনিবাসী রাধারমণ রাহা ইংরাজী স্কুলের ১ম শিক্ষক ছিলেন। বারাসতনিবাসী রামচন্দ্র দাসই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ লালু হংসরাজ সেই স্কুলের ছাত্র। তখন পঞ্জাবের সমস্ত জেলায় যত স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত স্কুলেই বাঙ্গালী হেডমাষ্টার ছিলেন। ৪০।৫০।৬০ বর্ষ বয়স্ক যত ইংরাজী জানা লোক পঞ্জাবে এখন আছেন, তাঁহারা সকলেই সেই আদিবাঙ্গালী হেডমাষ্টারগণের ছাত্র। একবারে সীমান্তপ্রদেশে হাজার হাজার জেলায় কেবল পাঠানের বাস, তাহাদের ভাষা পস্ত। বাঙ্গালীর গৌরবের কথা এই যে, এই পস্ত ভাষার দেশেও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামে এক বাঙ্গালী “আঞ্জুমান হাজারা” নামে এক সভা স্থাপন করেন, পাঠানদিগকে তাহার সদস্য করেন, আর সেই সভাদ্বারা সেদেশে স্কুল, কল্যা-পাঠশালা, দাতব্য-ডাক্তারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালী। রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরই সর্ব্ব প্রথমে উর্দু প্রাইমার রচনা করিয়া পঞ্জাবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। Dr. Lightner (the Orientalist) প্রথমে Oriental College স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩রা কালীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর, ৬শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায় প্রভৃতির যত্নে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হয়। রহিম খাঁ নামক এক বাঙ্গালী-মুসলমানের চেষ্টায় লাহোরে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। সেকালে বর্ধমাননিবাসী শুভিবন্ধলারশিপ প্রাপ্ত ডাক্তার তন্মিহ খাঁ আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন। গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রিসভার সদস্য ডাঃ ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুর হইতেই লাহোরে Freemasonry প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই Grand Master হইয়াছিলেন।

এই ব্রজবাবুর পিতার কোশলেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ১৫০ জন বাঙ্গালীর প্রাণ বাচিয়া ছিল। সিপাহীরা তোপের সঙ্গে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন বেলা একটার সময় তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার কল্পনা করে। ব্রজবাবুর পিতা সিপাহীর পোষাক পরিয়া

সাঁতার দিয়া যখন পার হইয়া, অপর পারে কর্ণালে ইংরাজের ছাউনীতে গিয়া সেই খবর দিলে তাঁহারা আসিয়া বাঙ্গালীদিগকে উদ্ধার করেন। পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রশংসাস্বরূপ একটি প্রবাদ বাক্য চলিয়া গিয়াছে, “কাসাওয়ে টোপীওয়ালা থায় খুতিওয়ালা।”

কাজাড়া জেলায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ আছে। ভূমিকম্পের পর সেখানে গেলে সেখানকার অধিবাসীর হাতে ঠিক বাঙ্গালা দেশের বাসিন্দা বাঙ্গালীর হাতের মাছের ঝোল ও অন্ন খাইয়া বিস্থিত হইয়াছিলাম। নামও শুনিলাম রাজেন্দ্র পাল ও নিকন্দন সেন। অনুসন্ধানে বক্শী জৈসীরাম এক পুরাতন বংশপত্রিকা দেখাইয়া বলিলেন, আকবরের সময়ে রাজা টোডরমল ১০০ ঘর কায়স্থকে বাঙ্গালা দেশ হইতে আনিয়া এদেশে বাস করান। এখন তাঁহারা মহাজন জাতি। ব্যারিষ্টার মন্তিলাল এখনও আপনাকে বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়া গর্ব করেন। হিন্দুর মধ্যে শৈবই অধিক। ইহাদের মধ্যে পাল ও সেন উপাধি অনেক।

বৈষ্ণবেয়া প্রায়ই বৈরাগী এবং রামভক্ত। এখানকার স্বকেন্দ্র রাজ স্বাধীন রাজা। রাজেন্দ্র পাল বলেন, আমরা ওদিক্ অর্থাৎ বঙ্গাদি পূর্বাঞ্চল হইতে আসিয়াছি। হীরানন্দ শাস্ত্রী এম্ এ বলেন, ভূমিকম্প যে বালী-বাড়ীর ধ্বংস হইয়াছে, উহা শতাধিক বর্ষের প্রাচীন এবং বাঙ্গালী দ্বারা স্থাপিত। মন্দিরও যাহা ছিল, ঠিক তাহা বাঙ্গালার মন্দিরের অনুরূপ, এ অঞ্চলের পার্শ্বত্যা মন্দিরাদির ভায়া নহে। রমণীরা লালপেড়ে সাড়ী পড়ে, সিন্দুর মাথায় দেয়, মাছের ঝোল, অম্বল, ভাত খায়, বাঙ্গালীর দেবতা কালীপূজা করে, তার উপর ইতিহাসের কিম্বদন্তীতেও বাঙ্গালীর সংশ্রব পাওয়া যাইতেছে। অতএব এস্থলে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

এক সময়ে পঞ্জাবে বাঙ্গালীর এত প্রভাব ছিল; কিন্তু আজকাল আর সে ভাব নাই। আমার পিতার সময়ে লাহোরে ৭০০ ঘর বাসিন্দা বাঙ্গালী ছিলেন, আর এখন মাত্র ৮০ ঘরে ঠেকিয়াছে। তাহার মধ্যেই দলাদলি, হুই ঘরে মুখ দেখাদেখি নাই। এক পুরুষেই এত পরিবর্তন। সে যাহা হউক, আমার এত কথা বলিবার অর্থ এই যে, বাঙ্গালী যে দেশে গিয়াছেন সেই দেশেরই সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে একতা-স্থাপন করিয়া কালীবাড়ী ইত্যাদি স্থাপন করিতেন। পরিষৎ বহু প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি—অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সকল কীর্তিকথাও ত্রিনি সংগ্রহ করুন, বঙ্গদেশের অনেক মহাত্মাও অনুসন্ধানের পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পাইবে। অনেক মহা মহা কীর্তিমানের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া আছে। আমি শুনিয়াছি, Black Mountain Expeditionএ একজন Post-Master কর্তব্য-পরিচালনের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে গিয়া শত্রুহস্তে মারা যান। তাঁহার শব-বহনকালে কমিশনর ও প্রধান সেনাপতি টুপি খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই কর্তব্যপারায়ণ কর্মবীরের নামটি পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন, এই আমার সর্বকর্তৃক অনুরোধ।

কালীপ্রসন্ন বাবুর এই বক্তৃতায় বাঙ্গালীর গৌরবলীলা শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকেই পঞ্চাবে বাঙ্গালী-কীর্তির সঙ্কলন ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতি মহাশয় তৎপরে তাঁহাকে এইরূপ জাতীয় কীর্তিকাহিনীর সংবাদ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। সভাস্থ সকলেই কালীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্তলাভ করিলেন।  
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।



## ১৭শ বাৎসরিক অধিবেশন

সময় ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে, রবিবার—অপরাহ্ন ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের বঙ্গবিবরণপাঠ। ২। সভা-নির্বাচন। ৩। মুক্তাগাছার জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর অচ্যোদ্য চৌধুরী বাহাদুরকে পরিবদের আজীবন সভা নির্বাচন। ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ সভা-নির্বাচন। ৫। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৬। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহা এম্‌এ বি, এল, মহাশয়ের প্রদত্ত ছবিটী প্রাচীন সুবর্ণমুদা, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ, মহাশয় প্রদত্ত প্রথম কণিকের সুবর্ণমুদা, (গ) শ্রীযুক্ত হরিন্দাস পালিত মহাশয়ের প্রদত্ত গোড়ের মিনা করা ইষ্টক। ৭। কার্যা-নির্বাহক সমিতির প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম সহকারী সম্পাদক নির্বাচনার্থ নিয়মাবলীর আবশ্যিক সংশোধন। ৮। সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণ-পাঠ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা। ৯। চিত্র-প্রদর্শন,—পরিবদের ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র। ১০। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্য নিবাহক সমিতি-গঠন। ১১। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কর্মচারি-নিয়োগ। ১২ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। ১৩। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অমলাচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক ১৩১৭ সালে বঙ্গালাসাহিত্যের বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা। ১৪। বিবিধ।

উপস্থিত—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সাবদাচরণ মিত্র এম এ বি এল। সভাপতি।

রায়	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ বি এল
কুমার	" অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
"	" ধীরেন্দ্রকুমার রায়
রায়	" চুনিলাল বসু
"	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ বি এল
"	" বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ	" সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম এ পি এইচ ডি
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্গব	শ্রীযুক্ত হর্গাদাস ত্রিবেদী
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গৌরহরি সেন	" পুলিনবিহারী দত্ত
কবিরাজ হর্গাদারায়ণ সেন শাস্ত্রী	" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" বনওয়ারি লাল চৌধুরী বি এস সি	" চারুচন্দ্র বসু
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ	" চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি, এল

শ্রীযুক্ত সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি

শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সাত্তাল

- .. যাদবচন্দ্র মিত্র
- .. মন্থমোহন বসু বি, এ
- .. অমলাচরণ ঘোষ বিজ্ঞান
- .. অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি
- .. নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
- .. ভৈরবকুমার বসু
- .. শ্রীশচন্দ্র মিত্র
- .. ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত
- .. নলিনীবজ্রন পাণ্ডা
- .. গঙ্গদাচরণ কালক
- .. রামকমল সিংহ
- .. ফারিউদ্দীন রায়
- .. গোপেন্দকুমার সরকার
- .. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- .. ভাবাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞানবিনোদ
- .. কানাই লাল দত্ত

- .. হেমচন্দ্র সরকার এম এ
- .. বাণীনাথ নন্দী
- .. সঙ্গীতচন্দ্র সাত্তাল এম এ
- .. কবীকুমার মজুমদার
- .. বেবতীকান্ত সেন
- .. শ্রীশচন্দ্র সন্দ্বাদকাব্য
- .. শ্রীশচন্দ্র বসু
- .. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- .. চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- .. দীননাথ দত্ত
- .. নৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- .. ভবানীচরণ ঘোষ
- .. যাদবচন্দ্র মিত্র
- .. অমীকেশ মিত্র
- .. সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)

.. বোমকেশ মুস্তফী

.. তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি, এ

} সহঃ-সম্পাদক

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা-নির্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ৩৬১১১ কালীঘাট-রোড।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীদেববত বিজ্ঞান এম এ এম এ, বি এল	২। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ ২০ শ্রীমজার হাট।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীশচন্দ্র বসু	৩। শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০ পার্কলী বোমের লেন।

প্রতীক	সমর্থক	নূতন সভা
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল ১৫ গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর।
	"	৫। শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ মৌলিক, জমিদার পাচখুপি, মুশিদাবাদ।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	৬। শ্রীভৃকেশ্বর শ্রীমানী ১১। ১ ওল্ড পোঃ আফিস ষ্ট্রীট।
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৭ক। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাকসাদা বেতড়, হাবড়া।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	৭। শ্রীববীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪। ৬ কণ্ডওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	৮। শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস Prof. Presidency College
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	৯। শ্রীশ্রীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি.এল উকীল, আলিপুর, ৮ কলীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীগৌরহর সেন চেতন্তলাহবেবী, বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞানবিনোদ		১১। শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় জয়দা বাহার ২৪ পরগণা।
শ্রীচিত্তব্রত সাংখ্য	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৩৮৯ বহুপাড়া লেন।
শ্রীঅমলাচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ	শ্রীচাঁকচন্দ্র মিত্র	১৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
কে বিখরাজ ধনন্তরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৪। মিঃ জি, জি, জেনিংস এম্ এ অধ্যাপক মুর সেন্টাল কলেজ, এলাহাবাদ। ১৫। ডাঃ ডি এন রায় এম্ ডি Dr. of the Homeopathic of Late Dr. M. N. Bose, Calcutta.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		১৬। শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় গণপুর, মল্লারপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৭। শ্রীকুমদবন্ধু ভট্টাচার্য মগনা মিথলা টাঙ্কাইল, ঝয়মনসিংহ।



পস্থাপক	সমর্থক	নতুন সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮। শ্রীকেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী Secy Vidyasagar Reading Club, Kakurdah, Barisal.
"	"	১৯। শ্রীসৈয়দজামালদীন জোকা নোছাটা, যশোর।
"	"	২০। শ্রীবামপতি সরকার এম এ বিএল ১০নং কেন্দার বসুর লেন, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	"	২১। শ্রীগণীন্দ্রনাথ রায় জমিদার কাশীপুর, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	"	২২। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায় জমিদার কাশীপুর, কলিকাতা।
"	"	২৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীসতীন্দ্রসেন নন্দী	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	২৪। শ্রীনবেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি এ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসাবদাচরণ মিত্র	২৫। শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ বি এ Executive Engineer 1st Calcutta Division
শ্রীব্যোমকেশ মৃত্যুদী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৬। শ্রীবার্ধক্যমোহন সেন এম এ বিএল টুকৌল বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	২৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার থাগড়া, বহরমপুর।
"	"	২৮। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল থাগড়া, বহরমপুর।
"	"	২৯। শ্রীসুধাংশুশেখর বাগচী থাগড়া, বহরমপুর।
"	"	৩০। শ্রীবসন্তকুমার নন্দী রাজবাটী, কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ।
"	"	৩১। শ্রীমগেন্দ্রনাথ নন্দী রাজবাটী, কাশীমবাজার।
"	"	৩২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থাগড়া, সৈদাবাদ।
"	"	৩৩। শ্রীবজ্রেন্দ্রকুমার বসু বি এল রাজবাটী, কাশীমবাজার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৫। শ্রীবামাপদ দত্ত বি এল আগরা, বহরমপুর
		৩৫। কুমার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কলকাতা রাজবাটী, আগরা, বহরমপুর।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্রদাশ গুপ্ত	৩৬। শ্রীআদিনাথ সেন এম্ এ বি এস সি গাণ্ডারিয়া ঢাকা
"	"	৩৭। শ্রীঅতুলচন্দ্র বাগ্‌চী বি এল টৌনিং কলেজ বোড, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী	"	৩৮। শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস গুপ্ত ময়মনসিংহ।
"	"	৩৯। শ্রীবসন্তচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
"	"	৪০। শ্রীবসন্তকুমার আইচ ঐ
"	"	৪১। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ
"	"	৪২। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার ঐ
"	"	৪৩। শ্রীমধুসূদন সরকার ঐ
"	"	৪৪। শ্রীকমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ
"	"	৪৫। শ্রীমোহিনীমোহন রায় ঐ
"	"	৪৬। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ঐ
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৪৭। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র ঐ
"	"	৪৮। শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ ঐ
"	"	৪৯। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার উকীল ঐ
"	"	৫০। শ্রীহুগাদাস রায় ঐ
"	"	৫১। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
"	"	৫২। শ্রীমনোমোহন নিয়োগী ঐ
"	"	৫৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় ঐ
"	"	৫৪। শ্রীচিন্তাহরণ মজুমদার ময়মনসিংহ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		৫৫। শ্রীরমণীকান্ত দাস বারিষ্টার, ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী		৫৬। শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র নাগ বারিষ্টার, ময়মনসিংহ।

প্ৰস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচাৰ্য্যচৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৫৭। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	.	৫৮। শ্রীচারুচন্দ্র দাস
		ব্যৱিষ্টার
	"	৫৯। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন
		পুঃ সবইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহ।
মাননীয় মহারাজ	শ্রীযোগেশ শস্ত্রী	৬০। কুমার অজিতেন্দ্রকিশোর আচাৰ্য্য চৌধুরী
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর		মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
মাননীয় মহারাজ	শ্রীযোগেশ শস্ত্রী	৬১। শ্রীশ্রীনাথ রায়
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর		মানিক্য মহারাজকুমার শশিকান্ত আচাৰ্য্য
		বাহাদুরের ষ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৬২। মহারাজ কমান শশিকান্ত আচাৰ্য্য চৌধুরী
		৭৬ নং পোস্তার মাকুলার রোড।
"	"	৬৩। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
		রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	৬৭। কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
		গৌলকপুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচাৰ্য্য	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫। শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী
		সেরপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	৬৬। শ্রীসুরেন্দ্র প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী
		কালীপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	৬৭। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম.এ. বিএল
		ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
"	"	৬৮। শ্রীহরষচন্দ্র চৌধুরী
		ঐ
"	"	৬৯। শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী
		ঐ
"	"	৭০। শ্রীবেবতী শঙ্কর রায়
		ঐ
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচাৰ্য্যচৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১। শ্রীস্বর্ধ্যকুমার সোম এম এ
		বিএল ময়মনসিংহ।
"	"	৭২। শ্রীকেশবনাথ মজুমদার এম, আর এস
		ময়মনসিংহ।
"	"	৭৩। শ্রীবিনয়ভূষণ নাগ বিএ
		সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ।

পুস্তক	সমর্থক	সম্মত
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪।	শ্রীনরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী কালীগর, ময়মনসিংহ।
চৌধুরী		
"	"	৭৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী ভবানীপুর ঐ
শ্রীবামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকী	"	৭৬। শ্রীবনবিহারী সেন আগবা, বহরমপুর।
"	"	৭৭। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র ঐ
"	"	৭৮। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচী ঐ
"	"	৭৯। শ্রীবাধাকমল মুখোপাধ্যায় ঐ
"	"	৮০। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় ঢাকা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	"	৮১। শ্রীযতীন্দ্রকুমার চৌধুরী সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ।
"	"	৮২। শ্রীবিজয়কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৮৩। শ্রীসুধেন্দ্রনাথরায়ণ আচার্য্য মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৮৪। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় জ্ঞানচৌধুরীর লেন ঐ
"	"	৮৫। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৮৬। শ্রীবিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৮৭। শ্রীতীনাথ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	৮৮। শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী ঐ।
"	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	৮৯। শ্রীভারকেশ্বর চিত্রনবীশ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	"	৯০। শ্রীললিতাকুমার রায় জীবনপুর বাটা, ঢাকা।
"	"	৯১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্ট নেং নয়াবাজার রোড, ঢাকা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নজুমদার	শ্রীহেমচন্দ্র দাস প্রমুখ	৯১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ অধ্যাপক ঢাকা কলেজ।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	৯২। শ্রীবরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
"	"	৯৪। শ্রীসারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৫। শ্রীগোপালদাস আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৬। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	৯৭। শ্রীরমেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১৬০১ মাণিকভলা ষ্ট্রাট
"	"	৯৮। শ্রীসুধীরচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
"	"	৯৯। শ্রীকিরণচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	১০০। শ্রীসুবোধকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০১। শ্রীহরিদাস আচার্য্য চৌধুরী ঐ
"	"	১০২। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ৪৩ বিডন রো।
"	"	১০৩। শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
"	"	১০৪। শ্রীকালীনাথ ঘোষাল মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০৫। শ্রীসুধাক্ষার সরস্বোজ মানেন্দ্রার হরদাস আচার্য্য চৌধুরীর ষ্টেট।
"	"	১০৬। শ্রীগিরিশচন্দ্র দে হেডমাষ্টার, আর, কে, এইচ স্কুল মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
"	"	১০৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
"	"	১০৮। শ্রীরমেশচন্দ্র সায়্যাল ঐ
"	"	১০৯। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সায়্যাল ঐ
"	"	১১০। শ্রীমার হরেকিশোর রায় চৌধুরী রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।

প্রতীক	সমর্থক	নতুন-মন্তা
শ্রীহেমেন্দ্ৰকিশোর	শ্রীঅম্বৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ	১১১। ৰাঘু সতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰী বাহাদুৰ
আচাৰ্য্য চৌধুৰী	আচাৰ্য্য চৌধুৰী	ভবানীপুৰ, ময়মনসিংহ।
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	১১২। শ্রীস্বৰেন্দ্ৰনাথ সেন বি, এ
		দোলক, বৰিশাল।
শ্রীনলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	১১৩। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
		১৯ ৰামবাগান লেন।
শ্রীচৈয়চন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	"	১১৪। শ্রীকৃষ্ণদেব বৰুৱা
		নগদা সিমলা, টাঙ্গাইল।
শ্রীভাৰাণ্ডাস গুপ্ত	"	১১৫। শ্রীউমেশচন্দ্ৰ সেন, লাবান, সিলং।
শ্রীঅসিতকুমাৰ মুখোপাধ্যায়	শ্রীচন্দ্ৰভূষণ মৈত্ৰ	১১৬। শ্রীমণীন্দ্ৰলাল মিত্ৰ এম, বি,
		৩২ নং ৰাজা নবকৃষ্ণৰ ষ্ট্ৰীট।
"	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	১১৭। শ্রীজ্ঞানকীৰ্ত্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
		১৫ নং ৰামকান্ত বৰুৱা ষ্ট্ৰীট।
শ্রীহেমপ্ৰসন্ন ৰায়	শ্রীহেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত	১১৮। শ্রীগিৰিজামোহন নিৰোগী
		কালীতলা, দিনাজপুৰ।
শ্রীহেমপ্ৰসন্ন ৰায়	শ্রীহেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত	১১৯। শ্রীউমেশচন্দ্ৰ নিৰোগী এম, এ, বি, এল
		কালীতলা, দিনাজপুৰ।
"	"	১২০। শ্রীউপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত
		কালীতলা, দিনাজপুৰ।
"	"	১২১। শ্রীৰামনন্দন বৰ্টক
		কালীতলা, দিনাজপুৰ।
শ্রীগোপেন্দ্ৰ সৰকাৰ	শ্রীস্বৰেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১২২। শ্রীৰাসবিহাৰী সেন
		সদৰপুৰ, ২৪ পৰগণা।
"	"	১২৩। শ্রীআশুতোষ ৰায় কোৱাৰ
		ইন্স্পিৰিয়াল মেডিক্যাল হল, দিল্লী।
"	"	১২৪। শ্রীঅক্ষয়কুমাৰ ৰায়
		৮/০ মেন্স'ন সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
"	"	১২৫। শ্রীজ্ঞানেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ কোৱাৰ
		৫নং বেচু চাট্‌ৰ্‌ৱেৰ ষ্ট্ৰীট।
"	"	১২৬। শ্রীপ্ৰসিদ্ধ কুমাৰ বসু
		১৩৩ হিলাৰ স্ট্ৰীট, দিল্লী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার	১০৭। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু স্কোয়ার ৪৪ নং মুরারীপুকুর রোড, মাণিকতলা।
"	"	১০৮। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্ট স্কোয়ার এনং স্বঘূনাথ চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীসারদা চরণ মিত্র, ১০২।	শ্রীগঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, বগুড়া।
"	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার ১০০।	শ্রীস্ববোধচন্দ্র রায় বি, এ, Assistant Secy & Dy R Compt Hindusthan Co-Operative Insurance Society ৩০নং ডালহাউসি স্কোয়ার।
"	"	১০১। শ্রীঅধিকাকমার রায় চৌধুরী জমিদার, বাকুইপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	১০২। শ্রীনিশীথনাথ রায় স্কোয়ার বালেশ্বর।
"	"	১০৩। শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল, সবজজ, ময়মনসিংহ।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীগোপেন্দ্র সরকার ১০৪।	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৬৯৭ চিংপুর রোড।
"	"	১০৫। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Hd. Asst Lower Ganges Bridge-office Paksey (Pubna)
"	"	১০৬। শ্রীনরনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ, বাগেরহাট, গুলনা।
"	"	১০৭। শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় এখনং চক্রবেড়ীয়া রোড, ভবানীপুর।
"	"	১০৮। শ্রীফকিরচাঁদ রায়, সবরেজিষ্টার, জগদল্লভপুর, হাবড়া।
"	"	১০৯। শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, উলা, রাণাঘাট, নদীয়া।
শ্রীব্যোমকেশ ম্তফলী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী ১৪০।	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি, এ জমশেরপুর, নদীয়া।
"	"	১৪১। ডাঃ শ্রীমুকুন্দর সামন্তাল বি, এস, সি, এল, এম, এস, নয়ানচাঁদ দত্তের লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভা
মাননীয় মহারাজ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৪২। রাঁধা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর		মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
		১৪৩। মহাবাজ শ্রীর প্রতাপকুমার ঠাকুর
		নাইট বাহাদুর আসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ	১৪৪। শ্রীবাণিনবিহারী রায়
আচার্য্য চৌধুরী	আচার্য্য চৌধুরী	১৮০ কুমার জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী,
		মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমদ্যথমোহন বসু	১৪৫। শ্রীশ্রীচন্দ্র সর্বাধিকারী
		ওয়েলেন্সলি ষ্ট্রাট।
শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	১৪৬। শ্রীবেকচন্দ্র চক্রবর্তী
আচার্য্য চৌধুরী		সেরপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	১৪৭। শ্রীঅরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
		ময়মনসিংহ।
"	"	১৪৮। শ্রীঐক্যনাথ সোম
"	"	ঐ
"	"	১৪৯। শ্রীরজনাক্ষবিহারী
"	"	ঐ
"	"	১৫০। শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
		সেরপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	১৫১। শ্রীবেবর্তীমোহন গুহ
"	"	ময়মনসিংহ
"	"	১৫২। শ্রীনবকান্ত গুহ
"	"	ঐ
"	"	১৫৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল
"	"	ঐ
"	"	১৫৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ন
"	"	ঐ
"	"	১৫৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী
"	"	ঐ
"	"	১৫৬। শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত
"	"	ঐ
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫৭। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
		১০১ আহিরিটোলা ষ্ট্রাট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৮। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী,
		মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
		১৫৯। শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
		কটনকলেজ, গোহাটী।
শ্রীশিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৬০। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
		১০১ বকুলবাগান রোড।



প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভা
শ্রীশিবপ্রসন্ন তর্কচাৰ্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৬১। শ্রীঅমলাচরণ বসু বি, এল, ৩৬ নং চন্দ্রনাথ চাটুখ্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৬২। শ্রীবৈষ্ণবনাথ দত্ত বি, এল, ১৭নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন।
"	"	১৬৩। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস এম, এ, বি, এল, ৩৯নং চক্রবেড়িয়া রোড।
"	"	১৬৪। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল, ৫২ স্কিকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৫। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম, এ, বি, এল, ৭১২ চক্রবেড়িয়া রোড।
"	"	১৬৬। শ্রীবজ্রলাল চক্রবর্তী এম, এ বি, এল, ৫০। ১নং ডয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৭। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ১৭নং মধুসূয়ের লেন।
"	"	১৬৮। শ্রীধীরেন্দ্রলাল কান্তগীর বি, এল, ৬৫। ২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
"	"	১৬৯। শ্রীগোপালকৃষ্ণ পাল এম, এ, বি, এল ৩৬ বেচুচাটুখ্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৭০। শ্রীহারাদন নাগ এম, এ, বি, এল ৪৫নং স্কিকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	১৭১। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র এম, এ, বি, এল, ৯৯নং কাশারীপাড়া রোড।
"	"	১৭২। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল, ২৯নং হুজুরিখাল লেন।
"	"	১৭৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি, এল ১২। ১। ৩। ১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৪। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এল, ৬৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৫। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, ৮নং চন্দ্রনাথ চাটুখ্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৭৬। শ্রীকরণ্যম্বর বসু এম, এ, বি, এল ২৫ নং কাশারীপাড়া রোড।

প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	নুতন সভ্য
শ্ৰীশিৰাপ্ৰসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য	শ্ৰীবসন্তকুমাৰ বসু	১৭৭। শ্ৰীলক্ষ্মীনাৰায়ণ সিংহ বি, এল, ১৮নং ৰামমোহন দত্ত ৰোড।
"	"	১৭৮। শ্ৰীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, ৬৩৪নং পদ্মপুকুৰ ৰোড।
"	"	১৭৯। শ্ৰীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ুযোপাড়া লেন।
"	"	১৮০। শ্ৰীমণীক্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ৭১১ হৰিষোৰেৰ ষ্ট্ৰীট।
"	"	১৮১। শ্ৰীমন্মথনাথ ৰায় এম্, এ, বি, এল, ২নং বলৰাম বসুৰ ফাষ্ট লেন।
"	"	১৮২। শ্ৰীমুকুন্দনাথ ৰায় বি, এল, ৬নং জয়িফ লেন, বিডনস্কোয়াৰ।
"	"	১৮৩। শ্ৰীমণীক্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য; এম্, এ, বি, এল, ১১ তায়বল লেন।
"	"	১৮৪। শ্ৰীনগেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য এম্, এ, বি, এল, ৫২নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীট।
"	"	১৮৫। শ্ৰীপ্ৰিয়শঙ্কৰ মজুমদাৰ বি, এল, ৫৪নং হৰিশ্চন্দ্ৰ মুখাৰ্জী ৰোড।
"	"	১৮৬। শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় বি, এল, ৪৮নং সাঁকাৰিপাড়া ৰোড।
"	"	১৮৭। শ্ৰীপ্ৰবোধকুমাৰ দাস বি, এল, এস, আই, আৰ, এল, ১৫১নং বাহাৰাম অকুৰ লেন।
"	"	১৮৮। শ্ৰীপ্ৰভাসচন্দ্ৰ মিত্ৰ এম্, এ, বি, এল, ৭৩নং পদ্মপুকুৰ ৰোড।
"	"	১৮৯। শ্ৰীপ্যারীমোহন ৰায় বি, এল, ৪৬নং চক্ৰবেড়ীয়া ৰোড।
"	"	১৯০। শ্ৰীশচীক্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ বি, এল ১৩১৩ কুৰণিগাটোলা ষ্ট্ৰীট।
"	"	১৯১। শ্ৰীশৈলেন্দ্ৰনাথ পালিত বি, এল, ১৩নং বেচু চাটুৰ্য্যেৰ ষ্ট্ৰীট।
"	"	১৯২। শ্ৰীসম্ভলচন্দ্ৰ দত্ত এম্, এ, বি, এল, ১৭নং কাৰবালা ট্যাঙ্ক লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভা
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীবসন্তকুমার বসু	১৯৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক এম, এ, বি, এল্ ২নং কুণ্ডু রোড।
"	"	১৯৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ ৬০নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	১৯৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, বেহালা।
"	"	১৯৬। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খাঁ বাহাদুর বি, এল্, ৭নং মৌলবী গোলাম সোভান লেন।
"	"	১৯৭। শ্রীস্বতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, ৩৫নং হরিশচন্দ্র মুখাফিয়ার রোড।
"	"	১৯৮। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ৫১২নং মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন।
"	"	১৯৯। শ্রীসুব্রহ্মচন্দ্র বসু বি, এল্, ৫২নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২০০। শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এল্ ৫২১৩ হারিসন রোড।
"	"	২০১। শ্রীশ্রীগচরণ রায় বি, এল্, ১ বলরাম বসুর ঘাট রোড।
"	"	২০২। শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্, ৪৭নং বোসপাড়া লেন।
"	"	২০৩। শ্রীতারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ ৮নং কেন্দার দত্তের লেন।
"	"	২০৪। শ্রীউপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি, এল্, ৩০নং জেলেপাড়া রোড।
"	"	২০৫। শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্, ১৮নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২০৬। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, উত্তর পাড়া, হুগলী।
শ্রীহীরলাল চক্রবর্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	২০৭। শ্রীঅসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ ৪৫নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
		২০৮। শ্রীঅমৃতলালচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ৪নং গঙ্গাধর বাবুর গলি।

প্রাপ্তব্যক	সমর্থক	সম্মত
শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	২০৯। শ্রীব্রাণসী মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, ৫০নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২১০। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, ৩৮নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট।
"	"	২১১। শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল ২৩নং নেবুলা লেন।
"	"	২১২। শ্রীচাক্রচন্দ্র বিশ্বাস এম, এ, বি, এল ৫৮নং পদ্মপুকুর রোড।
"	"	২১৩। শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল ৫০নং বকুলবাগান রোড।
"	"	২১৪। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম,এ, বি,এল, ১০১২ চক্র বেড়িয়া রোড।
"	"	২১৫। শ্রীয শ্রীননাথ বসু এম, এ, বি, এল ৪৯নং শ্রীমবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	২১৬। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল; ৭৯নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
"	"	২১৭। শ্রীযতীশচন্দ্র হাজরা এম, এ, বি, এল, ৫নং কালীঘাট রোড।
"	"	২১৮। শ্রীযতীশচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল, ২৭নং ডাক্তারের লেন।
"	"	২১৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল, ১১৩ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
"	"	২২০। শ্রীমোহিনীনাথ বসু এম, এ, বি, এল, ৬৯নং বিডন ষ্ট্রীট।
"	"	২২১। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল, ৩০১৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রীট।
"	"	২২২। শ্রীরামতারণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ৪৫নং গিরীশ মুখার্জীর রোড।
"	"	২২৩। শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, ৫১১ কুজুরোড ভবানীপুর।
"	"	২২৪। শ্রীশশধর রায় বি, এল, ৫৮নং চক্রবেড়িয়া রোড।

અહાલક

समर्थक

मङ्ग

श्रीहीरानाम चक्रवर्ती

• শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ২৪৫। শ্রীমতীশচন্দ্র ভট্ট বি, এল্

২৩১ ক্রমবাগান ষ্ট্রীট ।

২২৬। শ্রীমুরেশ্বর নাথ মজুমদার বি, এল.,

১নং অনাথ নাথ দেব লেন ।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাড়াগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত  
বণারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা

उपज्ञात पुरुषादि

ଶ୍ରୀରାମେନ୍ଦ୍ରସୁନ୍ଦର ତ୍ରିବେନୀ

२०२ | Epigraphia Indica & Record of the  
Archæological Survey of India part I 1888 (oct.)

809 f do

do

do part II January 1888

808 | do                      III      April      1889

806 1 do      IV    July      1889

805 | do V October 1889

809 | do      VI    November   1890

807 | do do

802 | do Vol 11 part X August 1892

85. | do do      part XI September 1892

855 | do do      part XII December 1892

822 | do do      part XIII June      1893

8501 do do part XIV March 1893

828 | do do | part XV | Máj | 1894

826 | do do      part XVI December 1894

४७१ Further Jaina Inscriptions from  
Mathura ( Epigraphia Indica )

829 | Maps of Asia East Indies & General  
View of the principal Roads &  
Divisions of Hindustan 1790

৪১৮। আহীর পীর (১৬৩) ত্রিশরচন্দ্র দেব

৪১৯। বঙ্গীয় কৃষি-বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল পত্র—

श्रीअविनाशछत्र संश्लेष

- ৪২০। বেকারে ব্যাগার (১ম, ১য় খণ্ড শ্রীশরচ্চন্দ দেব )  
 ৪২১। উড়োকদ  
 ৪২২। পালের পাঁচালী  
 ৪২৩। Kanva-Sulkamu ( A Telegu comedy )  
 G. V. Apparow N. A.  
 ৪২৪। The nineteenth century July, 1899  
 ৪২৫। Do August, 1899  
 ৪২৬। Do October, 1899  
 ৪২৭। Do „  
 ৪২৮। Report of an Archaeological tour with  
 the Benares field force.  
 ৪২৯। Geographical & Statistical Report of the  
 Dist. of Burdhum  
 ৪৩০। A map of India : Ad Antiquissime Indian  
 Geographical Tabula )  
 মোলবী সেখ আবদুল জব্বার ৪৩১। বর্জ্জা-মালা—মহম্মদ মোহেবু উল্লা  
 ৪৩২। শ্লোক-মালা—মহম্মদ মোহেবু উল্লা  
 ৪৩৩। বাংলাবিবাহের বিষময় ফল „  
 ৪৩৪। উপদেশমালা  
 Mr. C. W. Me mimi L. C. S. ৪৩৫। Fraser's magazine 1857  
 ৪৩৬। Do 1858  
 ৪৩৭। Do 1859  
 ৪৩৮। Do 1860  
 ৪৩৯। Do 1861  
 শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায় ৪৪০। প্রেমের স্বপন  
 „ নগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ৪৪১। চরিত-শতাব্দ—শ্রীশরচ্চন্দ দেব  
 ৪৪২। নিগৃঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব বা বেদ কোরাণাদির তুল্য মীমাংসা „  
 ৪৪৩। গৌরীসঙ্গীত-হার  
 ৪৪৪। Report in higher Education in the state  
 of New York for the year ending 1909  
 ৪৪৫। গম্ভীরায় গীত  
 ৪৪৬। Words from letters

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪৪৭। সংযুক্ত ( স্বরচিত )
হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪৪৮। অহল্যা—শ্রীযুক্ত দেবেঞ্জকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
	৪৪৯। গায়ত্রী ঐ
সম্পাদক, আরজাবাদ-সম্মিলনী	৪৫০। আরজাবাদ সম্মিলনীর ১১শ বার্ষিক কার্যাবিবরণী "
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত	৪৫১। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত (দ্রষ্টব্য)—রামনারায়ণ তর্করত্ন
	৪৫২। গে সাঁহিব রচিত ইংরাজী-ভাষাভাষিত ইতিহাসচয়
	The Version of Gay's Fables (দ্রষ্টব্য) Poet Gay.
	৪৫৩। জীবন-মৃগতৃষ্ণা—তারাকুমার চক্রবর্তী
দোলত আহম্মদ এস এস দোহার	৪৫৪। জীবন-মঙ্গল
শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্মা চৌধুরী	৪৫৫। ওঁ ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিজ্ঞা
„ নীরদবরণ মিত্র	৪৫৬। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
„ প্রভাতচন্দ্র মজুমদার	৪৫৭। ভারতবর্ষীয় বিগলয়সমূহের নিমিত্ত স্বাস্থ্যবক্ষার
	১ম পুস্তক
	৪৫৮। কলের ডালা ৩ খানি
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী	৪৫৯। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব ( খণ্ডিত ) প্রাচীন মুদ্রিত
	৪৬০। উদ্ভূতভাষার প্রাচীন গ্রন্থ
	৪৬১। সার ১খানি ঐ
বিরজাকান্ত ঘোষ	৪৬২। ভূগোপুত্র ( পুঁথি )
	৪৬৩। সত্যনারায়ণের বক্তব্য ঐ
	৪৬৪। মণিহরণ পুস্তক ঐ
	৪৬৫। রামায়ণ ( অরণ্যকাণ্ড ) ঐ
	৪৬৬। রামপ্রসাদের মানসীগান ঐ
	৪৬৭। ১০০ বৎসরপূর্বে ভৌজিলিখন কএকপৃষ্ঠা নমুনা
অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন	৪৬৮। ধাতুপাঠম্ ( পুঁথি )
	৪৬৯। স্মৃতিগ্রন্থের অংশ "
	৪৭০। লিঙ্গাবাদনং "
	৪৭১। যুক্তবোধব্যাকরণম্ "
	৪৭২। সুবাও রত্নি "
	৪৭৩। নারদ পঞ্চরত্ন "
	৪৭৪। গৌতমীয় তন্ত্র "
	৪৭৫। রাধিকায় সহস্রনাম "
পুলিনবিহারী দত্ত	৪৭৬। চিকিৎসা-সার

৪৭৭। বলবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪৭৮। পদ্মমালা—তারাকুমার চক্রবর্তী

৪৭৯। The city of the East

,, দলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৮০। ছড়া ও গল্প

অতঃপর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত রাজস্ববর্ণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্যপদে নিষ্পাচিত হইলেন :—

১। মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর

প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা

২। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ সদস্য নিযুক্ত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ। ২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—বসন্ত বাবু পরিষদের পুঁথিসংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুঁথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুঁথি সংগ্রহের জন্ত ইঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তজ্জন্ত ইঁহার বাহনের খরচ আছে, খাই খরচ আছে, পরিবহন হইতে তিনি তাঁহার এক কপর্দকও লয়েন না বা এই কাষ্যের জন্ত পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহবশে তিনি বহুবার স্বীকার করিয়াও এই কাষ্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথম বৎসর হইতেই ইঁহার সদস্য আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য-সম্পর্কে ইঁহার কোন না কাষ্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, অথচ নিঃস্বার্থ ভাবে ইঁহার চাঁদা দেন। পূর্বে তিনি সমস্তপুঁথি রেল আপিসে কাষ্য করিতেন। এখন পেন্সন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্বস্নেহ সমান বজার রাখিয়াছেন, এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী বন্ধুকে ইঁহার বিশেষ সদস্যপদে নিষ্পাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।

সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ক্যানিংলাইব্রেরী পুস্তকালয়ের সুপ্রাচীন সুপরিচিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনারা অনেকই জানেন। ইনি পরিষদের একজন অপ্রাণিত বন্ধু। ইনি পরিষদের চিত্রশালায় রাখিবার জন্ত বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকের লিখিত এবং অশান্ত কএকজন দেশের গণ্যমান্ত লোকের পত্র আমাকে দান করিয়াছেন। একরূপ অস্বাভাবিক বৈষম্যের নিকট পরিষদ পাহায়াছেন, তাঁহাকেও আমি পরিষদের বিশেষ সদস্যপদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।



ব্যোমকেশ বাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর প্রাচীন মুদ্রাগুলির উল্লেখ করিয়া প্রদর্শকই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুদ্রাগুলির উল্লেখ করিয়া উপস্থাব-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৭ বার্ষিক কার্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয় পড়িয়া শুনাইলেন, ১৭শ বৎসরের কার্য-বিবরণ শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত পুণিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে কার্যবিবরণ পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন—সুখের বিষয় দিন দিন পরিষদের কাগ্যক্ষেত্রের প্রসার বাড়িতেছে। কাগ্যক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্মচারীর সংখ্যা বাড়িতে হইতেছে। প্রথমে একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী দ্বারা ইহাব সমস্ত কৰ্ম্ম সুশৃঙ্খলে নির্বাহিত হইত। ক্রমশঃ গত বৎসরপর্যন্ত বৃদ্ধিত কন্মের বিভাগ নির্দেশ করিয়া এক এক বিভাগের কায়াপরিদর্শনের জন্ত এক একজন সহকারী সম্পাদকের প্রতি ভার দিতে হইয়াছে।

গতবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সমস্ত কার্য এবং সাহিত্য-বিভাগের সমস্ত কবাবোর ভার লইয়া কায়া করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় পত্রাবহার ও সুভাধিবেশনের যাবতীয় কবাবোর ভার লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালা, প্রাচীন পুথিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য ও রমেশভবনের সমস্ত কায়া চালাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত তারাশ্রম গুপ্ত মহাশয় হিসাবপত্র ও আয়ব্যয়ের বিভাগে কায়া পরিদর্শন করিয়া সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। আজকাল এই বিভাগগুলি ব্যতীত মুদ্রণ-বিভাগ পরিষদের কায়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পরিষৎ ত্রীভাষা, শতপথ-প্রাক্ষণ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, রাঢ়ীয় শব্দকোষ প্রভৃতি বহু বহুগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় পত্রিকাসমিতির নিয়মানুসারে নবপ্রথম পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা করায় মুদ্রণ-বিভাগে আট নয়টি ছাপাখানায় যুগপৎ বহুকায়া চলিতেছে। সমস্ত বিষয়ের পরিদর্শন প্রক্ষ দেখা, ছবিছাপা, তাগাদাকরা কাগজের ব্যবস্থা করা, দপ্তরীয় ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বহুকায়া বাড়িয়া গিয়াছে। গতবৎসরে পত্রিকা-সমিতির অভিপ্রায় মত পত্রিকার কায়া পরিচালনার্থ আপনারা পত্রিকা-সম্পাদককে একজন বেতনভোগী সহকারী প্রদান করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হওয়ার এই সহকারী দ্বারা মুদ্রণবিভাগের অন্যান্য কৰ্ম্ম পরিচালনের সাহায্য লইতে হইয়াছে, ইহাতেও পত্রিকা বা গ্রন্থাবলীর কায়া সুশৃঙ্খলে নির্বাহিত হইতেছে না। অতএব আমি প্রস্তাব করি, এই মুদ্রণ-বিভাগের তত্ত্ব করিবায় জন্ত এবংসর হইতে আর একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক এবং এইজন্ত পরিষদের নিয়মাবলীর ১৯শ ও ২৩শ নিয়মের আবশ্যক মত পরিবর্তন করা হউক। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী বি এন্স সি (লন্ডন) মহাশয়ের

প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নোক্ত কক্ষচারিপদে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জ্ঞাত নিযুক্ত হইলেন।

- ১। শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ ( সভাপতি )
- ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ াত্ৰী এম্, এ, ( সহকারী সভাপতি )
- ৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ
- ৪। মাননীয় মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ঐ
- ৫। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, ( সম্পাদক )
- ৬। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাকী ( সহকারী সম্পাদক )
- ৭। শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এম্, আর, এ, এস্ ঐ
- ৮। শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্, এ, ঐ
- ৯। শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, ঐ
- ১০। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ, ঐ
- ১১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানজ্ঞাব ( পত্রিকা-সম্পাদক )
- ১২। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন ( ধনরক্ষক )
- ১৩। অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ ( গ্রন্থরক্ষক )
- ১৪। শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ ( ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক )
- ১৫। গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, বি, এল্ ( আয়বায়-পরীক্ষক )
- ১৬। শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র এম্, এ ঐ

এই সময় কোন প্রয়োজনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় অন্তত্বে গমন করিলে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৮ সালের কার্য-নিকাষক-সমিতির সদস্য-নির্বাচনের ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, এবার সর্বমুদ্র ৫৭৯ জনে ভোট দিয়াছেন। সদস্য-প্রার্থীদিগের মধ্যে এবারে সহরে ২৩জন ও মফস্বলে ২জন ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নমত ভোট পাইয়াছেন।

- ১। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীমতীশ চন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্, এ, পি, এচ্ ডি
- ২। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীকৃষ্ণ
- ৩। শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ,
- ৪। শ্রীশ্রুতেশচন্দ্র সমাজপতি
- ৫। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ,
- ৬। শ্রীকীর্ত্তি প্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ এম্ এ,
- ৭। শ্রীথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
- ৮। শ্রীঅমলচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ

২। শ্রী বনওয়ারী লাল চৌধুরী বি, এম, সি (লণ্ডন)

১০। শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ

ইহাদের মধ্যে ২য় ও ৩য় ব্যক্তি পূর্বের কমিটীর পক্ষে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের স্থানে ৯ম ও ১০ম ব্যক্তিকে লইয়া কার্য-নির্বাহক-সমিতির ৮ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া স্থির হইল।

অতঃপর কার্য-নির্বাহক-সমিতি আপনাদের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত চারিজনকে মনোনীত করিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

২। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

৩। „ চারুচন্দ্র বসু

৪। „ মনমথ মোহন বসু বি, এ

অতঃপর কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, কাগ্যানির্বাহক-সমিতির সাধারণ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৮ জন, মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ৪ জন, এই ১২ জন নির্বাচনে প্রাপ্ত এবং কমিটীরূপে প্রাপ্ত ১৪ জনকে লইয়া এবার কাগ্যানির্বাহক সমিতি গঠিত হইতেছে। ইহাতে সংখ্যার অনুপাত ঠিক হইতেছে না। আমি প্রস্তাব করিতে চাছি নির্বাচিত ও কমিটীরূপে সদস্যের সংখ্যা সমান হউক। একজনে ১৪ জন কমিটীরূপে ও মনোনীত সদস্যের ৪ জন স্থলে ১ জন এবং সাধারণ নির্বাচনে গৃহীত ৮ জনের স্থলে ১৬ জনকে লওয়া হউক। এবারকার ভোটে নির্বাচিত ১০ জনকে লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের পরবর্তী আর আটজন ভোটের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া লওয়া হউক। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, মনোনীত দুইজনকে বাদ না দিয়া নির্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অপর আটজনকে লওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ দুর্গানারায়ণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, চারু বাবুর প্রস্তাব দুর্গানারায়ণ বাবুর প্রস্তাবের মূল কথা বিরোধী তাহাতে নির্বাচিত ও কমিটীরূপে সদস্যের সংখ্যা সমান হইবে না।

ইহার পর মনমথবাবু ও সত্যীশ বাবু কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তাবের গুরুত্ব দেখাইয়া বলিলেন, এ বৎসরের জন্য এ পরিবর্তন অপ্ৰয়োজনীয়, কারণ সংখ্যার সমতার অভাবে যে দোষের আশঙ্কা আছে পরিষদে তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, প্রস্তাবকের যুক্তি গ্রহণীয় কিন্তু তাহা হইলে নিয়মাবলীর বহু নিয়মের বহু অংশ এখন পরিবর্তন করিতে হয়। সাধারণতঃ তাহা না জানাইয়া তত বেশী পরিবর্তন করা দোষের হইবে। বিশেষতঃ পরিষদের সেই শৈশব-গঠিত বর্তমান নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্তন যে এখন প্রয়োজন, তাহা পরিষৎ বুঝেন, আর সেই জন্য নিয়মাবলীর আমূল সংস্কারের জন্য নিয়ম-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছে। ঐহারা নিয়ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা অবশ্যই সূক্ষ্ম কথারও বিচার করিবেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ বৎসর তাহা হইয়াছে তাহার আর

পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ-পত্রে পূৰ্ণ হইতে বিজ্ঞাপন না দিয়া কার্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতিতে না জানাইয়া হঠাৎ এত বেশী পরিবর্তনের কল্পনা করা বা তদনুসারে প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় রামেন্দ্রবাবুর কথা অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এবং সরে আপনারা এই রূপেই কার্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতি গঠন করণ, পরে নিয়ম-সমিতির মীমাংসা লইয়া বিচারকালে সাধারণ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হইবে।

প্রস্তাবক কবিরাজ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধমত আপন প্রস্তাব নিয়ম-সমিতির মীমাংসাকাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলেন।

পরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন কম্বচারী ১৪ জন, নির্বাচিত সদস্য ৮জন এবং মনোনীত সদস্য ৪জনকে লইয়া ১৯১৮ সালের কার্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন “আমি পরিষদের নিয়মাবলীর ১৫ (খ) ও (গ) নিয়মের প্রতি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও তদনুসারে অদ্যকার গঠিত সমিতি হইতে যে সকল ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া কর্তব্য তাহা দেওয়া হউক ও তাঁহাদের স্থানে ভোটের সংখ্যাধিক্যানুসারে অপব ব্যক্তিগণকে সমিতিতে গ্রহণ করা হউক। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার কর মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই প্রস্তাবের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবু বলিলেন ১৯১৮ সালের বৈশাখের হিসাব এখনও খতিয়ান করা হয় নাই, কাজেই বলিতে পারি না কাহার কত বাকী আছে। সুতরাং নিয়ম অনুসারে আমি এখন কাজ করিতে পারি না। সভাপতি মহাশয়ও এক্ষণে পূৰ্ণ প্রস্তাবের যুক্তি দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন এবারকার নির্বাচন পণ্ড কবা ঠিক নহে, কারণ নির্বাচনকারীরা নাম পাইয়া সরল বিশ্বাসে ভোট দিয়াছেন। যাঁহারা প্রার্থী হইয়াছিলেন, আপীস হইতে তাঁহাদের নামাদি ছই নিয়মানুসারে বাছিয়া ছাপিতে দেওয়া উচিত ছিল, অতএব আমাদের ক্রটিতে যাঁহা দোষাবহ হইয়াছে তাঁহার জন্ত এবার সাধারণের প্রদত্ত নির্বাচন নষ্ট করা উচিত নহে। সত্যভূষণ বাবু বরং এ বিষয়ে কার্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতিতে কর্তব্য অবধারণে অনুরোধ করিলে সুব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। সত্যভূষণ বাবু তাহাতে সন্মত হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

অতঃপর পরিষদের ভূতপূৰ্ণ সভাপতি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বর্তমান সভাপতি মহাশয় বলিলেন—চন্দ্রনাথ বাবু ও আমার বাসস্থান একই স্থানে। আমাদের উভয়ের জন্মস্থান আধক্ৰোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। আমাদের মধ্যে বাংলা-বন্ধুত্ব ছিল। আমরা একত্র বহুস্থানে কাজ কর্তব্য করিয়াছি। তাঁহার জ্ঞান নির্ভাবান সাহিত্য-সেবক অতি অল্পই পাওয়া যায়। তিনি প্রথম হইতে সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বহুদিন ইহার সভাপতি থাকিয়া ঐকান্তিক যত্নে এবং প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইহার গঠনকার্য্যে উন্নতি সাধন এবং কার্য্যপরিচালনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ঐর্ষ্যাশালী এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে সভাপতিত্বে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া পরিষদের প্রথম অবস্থার নিরূপণে সর্ব-

বিষয়ে উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিজের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষার একটা বিশেষ চেষ্টা, দেখিতে পাওয়া যায়। রচনার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিতেন। তাঁহার এসম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর প্রসঙ্গ আছে। পরিষৎ-মন্দিরে আজ একরূপ একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের এবং ইহার একজন অক্লান্তম ত্রিভঙ্গী বাবুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় এবার ইহার সদস্য-সংখ্যা-বৃদ্ধি, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণের সহায়-ভূতি আকর্ষণের জন্ত নানারূপ সহজ এবং সুবিধাজনক প্রস্তাব করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রীতিপূর্ণ ও সহজ-সাধ্য প্রস্তাবাদি শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। (এই অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় “১২১৭বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হওয়াতে এ প্রবন্ধটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হইয়াছে। (এই প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ষশেষে পরিষদের সকল হিতৈষী ও আত্মগ্রাহকবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন :—সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা আত্মগ্রহপূর্বক সর্বদা পরিষৎ-কথা স্ব পত্রে প্রকাশ করিয়া ইহার কার্য পরিচালনে সহায়তা করেন। অনেকে অযাচিত ভাবে ইহার সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইহার বলবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়তা করিবেন। গত বৎসরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং এবৎসর পণ্ডিত রসিকরঞ্জন কাব্যার্থী মহাশয়ের যত্নের ও চেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের প্রশংসা করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।